আলোর সন্ধানে

(প্রথম খন্ড)

শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক
শ্রীরণজিৎ সেন
আর্ট য়্যাণ্ড লেটারস্ পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
দোলপূর্ণিমা
১৩৭২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীঅমূল্য দাস

মুদ্রক
ধন্বন্তরি প্রেস লিমিটেড
৫৫ হ্যারিসন রোড
কলিকাতা ৯

।। উৎসর্গ ।।

আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের
পূণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম

*****

☞ প্রস্তাবনা

আমার লেখার অভ্যাস ছিল না কোন কালেই, কিছু যে লিখতে হবে ভাবিওনি কখনও, তবে কালি, কলম, কাগজ সঞ্চয়ের ঝোঁক ছিল খুবই। টুক্ টাক, রোজনামচার মত লেখা কিছু ছিল অবশ্য। গুরুবাবা মাঝে মাঝেই বলতেন, "বিষ্টু, কবে ক্রিয়া পেলে, কবে কোন্ উপরের ক্রিয়া পেলে ও তার অবস্থা কি রকম, দিন তারিখ দিয়ে সব লিখে রেখো।" আমার কিন্তু রাখা হয়নি। এখন তাই বুঝছি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কথার সুদুর প্রসারী ক্রিয়াশক্তি। আজ বহুজনের (ক্রিয়ান্বিত/ক্রিয়ান্বিতা) কাছ হতে বার বার তাগাদার পর কাগজ কলম হাতে নিলাম, আর আমার দয়াময় বাবার কাছে প্রার্থনা জানালাম যেন আমার লেখনীতে তিনি মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন। বোধহয় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে তিনি কিছু লেখাচ্ছেন। আমার লেখার কোনই অভ্যাস্ ছিল না, আগেই বলেছি, লিখিওনি কোনদিন, তাছাড়া আমার হাতের লেখাও খুবই খারাপ। সেই লেখা থেকে উদ্ধার করে ছাপাবার উদ্দেশ্যে পান্ডুলিপি অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী করে দেয় আমাদের সম্প্রদায়েরই ভক্ত ক্রিয়ান্বিত অধ্যাপক কিরীটি কুমার। তার আত্মিক উন্নতির জন্যে গুরুদেবের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাই। তাছাড়া আরও যারা সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে আমার অকৃত্রিম বান্ধব "দিলীপদা" (দিলীপ কুমার মিত্র) একজন ভক্ত ও উচ্চ ক্রিয়ান্বিত। এই দিলীপদা বহুকষ্টে আমার টুকরো টুকরো লেখাগুলো সংগ্রহ করেছে ও পাঠোদ্ধার করে দিয়েছে। এরা ছাড়া আরও অনেকেই আছে এই পুস্তকের প্রকাশ ঘটাতে নানাভাবে নানাদিকে সহযোগিতা করেছে, তাদের সকলের নাম কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়

উল্লেখ করা গেল না। আরও যে দুজন আছেন এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে যাদের নাম উল্লেখ না করলে ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাদের মধ্যে একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর অপরজন আমার গুরুভ্রাতা শ্রীকালিদাস মজুমদার। যিনি ছাপানোর কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ না করলে পুস্তকটি ছাপানো সম্ভব হোত না। এঁদেরও আত্মিক উন্নতির জন্য গুরুদেবের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাই। এছাড়া আমার মত সাধারণ জীব আর কি করতে পারে? আর আর্থিক সাহায্য যাঁরা করেছেন তাঁরা বিত্তবান না হলেও অনেক প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। হাওড়া জেলার জুজার সাহা নিবাসী কয়েকজন ক্রিয়ান্বিত এঁদের অন্যতম। গুরুদেব এঁদের মঙ্গল করবেন। উল্লেখ করতে হয় স্থানীয় ও নানাস্থানের কয়েকজন ক্রিয়ান্বিতের প্রেরণা, যাদের লাগাতার প্রেরণা পুস্তকটির প্রকাশনায় বিশেষভাবে উৎসাহ যোগিয়েছে।

এই পুস্তকের দ্বারা যদি ক্রিয়ান্বিত/ক্রিয়ান্বিতাদের মধ্যে ক্রিয়া করার সামান্য উৎসাহও জাগে, তাহলেও জানব আমার জীবন ধন্য।

আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা ক্রিয়ার জয় হোক। ক্রিয়ার জয় হলেই নিপীড়িত জীবের মহাকল্যাণ হবে — হবে আমাদেরও কল্যাণ।

জয় গুরু।

শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-

মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্তরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।।

গীতা ৮/৯

ওঁ

আলোর সন্ধানে

প্রথম অধ্যায়

শৈশব ও আমি

সাধনাতে বাধা অনন্ত, কিন্তু হতাশার অনুপ্রবেশ ঘটলেই মহা বিপদ। জয় সুনিশ্চিত এ'কথাটা মনে রাখতে হবে। **নাছোড়বান্দা হয়ে শ্বাসের পেছনে লেগে থাকতে হবে এবং শ্বাসের উজানে চলতে চেষ্টা করতে হবে তার উৎস সন্ধানের জন্যে।** শ্বাসকে ধরতেই হবে কারণ এই শ্বাসই হল আমাদের মাতা, শ্বাসই হল আমাদের পিতা, এমন কি কীটপতঙ্গ হতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সবই এই শ্বাস — যা দুই নাসিকার ভেতর যাতায়াত করছে। সে আমার শত্রু, মিত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যতকিছু আছে সকলের সাথে একমাত্র যোগসূত্র, ঈশ্বর সাধনার উৎস ও অন্ত। ইনিই আমাদের শস্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, যম ও জীবন — যার বিহনে এক মুহুর্ত্ত চলে না। শ্বাস আমাদের পরম পরিত্রাতা, এতে লেগে থাকতে পারলেই মনটাকে এর দ্বারাতেই বাঁধা যেতে পারে এবং জয় করা যেতে পারে। শ্বাসকে জয় করতে পারলেই জগৎকে জানার আর বাকি থাকে না, তাই একমাত্র শ্বাসই সাধ্য বিষয়, শ্বাসই সাধনা, শ্বাস ছাড়া সাধনা হয় না। **একমাত্র শ্বাসকেই আমরা নানারূপে পূজা করি।** শ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলেই প্রকৃত 'জপ' হয় এবং এতেই 'জপসিদ্ধ' হওয়া যায়। শ্বাস অতি সহজ বস্তু, তাকে জয় করতে পারলেই 'সহজিয়া' হওয়া যায়।

গায়ের জোরে শ্বাসজয় হয় না, তার একটা কৌশল আছে। সঠিক পদ্ধতি অতি গোপনীয় গুরুমুখী বিদ্যা, একমাত্র গুরুসেবা দ্বারা তা জানা যায়, কারণ এ বিদ্যা অতি গুপ্ত, অতি প্রাচীন বিদ্যা। আর

সেই প্রাচীন বিদ্যার সঠিক কৌশল, সঠিক পদ্ধতি না জেনে আমরা সাধনাকে জটিল থেকে জটিলতম করে তুলি অথচ পাহাড়, পর্ব্বত, জঙ্গল, গুহা সর্ব্বত্র যে শ্বাস বিদ্যমান, তাকে অন্তরে ধারণ করেই 'মহাযোগী' 'মহামহেশ্বর' অবস্থা লাভ করা যায়।

ত্রিভুবনে শ্রীগুরুর মত এমন দয়ালু আর কে আছে? জীবনে এত দেখলাম, আজ জীবনের সন্ধ্যায় এই বোধ হচ্ছে যে প্রকৃত আপনজন গুরু (ঈশ্বর) ভিন্ন আর কেউ নেই। তিনি কিছুই প্রত্যাশা করেন না — স্তুতিতে, নিন্দায় অবিচল তিনি। শতসহস্র ঝড় ঝঞ্ঝাতেও তিনি নিশ্চল। সব দেখেন তিনি, কিন্তু থাকেন অবিচল। তিনি দেখেন তাঁর নিজের সৃষ্টি কেমন ভাবে ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু বিকার গ্রস্ত হন না, নির্ব্বিকার চিত্তে সৃষ্টির কাজে লেগে থাকেন। আমরা তাঁর যে স্তুতি করি, সেটা তাঁর প্রসন্নতার জন্যে নয়, সে শুধু নিজের প্রসন্নতার জন্যে, নির্ম্মল হওযার জন্যে, শান্ত হতে পারার জন্যে। তাঁকে আমরা দিইনা কিছুই, মনেও আসেনা আমাদের, কিন্তু অকাতরে কত কিছুই না তিনি আমাদের সর্ব্বদাই দিয়ে চলেছেন।

গুরুরূপে তিনি বিকারশূন্য, কিন্তু সেই তিনিই যখন কোন ঘটে প্রবেশ করেন, তখন তিনিই আবার কত বিকারকাতর বা কত না উচ্ছ্বাসে মেতে উঠছেন। একমাত্র সাধনা দ্বারা যদি এই বিকারের নাশ করা যায় তাহলে আবার যে কে সেই। দেহের ভেতরে যখন আছেন তখন তিনি 'জীব' — আর সেই দেহের মোহ ছেড়ে যখন দেহের বাইরে যান তখনই 'শিব'— তাই দয়াল গুরুর মহিমা বোঝা দায়। ঘর হতে বার হলেই "সেই আমি" আর ঘরের ভেতরে এলেই "এই আমি"। ঘরে ফিরলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মায় মোহ ইত্যাদি নোংরামিতে জড়িয়ে কেমন যেন এক কিম্ভুত কিমাকার চেহারা, চরিত্র — আর দিগম্বর হতে পারলেই অর্থাৎ দেহ থেকে প্রাণ আলাদা হলেই এক আনন্দঘন অবস্থা। তখন আমিই আনন্দ, আমিই জ্ঞানী, আমি সবাকার, সবাই আমার — নেই কোন ভেদাভেদ,

নেই কোন স্বার্থপরতা, নেই কোন জাতিভেদ, নেই কোন আপন পর সেই অবস্থা, ''কহনে না যায়।'' এ সমস্তই আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান। তাই অনেকেই যখন আমার নিজের জীবনের ইতিহাসের খবরে আগ্রহ প্রকাশ করেন, চেষ্টা করব দয়াল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে — তিনি যেন আমার ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতি থেকে সারবত্তাহীন ঘটনাবহুল জীবনের ঘটনাগুলোকে টেনে এনে লেখনীতে প্রকাশে সাহায্য করেন।

শিশুকাল থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে গেলে, কোন কোন জায়গায় একটু খাদ হয়ত থাকলেও থাকতে পারে; কারণ, নির্ভেজাল সত্য অনেক সময় স্বাদবিহীন হয়। তাই পূর্ব্বেই বলে রাখা ভাল যে ঘটনাগুলোকে সাজাতে একটু স্বাদ ও রসযুক্ত করার জন্যেই হয়ত একটু খাদ মেশাতে পারি; কিন্তু তাতে সত্যের বিলোপ হবে না বলেই বিশ্বাস করি; তারপর গুরুদেব জানেন। জীবনটা যেহেতু ঘটনাবহুল, তাই বহুকথা, বহুব্যথায় ভরা শিশুকালের সব স্মৃতি গুছিয়ে লেখা হবে কিনা তা গুরুদেবই জানেন। সারাটা জীবন তাঁর বৈচিত্র্যময় লীলাই শুধু দেখে গেলাম।। আর সেই লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্যই বুঝি ১৩৩৯ সনের ৭ই বৈশাখ বুধবার (ইং ২০শে এপ্রিল ১৯৩২) দিবাভাগে ৩টা ১৫মিঃ পূর্ণিমা তিথিতে 'ময়মনসিং' জেলার 'জামালপুর' মহকুমার অন্তর্গত 'নারায়ণপুর' গ্রামে এই অভাগা মাতৃগর্ভ থেকে চ্যুত হয়ে দেহধারীরূপে ভূমিষ্ঠ হল, যা আজও বহন করে চলেছি, আর এই দেহটা নিয়েই পরম দয়াল গুরুদেব কত রকমারী লীলা করে চলেছেন সে সমস্ত ভাষায় প্রকাশ করা খুবই সুকঠিন।

আমার মাতৃদেবীর গর্ভযাতনা আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে গর্ভচ্যুত হওয়া পর্য্যন্ত নাকি মায়ের ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। একে বৈশাখের প্রচন্ড গরম, তার উপর দুপুরের মার্ত্তন্ডদেবের দাবদাহ।

পরে, আমার মা ঠাকুমার মুখে শুনেছি যে, আমি নাকি প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে জন্মেছি এবং অদ্যাবধি জ্বালা দিয়েই চলেছি। ছোট্টবেলায় নাকি লাগাতার কাঁদতাম, আর আমার দৃষ্টিতে নাকি পাকামির ছাপ স্পষ্ট ছিল, তাই আমার আজন্ম শত্রু আমার ঠাকুমা, আমার নাম রেখেছিল ''কাঁন্দুরা বুড়া''। আমার জন্মভূমিটা তো পূর্ব্বতন পূর্ব্ববাংলায় যা পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব পাকিস্তান — অধুনা বাংলাদেশ। ঐ দেশের— 'ময়মনসিংহ' জেলার 'সেরপুর' থানার 'নারায়ণপুর' গ্রামের ছেলে আমি। বর্ত্তমানে সেরপুটাই জেলা হয়েছে। এখন অনেকেই বিশ্বাসই করবে না যদি বলি **প্রকৃত ''সোনার বাংলা'' নামটা পূর্ব্ববাংলার মত জায়গা ছিল বলেই বোধহয় হয়েছিল। সেখানকার মানুষের সহজ জীবন যাপন, সরল সাধাসিধে চিন্তাধারা, উচ্চমানের আদর্শ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে উন্নত করেছিল এমনভাবে যা বর্ত্তমানে কল্পনায় পাওয়াও মুস্কিল। মানুষের মধ্যে অভাব বোধ ছিল না বললেই হয় - আর প্রকৃতির দান ছিল প্রচুর। সমস্তই কালের করালগ্রাসে আজ বিলীন হয়ে গেছে - এখন সমস্তই ধারনার অতীত, শুধুই স্মৃতি হয়ে আছে।**

আমার পিতৃদেব ছিলেন বাড়ীর ভেতর প্রচন্ড গম্ভীর, খুব কড়া প্রশাসক, নিয়মানুবর্ত্তীতার ধারক ও বাহক। শোনা যায় বাবার কাঠিন্যকে একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে তবে ঘটনাটা ছিল এ'রকম।

তখন আমার বয়স মাস দেড়েক হবে সেই সময় একদিন আমার মা নাকি আমাকে সাময়িকভাবে বাবার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। দুপুরবেলা বাবা সাধারণতঃ ঐ সময়ে বাড়ীর বাইরে কাছাড়ীবাড়ীতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। কি কাজে বাবা হঠাৎ বাড়ীর ভেতরে এসেছেন, আর দেখেন ঐ অবস্থা অর্থাৎ আমি বাবার বিছানায় শুয়ে আছি। বাবার বিছানা থাকত অত্যন্ত পরিষ্কার — সাদা চাদর পাতা, সমস্ত বিছানাটা সাদা ধবধবে

শ্বেতশুভ্র। বাবা নিজের হাতে তাঁর সমস্ত কাজ করে নিতেন — বিছানার চাদর কাচা, বিছানাপাতা, পরিষ্কার রাখা, এমন কি বাড়ীর ভেতর ও বাইরে কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও গো-সেবা পর্য্যন্ত বাবা নিজে করতেন, নিজের কাজ কাউকেও করতে দিতেন না। কখনও বাবার কোন রোগ হতে দেখিনি, শুধু একবারমাত্র 'ভগন্দর' নামে ব্যাধি হয়েছিল কিন্তু সেই অসুস্থ অবস্থাতেও নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। প্রচন্ড কঠিনস্বভাবযুক্ত ছিলেন বাইরে, তাই আমাকে ঐ অতটুকু বয়সের শিশুকে নিজের ঐ পরিষ্কার বিছানায় দেখে, বিছানা নোংরা হওয়ার আশঙ্কায় এবং এটাকে অর্থাৎ ঐটুকু শিশুকে পরিষ্কার বিছানায় রেখে নোংরা করার সুলভ ইচ্ছাকে, ইচ্ছাকৃত অপরাধ ভেবে আমার পা দুটো ধরে ছুড়ে দিয়েছিলেন মেঝের উপর — আর আমি নাকি একবার মাত্র একটা 'ক্যাঁক' করে শব্দ বের করেই পরক্ষণেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, গায়ের রঙ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। ভাগ্যিস্ ঘরের মেঝেটা ছিল মাটির, সেটা যদি পাকা হোত তাহলে এ দেহটা সেইদিনই খতম্। রাগটা অবশ্যই ছিল মায়ের উপর। ঠাকুমা তো বাবাকে খুব গালাগালি করলেন। এমনিতে বাড়ীর কারও সাহসই ছিল না বাবাকে কিছু বলার, কিন্তু বাবা ঠাকুমার একমাত্র সন্তান হলেও, প্রচন্ড মাতৃভক্ত ছিলেন — তাই, সেদিন মায়ের ঐ বকুনি খেয়ে বাবা নাকি মাথা নীচু করে বাড়ীর বাইরে কাছাড়ী বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীটা ছিল দু'মহলা, ভেতরেরটা ছিল খাসবাড়ী বা অন্দরমহল আর বাইরের বাড়ীটাকে বলা হোত কাছাড়ীবাড়ী। অন্দরমহলটা ছিল টিনের চৌচালা —মাটীর ভিত, তাই সেদিন রক্ষে পেয়েছিলাম। বাবা হয়ত প্রকৃতপক্ষে অত জোরে ছুড়ে দেননি, তবে মা ঠাকুমার মুখে এ সমস্ত শুনেছি পরবর্ত্তীকালে। যাই হোক দেহটা সে যাত্রা টিকে গিয়েছিল।

শুনেছি কথা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে অকালপক্কভাব বা যাকে বলে এঁচোড়েপাকা ভাব ছিল, আচার আচরণ বা ব্যবহারে

দেখা গিয়েছিল বুড়োটে স্বভাব। তার একটা বিবরণ দিচ্ছি — যখন সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছি সেই অবস্থায় আদুল গায়ে, নাঙ্গা হয়ে সব জায়গায় চরে বেড়াতাম। কোমরে কালো ফিতে বাঁধা আর তাতে থাকত তখনকার নিয়মে লোহার জালকাঠি ও লোহার চাবি, সঙ্গে কানাকড়ি, যাতে কারও কুনজর বা কুবাতাস আমার গায়ে না লাগে। কখনও কখনও মা আমাকে দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গেও বেঁধে রেখে দিতেন, কারণ মা তো একা — নানা কাজে ব্যস্ত, আমাকে দেখার কেউ নেই। আমার দিদি আমার থেকে মাত্র দু বছরের বড় ছিলেন। হায়, সেই দিদিও আজ আর ইহজগতে নেই। সে আমার কত না অত্যাচার সহ্য করেছে ! আজ তাই ভাবি, আমার এই দেহে আমি যত কিছু যাতনা সহ্য করেছি বা করছি, তা আমি যা অপরের ওপর করেছি, তার তুলনায় এ কিছুই নয়। আজ তো বার্দ্ধক্যে পৌঁছেই গেছি । দয়াল গুরু এই ভোগের মধ্য দিয়ে কর্ম্মখন্ডন করিয়ে দিচ্ছেন। আর কতদিনই বা এ দেহ থাকবে? তাই দয়ালগুরু ভোগটুকু করিয়ে নিলেই মঙ্গল। আর যেন দেহ ধারণ না করতে হয়। যা কিছু যন্ত্রণা এই দেহটাতে, যত কিছু কলঙ্ক এই দেহটাতে — কাম, ক্রোধ যত কিছু রিপুর তাড়না এই দেহটাতে। আমাতে প্রকৃতপক্ষে এক বিন্দু নোংরা নেই । পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যত কিছু সংস্কার জড়িয়ে আছে এই দেহটাতে যার জ্বালায় এত অস্থির কান্ড। নানা রঙের কাঁচ লাগান আছে, তাই বাইরে থেকে মনটাকেও সেই রঙের মনে হয়। সব কিছু দেহটার সাথে এখানে পড়ে থাকবে — থাকবে সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর। কর্ম্মক্ষয় না হলে সূক্ষ্ম শরীর জানা যাবে না। তাই মনটাকে সাদা করতে হবে।

শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখলাম — প্রকৃত সুখ কিছুই নেই। যতটুকু সময় গুরুদেবকে মনপ্রাণ দিয়ে স্মরণ করা যায় ততক্ষণই যা সুখ।

যাই হোক, ছোট বেলাকার সেই যে পাকা পাকা আচরণের কথা বলছিলাম, যা আমার মা ও ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, সেই কথায় আসা যাক্।

তখন আমার বয়স দুই কিংবা তিন বৎসর হবে — সেই সময়কার কথা। আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীটাই ছিল আমার বাবার মামার বাড়ী। আমার বাবার মামার অর্থাৎ আমার দাদুর বড় ছেলের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ওদের সেই ছিটে বেড়ার ঘরে ওরা দুজনে অর্থাৎ আমার কাকা ও নোতুন কাকীমা তখন দুপুরবেলা, হয়ত দুজনে আছে, এমন সময় বেড়ার ফাঁকে আমাকে দেখে আমার নূতন কাকীমা হঠাৎ বলে উঠেছেন "কে রে ওখানে?" কাকীমা হয়ত মজা করার জন্যেই জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছিলাম 'তোর বাপ।' 'ব্যস্' আর যায় কোথা? সেদিন থেকেই নূতন কাকীমা আমাকে 'বাপ' ডাকতে সুরু করলেন আর কাকা ডাকতেন, 'শ্বশুর' বলে। এভাবেই চলে এসেছে।

ছোটবেলায় আমার দেহ ছিল গোল গাল মোটাসোটা। রঙ বেশ কাল এবং দেহ খুব ঠান্ডা — ওজন ছিল বেশ ভারী, মেয়েরা কেউই বেশীক্ষণ আমাকে কোলে তুলে রাখতে পারত না। মাও আমাকে কোলে করার চেয়ে বেশীর ভাগ কোমরের কালো ফিতেটাতে দড়ি বেঁধে মাটিতে রেখে দিতেন। অনেকে আমাকে পাথরের শিব বলতো। ক্রমে দিনে দিনে দেহটাও বাড়ে, বদ্‌বুদ্ধিও বাড়ে। বাবা ও মার কাছে মাঝে মাঝেই প্রচুর উত্তম মধ্যম উপহারও পাই, তবুও কিন্তু তাতে আমার বড় একটা চেতনা আসে না। আমার বর্ণ পরিচয় হয় খুব সম্ভব পিতৃদেবের কাছে। কারণ বেশ মনে আছে যে, বাবা আমার হাত ধরে শ্লেটের উপর দাগা বুলিয়ে দিতেন। লেখা পড়াতে মোটেই মন দিতাম না, শুধু খেলাধূলা করা, চুরি করে খাওয়া, দুপুরে আমার কাকা, দাদু যখন পুকুরে মাছ ধরতেন, তাঁদের সহযোগিতা

করা এই সবেই ঝোঁক বেশী ছিল। মোটের উপর আমাকে ঘরে আটকে রাখা ছিল দুরূহ কাজ। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় রোগ বালাই বড় একটা ছিল না বলা যায়, কখনও একটু আধটু রক্ত আমাশয় বা ম্যালেরিয়া হয়ত হোত, তবে তারাও বেশীক্ষণ আমল পেত না।

আমাদের বাড়ীতে নারায়ণ ও কামাখ্যা দেবীর শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল — তাঁদের নিত্যসেবা হোত — দুপুরে ভোগ, বৈকালে বৈকালী দেওয়া হোত। দুর্গাপূজা ছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ বাড়ীতে লেগেই থাকতো। দেখতাম, বাবা, মা, ঠাকুমা প্রতিটি বার ব্রতে কিভাবে উপবাস পালন করতেন। সারাদিন, যতক্ষণ না পূজা পাঠ শেষ হোত, তাঁরা জলস্পর্শও করতেন না। কালীপূজার উপবাস হোত ২৪ঘন্টা, কিন্তু এমনই মনের জোর ও অভ্যাস ছিল ওঁদের, যে উপবাসের পরে দেহে দুর্ব্বলতার কোন চিহ্নও থাকত না, অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারতেন — রোগ বালাই এঁদের কাবু করতেই পারত না, বিশেষ করে আমার পিতৃদেবের শরীর খারাপ হওয়ার কোন বালাই ছিল না। তিনি শুধু দিনের বেলা একবার আহার করতেন, — ডাল, ভাত, মাছ খুব কম, মাসে হয়ত ২/৩ দিন, দই রোজ দিনের বেলা খেতেন, আর রাত্রে শুধু একটু দুধ। এই খাদ্যাভ্যাসে তিনি ৯২ বৎসর জীবিত ছিলেন। কারও সেবা তিনি গ্রহণ করতেন না। ভগন্দর নামক ব্যাধিটিকেও মনে হয় মনোবলের দ্বারাই সারিয়ে ফেলেছিলেন।

শিশুকাল থেকে আজ প্রায় ৬৭ বৎসরে পদার্পণ পর্য্যন্ত এ দেহটাকে নিয়ে গুরুদেব কত খেলাই না খেলছেন — জীবের এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। সৎ বা অসতের বিচার করে কি লাভ তাও বুঝতে পারলাম না। দেহের উপরই সকলের নজর, দেহটাকেই সকলে ভালবাসে। আবার কেউ ভালবাসার পরমূহুর্ত্তেই অবজ্ঞা করে, কেউ কেউ ঘৃণাও করে কিন্তু এই দেহের ভেতর বাস করে 'যে' এ দেহটাকে নাড়াচাড়া করছে, তাকে কেউ দেখে না, লক্ষ্যও করে না।

বিচার করে দেখে না যে, যিনিই পিতা সেজেছেন, সেই তিনিই আবার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। দৃষ্টি না খুললে তো তাঁর হদিস পাওয়া যাবে না, তাই দ্বন্দ্বেরও অবসান হয় না।

আমার যতদূর মনে আছে ছোটবেলা থেকেই আমার বিশেষ করে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর উপর একটা টান অনুভব করতাম। বাবা কিন্তু আমাকে কাছে কাছে রাখতেন বলেই, অথবা বাড়ীতে বারোমাসে তের পার্ব্বণ লেগে থাকতো বলেই, বোধহয় এটা সম্ভব হয়েছিল। খাবারের গন্ধ পেলেই আমি মায়ের কাছে কাছে বেড়াতাম — উদ্দেশ্য থাকত যদি কোন প্রকারে কিছু উপরি পাওনা পাওয়া যায়। আমার উপর কড়া নজরদারী সত্ত্বেও মা (আমার গর্ভধারিনী) আমার ছলনার কাছে হার মানতেন। অনেক সময় বুঝতে পারতেন, কিন্তু হাতে নাতে ধরা না পরার জন্যে হার মানতে বাধ্য হতেন। আর তার পরেই রাগের জ্বালায় আসত শাপ শাপান্ত — অর্থাৎ ''দেখবি ঠাকুর অভিশাপ দেবে, মরবি, জন্তুতে খাবে তোকে, হেগে হেগে মরবি'' এইসব আর কি। আর গালাগাল তো ছিলই যেমন, ''অসুর কোথাকার, কচ্ছপ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস যে, মায়ের রাগ ছিল জলের রেখার মত — ওটা অভিশাপ নয় আশীর্ব্বাদের নামান্তর।

শিশুকাল থেকেই আমার প্রকৃতিটা এমনই ছিল যে, অবহেলা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা এ সবই ছিল আমার স্বাভাবিক প্রাপ্তি। এর কারণ, আমার আচার আচরণ এমনই ছিল যে, ঘরে একরূপ, বাইরে অন্যরূপ। বাইরের লোকের কাছ থেকে আদর, যত্ন, ভালবাসা, সম্মান বাহ্যতঃ হলেও যথেষ্ট প্রাপ্য ছিলই। এমন কি আজ এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও ঐ একই নিয়ম চলে আসছে। কেন জানি না, আমার এই দেহটা থেকে এমনই আচার আচরণ প্রকাশ পায় যে, যাদের সাথে একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা যখনই হয়, তখনই তাদের কাছ থেকে অমনি,

আসে অবজ্ঞা, অবহেলা আর অপমান। আমার এই দেহটা দিয়ে ঘরের বা বাইরের কারও যত স্বার্থসিদ্ধি বা যত উপকারই হোক না কেন, আমার ঐ প্রাপ্যটুকু ব্যতিক্রম হয় না। আবার বলছি যে— দোষটা কারো নয়, দোষটা আমার। কারণ আমা হতে যে আচার আচরণ প্রকাশ পায় তার দোষ। যদিও প্রাথমিক স্তরে অহং এ কিছু আঘাত হয় তবে পরে বিচারের দ্বারা সেই আঘাত নিরাময় হয়। মায়াবদ্ধ জীব আমরা — মায়ার প্রভাব যাবে কোথায় ?

মনে পড়ে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক দলের কাজ, কর্ম্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। একে ত তৎকালীন পূর্ব্ববাংলায় রাজনৈতিক চেতনা বেশ প্রবল ছিল, এছাড়াও, আমাদের পরিবারের সবার বড় দাদা ও আর এক দাদা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাড়ীতে পুলিশী হামলা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমাদের কয়েকজনের শিশুকুলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যে, সন্দেহভাজন লোকজন দেখলেই বড়দের সংকেতের মাধ্যমে খবর দেওয়ার। তারপর আর একটু বড় হওয়ার পর দায়িত্ব ছিল বহিরাগত রাজনৈতিক নেতাদের গভীর রাত্রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পথ আলোর সংকেতের দ্বারা চিনিয়ে পৌঁছে দেওয়া, রাত্রে পোষ্টার লাগানো, প্রভাত ফেরী ইত্যাদি। **সেই সময়কার রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ছিল অনুকরণীয়। তাদের হৃদয় ছিল বিশাল - তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রাণে প্রচন্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করত।** প্রতিটি কাজের সাথে ঈশ্বর স্মরণ ছিল আমার একটা অভ্যাস, আর এটা বোধহয় পেয়েছিলাম আমার পিতামাতার কাছ থেকে। কারণ, তাঁদের দেখেছি, ভোর রাত্রে জাগরণের পর থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের মুখে সব সময় নানা দেব দেবীর নাম স্মরণ ও স্তোত্র পাঠ লেগেই থাকত। আর প্রতিদিন বৈকালে দেখতাম মা, ঠাকুমা ও পাড়ার অন্যান্য মহিলারা একত্রে বসে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পাঠ করতেন — আর

আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে বসে সেই পাঠ শুনতাম। কি যে ভাল লাগত কি বলব? সমস্ত পরিবেশটা যেন অন্য রূপ পেত, সকলে আমরা যেন এক পরিবারের বলে মনে হোত। আর একটা কারণও ছিল ঈশ্বর নির্ভরতা আসার — সেটা হল, রাজনৈতিক শত্রু যে শুধু পুলিশই ছিল তা নয়, আত্মীয় পরিজনের মধ্যেও ছদ্মবেশে যারা ছিল, তাদের চিনতে ঈশ্বরনির্ভরতা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

যতদূর মনে পড়ে আমি একা একা আপনমনে থাকতে সেই সময় থেকেই খুব ভালবাসতাম। বন্ধু বান্ধব যে ছিল না তা নয়, তবে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বা আন্তরিকতা ছিল কম। যা করতাম তা নিজের মর্জ্জিতেই করতাম, কারও আধিপত্য পছন্দই করতাম না— শুধু ঈশ্বরকে বা কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ ও মা কালী ইত্যাদি দেবদেবীর যাকে তখন ভাল লাগত তাকে স্মরণ করেই করতাম। তাই বলে বড় হয়ে কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের সব সময় সব রকম সম্মান দিতাম, কখনও অবজ্ঞা করতাম না। এটা ছিল আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। সমবয়স্কদের মধ্যে যেখানে আমার আধিপত্য খাটতো না সেখান থেকে সরে পড়তাম। কিন্তু ক্লাবে, পাড়ার কাজে বা অফিস ইউনিয়নে ষোল আনা কাজ করলেও পদের কোন মোহ ছিল না, শুধু জীবনে একবার মাত্র বড়দের চাপে, জোর জবরদস্তিতে পাড়ার পূজা কমিটিতে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। যে কোন কাজ জীবনভোর নিজ দায়িত্ব নিয়ে করতে ভালবেসেছি এবং গুরু কৃপায় এই ব্যাপারে কখনও সফলতা ছাড়া বিফলতা আমাকে স্পর্শও করতে পারেনি।

খুব ছোটবেলাকার ঘটনাগুলো এত বেশী, এত বৈচিত্র্যময় যে স্মরণে আনা ও লেখনীতে প্রকাশ করা সুকঠিন। মোটামুটি বলা যায় যে ঐ সময়ের মনে বদ বুদ্ধি খুব পাক খেতো, নোতুন নোতুন ভাবে চুরি করে খাওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাছ বিচারও ছিল না। আমার মাতা ঠাকুরাণী ও ঠাকুমা আমার

চুরি করে খাওয়ার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন কিন্তু কোন রকমেই চুরি করে খাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারতেন না। খিদে যেন সর্ব্বদা অমার পিছু ধাওয়া করতো। স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভাল, গায়ে বলও ছিল যথেষ্ট, তাই সমবয়সীরা তো দূরের কথা অনেক বেশী বয়সীরাও আমার সাথে, এঁটে উঠতে পারতো না। খেজুর ও তালগাছ ছাড়া সব গাছে উঠতে পারতাম, পুকুর বা নদীতে সাঁতার কাটা ছিল ছেলেখেলা। ব্যায়াম তো নিয়মিত করেছি, কুস্তি করেছি আর ভারোত্তোলনও করেছি, কিন্তু কখনও কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি, কারণ নিজেকে বড় করে দেখানো আমার চিরদিনের অনীহা। নাটক, আবৃত্তি সকলের সাথে গলা মিলিয়ে গান করা, এই সবই বেশী করেছি।

শিশুকাল থেকেই আমার জীবন খুবই ঘটনাবহুল। এই প্রায়োবৃদ্ধ বয়সে এসে এখন ভাবি যে দয়াল গুরুদেব হয়ত পরবর্ত্তীকালে এই অবস্থায় ফেলবেন বলেই বোধকরি এত অভিজ্ঞতা জমা করে রেখেছিলেন। জীবনের শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত রকমের নারী ও পুরুষের সাথে যে মিশতে হয়েছে — কত বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার হিসাব রাখা দুরূহ। মনের গভীরে যখনই প্রবেশ করি তখন যেন দেখি যে তাদের কারও সঙ্গে বা এই জন্মে, কারও সঙ্গে বা পরিচয়ের সূত্র কয়েক জন্ম ধরেই রয়েছে এবং সেই ক্রম অনুসারে কারও সাথে অতি আন্তরিক ভাবে মিশে যাই, আবার কারও সঙ্গে বাইরে আন্তরিকতার ভাব থাকলেও সেখানে ভাবের গভীরতা তত থাকে না। মায়ার দুনিয়াটা এক প্রচন্ড বিস্ময়, আজব দুনিয়া বলা যায়, তবে এটা কিন্তু অনুভবের বিষয়, অপরের অনুভূতিতে আনা যায় না। এর মধ্যে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা এই নারী চরিত্র — যাকে কত কবি কত সাহিত্যিক তাঁদের অমর লেখনীতে কত বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছে, কিন্তু তবুও যেন বাকি রয়ে গেছে অনেক কিছুই। এরা কখনও শ্যামা, কখনও বামা, কখনও রমণী, কখনও বা ব্রহ্মময়ী।

অনন্ত সংখ্যক কলম ও এক সমুদ্র কালি নিয়ে বসে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল ধরে লিখে গেলেও নারীর চরিত্র পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব বলে মনে করি। এ মহামায়ার এক বিচিত্ররূপ। স্থূল জগতে পুরুষকে সংযত করতে পারে নারী; মোহিত করে ফেলতে পারে এই নারী, কিন্তু আত্মিক জগতে পুরুষই পারে নারীকে সংকুচিত, সংহত ও আত্মসাৎ করতে। নচেৎ নারী উভয় জগতে অপ্রতিহত। পুরুষের মধ্যে নারীশক্তি নিহিত থাকে বলেই পুরুষ এত কর্ম্মক্ষম, আর আত্মিক জগতে নারী চরিত্র পুরুষ শক্তিতে (ব্রহ্মশক্তিতে) বলীয়ান বলে সেই রূপে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহারক। ভগবান জীবকে বলছেন — মান, অপমান, স্তুতি, নিন্দা, সুখ, দুঃখ, প্রাচুর্য্য, অভাব, পাপ, পুণ্য সমজ্ঞান করতে, কারণ আমরা তাঁর সন্তান — তাঁর মায়ার দ্বারা আবরিত হয়ে অনেক নোংরা ঘেঁটেছি, সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছি। কিন্তু যদি একবার সঠিকভাবে তাঁর শরণাগত হওয়া যায়, যদি তাঁর দ্বারস্থ হওয়া যায় (যা কিনা সদ্‌গুরুর দ্বারা সম্ভব একমাত্র) তবে দেখা যায় সে আমাকে অম্লান হাসিমুখে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত এবং উদ্যত, যেন কোন মা অনেকদিন বাদে তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছে। সেই মা তখন পাপ, পূণ্য, সুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম কিছুই বিচার করেন না। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন, শুধু তাঁর শরণাগত হতে আর তাঁকে স্মরণ করার সময় অন্য চিন্তা যেন মনে না আসে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে সংসারে মোহ সৃষ্টিকারী যে সমস্ত শক্তি কাজ করে তার মধ্যে নারী জাতির মধ্যে মোহ সৃষ্টিকারী শক্তি অসাধারণ এবং এই শক্তি পুরুষকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে একেবারে ধ্বংস করতে পারে। আবার ঐ নারীজাতির ভিতরে এমন করুণাঘন সঞ্জীবনী শক্তি আছে যা বিপরীত ভাবে একটা জাতিকে

সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে। নারী রুষ্টা হলে এর মত নাশকারী দ্বিতীয় শক্তি আর কিছু নেই, তাই পুরুষ ঐ নারীর মোহে মোহিত হয়ে করুণাঘন মাতৃরূপকে ধ্বংসকারী শক্তিতে পরিণত করে নিজেই ধ্বংস হয়।

শিশুকাল থেকেই দেখেছি কিভাবে একটা সংসার ধ্বংস হয়, আবার দেখেছি আর একটা সংসার কেমনভাবে সোনার সংসাররূপে গড়ে ওঠে। এ যেন একই নদীর দুটো রূপ — সৃষ্টি ও ধ্বংসের রুদ্ররূপ ও মাতৃরূপ। শিশুকালে আমার মা খুব রুগ্না ছিলেন — তাই আমার এই দেহটা অপরের হাতেই গড়ে উঠেছে। সেই ছোট বেলায় দেখেছি নারী রুষ্টা হয়ে কিভাবে আমাদের বাড়ীর পূর্বে, পশ্চিমে যতগুলো আত্মীয়, অনাত্মীয়, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ পরিবার ছিল সবকটা পরিবারই ধ্বংস হয়ে গেল। যদিও বঙ্গবিভাগ একটা কারণ, তবুও, তার মধ্যে নারীদের বিবাদও একটা বড় কারণ। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে আমাদের পরিবার টিকে রইল। বাংলাভাগের অনেক পরেও, আমার বাবা যতকাল জীবিত ছিলেন, ততদিন মাকে এপার বাংলায় আনিনি, - বাবার দেহত্যাগের পর মাকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হল। তারপর আমার এক অবিবাহিত বড দাদা এক রাত্রে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন কারণে হোক খুন্ হয়ে গেলেন, আর তার পরে পরেই ওপার বাংলার পাট চুকিয়ে এপার বাংলায় অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলার "বালী" গ্রামে গুরুকৃপায় এক পাকা বাড়ী গড়ে উঠল — মুখ্যতঃ আমারই চেষ্টায় ও আমার গুরুবাবার নির্দ্দেশে, সেই বাড়ীও আমাকে কালক্রমে যে ত্যাগ করতে হয়েছে, তার কারণও সেই নারী। তবে শুধু মেয়েদের দোষ দেওয়া অন্যায়। কারণ মেয়ে ও পুরুষের উভয়ের সংযোগেই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা থেকে ধ্বংসকারী শক্তি যেমন তৈরী হয়, তেমনি সৃজনকারী শক্তিও তৈরী হয় এবং ঈশ্বর উপাসনার ক্ষেত্রে এই অশুভ শক্তিই সাধনার পথকে

সংকীর্ণ করে দেয়, এমন কি রুদ্ধও করে দেয় অগ্রগতির পথ। তাই অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানে বলছি "একে - অপর" থেকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে, নচেৎ ক্ষতি অনিবার্য্য। যতকাল মনের অস্তিত্ব আছে ততকাল এই মনকে কোন ক্রমেই বিশ্বাস নেই। কখন কি রূপ সে পরিগ্রহ করবে তা বলাও খুব কঠিন। অনেক অনেক বন্ধুর ও সুগম পথ অতিক্রম করে এসেও আজও এর কিনারা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি এবং কখনও কারও দ্বারা সম্ভব হবে কিনা জানি না। **একমাত্র সহজ উপায় হোল একে অন্যের থেকে দূরে থাকা, আর সেটা বুদ্ধিমানের কাজও বটে।**

****

দ্বিতীয় অধ্যায়

☞ ক্রিয়াপ্রাপ্তির/দীক্ষাপ্রাপ্তির পূর্ব্বজীবন ও তৎকালীন ঈশ্বরবোধ

"জীবনপুরের পথিক রে ভাই, কোথাও আমার সাকিন্ নাই" সাকিন্ সেদিন আমারও ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত সেকালের পূর্ব্ববাংলা থেকে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করে জোর করে চলে এসেছিলাম কোলকাতায়, আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে সাময়িকভাবে বসবাস করে নিজের জীবনকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে। তাই আজ নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করি "পথিক ! তোমার কি মনে পড়ে কবে তোমার যাত্রা সুরু হয়েছিল? পথে যেতে কত ঘটনার আবর্ত্তে তুমি পড়েছিলে? মনে হয়েছিল নাকি পৃথিবীটা কত সুন্দর করে ভগবান সৃষ্টি করেছেন? কিন্তু তখন তোমার জানা ছিল না যে

ভগবান মানুষকে আরও একটা জিনিষের স্বাদ দিয়ে রেখেছেন, সেটা হল তার মনের স্বাধীনতার "আস্বাদ।" আর মনেই সৃষ্টি হয়েছে জটিলতর অবস্থা। তাই আজ ভগবানের সন্তান হয়েও সে প্রতিনিয়তই কাঁদছে — কেননা সে সুখ চায়, দেহসুখ, সন্তানসুখ, মানসিক সুখ। ঈশ্বর প্রাপ্তির সুখকে মনের স্বাধীনতা পেয়ে সে ভুলে গেছে চাইতে। তাই কান্নারও তার শেষ নেই। যতদিন না সে ভগবানের দেওয়া মনকে আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বলছে, "প্রভু! তোমার দান তুমি গ্রহণ কর — তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহান"— ততদিন কান্নাই তার সার। ভগবান তো নিজের দান নিজে ফিরিয়ে নিতে পারেন না। তাই জীবনপুরের পথিকের পথচলার বিরাম আজও হয়নি, সে হেঁটেই চলেছে মনটাকে ধরার জন্য। কারণ মনটাকে ধরতে পারলেই মনের মানুষটাকে ধরা যাবে এই বোধে। আর তাই বুঝি রূপকাকারে দেখি শিব জীবের বেশে অন্নপূর্ণার দ্বারে দীনভিখারী সেজে দাঁড়িয়ে আছে।

হে পথিক, তুমি যদি আদ্যন্ত ঘটনা মনে করতে পারতে, তবে দেখতে আজকের জগতের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তারও একটা অতীত ইতিহাস আছে, আর সেই ইতিহাস হল দেনা পাওনার ইতিহাস। বিচলিত হয়ো না। কি পাওনি তার হিসাব করতে চেয়ো না, তাতে দুঃখের অবসান হবে না, হিসাব করতে থাকো "কি দিতে পার নি !" তাতে হয়ত বা সুখের সন্ধান পাবে। তুমি জীব হয়ে ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে উল্টোদিক থেকে তোমার জীবন খাতার প্রতি পাতায় যতই লেখা হিসেবের হিসেব নিকাশ করতে চাও. কিছুই হবে না, মিলবে না তোমার হিসাব, শেষ হবে না তোমার পথচলার। তার চেয়ে হিসাব রক্ষক যিনি আছেন, যিনি তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণের, প্রতিটি মুহূর্ত্তের হিসাব রেখেছেন, যাঁর হিসাবে কোন গরমিল নেই, যিনি কখনও বিশ্বাস ঘাতকতা করেন না, যাঁর চাইতে ধ্রুব সত্য আর কিছু নেই, যিনি তোমার ভ্রান্ত পথেও পথ দেখাবার জন্য আকুল

আগ্রহে তোমার আবেদনের প্রতীক্ষায় প্রতিনিয়ত প্রহরগুণে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান রয়েছেন, তোমার হাত ধরে চলার জন্য তাঁর উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করে নির্ভরশীল হও, তখন দেখবে তিনি তোমারই মধ্যে প্রকট হয়ে তোমার হিসাবের খাতা তোমাকে দেখিয়ে তোমার হিসাব মিলিয়ে দেবেন। তোমার উদ্‌ভ্রান্তির হবে অবসান, তখন এই তুমিই জীবন খাতার দ্রষ্টারূপে ভ্রান্তিনাশে শান্তি পাবে।।

আজ চোখের সামনে ছোট বেলার স্মৃতির তরণী বেয়ে কত কথাই না ভেসে আসছে। খেলতে বা খেলা দেখতেও খুব ভালবাসতাম তখন। তবে নিজে কিন্তু ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না কখনও। এমন কি গ্রামের ছেলেদের কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাতেও যোগ দেওয়ার কোন যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে হ্যাঁ! সখের প্রতিযোগিতায় খেলেছি শুধু দর্শকদের হাসির খোরাক জোগাতে। কারণ খেলাতে কৌশল বলতে তো কিছু ছিল না — ছিল শুধু গায়ের জোর। শরীরটা ছিল ভারী, সাধারণের তুলনায় গায়ে গতরে বেশ স্থূলাকার, আর গায়ে শক্তি ছিল অন্যের থেকে বেশী, কাজেই আমার খেলাটাই ছিল মূলতঃ শক্তি প্রদর্শনের খেলা। একবার গতরটা অন্যের উপর চাপিয়ে দিলেই হোল, ব্যস্। তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানোই দায়, আর গায়ের জোরের কথা হলে তো কোন ব্যাপারই নেই, আমার দলের পক্ষে তখন মাভৈঃ অবস্থা। তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি বুদ্ধির খেলা থেকে দশহাত দূরে আমি, বুঝতাম না কিছুই, এখনও বুঝি না। তবে তখন হাঁ করে দেখতাম, এখন আর হাঁ করে না দেখে শুধু চেয়ে দেখি এই আর কি।

☞ কৈশোরের দামালপনা

আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন থেকেই শরীরচর্চ্চা আরম্ভ করেছিলাম মনে আছে। তবে এর উৎসাহ কোথা থেকে পেয়েছিলাম,

সঠিক আজ আর মনে নেই। মনে হয় আমাদের তখনকার ঐ গ্রাম্য শহরে যে ব্যায়ামাগার ছিল, যেখানে শরীরচর্চ্চা হোত, ভাল ভাল সব 'দেহী' তৈরী হত, সেখান থেকেই উৎসাহটা জেগেছিল। সেই সমস্ত ব্যায়ামাগারে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা সব শেখান হত। ভাল ভাল ওস্তাদ লাঠিয়ালও ছিল কয়েকজন সেই সময় ঐ দেশে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে লেঠেল বা লাঠিয়াল বলতে সাধারণের ধারণা এই যে ঐ জাতীয় ওস্তাদগির্গির বোধহয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার, তা নয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওস্তাদ লাঠিয়াল তো ছিলই এমনকি উচ্চ বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেকালে লাঠিখেলা শেখার প্রচলন দেখেছি, যা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। তবে এই সমস্ত খেলার প্রচলনের মূলে অনুশীলন সমিতির অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী। তাদেরই সৌজন্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় পেয়েছিলাম তখনকার দিনের লাঠি ও ছোরা খেলায় সিদ্ধহস্ত কয়েকজনকে। যেমনঃ—যোগেন নাগ, গোপী বক্সী, পচা বক্সী — বাপ ব্যাটা দুজনই লাঠিয়াল। মণি নিয়োগী ছিল ছোরা খেলার ওস্তাদ। এরা সবাই ছিল অনুশীলন সমিতির সদস্য, পরবর্ত্তীকালে এঁরা অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়ীর একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল 'সৎ ব্রাহ্মণবাড়ী ' বলে। আর এই ব্যাপারে আমার পিতৃদেবের ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ পরিচিতি তো ছিলই। তারপর আমার· বড়দা ৺হেমন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য নিজে ছিলেন ঐ অনুশীলন সমিতির তাত্ত্বিক নেতা। তাছাড়া আমার দাদা শ্রী শান্তিকুমার ভট্টাচার্য্যও স্কুলে ভাল ছাত্র হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই দাদাকে ক্রমিক নম্বরে ইনি ন'দার স্থানীয় হলেও শুধু দাদা বলেই ডাকতাম। আমার উপরে আর এক দাদা ছিলেন, তিনি শিশুকালেই মারা যান, সুতরাং দাদা হিসাবে এই দাদাকেই অর্থাৎ ন'দাদাকেই সর্ব্বদা কাছে পেতাম। ইনিই আমাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করতেন,

অভিভাবকও ছিলেন ইনিই। আমার যতকিছু আবদার ছিল এই দাদার কাছেই। বড় হয়ে ত দাদাকে ছাড়া নিকটতম আপনার জন হিসাবে অন্য কাউকেও বুঝতাম না। যদিও ভাগ্যের পরিহাসে আজ সে দাদার সঙ্গেই দুরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। গুরুদেব কৃপা করে এটা দূর করলেই বাঁচি। করে দিয়েছেনও।

সেদিনের ছায়াঘেরা সেই গ্রাম্য শহরে এই রকমের নানা সুবাদে আমি ছিলাম জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের অত্যন্ত প্রিয়, তাই আমারও একটা চেষ্টা ছিল আরও প্রিয়তর হওয়ার নৈতিক দিক থেকে। পড়াশুনায় প্রায় গবেট ছিলাম কিন্তু স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক বিচারে মাষ্টার মহাশয়দের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলাম। যদিও ভিতরে ছিলাম দুরন্ত শয়তান আর বদবুদ্ধির আখড়া কিন্তু উপরে ছিলাম সাধু প্রকৃতির। জীবনে কারও ক্ষতি করিনি কেউ করলে সহ্যও করতাম না। আমার সমবয়সী তো বটেই, বড় বয়েসীরাও আমাকে সমীহ করত, আর বিশেষভাবে ভালবাসত। গুরুকৃপায় গায়ে বলও ছিল অন্যের তুলনায় বেশী। খেতেও পারতাম বেশী, সেজন্য সহজেই লোকের নজর কেড়েছিলাম। একটা আস্ত কাঁঠাল, এক ধামা খই আর গোটা পঁচিশ ত্রিশ আম, আমার কাছে ছিল জলখাবার, যা আজ শুনলে অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না হয়ত।

খাওয়ার লোভ, খাওয়ার প্রতি মোহ আমার প্রচন্ড ছিল। তবে অন্য কোন রকমের মোহ আমাকে কখনও বিব্রত করতে পারেনি। তখন থেকেই ভিতর হতে কে যেন বলে দিত "মায়ার ফাঁদে পা দিসনি যেন"! তাই কখনও কারও মায়া কান্নাতে আমার মন বিগলিত হোত না, বরং বিরক্তি আসত। এমনকি আমার গর্ভধারিনী মা নিজে আমার সামনে চোখের জল ফেললে কোন কারণে আমার ভেতরটা

কেমন যেন শক্ত হয়ে যেত। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে শুধু একবার কি করে যেন কারও মায়া কান্নাতে হঠাৎ করে কেন জানিনা বিবশ হয়ে গেলাম। আমার কপালে আজ এই দুর্গতি ছিল বলেই বোধহয় সেই দিনের সেই মায়াকান্নায় মোহিত হয়েছিলাম। আর সেদিন থেকেই ঈশান কোনের সেই মেঘটা সারাজীবন আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তাকে দ্রুত পরিষ্কার করাও কঠিন; তাই সেই থেকেই ঝড় ঝঞ্ঝা চলছে, গুরুকৃপায় কোনরকমে সামাল দিয়ে চলেছি।

অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে সাকার ও নিরাকার সাধনার কথা অনেকে বলেন বটে, তবে এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে। কতটা বুঝেছি তা জানিনা, তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীগুরুর কৃপায় যা জেনেছি, তিনি দয়া করে যতটা বলাবেন বলার চেষ্টা করব।

সাধনার সুরু কিন্তু আমার সাকার নিয়েই। দুটোর মধ্যে ফারাক কিছু নেই, শুধু অবস্থার বিচারে আলাদা। সাধনার প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের স্মরণমনন করতে করতে কিছু কিছু রূপ অনেক সময় আপনা থেকেই এসে যায় হয়ত বা পূর্ব্ব সংস্কার বশেই হবে, তবে এ সব আসে। কারণ প্রতিমা শব্দটি এসেছে প্রতিম বা প্রতীক এই শব্দগুলো থেকে, যার অর্থ হোল অনুরূপ। এই সমস্ত বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ে বটে কিন্তু প্রতিমা আরাধনায় বা প্রতীক সাধনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না, ঈশ্বরত্ব অর্জ্জন করা যায় না। কিন্তু এ সব পূজা পাঠও একেবারে নিরর্থক নয়, কিছু হয় না বলতে পারি না। তবে এটা বলা যায় যে পরামুক্তি বা পরাভক্তি লাভের এগুলো প্রাথমিক সোপান, যা পরে সকাম সাধক ঠিকপথে চললে শেষে পরাভক্তির পথে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিজীবনের কথায় আসা যাক্।

☞ মা কালীর ভোগরান্না

আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়ীতে বারোমাসে তের পার্ব্বণ লেগেই থাকত আর সেই সঙ্গে যেহেতু বাবা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করতেন অর্থাৎ যাজকতা করতেন, তাই মূর্ত্তি পূজার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল। অন্য কোথাও হলেও তা আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করতাম আর মনের ভিতর একটা পবিত্র সুন্দর ভাবের উদয় হোত। কোনও কোনও জায়গার পূজার প্রসাদের প্রতি ভক্তি অসাধারণভাবে জাগ্রত হোত এবং সেখানে একটু প্রসাদ না পেলে নিজেকে খুব অভাগা বলে বোধ হত, নিজের উপর খুব ধিক্কার আসত আর প্রসাদ পেলেই যেন কৃতার্থ হয়ে যেতাম। অনেক সময় মনে একটা সুন্দর নির্ম্মল অনুভূতি জাগত, যা ভাষায় বলা যায় না। কিন্তু বাড়ীর পূজা ছাড়া কোথাও নিজেকে জড়াতে চাইতাম না। তবে একবার মাত্র, তখন সবে আমার পৈতা হয়েছে, সেই সময় আমার এক বন্ধুর পাড়াতে কালী পূজা হচ্ছে, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ভোগ রাঁধা নিয়ে। কে ভোগ রাঁধবে? কারণ একে ত মা কালীর ভোগ, তার উপর আবার শাক্তমতে দীক্ষা না হলে তার দ্বারা ভোগরান্না করান যাবে না। এদিকে আবার যদি বা সব পাওয়া গেল, যিনি রাঁধবেন তিনি আবার রক্ষণশীল পরিবারের মহিলা, বাইরে বারোয়ারী পূজার ভোগ রাঁধতে তিনি আসবেন না। কি করা যাবে এখন? বন্ধুরা তো খুব ফ্যাঁসাদে পড়ে গেল। আমার মনের মধ্যে তখন কি যেন একটা কান্ড ঘটে গেল। ভাবের চোটে মনে হোল "ও ত মা কালী, রাক্ষসী তো নয়, খেয়ে তো কখনই ফেলবে না"। কারণ হিসাবে বলা যায় তখনকার দিনে, আর শুধু তখনকার দিনে কেন, আজও, অন্য দেব- দেবীর চেয়ে মা কালী সম্পর্কে পূজারী/পূজারিণীদের ভীতি সমধিক বেশী। এই দেবীর পূজার সময় আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে যেন বেশী সজাগ থাকতে দেখা যায়। কেননা মা কালী বলে কথা, রক্তবীজের বংশ উদরস্থ করেছেন, শ্মশানে মশানে থাকেন, ডাকিনী

যোগিনী নিয়ে অসুরদের মেরে তাদের রক্তপান করেন, কাঁচাখেকো দেবী, পাঁঠাবলি চাই নচেৎ হবে না — কেমন যেন একটা গা ছমছম ভাবে অমাবস্যার নিশীথে ঘোর অন্ধকারে পূজা হয় —অতএব তাঁর ভোগরান্না করা যা তা ব্যাপার নয়। ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেই মহা বিপদ হবে। একবার যদি জাগ্রতা হয়ে আমাদের ধরে খেয়ে ফেলেন তাহলে কি হবে? খেয়ে যে ফেলতে পারেন এ সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। এত সব ভয়, ভীতি বিশ্বাসের মধ্যেও আমার মনে একটা দৃঢ় প্রত্যয় দেখা দিল এই ভেবে যে এটা কখনই সম্ভব নয়। জগতের মা জগন্মাতা যিনি তিনি কি তাঁর সন্তানকে ধরে খেতে পারেন? দেখাই যাক্ কি হয়? এই ভেবে আমার গর্ভধারিনীকে বললাম, "মা রতনদের ওখানে কালীপূজা হচ্ছে কিন্তু ভোগ রান্না করার মত ওদের কেউ নেই, তাই আমি ওদের কথা দিয়েছি যে আমি যেমন পারি তেমনি করে ভোগ রান্না করে দেব। কারণ স্কুলের সরস্বতী পূজার ভোগ আমিই তো রান্না করি, রতনরা সেটা জানে। তাই ওরা আমাকে বলল বলে কথাও দিয়েছি। শুনেই তো মা একেবারে আঁতকে উঠলেন, তারপর আমাকে সে কি তোষামোদ-খোসামোদ। "লক্ষ্মী সোনা আমার! মানিক আমার! ও কাজে যাস্‌নে বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আর কর্ত্তা যদি জানতে পারে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না, একেবারে মেরেই ফেলবে।" মাকে বললাম "মা তুমি ভয় পেয়ো না। দেখো আমি ঠিক পারব। ভয়টা কিসের? তুমিও তো মা! তুমি এত উপদ্রবেও যখন আমাকে খেতে পারোনি তবে ঐ মারও আমাকে অরুচি লাগবে। কোন চিন্তা করো না। তুমি শুধু একটু দেখো যে বাবা যেন কোন রকমেই জানতে না পারে। ওখান থেকে আমার কোন ক্ষতি হবে না জানবে। কিন্তু বাবা জানতে পারলে ঐ মায়ের মত একটু করে খাবে না একেবারে জ্যান্ত গিলে খাবে, সেখান থেকে কিন্তু আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" বাবাকে ভীষণ ভয় পেতাম কিনা, কিছু একটু করলেই পায়ের খড়মজোড়া আমার পিঠে পড়েই থাকত — উঠতে আর চাইত না — তাই।

যাই হোক, ভোগ হোক আর দুর্ভোগই হোক মা কালীর পূজার সেদিনের সেই রান্না আমিই করেছিলাম। আর আমার গর্ভধারিণী মায়ের শিক্ষায় রান্নাটা আমি মোটামুটি ভালই পারতাম বলে সেদিন কোন অসুবিধাই হয়নি। আর মা কালীও আমাকে খাননি।

বাবা পরে শুনেছিলেন কিন্তু খুব গম্ভীর ছিলেন বলে সব শুনেও পরে আমাকে আর কিছু বলেননি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন নিজে কিন্তু কোন সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি বাবার মধ্যে কখনও দেখিনি। আমার উপর দেখতাম বাবার একটা যেন আলাদা বিশ্বাস ছিল। কেন জানি না, বরাবরই এটা কিন্তু লক্ষ্য করেছি। হয়ত কাজটা নির্ম্মল চিত্তে মনদিয়ে করেছিলাম বলেই হোক, অথবা এটা একটা বালক স্বভাব সুলভ ব্যাপার মনে করেই হোক — বাবা কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান যাজক হয়েও একাজ করার জন্য কিছু প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে হয়েছে বলে দেখিনি। আমার মনে কিন্তু ওই কাজটি করার পর এক নির্ম্মল আনন্দ, এক ঝলক তৃপ্তির স্বাদ এসেছিল আর তাই আজও বিশ্বাস করি যে **নির্ম্মল চিত্তে সাকার সাধনায় যে কিছু হয় না তা নয়।** সাকার সাধনায় আমার নিষ্ঠা ও ভক্তি বহুদিন আগে থেকেই ছিল, পরে হঠাৎই ওটা চলে যায়। যদিও তার পিছনেও একটা ঘটনা আছে যথাসময়ে বলব।

নিজে কখনও পাঁঠাবলি দিতাম না, তবে মানত করেছি অন্ধ বিশ্বাসে, যদিও পরবর্ত্তীকালে এই কাজের অসারতা স্পষ্ট বোধ হওয়ার জন্য ওগুলো ত্যাগ করেছি। শুধু ত্যাগ নয় এই কাজের বিরোধিতাও করেছি। এই বোধ যেন মা জগন্মাতা প্রত্যক্ষভাবে আমার ভেতরে দিয়ে দিয়েছিলেন নচেৎ যখন কানে ফুঁ মন্ত্র দীক্ষার জন্য সবিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম তখনই করুণাময় গুরুদেব এমন এক কান্ড ঘটালেন যে আমাকে আর মন্ত্র দীক্ষা নিতেই দিলেন না। কেন? সে এক অন্য ব্যাপার অন্যত্র বলা যাবে। যে কথা বলছিলাম- বাহ্যিকভাবে যেকোন পূজা যখনই করেছি, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে করার চেষ্টা করেছি, শুধু তাই নয় যতটা পেরেছি বিশ্বাসের সঙ্গে

করেছি। স্নান, উপবাস, ব্রতপালন সব কিছুই কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে করেছি। যেমন অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের কথায় আসা যাক্।

☞ ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও ঈশ্বর বিশ্বাস

তখনকার দিনে একটা ধারণা ছিল চৈত্রমাসের অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান মহাপুণ্যের কাজ, যারা সেখানে যেতে পারত না তারা বাড়ীর পুকুরেই সে পুণ্য কাজটুকু সারত।

একবার, আমার তখন কত বয়স হবে? হয়ত ১৩/১৪ বৎসর খুব জোর — শুনলাম, আমার গর্ভধারিণী মা অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাবেন, ঘোড়ার গাড়ী ঠিক হয়েছে, সঙ্গে কে কে যাবে ঠিক হয়েছে আজ আর মনে নেই, তবে এটা মনে পড়ছে যে, আমার যাবার হুকুম নেই, মানে কর্ত্তার হুকুম নেই। আমার যাওয়ার এত ইচ্ছা যে কি বলব, কিন্তু কোন উপায় নেই। তখন মনে একটা জেদ্ চেপে বসল, "আমাকে যেতেই হবে যেমন করেই হোক।" বাড়ী থেকে নদী ৯/১০ মাইল পথ। তখনকার দিনে অনেকেই, এমনকি মেয়েরাও, পায়ে হেঁটেই স্নান করতে যেত। আমি ও আমার ক্লাসের এক বন্ধু কালু বক্সী ঠিক করলাম আমরাও যাব, দুজনে জোট বেঁধে পায়ে হেঁটেই যাব। এদিকে বাড়ীতে তো জানালে হবে না, যেতে দেবে না। তাই লুকিয়ে যাওয়াই স্থির, কপালে যা আছে হবে ভেবে। যেমন কথা তেমনই কাজ — দুজনে, অতি প্রত্যুষে, সূর্য্য উদয়ের আগেই, আমি আর আমাদের বাড়ীর পিছনে কালুদের বাড়ী থেকে কালু, দুজনার কোমরে জামার উপর গামছা বেঁধে, দুটো দাঁতন কাঠি মুখে করে বেরিয়ে পড়লাম পূণ্যস্নানের লক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্রের উদ্দেশ্যে। মায়েদের গাড়ী বার হওয়ার পর বের হয়েছি — দাঁতন করার অছিলায়। দাঁতন কাঠি সঙ্গে রয়েছে, গায়ে জামা পরার উদ্দেশ্য তখন চৈত্রমাস হলেও

একটু শীত শীত ভাব আছে, তার উপরে সকালবেলা, সুতরাং কারও কোন সন্দেহ জাগবে না। এই আর কি? তাছাড়া আমাদের বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার ওদিকে আসাম সীমান্তে গাড়ো পাহাড়ের কাছে, সুতরাং শীতের আমেজ ঐ সময় বেশ রয়েছে। কিছুদুর পর্য্যন্ত অর্থাৎ চেনা লোকজন বা প্রতিবেশী গ্রামের মানুষের গন্ডী পর্য্যন্ত হাঁটি হাঁটি পা পা করে গেলাম — তারপর, চেনা গন্ডী পার হতেই মার দৌড়, যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ীর লোকজনের বা পরিচিতির গন্ডী পার হতে পারি। ধরা পড়লেই সব পন্ড হবে, কান ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের ঐভাবে ছুটতে দেখে অন্য লোকেরা ভাবছে সকালে শরীর চর্চ্চায় বেরিয়েছে। প্রায় ২মাইল ছোটার পর একটা নদী পড়ে, তার উপর একটা পুল আছে সেই পুলের কাছে গিয়ে থামলাম। রাস্তা দিয়ে অনবরত লোকজন যাতায়াত করলেও এতদুরে আমাদের কেউ চিনবে না ভেবে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা সুরু করলাম। ব্রহ্মপুত্রের কাছে পৌঁছে সে কি আনন্দ? কত লোকজন কি বলব? ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী, অন্ধআতুর সকলের এক লক্ষ্য - এক উদ্দেশ্য। এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য হলে বোধহয় এমনই আনন্দ হয় সব কাজেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও খুব আনন্দ হোল। মনে হল ছোট হয়েও আমরা এক বিরাট কাজ করতে পেরেছি। আমাদেরও অনেক পূণ্য হোল। হঠাৎ সেখানে দেখি আমার বড়দা — বড়দা একটা বড় জলসত্রের দায়িত্বে রয়েছেন, সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা। বড়দা তো আমাদের দেখে হেসেই খুন — আর আমাদেরও বড়দাকে ঐ সময়ে ঐখানে দেখে কি আনন্দ ! এতক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন বোধ ছিল না কিন্তু এবার ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হল। স্নানযাত্রীদের জন্য জলসত্রে ঘোলের সরবত ব্যবস্থা ছিল, বড়দা আমাদেরও সরবৎ দিলেন। তখন স্কুল, ক্লাব ও রাজনৈতিক পার্টির তরফ থেকে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা হোত। আবার কোন কোন জমিদার বা অর্থবান লোকেরা এ সবের ব্যবস্থা করত লোক রেখে। সরবৎ খাওয়ার পর বড়দা বললেন "তোরা স্নান করে আয়, আমি এখানে আছি, আমি তোদের দই,

চিঁড়ে, খই পেট ভরে খাওয়াব।'' আমি আর কালু তখন স্নান করতে গেলাম সে কি উৎসাহ! সেখানে যে আমার মা স্নান করতে গেছে তা তখন আমার মনেই নেই।

সবে মাত্র স্নান করে উঠেছি সুরু হল কাল বৈশাখীর ঝড়, সে কি ভীষণ ঝড়! ব্রহ্মপুত্রের চরের যত ধুলোবালি উড়ে এসে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, — তেমনি প্রচন্ড বেগে বাতাস — আমরা দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে আছি কেউ কাউকে ছাড়ছি না। বোধহয় একটু ভয়ই পেয়েছিলাম, চোখ পর্য্যন্ত খুলতে পারছি না - ভিতরে ভিতরে কিন্তু সমানে ঈশ্বর স্মরণ করছি। কানু আমাকে সাহস জুগিয়ে চলছে। কানুর সাহস ছিল কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মজার কথা হোল ওর দাদু ছিলেন মহাবৈষ্ণব, পরম ধার্ম্মিক প্রভু জগবন্ধুর শিষ্য। ঝড় থামার পর দেখলাম বড়দা তার লোকজন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। একটা কথা আগে ভুল বলেছি - তখন আমাদের বয়স ১৩/১৪ নয়, আমাদের বয়স তখন খুব জোর নয় কিংবা দশ, কখনই তার বেশী নয়, কিন্তু ঐ বয়সেই ঠাকুর দেবতাতে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। পরে বুঝেছিলাম যে সেই বিশ্বাসের জোরেই সেযাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম। শুধু সে যাত্রা কেন, পরবর্ত্তীকালে বহুবার অনেক দুরন্ত বিপদ থেকে এই বিশ্বাসের জোরেই বেঁচে গেছি, এ আমি এখনও বিশ্বাস করি। তখন থেকেই বুঝেছি যে **তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে যত ভয়ানক বিপদই হোক না কেন, তিনি সমস্ত দিক থেকে রক্ষা করেন**। শৈশবের তো কথাই নেই। একটু জ্ঞান হলে বা বড় হলে তিনিই রক্ষা করেন ঠিকই, তবে একটু বাজিয়ে দেখেন, কারণ আমাদের ঐ বয়সে, শিশুর মত সরল বিশ্বাস থাকে না বলেই তাঁর সাড়া পেতে দেরী হয়। এই সমস্ত ঘটনার অবতারণা করার আমার একটাই উদ্দেশ্য হোল আমি বলতে চাই যে বৈধী ভক্তিতে যদি সোজা সরল বিশ্বাস কারও থাকে তবে তাকে তিনি কাছে এসেও কৃপা করেন — প্রত্যক্ষ বোধে এটা আসে না বটে তবে অটুট বিশ্বাস এতে লাভ হয়।

☞ বৈধী ভক্তি ও পরাভক্তি

বৈধী ভক্তির পরে আসে পরাভক্তি। সে অনেক পরের কথা। বৈধী ভক্তিতে এ দেবতা সে দেবতা, এ ঠাকুর সে ঠাকুর, নানা জায়গায় গিয়ে নানা ঠাকুরের পূজা করা, নানা রকমের পূজা, নানা রকমের ভোগ, নানা রকমের মন্ত্র, নানা প্রকারের আচার অনুষ্ঠান, নানা রকমের শক্তির অধিষ্ঠাতা/অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর কাছে নানা রকমের কৃপা প্রার্থনার চেষ্টা আসে। মা লক্ষ্মীর কাছে ধনকামনা করে এক রকমের মন্ত্র এক রকমের ভোগ, আবার মা কালীর কাছে অন্য কামনা করে অন্য মন্ত্রে অন্য রকম ভোগ। দিন, ক্ষণ, তিথি, বার, ব্রতও সব আলাদা আলাদা। মা কালীর পূজায় বেলপাতা চাই আবার লক্ষ্মীর পূজায় বেলপাতা চলে না। কিন্তু পরাভক্তির পূজায় একের মধ্যেই বহু মন্ত্র, একই দিনরাত, একই তিথি নক্ষত্র, কোন স্থানকাল নেই, কোন বাছবিচার নেই — এখানে যেমন ভাব তেমন লাভ। এখানে ঈশ্বর এক, মন্ত্রও এক — নেই কোন আচার আচরণ, নেই কোন উপকরণের বালাই, এখানে শুধু মনটাকে দিতে পারলেই হোল। এখানে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এক মন্ত্র, কারণ মনের ত্রাতা একজনই। মনটাও এক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে সাধকের সংস্কার অনুসারে সেই রকম আচরণ করে। এর কারণ হোল প্রাণ যে এক, এর কোন দ্বিতীয় নেই। একই প্রাণ সমুদ্রে আমরা হলাম নানা রকমের বুদবুদ। একই জলে ভাসছি, একই জল থেকে উঠছি, একই জলে মিশে যাচ্ছি। জলের উপরে যখন ভাসছি তখনই শুধু আকারে, রঙে, স্থায়িত্বে বিভিন্নতা দেখা যায়। তেমনি মনটাও এক অখন্ড প্রাণে মিশে এক অখন্ড প্রাণসাগরে ভাসছে। যখন ভাসছে, তখন বিভিন্নতা, তখন বৈচিত্র্যময়, আবার মিশে গেলেই সব এক। সৃষ্ট হলেই তার মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। বৈধী ভক্তিতে ভক্তি কাজে যায়, ভক্তি ও ভগবানে ভেদ থাকে, পরা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানকে এক করে। বৈধী ভক্তিতে মন থাকে, সেই মন দিয়ে সাধক লীলারস আস্বাদন

করে। সাধ্য ও সাধকের ভেদ থাকে আর তাতেই তার বেশী আনন্দ, সে ভেদ রাখতে চায়। যেমন গোপীজনবল্লভ আর গোপীজন। কিন্তু পরাবুদ্ধিতে ভেদবুদ্ধির নাশ হয়।

ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়, লীলার অবসান হয়, দুই এ মিলে এক হয়, দ্বিতীয়ের স্থান থাকে না - তারপর একেরও অন্ত হয়। তাই দেখা যায় প্রথম স্তরের সাধক বা প্রবর্ত্তক সাধক প্রথমে একটা কিছু চায় নচেৎ অবলম্বন শূন্য হয়ে পড়ে, সাধকের সাধনা টেকে না। একটু শক্তি অর্জ্জন হলেই তখন অবলম্বনটা খসে পড়ে। এই অবস্থা অনেক পরের কথা। তাই আমার জীবনে দেখেছি রূপ, আচার-আচরণ, বিধি-বিধান প্রথমে একটু চাই নইলে সাধনা পোক্তাই হয় না। সাধন পথে বাধাও আসে পর্ব্বত প্রমাণ। বিনা বাধায়, বিনা কষ্টে, বিনা যাতনায় "তাঁর" সাথে একাত্ম হওয়া যায় না। একাত্ম হতে গেলেই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, তবেই পরাভক্তি আসে। সমস্তই আমাদের দেহের মধ্যেই আছে কিন্তু এই বোধ আগে আসে না — সাধনার দ্বারা লাভ হয়।

☞ ঈশ্বর বিশ্বাসে পারিবারিক প্রভাব

ছোট্টবেলায় দেখেছি ঠাকুমা, বাবা, মা সন্ধ্যা আহ্নিক নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। বাবাকে তো বলতে সাহস হোত না — দেখতাম মা, ঠাকুমা সবাই বলতেন, "ভগবানকে তো কেউ দেখতে পায়না, তিনি স্বর্গে থাকেন - সেখান থেকেই আমাদের দেখেন, পূজা গ্রহণ করেন।" আমরাও তাই বিশ্বাস করতাম, নানা রকমের ঠাকুর দেবতার রূপ বিশ্বাস করতাম। মা শীতলা বসন্ত রোগ দেন, মা কালী কলেরা রোগীদের দেখেন। সুতরাং ঐ সব রূপ স্মরণ করে তৃপ্তি বোধ করতাম। ঐ সব দেবদেবীর বিভূতি স্বপ্নে দেখতাম। একবারের ঘটনার কথা বলি দুটো একটা —

তখন "বালিতে ভাড়া" বাড়িতে থাকি। ঐ বাড়িতে মা কালীর পূজা, সরস্বতীর পূজা, লক্ষ্মী পূজা এসব হতো। আমার মা তখনও জীবিতা। রাত্রে শোবার আগে ঐ কালী, নারায়ণ (চতুর্ভূজ) ইত্যাদি ধ্যান করতাম। এমন কি ছোটবেলাতে যখন দেশে থাকতাম তখন আমার বয়স কতটুকুই বা হবে — মাথার কাছে, পাশে টিনের দেওয়ালে মা কালীর ফটো রাখতাম। এ ছাড়া রামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ফটো রাখতাম। এমন কি ব্যায়াম করতাম বলে "মহাবীরজীর" অর্থাৎ হনুমানজীরও ফটো রাখতাম। আর প্রতিদিন ঘুমোবার আগে ও সকালে উঠেই তাঁদের প্রণাম করতাম এবং ভেতরে খুব তৃপ্তিবোধ করতাম। এমন কি এই দেহেই নানা রিপুদের তাড়নায় অস্থির হয়ে মনে মনে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতাম। তবে তাতে কোনও ফল হোত না অর্থাৎ রিপুদের দৌরাত্ম্য তাতে কমত না। ওদের জ্বালায় অস্থির হয়ে বহু মন্দিরে, দেবালয়ে যেতাম ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতাম আমার ক্রোধ ও প্রবৃত্তি নাশ করার জন্য। ক্রোধ ছিল প্রচন্ড, আর অন্যান্য রিপুদের তো কথাই নেই। দেবালয়ের প্রধান পুরোহিত, ব্যায়ামাগারের শিক্ষক এদের কাছেও নিজের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করতাম, কিন্তু কেউই সঠিক উপদেশ দিতে পারতেন না। পরে বুঝলাম সমস্তই বায়ুর খেলা। প্রাণই চঞ্চল হয়ে সমস্ত রিপুদের প্ররোচিত করে আর তখনই যে গুণের আধিক্য থাকে এই দেহেতে, সেই গুণের দাপাদাপি সুরু হয়ে যায়। দুনিয়ায় তখন যত দেবদেবী বা ঠাকুরই থাক না কেন সেই রিপুদের দমন করার সাধ্য তখন কারও নেই; কেননা সেই রিপুরাও তো খোদ পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান ঐ দেবদেবীদের মতই। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত আত্মার কাছে সব কিছু সমর্পণ করা যায় ততক্ষণ কোন রেহাই নেই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাজনা মকুব করার ক্ষমতা গোমস্তাদের নেই, আছে জমিদারের; এই হল আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা। **একমাত্র শ্বাসকে ধরতে হবে, শ্বাসকে জানতে হবে, শ্বাসকেই মানতে হবে। দেহঘটে শ্বাসের আনাগোনা করা বন্ধ করতে পারলেই তখন শ্বাস চঞ্চল হওয়ার**

আশঙ্কা থাকবে না, তখন সকলের কেরামতি খতম্। যেমন মৃত ব্যক্তির কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি কোন রিপুরই উৎপাত থাকে না,সেরকম জীবন্তে যারা মৃত হতে পেরেছেন তাদের দেহেও কোন রিপুর আর দৌরাত্ম্য থাকে না। তাঁর সব কিছু থাকবে, জীবন্মৃত হতে পারলে শুধু শ্বাসের গতি উল্টে গিয়ে সুষুন্নায় বইতে থাকে।

☞ "আসল আমি" ও "নকল আমি"

এই কয়েকদিন হোল বাবা কিছুই লিখতে দেননি প্রাণের কথা। তিনি না দিলে, তিনি না জোগালে আর কি লিখব? তিনি যেমনভাবে বলান তেমনি বলি, যেমনভাবে চলান তেমনি চলি, যেমন লেখান তেমনি লিখে চলি।

এই দেহেতেই "আমার আমি" বাস করছে। এই দেহটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই কি সুষ্ঠুভাবেই না তিনি এই দেহটা পরিচালনা করছেন, কিন্তু কাউকে এ ব্যাপারে এক বিন্দুও তিনি বুঝতে দিচ্ছেন না। সব কিছুই তিনি বলছেন, করছেন, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সব কিছু, কিন্তু কি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার, আমি জ্বালা অনুভব করছি এই মনে করে যে, সব কিছু আমিই করছি, সব দায় দায়িত্ব আমারই। মায়ার ফাঁদে পড়ে সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে দায়িত্ব এড়াবার জন্য কত ছলা কলা করছি কিন্তু একবারও বুঝতে পারছি না যে সব দায় দায়িত্ব তো 'আসল-আমির', দেহধারী এই 'নকল-আমিটা' তো মিথ্যা। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলেই ঈশ্বরকে জানা যায়, ঈশ্বর হওয়া যায়, আর এই দুরূহ কাজটা খুবই সহজ হয় যদি আমি কোনপ্রকারে আমার এই দেহের ভিতর যে শ্বাস যাতায়াত করছে, তার প্রতি অবিচ্ছেদে লক্ষ্য রাখতে পারি। যদিও এটা একটা দুঃসাধ্য কাজ, কিন্তু অসাধ্য নয়।

শ্রীগুরু প্রদর্শিত পথে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে, শ্বাসের যাতায়াতে অবিচ্ছেদে লক্ষ্য রেখে, শ্বাসের চঞ্চল গতিকে যদি স্থির করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা— দুনিয়ায় যত মত, যত সম্প্রদায়, যত জাতি, যত ভাষা, যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন কারও সাথে "আমার আমির" কোন বিরোধ নেই - শুধু আমারই মলিনতার আবরণেই "আমার-আমিই" আবৃত, তাই তাকে কেউ দেখতে পায় না, নচেৎ এই আমার-আমিই প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞ। তাঁর দীপ্তির কোন তুলনা নেই — সেই প্রকৃত সত্য। এই আমি তাঁরই দান, তিনিই হেতু, তিনি অর্থাৎ "আমার আমি" অর্থাৎ "সেই আমি" যার বর্ত্তমানতায় "এই আমিটা" রয়েছে, যাঁর অবর্ত্তমানে "এই আমিটা" জড় পদার্থ ছাড়া কিছু নয়, "সেই আমিকে" তাই ধরতে হবে। আর তা ধরতে হলে শ্বাসের শরণাগত হতে হবে, অন্য কোন উপায় নাই। যতকাল এই শ্বাসের যাতায়াত থাকবে, ততকাল "এই আমিটার" অস্তিত্বও থাকবে, কাজেই আর দেরী নয় — তাঁকে জানতেই হবে, বুঝতেই হবে, ধরতেই হবে, নচেৎ এই জীবনটাই নিষ্ফল। কিন্তু কি করে, কেমন করে, কোন কৌশলে তাঁকে দেখব, জানব, বুঝব, ধরব, কে প্রত্যক্ষভাবে দেখাবে তাঁকে, কে জানাবে, কে বোঝাবে, কে বলে দেবে আমায় সে দুটি চোখ আছে কোথায় — যে চোখ দিয়ে চেনা যায়, জানা যায়, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়? তাই প্রয়োজন এবার দীক্ষা ও দিশারীর — জীবনপুরের পথিক তাই আজও এগিয়ে চলেছে আলোকের পথে উত্তরণের সেই নাবিকের সন্ধানে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, জ্ঞান থেকে জ্ঞানাতীতে পৌঁছানোর জন্যে লীলা থেকে নিত্যে ফেরার, সিন্ধু হতে বিন্দুতে আসার, এক কথায় ব্যক্ত হতে অব্যক্তে চলার অসীম আগ্রহ সঙ্গে নিয়ে।

****

তৃতীয় অধ্যায়

☞ সাধন পথে (উপদেশ ও সতর্কতার কথা)

"ভজন পূজন জানিনা মা, যেমন চালাও তেমনি চলি "
কোন ভাষা জানিনা তাই, তোর ভাষাতেই কথা বলি।।"

- এ অতি সত্য বাক্য, প্রকৃত মাতৃভক্তের কথা, সাচ্চা ঈশ্বর সেবীর চরম সমর্পণের পরম কথা - ভাগ্যবান ভক্তের পরম পিতার শ্রীপাদ পদ্মে নিজেকে সম্যকরূপে উৎসর্গ করার বিনীত বাণীমন্ত্র। এভাবে নিজেকে উৎসর্গ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না আর উৎসর্গ করতে হলে মন প্রাণের ঐক্য সহকারে সাধন করা দরকার। কিন্তু বলপূর্বক তো মন প্রাণের ঐক্য সম্পাদন করা যায় না — মনপ্রাণের ঐক্য আনার জন্য সদগুরু প্রদত্ত আত্মকর্ম্মই প্রশস্ত, তাই প্রত্যেক মহাপুরুষই ভগবদ্ সাধনার জন্য মন ও প্রাণের স্থিরতা আনার কথা বলেছেন এবং তা লাভ করার ব্যাপারে প্রাণায়ামরূপ আত্মকার্য্যকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মন্তব্য করেছেন। তাই আমিও বলি কি — সাধন ভজন তো আমিও জানি না — লিখছি শুধু গুরু নির্দ্দেশিত পথে চলতে গিয়ে জীবনপুরের এক পথিকের সাধন পথে চলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত ইতিহাস। এ কোন ধর্ম্মোপদেশ অথবা সাধনোপদেশের বাণী বহন করবে কিনা জানি না কিংবা কারও কাছে এটা জীবন কাব্যের ক্ষণিকের পরিচয়রূপে দেখা দেবে কিনা তাও জানি না, জানি শুধু —

"যেমন লেখাও তেমনি লিখি;
আমার মাঝে তোমায় দেখি।।"

এই লেখা তাই সাধন জীবনের পথ চলার ইতিহাস। ইতিহাস অতীতের কথা বলে — এই ইতিহাস কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পথের সন্ধানের ইতিহাস। ইতিহাসের চরিত্র ও ব্যাপ্তি সবই মৃতের —এই ইতিহাস দেবে প্রাণের সন্ধান, দেবে প্রাণের স্পর্শ। ইতিহাস

সত্য মিথ্যার, অমৃত গরলে জড়ানো, এ ইতিহাস শুধু অমৃতের স্বাদ আনে। ইতিহাসের পাতা পিছনে টানে, এ ইতিহাস দেবে মন থেকে মনান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এগিয়ে চলার, ''চরৈবেতি'' শিক্ষার সন্ধান দেবে, ''গীতার'' অগ্নিগর্ভ বৈদিক বাণী ''স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে'' হওয়ার মন্ত্র।।

যে পথ আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তা আমাদেরই

প্রস্তুত করতে হবে। তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও আমাদের নিরন্তর করতে হবে। কোন মূল্যবান কাজ করার আগে যেমন আমাদের তার অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয় তেমনি যদি আমরা পূত পবিত্র হতে পারি, শুধুমাত্র দেহের আকাঙ্খা পূরণের জন্য যদি আমরা আমাদের ভেতরে ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা না করি, তাহলে অন্তরের ডাকে সাড়া না দিয়ে, আমরা কিছুতেই বধির হয়ে থাকতে পারব না।

যাদের ভাবে কোন সুকুমার ভাব নেই - পবিত্রতা কি জিনিষ তা তারা জানে না। আমাদের ভেতরে মহাশক্তি বাস করছেন, যদিও তা আমাদের নিজস্ব নয়, আমরা তার আধার। তবু বলা যায়, মনের স্বাভাবিক অবস্থায় সেই শক্তির স্রোত বিপুলভাবে প্রবাহিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই আধ্যাত্মিক বৃত্তি স্বাভাবিকভাবে থাকে, আর যদি সেই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয় তখন যে কাজই করা হয় তা গৌরবমন্ডিত হয়। আর মানুষ যখন ক্ষুদ্র কিছুর মধ্যে বন্দী থাকে বা তুচ্ছ বিষয়ে যুক্ত হয় তখনই সে বড় কিছু থেকে বঞ্চিত হবেই।

এ জীবন যদি যথার্থ হয় তবে এই জীবনের পেছনে যা আছে তার সঙ্গে তোমার যোগ স্থাপনা কর। আর যদি আরও উন্নত ও আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করতে চাও, তবে বিশ্বাস, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়

ও সাহস অক্ষুন্ন রাখ, কারণ এ সব গুণ ছাড়া কখনও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে না।

যারা প্রেমপ্রবণ ক্ষমাশীল তাঁরা নির্য্যাতিত হলেও ক্ষমা করতে পারেন। আমাদের অন্তরে যা আছে বাইরেও তাই প্রকাশ পায়, তাই অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও অটল রাখার চেষ্টা কর।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে বাস করার জন্য জীবন পরিবর্ত্তনশীল হয়

কিন্তু বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন যেন না ঘটে। জীবনের সব অবস্থায় বিশ্বাস যেন একবার উপরে উঠে নীচে নেমে না যায়।

গৃহ বা বাসস্থানকে কখনও যেমন অন্ধকার করে রাখতে নেই, আলোর অভাবে ঐ স্থান প্রাণহীন হয়, মানুষের জীবনও ঐরূপ— যতই প্রতিভা বা বাহ্যিক অলংকার থাকুক না কেন, অন্তরের আলোয় সে জীবন আলোকিত না হলে সে জীবন বৃথা, মৃতবৎ।

ভগবানকে ডাকার বা ধর্ম্মলাভের প্রশস্ত সময় হোল প্রথম বয়স— কারণ তিরিশ পেরোলেই তো ফরসা, রোগ ব্যাধি লেগেই থাকে, আর অল্প বয়সে রোগ ব্যাধি হলে ওগুলোকে বরং অগ্রাহ্য করা যায়, দাবিয়ে রাখা যায় - মনোবল ও শারীরিক বলে। তাই যারা বুড়ো বয়সে ভগবদচিন্তা ও স্মরণের কথা বলে, তারা ভুল বলে। বুদ্ধকে দেখ, শঙ্করকে দেখ, চৈতন্য ঠাকুরকে দেখ, স্বামীজিকে দেখ, যা কিছু করার এঁরা প্রথম বয়সেই করেছেন, তাই লোহা গরম থাকাকালীনই ঘা দাও — আকার, আকৃতি সব মনের মত করে পাবে।

মহাপুরুষদের জীবন হল ইহলোকের সঙ্গে অচিন দেশের এক নির্ভরযোগ্য সেতু, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন। তাই বেলা থাকতে থাকতে সময় করে সেতু পার হওয়াই মঙ্গল।

আর দিন থাকতে থাকতে যদি সেতু পার না হওয়া যায় তাহলে অন্ধকারে, দুযোর্গপূর্ণ আবহাওয়ায় সেতু পার হওয়া কঠিন ব্যাপার, পথভ্রষ্ট হওয়ার বা পতনের সম্ভাবনা প্রতিনিয়তই থাকছে। তাই সাধকের জীবনে প্রতিটি মূহুর্ত্ত বর্ত্তমানের প্রতিটি ক্ষণ ঈশ্বরের দান মনে করে, অমূল্য মনে করে কাজে লাগান উচিৎ। কারণ ভবিষ্যৎ মূহুর্ত্তে আরো বিপদ আরো অন্ধকার অপেক্ষা করছে কিনা তা তো জানিনা — বিশ্বাসের আলো জ্বেলে বর্ত্তমানকেই আঁকড়ে ধরে আখের গুছানো ছাড়া ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকা মূর্খামি — সে জীবন পবিত্র ও নিরাপদ নাও হতে পারে।

এই জীবনের উৎস যিনি, তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই এই ক্ষুদ্র জীবন আলোয় ফিরে মহিমা মন্ডিত হয় — আমরা শান্তি খুঁজে পাই - তুচ্ছ জীবন ধন্য হয়, আমরা জীবনের সুন্দর গুণাবলীকে অভ্যাস করতে শিখি। শান্ত চিত্ততা, দৃঢ় বিশ্বাস, অটুট মনোবল জীবনের এই সব অলঙ্কার তখন আমাদের চরিত্রকে মহিমামন্ডিত করে।

আলোর অভাবে আমরা মোহান্ধ হয়ে, জগতের বাহ্যিক চাকচিক্যে আলো ভেবে মুগ্ধ হই — যা নিমেষে মেঘের মত উড়ে যাবে। মানুষ নিজে তো শক্তিমান নয়। তাই যখন সে মাথার উপরে যিনি রয়েছেন তাঁর উপর নির্ভর করতে শেখে, তখন তার সকল বিদ্রোহ, মনের সব যাতনা দূর হয়। সে তখন প্রতিটি ঘটনার কারণ ও মূল্য বুঝতে পারে, নতুন দৃষ্টি পেয়ে সব দেখে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা লাভ করে, তার সকল শক্তিকে ভগবানের দিকে চালনা করে, তখন তার কাছে জগতে মন্দ বলে কিছু থাকে না। সেই দিব্য দৃষ্টির অভাবে আমরা নিজেই অহং বোধে ক্ষমতার অপব্যবহার করি, অমঙ্গলের সৃষ্টি করি। তাই দিব্যচক্ষুর জন্য সাধনার দরকার হয়।

জগৎজননী মায়ের আমার অপার মহিমা। যে জন তাঁর প্রেমসাগরে সাঁতার দিতে শিখেছে, তার আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না। আমাদের কাছে মা চান একমাত্র শুধু সরল বিশ্বাস। মায়ের প্রতি

অবিচলিত বিশ্বাসে যদি তুমি বিশ্বাসী হও, তোমার কি আছে বা না আছে ভেবে যদি কখনও মন খারাপ না করো, দেখবে, মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। মা যে মহাকালের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই দেখবে ঠিক সময়ে তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না। সেই মহাশক্তি আমাদের প্রতি পদক্ষেপে চালনা করছেন। অনেক সময় আমরা ভয়ে কাতর হই, তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহসী হই না। কিন্তু কেন আমরা অকারণে ভয় পাই? কাকে ভয় পাই? আমাদের ভিতরে এমন জিনিষ রয়েছে যা প্রাণশক্তি। তবে আমরা যদি সেই ভগবদ্ শক্তির দিকে আমাদের মনের দুয়ার খুলে না রেখে বন্ধ রাখি তবে সেই শক্তি আমাদের তখন স্পর্শ করে না, আর মনের দুয়ার খোলা রাখলেই তখন সেই শক্তির সঙ্গে পরিচিত হই, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পৌঁছাই অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ ঘটে।

তুমি কি মনে কর তোমার এই বুদ্ধি দিয়ে আধ্যাত্মিক যা কিছু বুঝতে পারবে? কিন্তু মানুষ তাই করে ও বিশ্বাস এবং দিব্যদৃষ্টি তথা স্থির বুদ্ধি না পেয়ে বিরাটের সন্ধান পায় না। আমি বলছি, **বিশ্বাসের জোরে তোমার হবেই, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।** যার বিশ্বাস আছে, সে সাহস ও উন্নত প্রেরণার জোরে শক্তিমান হয়, পূর্ণতা লাভ করে, তাদের সত্তা তখন সজীব, সজাগ ও শক্তিমন্ডিত হয়ে ক্রমশঃ তাকে জীবনের সকল অবস্থায় অটুট বিশ্বাসী ও অসীম সাহসী করে আদর্শ ও চরিত্রবান করে। উন্নত সত্তার সংস্পর্শে এসে সে তখন কোলাহল প্রিয় নগণ্য ‘‘আমির’’ উপরে উঠে নীরব হয়ে শিবত্বলাভ করে। কিন্তু কামনা বাসনা শূন্য না হলে সাহস ও বিশ্বাস আসে না, কামনার বশীভূত হলেই শক্তি ও সাহস উভয়ই কমে যায়। তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন, তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব হয়।

কাম থেকে কামনা — কাম রিপুকে দমন করতে মুখটা ঘুরিয়ে দাও, ঠিক ঠিক চাওয়া হলে পেতে বেশী সময় লাগে না এ আমার জীবন বোধের কথা। মানুষ তো ঠিক বোঝে না ঠিক ঠিক সে কি চায়, তাই পেতে দেরী হয়। সর্ব্বার্থ সিদ্ধি চাইলেই ঠিক চাওয়া হয়। সহজিয়া সাধনার আধার খুব ক্বচিৎ মেলে। এ পথ ক্ষুরস্য ধার — ক্ষুরের ধারের মত বিপজ্জনক, কঠিন পথ। অধিকাংশ মানুষই দেহাত্মবাদী, তাই দেহের সংস্পর্শে মনটাও নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ে, সাধকের পতন ঘটে। তাই এ পথে বিপদের সম্ভাবনা বেশী।

গাছ পাথরেও ঈশ্বর আছেন, এদের পূজা করলেও তাঁরই পূজা করা হয়, কিন্তু মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ বিশেষভাবে ঘটে থাকে। মানুষ যদি না থাকত তাহলে তাঁর কথা বলত কে? বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ কে লিখত? কে লিখত গীতা নামে ধর্ম্মের সারগ্রন্থখানি? যুগে যুগে তাঁর কথা শোনাত কে? কে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করত? তাই মনুষ্যজন্ম সাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ জন্ম, দেবতারাও তঁদের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য মনুষ্যদেহধারী হতে কামনা করেন।

☞ অবতার ও আমরা

অবতার হলেন মনুষ্য আর ঈশ্বরের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনার মাধ্যম, একটা সেতু। ঈশ্বর সাধনায় মন ব্যাকুল হলে তখন ঈশ্বরের কৃপালাভ হয়। পরাভক্তি লাভ না হলে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব আর বৈধী ভক্তির ভেতর দিয়ে পরাভক্তির উদয় হয়।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

যে আমাকে ব্যাকুল প্রাণে আহ্বান জানায় তার প্রতি কৃপা বর্ষিত

হয়। পাত্রভেদে, যোগ্যতাভেদে কৃপার তারতম্য ঘটে।

যুগাবতারের আবির্ভাবের সাথে সাথে একটা সর্ব্বব্যাপক শক্তি জাগ্রত হয়। এর সুযোগ যারা নিতে পারে তারাই ভাগ্যবান। তারা সহজেই মুক্ত হয়ে যায়, আর যারা সুযোগ নিতে পারে না, তারা জন্ম জন্মান্তর পরে মুক্ত হয়। সুতরাং অবতারের আবির্ভাবের এমন সুযোগ যদি হেলায় নষ্ট কর, তবে পস্তাতে হবে। বর্ত্তমানে আমরা জাগতিক বস্তুকেন্দ্রিক মন নিয়ে বিষয়াসক্ত হয়ে ভোগেই লক্ষ্য দিচ্ছি, তজ্জন্য উদ্যম অচিরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মায়া মোহের ছলনায় ভুলে নিজের জালে নিজে জড়াচ্ছি। আত্ম সচেতনতার অভাবে নিজের দিকে দৃষ্টি

না দিয়ে অপরের দিকে তাকিয়ে দিক ভুল করছি। সাধককে তাই সর্ব্বদা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করতে হয়, বলতে হয় ''হে ঠাকুর আমার চেতনা যেন না লোপ পায়।'' সচেতন থাকলে সাধনায় বেশী সময় লাগার কথা নয়। আত্মনারায়ণের সাধনা ছাড়া মুক্ত হওয়ার কোন পথ নেই, আর তাঁর সাধনায় তিনিই একমাত্র সাহায্যকারীরূপে দেখা দেন।

কোমর বেঁধে দাঁড় টেনে চল। যত পাপের বোঝা থাকুক না কেন জ্ঞানের স্রোতে সব ভেসে যাবে। শুধু জোয়ার আসার অপেক্ষা কর, . আর জোয়ার এলেই শুধু হালটা ধরে বসে থাক। আরামসে যাও আর গলা ছেড়ে গাও — তাঁরই গুণগান, পাড়ে ভেড়ার গান। খেয়াল করো কামনা বাসনার চুম্বক পাহাড়ে যেন ধাক্কা না লাগে, তাহলে পাড়ে এসেও তরী ডুবতে পারে। পাড়ে ভেড়ার আনন্দে বিভোর হয়ে যেও না, বিপদ কিন্তু পাড়ে না ভেরা পর্য্যন্ত পদে পদে তোমাকে অনুসরণ করছে, এতটুকু অসাবধান হলেই রক্ষা নেই; তখন আবার নোতুন যাত্রার সূচনা হতে পারে।

☞ কর্ম্ম — প্রকার ভেদ

কর্ম্ম তিন প্রকার — মোহবশে কর্ম্ম, রাজসিক কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম আর এই কর্ম্মের ফলও তিন প্রকার শরীরে ভোগ হয়। স্থূলশরীরের কর্ম্মগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগ করে আর স্থূল শরীরের মানসোদ্ভব আশাগুলি সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে ভোগ হয়। এ কারণ শরীরই বীজ ভান্ডার। কারণ শরীরে সব বীজ সঞ্চিত থাকে। ভগবান যেমন অনন্ত - তাঁর কর্ম্মও অনন্ত। ভগবান যেমন অনাদি, কর্ম্মও অনাদি। আমরা এখানে জগদ্ধিতায় কর্ম্ম করতে এসেছি। তাই আমাদের অন্যের দোষের দিকে তাকান উচিত নয়। আমাদের ভাবা উচিত, আমরা এসেছিলাম তো সাধু হয়ে, সাধু হচ্ছি কিনা, সাধুভাব

আছে কিনা সেইদিকে অনবরত লক্ষ্য রাখা। **সহস্র উপদেশ শুনে কাজ হবে না, যদি জীবনে একটা উপদেশও পালন করে কাজ করতে পারি তবে সাধু হওয়া যায়।**

☞ মায়া কাকে বলে?

যার দ্বারা এক বস্তু অন্য বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই মায়া। এই সৃষ্টি মায়া দিয়ে তৈরী তাই মায়াময় এই সংসার। সৃষ্টি রহস্য জানলে তবে মায়া কি তা জানা যায়।

প্রথমে হল নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই গুরু। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি মায়া করবেন। লীলা তো একা হয় না, তাই ইচ্ছামাত্রেই মায়ের সৃষ্টি হল। এই হলেন সগুণ ব্রহ্ম। এই মা আবার পুরুষ প্রকৃতি দুইভাবে অবস্থান করেন। এইভাবে সৃষ্টি চলে আসছে। সগুণ ব্রহ্ম এবার সৃষ্টি করেও নির্ব্বিকারত্বে অবস্থান করতে লাগলেন। এই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ. সুতরাং ব্রহ্মের তিন অবস্থা - ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান।

☞ পরিত্রাণের উপায়

ভগবদ্ উপাসকের অনেক দুর্গতি হয়, তবে লাগাম তাঁর হাতে থাকে। লাগাম ছাড়া যে হয়না তা নয়, হলেই বিপদ, বেচালে চলে ধরা পড়ে বেদম মার হয়। তখন পথ চলাই কঠিন হয়, অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা। সাধক জীবনে ধূমকেতুরূপী আগন্তুক এই মায়ার ফাঁদে কোন অসতর্ক মুহুর্ত্তে পা দেওয়ার ফলে জীবনপুরের পথিকের জীবনেও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে দেহটাই যেতে বসেছিল। মহামায়ার মায়া যখন বিশেষভাবে কারও উপর আরোপিত হয় তখন বিধি, হরি, শম্ভু একসাথে তার প্রতিরোধ করতে পারে না। তখন প্রয়োজন হয় বিশেষ গুরুকৃপার। একমাত্র তাঁরই উপর আস্থা স্থাপন করে তখন সাধককে পড়ে থাকতে হয়, নচেৎ কারও রক্ষা করার যোগ্যতা নেই।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকতে থাকতে কখনও যদি এতটুকু মনে হয় যে "বোধহয় আমি একটু স্বাবলম্বী হয়েছি" ব্যস! আর রক্ষা নেই- অমনি মহামায়ার খেলা সুরু হয়ে যাবে। তীক্ষ্ম তীক্ষ্ম বাণ নিক্ষেপ করে তোমাকে জর্জ্জরিত করে ফেলবে তার সঙ্গে সঙ্গে। তোমার দেহের ভিতরের শত্রুরা যারা তোমার জন্মের সাথে সাথে এই দেহে বাস করছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত থাকবে দেহ চলে গেলেও সূক্ষ্ম দেহে থাকবে, এমনকি যাদের রেশ কারণ দেহেও পৌঁছাবে, তারা তখন ঐ মায়ার খেলায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তোমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। সাধককে তখন শ্রীগুরুর চরণ স্মরণ করে অবিরত বাণ নিক্ষেপ করতে হয় আর আকুল হয়ে তাঁকে সে ডেকে বলবে, "এ যে মরেও মরে না রাম, এ কেমন অরি!"

তবে সাধকের চিন্তার কোন কারণ নেই - যা কিছু ঘটে মঙ্গলের জন্যই ঘটে। আজ আমার কাছে যা দুঃখজনক তা তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। হয়তো কোন এক সময় আমি ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত হয়েছিলাম, তাই সেই সুখের চেয়ে বহুগুণ কষ্টের মধ্যে

ফেলে গুরুদেব এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যাতে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য মন কোন দিন আর লালায়িত না হয়। আজ যা কিছু আমার কাছে সুখের বা কষ্টের, তার জন্য দায়ী তো আমি নিজে, অপরে তো নয়। আমি তাই নিজের কাছে নিজেই অপরাধী বা ধন্যবাদের পাত্র। আমিই আমার শত্রু আবার আমিই আমার মিত্র। মায়ার ছলনায় মোহিত হয়ে আমি বা আমরা একে অপরকে যে দোষারোপ করি বা কৃতজ্ঞতা জানাই তা চরম ভ্রান্তির, স্থূলবুদ্ধির বা অজ্ঞানতার কাজ। মনে রাখতে হবে আমার জ্ঞানকে পাকা করার জন্যই, মায়াকে চেনাবার জন্যই গুরুদেব এই লীলা করছেন। মোটা বুদ্ধিতে আমরা এটা বুঝতে পারি না - এই বোধ বা জ্ঞান অর্জ্জন করতে গেলে শ্বাসে লক্ষ্য রেখে প্রাণায়াম করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, কারণ শ্বাস জয় না হলে এ বোধ আসে না। কালের স্রোতে কালধর্ম্মে পড়ে আমাদের শ্বাসের গতি অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে এবং মহামায়ার প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের জীবনে প্রবলভাবে বেড়ে যাওয়ায় আমরা অপরাবিদ্যার মোহজালে জড়িয়ে গেছি, দৃষ্টিভ্রম দেখা দিয়েছে, বুদ্ধিভ্রম প্রবলভাবে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু গুরু আমার দয়ার সাগর। তিনি তো নিরন্তর কষ্ট দিতে পারেন না। এ সমস্তই সাময়িক, অন্ধকার চিরকাল টিকে থাকেনা। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার জন্য অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী মনে হয়। সর্ব্ব অবস্থাতেই তাই শ্বাসকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করা উচিত। তাঁর শরণাগতকে তিনি কখনই উপেক্ষা করেন না, তবে স্মরণ আন্তরিকভাবে হওয়া চাই।

একটা কথা অবশ্যই সত্য যে মনীষিগণ নিজেদের জীবন সত্তার প্রকৃত রূপ জানাবার মধ্যে দিয়ে আমাদের আহ্বান জানান নিজের জীবন সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য, আর তাঁদের এই দয়ার দানে, আমরা সাধারণ নরনারীরা জানতে পারি প্রাণ কি, জীবন কি, মহামায়া কে, সাধুজীবন কাকে বলে; কিন্তু এ কথাও অতি সত্য যে নিজের অহং ত্যাগ করে নিজেকে তাঁদের কাছে উন্মুক্ত করলে তবে তাঁরা এগিয়ে এসে বহু শিক্ষণীয় বিষয় বহু আশীর্ব্বাদ ও বহু অনুপ্রেরণা দান করেন — অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল ভগবানকে নিজের দিকে টানার

চেষ্টা না করে নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদনের চেষ্টা করা, নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দেওয়ার প্রয়াসী হওয়া, তবেই তাঁরা কৃপা করে নিজ জীবন সত্তায় উপলব্ধির আঙিনায় দাঁড়িয়ে এই বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান করেন। মহামায়ার এই মায়ার খেলা প্রসঙ্গে এক মনীষির জীবনকাব্যের আংশিক বক্তব্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানান হল।

"যে শরীরের ভিতর বিশ্বময়ীর এই লীলা খেলা চলছে সেই শরীরের ভিতরে ও বাইরে কতনা বিচিত্র ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। শিশুকাল হতে কত ঘটনার কথাই না মনে পড়ছে, কালি কলমে যার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। আজ কিন্তু স্পষ্ট অনুভব হচ্ছে মহামায়ার এই

লীলা, আমাকে নিয়ে বিশ্বময়ীর এই খেলা, কথায় ও ভাষায় প্রকাশ করি — তাই এই প্রচেষ্টা ।"

ছোটবেলায় কত বিচিত্র চুরির ঘটনা থেকেই অর্থাৎ আম চুরি, মাছ চুরি, লেবু, আখ, খেজুরের রস চুরি করার সময়ও কিন্তু সেই বিশ্বময়ীকে মনে পড়ত। তাঁর সাহায্য ছাড়া নিজেকে অসহায় মনে হোত। নিশাকালে পথ চলেও দেখেছি, তাঁকে স্মরণ করা মাত্রই মনে অদম্য সাহসের সঞ্চার হয়েছে, তা সে সৎ বা অসৎ যে কাজই হোক না কেন। বদবুদ্ধিতে আমার জুড়ি মেলা ভার ছিল কিন্তু অবাক কান্ড যে, আমি যে খারাপ কাজ করতে পারি মহামায়ার মোহজালে আবদ্ধ হতে পারি, বাইরের কেউই সে কথা বিশ্বাস করত না - অবশ্য আমার বাইরে একটা সাধুভাবের ভণিতা থাকত, তবু কিন্তু এটাই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা যে বাইরে বাহ্যিক জগতে মহামায়ার খেলায় আবদ্ধ জীব তুমি, যে কাজই করনা কেন, এই দেহের অভ্যন্তরে যে বিশ্বপিতা বাস করছেন, তিনিই একমাত্র মায়ার আবরণ ঘোচাতে পারেন তাকে স্মরণ করলে আন্তরিকতার সঙ্গে, সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন না — মায়ামুক্ত করেন জীবকে। সন্তানের আকুতিভরা মা ডাকে মা (গুরুই মা গুরুই বাবা) কি সাড়া না দিয়ে

থাকতে পারে? জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাই প্রারব্ধ বশতঃ হয়ত আপাতদৃষ্টিতে কোন বেমানান কাজ করলেও, তিনি যে মায়ামুক্ত, তাই আত্মদৃষ্টি থেকে তিনি কখনও চ্যুত হন না অর্থাৎ জাগতিক লোকচক্ষে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের দৃষ্টিতে তিনি পতিত হলেও ধর্ম্মের জগতে বা আধ্যাত্মিক জগতে তিনি কখনও পতিত হন না — যেমন আকাশ সাময়িক মেঘাচ্ছন্ন হয়, ধূম আবরিত হয়, কিন্তু সে তো ক্ষণিকের দৃষ্টি, আকাশ চিরকাল নির্ম্মল ও পবিত্রই থাকে — এই হল মহাপুরুষ ও শাস্ত্রকারের বাণী। গুরু অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে যে অকপট, তার কোন ভাবনা থাকে না, যেমনটা আবদার করে তেমন করেই চঞ্চলমনের বাসনা পূরণ করেন। মহাপুরুষদের কথায় আছে, মোহ মায়ায় মোহিত হয়ে এমন সমস্ত কাজ তাঁরা করেছেন যেন মনে হয় নেশাখোরের মত অবস্থা, একদম চেতনাবিহীন, কিন্তু সেই কর্ম্মের ফসল যখন ফলতে সুরু করেছে, তখন কি ঝড়, কি বৈপ্লবিক বিপর্য্যয়! দয়াল গুরু দয়া করে তাঁর সন্তানের চিরমুক্তির বিধানে সমস্ত মায়ামোহের বন্ধন চিরকালের নাশের জন্যই এই নিষ্ঠুর খেলা খেলে থাকেন। এই সমস্ত ব্যাপার একমাত্র জ্ঞানগম্য, নচেৎ নয়।

আমার জীবনেও এমন সমস্ত ঘটনা ঘটেছে যার কোন প্রয়োজন ছিলনা, তবু মহামায়ার মোহময় শক্তি, সাময়িকভাবে, বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে জাগতিক দৃষ্টির পঙ্কে ডোবানোর চেষ্টা করেছে। এই সমস্তই দয়াল গুরুর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যিনি আমাকে — এই বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা করেছেন এবং করে চলেছেন।

সাধক তাই যত সাবধানই থাকুন না কেন, মায়াশক্তির মোহিনী মায়া সদাই তাকে গ্রাস করতে চায়, তখনই সাধকের সমস্ত বিচার বুদ্ধি বোধহয় লোপ পায়, আর এই মায়ার হাত হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, বিশেষ গুরুকৃপা লাভের জন্য শ্বাসের রজ্জু ধরে মায়ার রাজ্য পার হয়ে যাওয়া। বীর অর্জ্জুনের মত হেলায়

যোগকৌশলে মায়াকে কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেহক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হওয়া, নচেৎ বিধি, হরি, শম্ভু পর্য্যন্ত যে মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নাচে তাকে অতিক্রম করা সোজা কথা? জ্ঞানীরা বলেন প্রতিটি সাধককে প্রারব্ধের ফেরে পড়তেই হবে, প্রারব্ধের ভোগ করতেই হবে, সে যে দেহেই হোক নচেৎ কর্ম্মক্ষয় হবে না আর কর্ম্মক্ষয় না হলে দেহাতীতে বা কালাতীতে পদার্পণ সম্ভব নয়। তাই দয়ালগুরু কৃপা করে সন্তানের "অশেষ হিতায় চ জগদ্ধিতায় চ" তিনটি (স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ) দেহে কর্ম্মক্ষয় করিয়ে, মহামায়ার হাত ছাড়িয়ে, তাঁকে প্রাণভরে ডাকার সুযোগ করে দেন – সন্তানের মহানির্ব্বাণ লাভ হয়, চিরশান্তির দেশে হয় তার মহা উত্তরণ। এ যেন এক মজার ব্যাপার! প্রারব্ধ মানে প্র+আরব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বে সুরু করা কাজ অর্থাৎ আমারই সুরু করা গত জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মগুলির ফলমুখী হোক বা না হোক দয়াল গুরুদেব কৃপা করে যেন তাঁরই সৃষ্টি করা মহামায়ার জাঁতাকলে ফেলে, দমবন্ধ হওয়ার অবস্থায় পরিত্রাতা রূপে তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডাকার সুযোগ করে দিয়ে তনুপ্রাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে আলোকতীর্থে উত্তরণ ঘটাচ্ছেন। দয়াল গুরুর লীলা বোঝা ভার। নইলে যে নারী মহামায়া রূপিণী হয়ে পুরুষের মধ্যে শক্তি এনে দেয়, বলসঞ্চার করে, যে নারী সুমতিরূপে সাধনপথে সাধকের পরম সহায়ক হয়, সাধন সমরের ঘনঘোর ঝঞ্ঝার অন্ধকারে আলো হাতে যে পথ নির্দ্দেশ করে, সাহস যোগায়, যে নারী জীবকে স্বর্গদ্বার দেখিয়ে মোক্ষলাভ ঘটায়, যে মহামায়া রূপিণী নারীর সাহায্য ছাড়া পুরুষ কখনও পূর্ণ হতে পারে না, সিদ্ধকাম হতে ব্যর্থ হয়, সেই নারীই কুমতিরূপে কি করে মোহজাল বিস্তার করে সাধকের সাধনপথে হন্তারক হয়ে দাঁড়ায়। এ সবই মহামায়ার খেলা, দয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রী গুরুদেবের লীলা। সাধক তাই এ সময়ে শুধু গুরুস্মরণ করে আর বলে "হে মহামায়ারূপিনী তুমি কৃপা করে দয়াময়ীরূপিনী হয়ে, পতিতোদ্ধারিণী রূপে জীবকে সাহায্য কর মা! সব পাপ তাপ হরণ করে নব বলের সঞ্চার করে কৃত কৃতার্থ না

করলে ওগো মা তারা সর্ব্বপাপহরা জীবের কোন গতি নেই যে মা! মহাকালের বুকে দাঁড়িয়ে, রজোগুণ ও তমোগুণকে নাশ করার, লোল জিহ্বা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে উল্টা পবনের গতি নির্দ্দেশের ইঙ্গিতে, জ্ঞানরূপ অসির আঘাতে কামনা বাসনারূপ অসুরদের মুন্ডচ্ছেদের রূপকের প্রকাশে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, জ্ঞান থেকে পরাজ্ঞানে, বিজ্ঞানের পথে যাবার, তোমার মহামায়ারূপকে অতিক্রম করে তোমারই নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হওয়ায় আমার সাধনা কি অপূর্ণ থেকে যাবে? হে দয়াল গুরু! হে কৃপাময়! আমায় উপায় বলে দাও, আমার চোখের মায়ার ঠুলি খুলে দিয়ে আমাকে, যে সারাজীবন সংসারকে এড়িয়ে চলেছে, তাকে কৃপা করে আলোকের পথে নিয়ে চল হে ঠাকুর।”

☞ সাধকের সাধন পথে চলার উপদেশমূলক অভিজ্ঞতা

(১) বহে চল, বয়ে যেও না অর্থাৎ জীবনতরণীর দাঁড় বেয়ে চল, স্রোতে ভেসে যেও না।

(২) তোমার প্রচেষ্টা তোমার জয়, আর চেষ্টা না করাটাই পরাজয়।

(৩) ভালবাসলে কিছু পাবেই, তবে বিনিময়ের বোধ নিয়ে যেও না, স্বার্থ ত্যাগ করো।

(৪) সেবা কর্ম্মই হল যজ্ঞ।

(৫) সুখ চেয়োনা, অর্থ চেয়োনা, চাও আনন্দ, প্রেম, প্রীতি আর ভালবাসা।

(৬) ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, মানুষও সত্য, কারণ একমাত্র মানুষই সত্য উপলব্ধি করতে পারে।

(৭) মন বিনিময় না করলে, অন্তরের খোঁজ পাবে না।

(৮) যদি কাউকে আনন্দ দিতে পার সেত ভাল, কিন্তু নিরানন্দ করার অধিকার তোমার নেই।

(৯) সংসারে কোন দুঃখকে প্রশ্রয় দেবে না, শুধু তাঁকে ডাকতে পারলাম না প্রাণভরে, এটাই তোমার একমাত্র দুঃখ। তিনি যেন আমার মাঝে ধরা দেন - এটাই তোমার একমাত্র প্রার্থনা।

(১০) অপেক্ষায় থাকো, অপেক্ষা আর প্রতীক্ষা হোল সাধনা।

(১১) কিছু পেলে বিশ্বাস করবে স্বার্থ আছে।

(১২) তিনি নিয়তই দান করে চলেছেন, আমরা গ্রহণ করতে পারছি না।

(১৩) ভক্তি কেউ কারো মধ্যে জোর করে আনতে পারে না ভক্তি হোল নিজের জিনিষ — অন্তরের সামগ্রী।

(১৪) সময়কে অবহেলায় অতিবাহিত হতে না দিয়ে মূল্য দিয়ে গ্রহণ করা উচিত।

(১৫) ভাল কথা দিয়ে মালা গেঁথে নিজের গলায় পরে থাকা উচিত।

(১৬) আমরা ভাবি, অন্যেরা আমাদের মেনে চলুক, অন্য জনকে মেনে চলার কথা ভাবি না। অন্যজনকে সম্মান দিলে তবে সম্মান পাবে।

(১৭) আপনার লোকের জন্য কিছু করা কর্ত্তব্য, চেনা লোকের জন্য করা ভাল কিন্তু অচেনা লোকের জন্য করলে সিদ্ধিলাভ হয়।

(১৮) হীনতা, মলিনতাকে বর্জ্জন করে গতিশীলতা অর্জ্জন করাই ধর্ম্ম।

(১৯) সবচেয়ে বড় দান হোল মানুষকে "অভয়দান" করা।

(২০) শুরু কর — ভাল কথা, শেষ করার কথা ভেবো না।

(২১) বীজাণু না হয়ে বীজ হওয়ার চেষ্টা কর কারণ বীজ নতুনকে জন্ম দেয় আর বীজানু অপরকে সংক্রামিত করে।

জয়গুরু জয়গুরু

****

চতুর্থ অধ্যায়

☞ ফেলে আসা দিনগুলি মোর

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়লে ক্রিয়া পাওয়ার কথা, শ্রীশ্রীবাবার বাড়ীর সেই দিনগুলোর মধুময় স্মৃতি আজও মনকে আচ্ছন্ন করে, কত কথা ভিড় করে আসে, সব তো লেখা যাবে না — সম্ভব নয়, আবার কত কথা না বলা রয়ে যাবে — এটাও তো ঠিকই, তাই যতটুকু মনে পড়ছে লিখে যাই। এগুলো সবই জীবন খাতার প্রতি পাতায় বাস্তব হয়ে ফুটে আছে চিরদিন, চিরকাল।

ইং ১৯৬৪ সালের শুভ গুরুপূর্ণিমার পুণ্য মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রী বাবার কাছে ক্রিয়াযোগের দীক্ষা পেলাম। অবশ্য ক্রিয়া পাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রী বাবাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, পরে ক্রিয়া চলাকালীন আরও তাঁকে বিশেষভাবে কেমন দেখেছি আমার অনুভূতিতে সেকথা পরে বলছি। ক্রিয়া পাওয়ার পূর্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝিনি কি এক অসাধারণ জিনিষ এই আত্মক্রিয়া। মনে হল যেন আমার নূতন করে জন্ম হল। মনে মনে সেদিন থেকেই জিদ্ চাপল যে একবার যখন পেয়েছি তখন এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব। বাড়ীর কেউই এতটুকু জানল না কি এক পরিবর্ত্তনের সূচনা হোল আমার মধ্যে। তখন মাত্র ১২টি প্রাণায়াম করছি ঐটুকু সময় ক্রিয়া করে মন ভোরতো না, খালি মনে হত আরও করি। যদিও ক্রিয়া পাওয়ার পর থেকেই অর্থাৎ প্রথম থেকেই ক্রিয়া করার পর কেমন যেন নেশার মত বোধহত। ভক্তদের কাছ থেকে আমার অনুভূতির কথা লেখার আবেদন এসেছে বলেই জানালাম। এ ছাড়া আরও একটা ঘটনার কথা জানাই। তখন বোধহয় ২৪টা ক্রিয়া করি। ক্রিয়া পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রিয়া চলছে, হঠাৎ দেখি, বাবা যেন এক খন্ড গীতা (যতদূর মনে হচ্ছে ১ম খন্ডই হবে, কারণ বাবার দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে আবার দেখেছিলাম গীতার ৩টি খন্ডই আমার হাতে। বাবা দিয়েছিলেন সেদিন) আমার হাতে দিয়ে আমাকে তাঁর পিছনে আসার ইঙ্গিত করলেন। বাবা আগে চলেছেন, আর আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলেছি। কোথায় চলেছি জানিনা, তবে পিছনে পিছনে চলেছিলাম একথাটা স্পষ্ট মনে আছে। যাই হোক ক্রিয়া করে চলেছি — ২৪টি ক্রিয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুবাবা রোজ ১দিন করে ক্রিয়া বাড়াতে বলেছিলেন। এতে অনেকে আমাকে বাঁকা চোখে দেখতে লাগলেন। গুরুভাইদের মধ্যে তখন শ্রীশ্রীবাবার কাছে কাছে যে কয়জন থাকতেন তারা সব ক্রিয়া জগতে তখন উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ — অধিকাংশই দ্বিতীয় স্তর থেকে ৫ম সোপানের মধ্যে কাজ করেন। নিজেকে ওদের মধ্যে খুব সাধারণ বলে মনে হোত আর বাবার প্রথম প্রথম আমার প্রতি আচরণকে খুব রূঢ় বলে মনে হওয়ার জন্য খুব কান্না পেত। ঐ সময়ে বাবারই গুরুভ্রাতা শ্রী বিভূতি চক্রবর্ত্তী, আমাদের শ্রদ্ধেয় বিভূতিকাকা ছিলেন

উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সপ্তম সোপানের ক্রিয়া করতেন, বাবার পরম অনুগত শিষ্যতুল্য আচরণ নিয়ে সর্ব্বদা বাবার কাছে থাকতেন, দেখলে মনে হোত বয়োবৃদ্ধ শিশু, প্রাণখোলা হাসি, উদাত্ত কন্ঠস্বর, ক্রিয়া ছাড়া কিছু বোঝেন না। ক্রিয়াশ্রিত সমাজের পরম আপনজন, ক্রিয়া প্রচারের অন্যতম বিশ্বস্ত অতন্দ্র প্রহরী। অমন ক্রিয়ান্বিত আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করা অমন ভক্ত বিরল বলা যায়। মেয়েদের মধ্যেও কয়েকজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করার মত। বিমলা পিসীমা ৫ম সোপান, রাজলক্ষ্মী পিসীমা ৫ম সোপান, অমলা পিসীমা ৩য় সোপানের কাজ করতেন। মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী এইসব ক্রিয়ান্বিতাদের আচরণ ছিল এত সুন্দর এত মমত্বপূর্ণ যে মূহুর্ত্তে তারা সকলকেই আপন করে নিতে পারতেন। এদের কথা মনে করেই তখন আমার দিন কাটত, কি ভালই না বাসতেন বাবা এঁদের। বাস্তবিক অমন ক্রিয়াঅন্ত প্রাণ ক্রিয়ান্বিত আজকাল দেখা যায় না। কি অনুরাগ এদের ক্রিয়ার প্রতি, কি বিশ্বাস গুরুর উপর, কি সমর্পণ গুরুচরণে — অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখতাম আর নিজেকে এদের পাশে নিতান্ত দীনহীন মনে হওয়ার জন্য, বড় বেমানান মনে হওয়ার জন্য, চোখে জল আসতো। এঁরা কিন্তু সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ওঁদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে শ্রীশ্রী বাবার আমার প্রতি রূঢ় আচরণে মনে হত বাবা আমাকে ভালবাসেন না। আজ মনে মনে সেই দিনের শিশুসুলভ ভুল অভিমানে আক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথার কথা মনে হলে, সেই ছোট আমিটার সেদিনের সেই অভিমানের সঙ্গে পরবর্ত্তী জীবনে আমার এক দিনের বিরহে, বলা যায় যেন মূহুর্ত্তের অদর্শনে বিরহকাতর এক বৃদ্ধের মুখখানা মনে হলেই ভাবি কি ভুলই না সেদিন করেছিলাম, কি অবিচারই না করেছিলাম বাবার প্রতি। বড় লজ্জা হয়, বড় কষ্ট হয় মনে। যে আমার জন্ম জন্মান্তরের নিত্যসাথী, যার সদাজাগ্রত দৃষ্টি প্রতিক্ষণে প্রতি মূহুর্ত্তে আমাকে পরম স্নেহভরে ঘিরে রেখেছে, যার অপার করুণার অমৃতবন্যা আমাকে প্রতিটি পলে অণুপলে জানিয়ে দিচ্ছে ভালবাসা বুভুক্ষিত পিতৃ হৃদয়ের কথা, পরবর্ত্তী জীবনে আমি ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেখলে হাসি

মশকরা করতে দেখলে যে আমি হিংসায় জ্বলে যেতাম, মনে হোত শুধু আমার বাবা হয়ে থাকুক শুধু আমি আর আমার বাবা বেশ একান্তে কথা বলব, কথা শুনব, একান্তে দুজনে দুজনার হয়ে থাকব, সেই আমি বাবাকে সেদিন চিনতে কি ভুলই না করেছিলাম? অবশ্য এ সবই তাঁর লীলা, তাঁর মর্জ্জি না হলে কারও আর্জ্জি টিকবে না তাঁকে ভালবাসার , তাঁর ভালবাসা পাওয়ার।

☞ আমার প্রতি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ

ক্রিয়া পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বাবা একবার এক ভক্তের বাড়ী গেলেন আমাকেও দয়া করে যেতে বল্লেন। যাঁর বাড়ী বাবা গেলেন তিনি আবার অতি প্রিয় শিষ্যা 'অঞ্জলিদি। স্বামীর নাম হরিহর মজুমদার, অতি সদাশয় ব্যক্তি সকলকেই খুব ভালবাসতেন। আমার সঙ্গেও তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলেরই পরে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং তার কারণ শ্রীশ্রীবাবা সেই সময় থেকেই খুব নিকটে টানছিলেন। যাই হোক বাবার সঙ্গে গেছি, মনে খুবই আনন্দ কিন্তু বাড়ী ঢোকার মুখেই অঞ্জলিদি আমাকে দেখেই দুটো ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর গলায় হাঁক পারলেন, "কাকে চাই?" মরেছে রে! আমি তখন ঘামছি, কারণ বাবার সঙ্গে তখন পর্য্যন্ত কোথাও যাইনি, কেউ আমায় চেনে না। তার উপর হোদকা চেহারা, ময়লা জামাকাপড়, ভাবলাম দিলে বোধহয় তাড়িয়ে এবার! কিন্তু ঠিক সেই মূহুর্ত্তে হরিহরদা, যিনি আমাকে দিলীপদার সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছেন-আমাকে ঐ তাড়া খাওয়া অবস্থায় দিদির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দোতালা থেকে জোর গলায় বলে উঠলেন, "আরে আরে বিষ্টুদা! আসুন! আসুন! আসুন! কি আশ্চর্য্য ওখানে দাঁড়িয়ে কেন সোজা ভিতরে আসুন!" হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেই দিন সকালেই বাবা তামাক সেবন করতে করতেই হঠাৎ আপন মনে চোখ বন্ধ অবস্থায় আমাকেই উদ্দেশ করে সকলের সামনে বললেন, **"তুমি একে ব্রাহ্মণের ছেলে, তায় আবার ভরদ্বাজ গোত্র - তোমার তো ক্রিয়া হবারই কথা।"** কথাটা

আমার মনে সাড়া ফেললেও নিমেষে মনে এলো এও কি সম্ভব? কারণ তখন বাবার ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বাবার খুব কাছের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করছেন। সর্ব্বশ্রী শ্রীবিভূতিকাকা অর্থাৎ ৺বিভূতি চক্রবর্ত্তী, যিনি ছিলেন আদর্শ ক্রিয়াবান ব্যক্তি এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব, শ্রীশুকদেব ভট্টাচার্য্য, যাঁর গুরুর আদর্শ পালনে জোড়া মেলে না, ৺সুধীর গিরি, গুরুসেবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে যিনি অদ্বিতীয়, শ্রীদিলীপ কুমার মিত্র, (আমার প্রিয় দিলীপদা), যার তুলনা তিনি নিজেই, যার মুখে শুধু নিজের নিন্দা ছাড়া অপরের নিন্দা কখনও শোনা যায়নি আজ পর্য্যন্ত — অন্ততঃ আমি শুনিনি, বাবার গিরীশ ৺রামচন্দ্র দত্ত, বর্ত্তমানের ক্রিয়ান্বিত শ্রী শুকদেব দত্ত যার নাতি, যার মত গুরুগত প্রাণ ভক্ত ও গুরুর পরে নির্ভরশীল শিষ্য দেখা যায় না। ভাবলাম এদের মাঝে আমি নিতান্ত নগণ্য ছাড়া কিছু নয়। আর ভাবনাটা তো অমূলক নয় কারণ এঁদের অনেকেই ক্রিয়াপ্রাপ্তির সময়ে আমার ঐ হোঁদকা ভুঁড়ি নিয়ে পায়ের কাজ করার সময় অপারগ হয়ে কেমন হাসির খোরাক হই সেটা দেখার জন্য সেদিন ব্যগ্র হয়েছিলেন মনে পড়ে এবং পরে আমার ঐ চেহারায় সাবলীল ভঙ্গিমায় কোন কষ্ট না করে কাজ শেষ করা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "পাকা মাল রে"। এই সব কথাগুলো মনে পড়ায় মনে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। অবশ্য আমার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। বাবার আমার প্রতি ঐরূপ আর্শীর্ব্বাদের পর সেদিনও সেখানে অনেকেই আড়নয়নে আমার দিকে তাকিয়েছিল — তার মধ্যে দিলীপদাও ছিল কিন্তু ঠিক ভাষায় বললে বলা যায় দিলীপদার দৃষ্টি বাঁকানয়নে হলেও ছিল সপ্রশংস। লক্ষ্য করেছিলাম আমাকে বাবা কিছু একটা বললেই দিলীপদার চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। প্রথম থেকেই দিলীপদার সেই ভালবাসা আজও আমার উপর অকৃপণভাবেই বর্ষিত হয়ে চলেছে। আমি কিন্তু গোড়া থেকেই দিলীপদার উপর আধিপত্য আজও সমানভাবে বজায় রেখে চলেছি আর দিলীপদাও আজ পর্য্যন্ত পরম বৈষ্ণবের মত সেই আধিপত্য স্বীকার করেই চলেছেন। এমনটি আর ইহজগতে কারও সঙ্গে নেই — যেন কত জনমের পরম আত্মীয়, মরমী মনের দরদী বন্ধু, সময়োচিত প্রয়োজনের অযাচিত

সাথী। প্রথম প্রথম দিলীপদার কাছে কত বুদ্ধি, পরামর্শ নিয়েছি — শাসনও করেছেন দিলীপদা, আর সে এমন শাসন যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ই থাকে না। তাই দিলীপদার মত জাত বোষ্টম বান্ধব যে কোন লোকের কাছে পরম কাঙ্খিত। সেই দিলীপদা — যিনি সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন, সকলকে আপন দেখেন, আমিও তাই এই সুযোগে গুরুদেবের কাছে দিলীপদার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

☞ প্রত্যাহার

ক্রিয়া করে চলেছি, নেশাও জমছে। একদিন, ঠিক মনে নেই, বোধহয় ৩৬ কিংবা ৪৮ সংখ্যা ক্রিয়া করি। ভেতর ও বাইরে নানা অনুভূতির সমাবেশ হচ্ছে - দেখি ক্রিয়া করতে করতে হারিয়ে গেছি। এমন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা আমার জীবনে অনেক আছে — তবে নিজের অনুভূতির সব কথা তো লেখা যায় না, আমার এই স্থূলদেহটা নিয়ে পরম দয়াল গুরুবাবা কত খেলা করেছেন - আমার সন্তান সন্ততিরা সে সব খেলা প্রত্যক্ষ করেছে আমাকে জানিয়েছে-বারান্তরে সে সব তাদের কথায় জানাবার অবকাশ রইল। হারিয়ে গেছি, কতক্ষণ ঐ অবস্থায় আছি জানিনা, যখন চেতনা আসল, বোধহল যে, আমার দুই নাসিকায় শ্বাস যাতায়াত এতক্ষণ বোধহয় বন্ধই ছিল। ওঃ! সে কি আনন্দঘন অনুভূতি! ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। এই ঘটনার পর ক্রিয়ার প্রতি অনুরাগ অনেক গুণ বেড়ে গেল। **পরে গুরুবাবা আমাকে আলোর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এটাই প্রত্যাহার।**

☞ মহামায়ার ফেরে — গুরুকৃপার কাহিনী

ক্রিয়া করি মনদিয়ে, প্রাণদিয়ে, সারাদিন রাত ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই নেই। যন্ত্রচালিতের মত অফিস যাই সেখান থেকে বাবার বাড়ী হয়ে বাড়ী ফিরি বালীতে। আমার প্রতি গুরুবাবার নির্দ্দেশ

ছিল, প্রত্যহ বাবার বাড়ি যাবার। রোজ সেই মতই চলি। একদিন মনের কি বিকার হোল সেদিন আর বাবার বাড়ী গেলাম না, আর সেই দিনই গুরুবাক্য পালন না করার ফল হাতে হাতে পেয়েছিলাম - সে এক আতঙ্কজনক অবস্থা। কারণ লিখতে যখন বসেছি তখন কোন কিছু গোপন করব না।

আমার তখন ২/১ জন ক্রিয়ান্বিত ছাড়া ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে কেউ নেই। সেদিন মনের কি বিকারে বাবার বাড়ী গেলামই না। বরং তার বদলে কি মনে হোল, আমি আমার পুরানো এক ছাত্রীর বাড়ীতে গেলাম। তখন সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ছাত্র ছাত্রী পড়িয়ে বাড়তি উপায় করতেই হোত নচেৎ উপায় ছিল না। পরবর্ত্তীকালে গুরুবাবার কৃপায়, তাঁর নির্দ্দেশে এবং তাঁর নিষেধে ছাত্র পড়ানো বন্ধ হয়েছিল। বাবার নিষেধ মেনে সবেমাত্র কয়েকদিন পড়ানো বন্ধ করেছি এমন এক সময়ের ঘটনা এটা। যে ছাত্রীর বাড়ীতে গেলাম সে খুবই গরীব, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, প্রচন্ড শ্রদ্ধা করত আমাকে, ভয়ও খেত খুব। হঠাৎ সেই মেয়েরই মধ্যে সেদিন যেন একটু চপলতা লক্ষ্য করলাম। এ সবই বাবার খেলা। ছাত্রীটি কখনও যা করেনা তাই করে বসল। একটা সন্দেশ নিয়ে এসে আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ করল। আমি তখন কারও বাড়ীতে কিছু খাইনা - সে সেটা জেনেও কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমি তো অবাক! এ কি দেখছি? যে আমাকে সমীহ করে চলে, ভয়ে লজ্জায় নত হয়ে থাকে সবসময়ে, তার এ কি হঠাৎ চঞ্চলতা? এ কি দুঃসাহস? আমি শিক্ষক, এসেছি পড়াশুনার খোঁজ নিতে - কিন্তু আরো বিস্ময়কর কিছু ব্যাপার বোধহয় সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল যার জন্য আমি সেদিন মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। "আপনাকে খেতেই হবে" — বলেই মেয়েটা আমার মুখটা জোর করে ধরে সন্দেশটা আমার মুখে পুরে দিয়ে ছেড়ে দিল। আমিও যেন যন্ত্রচালিতের মত একটা আবেশাচ্ছন্ন ভাবে চকিতে সন্দেশটা মুখে চাপ দিতেই

মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ হল — আর মনে এল বাবা যেন প্রত্যক্ষভাবে সে দৃশ্যটা দেখছেন। ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে শিউরে উঠে বিবর্ণ মুখে জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করলাম। পরিত্রাহি চিৎকার করতে পারলে হয়ত মনের জ্বালা কিছুটা মিটত, ক্ষণিক স্বস্তিবোধ হোত — পারিনি, তাই কোনরকমে স্খলিতপদে দ্রুত নিজের বাড়ীতে এসে পৌঁছালাম — একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সারা শরীর আচ্ছন্ন — একটা প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধ সমগ্র মানসিক সত্তাকে আমায় যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে — কেবলই মনে হতে লাগল এক প্রচন্ড বিপদের হাত থেকে দয়ালগুরু আমাকে রক্ষা করলেন। বিভীষিকাময় মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ব্যক্তির মত তাই সেদিন অলক্ষ্যে থাকা লীলাময় পরিত্রাতার কৃপার কথা স্মরণে আসতেই হৃদয় নিঙড়ানো আনন্দে চোখ দুটো আমার আবার সেদিন আবেশে আপনিই বুজে এল, কপাল বেয়ে নামল কৃতজ্ঞতার আনন্দ অশ্রুধারা।

পরদিন আবার সেই যথারীতি অফিস গেছি, অফিস ফেরৎ বাবার বাড়ী। ঘরে ঢুকতেই দেখি বাবা আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে - হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, "কিগো বিষ্টু ? ঘোড়দৌড়ের মাঠটা কেমন দেখলে ?"

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও নত হয়ে থুতনিতে মিশে যাওয়া মাথাটা আর তুলতে পারিনি সেদিন। সেদিন থেকেই বাবার বাড়ীতে না যাবার ইচ্ছাটা চিরতরে তিরোহিত হয়েছিল। প্রত্যহ, নির্দ্দিষ্ট সময় হলেই বাবার কাছে যাবার একটা অব্যক্ত প্রেরণা ভেতরে অনুভব করতাম - কে যেন ডেকে বলত, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ব্যস্! তারপর ঝড়, ঝঞ্ঝা তুফান কোন কিছুই এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেনি।

☞ গুরুবাক্য পালনে নিষ্ঠা, গুরুবাবার বিভূতি প্রদর্শন

এই বাবার বাড়ীতে প্রত্যহ নিয়ম বেঁধে যাতায়াত করতে গিয়ে কত যে বাধা, কত যে লাঞ্ছনা, আত্মীয় বিরোধের সন্মুখীন হতে হয়েছে, বলে শেষ হবে না । আমি কিন্তু আমার নিয়ম থেকে কখনও হঠে আসিনি। দয়াল ঠাকুর সমস্ত কিছু সামাল দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁকে নির্ভর করে থাকার প্রত্যক্ষ ফলাফল।

তখন আমি ষ্টেট ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখায় ক্যাশ বিভাগে কাজ করছি। ট্রেজারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য ঐ ব্যাঙ্কে তখন কাজের চাপ প্রচন্ড, তার উপর আমি ক্যাশ বিভাগে থাকার সুবাদে আমার কাজের চাপের বহর সীমাহীন - দায়িত্বও অপরিসীম। আমি কিন্তু দেড়টা বাজলেই বাবার বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হই। আমার নিয়মই ওই। তাই বলে কাজে ফাঁকি দিয়ে নয়, প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে অফিসে যাই, মাথা না তুলে একমনে কাজ সারি কারণ ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত হিসাব নিকাশ পাই পয়সা মিটিয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জমা দিয়ে তবে বেরুতে পারব। এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে থেকেও অনেক সময়েই তাঁরা আমার সময়ের আগে অফিস ত্যাগ করা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, আপত্তি করেছেন - বাধা দিতে চেয়েছেন কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই - ধোবে টেকেনি কিছু। মনের জোরে বলেছি "আপনার কাজ শেষ করে তবে যাই, আপনি বাধা দিতে পারেন না।" একদিন ম্যানেজারকেই জোর গলায় বলেছি, "আমি ব্যাঙ্কের চাকুরী করি, আপনার নয়, আমার কাজ করে তবে যাই, আমি ওভার টাইমও চাইনা, অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। যান, এর পরে কিছু করার থাকলে করবেন।" কোন ইউনিয়ন বাজী

করে বর্ত্তমান দিনের মত তাদের কোট গায়ে দিয়ে এ সব কথা বলতে সাহসী হয়েছিলাম মনে করলে ভুল হবে। বলেছি নিজের আত্মবিশ্বাসে ভর করে, নিজের চাকুরীর প্রতি নিষ্ঠার, সময়ানুবর্ত্তিতার উপর নির্ভর করে, অফিসে শৃঙ্খলা রক্ষার, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের নজিরের উপর নির্ভর করে। অফিসে যারা বয়স্ক প্রাচীনপন্থী ছিলেন, ছিলেন ব্যুরোক্রাট্ মনোভাবাপন্ন, তাঁরা একটু বাঁকা চোখে দেখলেও বাকী তরুণের দল সুইপার থেকে আরম্ভ করে বাকী সবাই আমাকে, আমার ব্যক্তিত্বকে, স্পষ্টভাষণকে ভালবাসত, আমার কথায় প্রায় এক পায়ে খাড়া। অবশ্যই তার মানে এই নয় যে প্রবীণরা আমার অশ্রদ্ধেয় ছিল বা তরুণদের উপর অন্যায় আধিপত্য করতাম। আমি বলতে চাই যে সকলের সাথেই মধুর সম্পর্ক ছিল তবে তরুণদের দলটা কেন জানিনা খুব গা ঘেঁষা ছিল। সব ব্যপারে তারা পরামর্শ নিত, উপদেশ মেনে চলত, এক কথায় আমি ছিলাম তাদের বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক। আমার সঙ্গ তাদের নান্দনিক আনন্দ দিত বলে শুনেছি তাদের কাছে। যাই হোক যে কথা বলতে গিয়ে এত কথার অবতারণা সেটা হোল একদিন ক্যাশ গুণে বান্ডিল বাঁধতে বাঁধতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। সর্ব্বনাশ! ১টা বাজে। ব্যস্! যেমন দেখা তেমন কাজ! মাথার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল — কি করে বাবার কাছে পৌঁছাব? অনেক দেরী হয়ে যাবে যে! আমার কাছে বাবার সিনেমা যাবার সব টিকিট পড়ে আছে। বাবার আবার উদ্বোধনী দিনেই সব বই দেখা অভ্যাস ছিল। উদ্বোধনী দিনে একে সিনেমার টিকিট পাওয়াই দায় তাও আবার হাওড়ার কদমতলার মত সিনেমাতে — সেও না হয় যা হোক করে ম্যানেজ করা গেছে কারণ ঐ সিনেমা মালিকের শো-এর বিক্রীর যত টাকা ব্যাঙ্কে আসত জমার জন্য সেখানে আমি ক্যাশ বিভাগে কাজ করার সুবাদে সিনেমা হলের ম্যানেজারের সঙ্গে একটা খাতিরের লাইন জমে গেছে। কিন্তু

বাবার বাড়ীতে পৌঁছে রিক্সায় বাবাকে নিয়ে ছোট খাট এই মাত্র ২৫/৩০ জনের বাবার লীলাসঙ্গীদের একত্রে হলে পৌঁছে দিতে তো প্রচন্ড দেরী হয়ে যাবে। মাথার মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা একসঙ্গে জুটতেই কি এক বিহ্বল অবস্থায় আমার ব্যাঙ্কের ড্রয়ারে চাবিখোলা অবস্থাতেই প্রায় ৪০ হাজার ব্যাঙ্কের টাকা ফেলে ঐ অবস্থায় দৌড়ে দৌড়ে এসে কোনরকমে হাওড়ায় ট্রেন ধরে টিকিয়াপাড়ায় নেমে বাবার বাড়ী যখন হাজির হলাম তখন আমার অর্দ্ধমৃত অবস্থা। কুকুর হাঁপান হাঁপাচ্ছি। দেখি বাবা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তৈরী হয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমি রিক্সা নিয়েই হাজির হয়েছিলাম — বাবা বললেন চল চল অনেক দেরী হয়ে গেল। তখন পর্য্যন্ত এ সমস্ত চিন্তায় এত বিভোর যে ব্যাঙ্কের কথা মনেই আসেনি। ট্রেনে উঠেই একবার চকিতের মত মনে এসেই এদিকের ব্যাপারে মানসিক চাপের ছাপ ফেলতে পারেনি। ব্যাঙ্কে যে আমি ৪০ হাজার টাকা জমা না দিয়ে চলে এসেছি, এমন কি ড্রয়ারে চাবি পর্য্যন্ত দিইনি দশ হাজারের ৪ টে বান্ডিল মোঝেতে ফেলে রেখে চলে এসেছি খেয়ালই নেই। দরবেশ নামে ক্যাশের কুলি আমার নামে জমা দিয়েছে — ক্যাশও মিলে গেছে পাই পয়সায়। কি তাজ্জবে কান্ড! দারোয়ান শুধু টাকাটা পেয়ে মন্তব্য করেছিল "এ আর কারও নয়, পাগলাবাবুরই কাজ।" কে নাম সই করে হুবহু পাই পয়সার হিসাব মিলিয়ে আমার সই হুবহু দস্তখত করে ম্যানেজারের কাছে হিসাব দিয়ে এসেছিল তাঁর সন্তানকে চৌর্য্যবৃত্তির অপরাধ / অপবাদ থেকে মুক্তি দিতে? কে সে? অলক্ষ্যে থেকে সন্তানের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় কে জেগে আছে সদা জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে? সে আমার জন্ম জন্মান্তরের পিতা, আমার চির আরাধ্য দেবতা, আমার গুরু জগদ্গুরু বিশ্বপিতা তাই আবার বলতে হয় দয়াল গুরুর লীলা বোঝা ভার। **সর্ব্বজ্ঞ গুরুর কাছে শিষ্যের কোন কিছু অজানা থাকে না।**

☞ জিহ্বা গ্রন্থি ভেদের কথা

ক্রিয়াকে ভাল না বাসলে ক্রিয়া কাউকে বরণ করে না, এটা আমার বোধের কথা। সারাটা দিন ক্রিয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে হবে। ক্রিয়াময় হয়ে থাকতে হবে, ক্রিয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে যেতে হবে। সমস্ত চিন্তা ছেড়ে ক্রিয়ার চিন্তায় থাকলে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মায় ক্রমে ক্রমে বলার চেষ্টা করছি। অবশ্য গুরুদেব যদি কৃপা করে জীবনের ঘটানগুলি মানস পটে জাগিয়ে তোলেন তবেই সম্ভব। নচেৎ ব্রহ্ম কার্য্যের কথা কালিকলমে প্রকাশ করা গুরুকৃপা ছাড়া অসম্ভব।

তখন প্রথম ক্রিয়াই করি — গুরুর আদেশক্রমে প্রতিদিন একটি করে প্রাণায়াম বাড়িয়ে চলেছি। এমন নেশা হোত যে কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাই হোত না — কাজকর্ম্ম করা তো খুবই কষ্টকর ছিল। ক্রিয়ান্বিত ছাড়া কাউকে ভাল লাগত না। ক্রিয়া পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায় — এই গ্রন্থিভেদের ঘটনার কথাই বলছি যার মধ্যে দিয়ে সর্ব্বজ্ঞ গুরুর কাছে যে শিষ্যের প্রতিটি শ্বাসের খবর থাকে এবং ''ঈশ্বর (গুরু) যা করেন মঙ্গলের জন্য'' এই কথাগুলো স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে এই উদ্দেশ্যে। অবশ্য যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ, যে যেমন ভাবে নিতে পারবে সে সেই ভাবেই প্রাপ্ত হবে।

রাজলক্ষ্মী পিসিমার বাড়ী বাবা যাবেন ঠিক হয়েছে — বাবার কথায় লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা আমি যে সঙ্গে যাচ্ছি এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে আমিও নিশ্চিত। কেননা, বাবা তখন যেখানে যেতেন আমাকে সঙ্গে রাখতেন। কিন্তু সেইদিন বাবা আমাকে কিছু বললেন না — অন্যান্য যারা যাবেন তাদের সঙ্গে কথা বললেন - বললেন, ''তোমরা তাহলে কাল রাজলক্ষ্মীর ওখানে সব যেয়ো''- বলেই বাবা গাড়ী ছাড়তে বললেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিল - রাজ্যের অভিমান জড়ো হল। তবু জোর করে একবার

বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি করব?" জিজ্ঞাসা করার অর্থ বাবা যদি একবার বলেন, "তুমি আমার সাথে চল" কিন্তু হায় আমার কপাল! বাবা বরং আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।" অভিমান ও দুঃখে চুপ করে আছি। বাবা আবার বললেন, "তোমার কাছে বাড়ী যাবার পয়সা আছে তো?" "হ্যাঁ আছে"- আমি বললাম, কন্ঠ কিন্তু রাগে, দুঃখে, অপমানে প্রায় রুদ্ধ। সেই দিনটা ছিল ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৪ সাল। তখনকার অবস্থা এমনই যে বাবা আমাকে ২/৪টি টাকা পকেটে দিয়ে দিতেন প্রায়ই। পরের দিন ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক ছুটি, আর আমি ক্যাশ ডিমার্টমেন্টে কাজ করি বলে ক্যাশ ছুটি থাকত। পরের দিনও ১লা জানুয়ারী সব ছুটি। আমার এদিকে পকেট গড়ের মাঠ - একটাও পয়সা নেই - ব্যাঙ্ক ছুটি থাকার জন্য টাকাও তোলা হয়নি সুতরাং রাজলক্ষ্মী পিসীমার বাড়ী আর যাওয়া হলনা। কারও কাছে ধারও করব না, এ জিদ আছে। ভাবলাম বাবার কাছেই যখন নিলাম না কারও কাছ থেকেই নেব না। তখনও আমার জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হয় নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, "আজ জিভ উঠাব তবে ছাড়ব নচেৎ ঘরের বাইরেও যাব না - খাবও না।" বাবার সঙ্গে যাবার তখন এতই টান আর বাবাও আমাকে ভালবাসতেন এমনই যে বাবা সঙ্গে নেননি বলে রাগে দুঃখে সারা শরীর তখন যেন জ্বলছে। আগে ক্রিয়াটা করে নিলাম তখন আমার ২০০ শত সংখ্যাও পূরণ হয়নি। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে দুখানি বাসি রুটি ছিল খেয়ে ঘরের দরজায় খিল দিলাম। কোন কথা বললাম না কারো সঙ্গে - অবশ্য তখন আমার অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছিল যে, কি ঘরে কি বাহিরে কারো সঙ্গেই কথা বড় একটা হোত না, শুধু মা ও দাদা ছাড়া, তাও দু চারটে নিতান্ত প্রয়োজন হলে - কারণ কারও সঙ্গে কথা বলতেই ভাল লাগত না, আর একটা সুবিধা ছিল যে আমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে কেউ আমাকে ডাকত না।

সুরু করলাম জিভের কাজ — রাগে দুঃখে বেশ জোরে জোরেই কাজ করছি খেয়ালই নেই কতক্ষণ এ ভাবে চলেছে, যখন

খেয়াল হোল তখন জিভের গোড়া কেটে রক্ত পড়ছে — পড়ুক, আমিও জাতে খাঁটি বাঙাল, রক্ত ঝরছে, কাজও সমানে চলছে — মাঝে মাঝে ঠেলছি জিভটাকে, এইভাবেই চলছে, কতক্ষণ চলেছে, কত সংখ্যা করেছি আজ আর কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে, হঠাৎ দেখলাম আমার জিভটা উঠে গেল! কি আনন্দ! আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে। আরও আশ্চর্য্য যে আঙ্গুল দিয়ে জিভ ঠেলে উঠাতে হচ্ছে না। এমনিই উঠছে-দিনটা ছিল ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৪। পরের দিনও পকেটে পয়সা নেই-ঘরের বাইরে যেতে পারলাম না। তার পরের দিন অর্থাৎ ২.১.৬৫ তাং যথানিয়মে অফিস গেলাম, মাইনে তুললাম। একটা কথা এখানে বলা ভাল যে আমার যত প্রয়োজনই হোক মাসের মাইনের তারিখের অর্থাৎ ১লা তারিখের আগে কখনও মাইনের টাকা আগাম নিইনি। চাকুরীর শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম মেনে চলেছি। আমিই তখন বাড়ীতে একমাত্র রোজগারী ব্যক্তি-যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়েই হয়ত বা হবে। তবে চিরকালই আমি একটু হিসাব করে চলার পক্ষপাতী। এরজন্য অনেকে আমাকে কৃপণ আখ্যা দিয়েছে। তা দিক ক্ষতি নেই কিন্তু বেহিসাবী খরচ বরদাস্ত করতে পারিনি, আজও পারিনা। প্রয়োজনে সাধ্যাতীত খরচ করতে আমি সর্ব্বদা রাজী কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ মেনে নিতে পারি না। আমার স্ত্রীর সাথে এই নিয়ে কত ঝগড়া, কত মতান্তর হয়েছে, আমি কিন্তু একই কথা বলেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার এই মত আমার জীবনের পরবর্ত্তী কালে কোন এক দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে অন্যের বেলাতে ধরে রাখতে পারিনি - আমার জেদ, আমার আজন্মের নীতি তখন মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল - সে সব কথা বারান্তরে লেখা হবে।

২রা জানুয়ারী ১৯৬৫ সাল বাবা ঐদিন বিকালে সবেমাত্র রাজলক্ষ্মী পিসিমার গড়পারের বাড়ী থেকে ফিরেছেন, আমিও অফিস থেকে গেছি। বাবা হাত মুখ ধুয়ে ওঁর খাটে বসার পর আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন,"তুমি রাজলক্ষ্মীর বাড়ী গেলে না

কেন?'' ''যাওয়া হয়নি কি করব?'' আমি বললাম, কন্ঠে পুঞ্জীভূত অভিমান। ''হু!'' বাবা বললেন বাবার স্বর একেবারে নিরুত্তাপ। তারপরেই বললেন, ''বিষ্টু তামাক সাজ।''বাবার আদেশ পেয়ে ওরই মধ্যে আনন্দ হল, তামাক সেজে, টিকা ধরিয়ে হুঁকাটা বাবার সামনে নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা বেশ আমেজভরে তামাক সেবন করছেন। বেশ আনন্দ পাচ্ছেন মনে হল। একটু সাহস সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে বাবার কাছে গিয়ে খুব চুপিস্বরে বাবাকে বললাম, ''বাবা, আপনার দয়ায় জিভটা উঠে গেছে।'' বাবা এতক্ষণ চোখ বুজেই ছিলেন - সেই অবস্থাতেই নিতান্ত সাধারণ ভাবে কারও কানে না যায় এমন নীচু স্বরে উত্তর দিলেন ''আমি জানি।'' বাবার ঐরকম উত্তরের আশায় মনটা তৈরী ছিল না। ভেবেছিলাম বাবা আনন্দের সঙ্গে বলে উঠবেন, ''সাবাস'' বা হয়ত বলে উঠবেন, ''বাঃ বাঃ! চমৎকার-'' অন্যের বেলায় সেই রকমই দেখেছি! আর আমার বেলায় ঐরকম রসকস বিহীন শুধু একটা নিরুত্তাপ কথা, ''জানি''- মনটা একেবারে দমে গেল। এত কষ্ট করে রক্তারক্তি করে জিভ উঠালাম আর তার বিনিময়ে কিনা শুধু শুকনো একটা 'জানি'। কই অন্যের বেলায় তো হয়না। ভাবলাম যার যেমন বরাত। পরের দিন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ''রোজ একটা করে প্রাণায়াম বাড়াচ্ছ তো?'' আমিও মনমরা ভাবে শুধু বললাম ''হ্যাঁ''- এরপর বাবা প্রায় অস্ফুটভাবে স্বগতোক্তির মত শুধু উচ্চারণ করলেন ''দেখা যাক, বাবা কি করেন।'' আজ ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লীলা বোঝে কার সাধ্য. সেদিন পর্য্যন্ত এতটুকু বুঝিনি যে রাজলক্ষ্মী পিসিমার বাড়ী বাবা কেন নিয়ে যাননি - কোন শক্তিবলে তিনি বললেন যে জিহ্বা গ্রন্থি ভেদের কথা আগেই জানেন! পরবর্ত্তী জীবনে অবশ্য তাঁর এই কালজয়ী শক্তির কথা, সর্ব্বজ্ঞতার কথা নানাভাবে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, খুলে দিয়েছিলেন আমার চোখের সামনে তাঁরই কৃপায় এক নতুন দিগন্ত।

প্রথম প্রথম আমার যে ধারণা হোত বাবা আমাকে তেমন পছন্দ করেন না সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি। কঠোর মনোভাব দেখাতেন-এমন কি দিলীপদাকে আমি একদিন বলেই ফেললাম, "জানলে দিলীপদা, বাবা আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না।" অন্তর্য্যামী গুরুদেব সেদিন আমার কথায় বোধহয় অলক্ষ্যে হেসে উঠেছিলেন কারণ পরবর্ত্তীকালে দেখলাম যে, যে বাবাকে একদিন কঠোর স্বভাবের মনে হওয়ায় দুঃখ পেয়েছিলাম সেই বাবারই সীমাহীন অতলান্ত স্নেহে ভাসিয়ে টানের চোটে আমাকে বেসামাল করে ছেড়েছিলেন।

☞ দ্রুত ক্রিয়াপ্রাপ্তির ইতিবৃত্ত

প্রথম ক্রিয়ার ২০০টি সংখ্যা যেদিন পূরণ হোল সেদিনই বাবা বললেন "এবার দ্বিতীয় ক্রিয়াটা নিয়ে নাও।।" আমার গুরুভাই ভগ্নিদের খুব আনন্দ হোল আর আমিও ততদিনে তাঁদের মধ্যে বাবার কৃপায় একটু বসার স্থান পেয়েছি কারণ এই দ্বিতীয় ক্রিয়াপ্রাপ্তির পর থেকেই বাবা আমাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখতে লাগলেন। তাঁরই কৃপায় ইতিমধ্যে পর পর ৫ বছরে ৫টী ক্রিয়া পেলাম, যা গুরুবাবার কাছে আমার আগে এই সৌভাগ্যের অধিকারী কেউ হতে পারেন নি। বাবাও তাঁর শ্রীমুখে সকলের কাছে বললেন, "বিষ্টুর মত এত সহজে ও এত অল্প সময়ে পর পর পাঁচ পাঁচটা ক্রিয়ার সোপান আমিও অতিক্রম করতে পারিনি।" তবে আমি মনে করি এটা বাবা তাঁর পুত্রস্নেহে মগ্ন হয়ে সন্তানকে উৎসাহদান করার জন্যই এ কথা বলেছিলেন। এরপর বাবা কিন্তু আমাকে না নিয়ে কোথাও যেতেন না আর আমিও বাবার বাড়ী প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। লীলাময় গুরুদেবের কত লীলাই যে এই সাধনা চলাকালীন দেখেছি, কোন ক্রিয়া চলাকালীন কি অনুভূতি হয়েছে তার সবিস্তার বলা খুব কঠিন। কারণ আমাকে ক্রিয়ার অবস্থার কথা যে

কোনদিন লিখতে হবে তা তো ভাবিনি তাই ক্রিয়ার অবস্থা প্রাপ্তিকে কোন গুরুত্বও দিইনি। ক্রিয়ার অবস্থার কথা কখনও কাউকে বলিনি, এমন কি বাবা জিজ্ঞাসা করলেও যথা সম্ভব এড়িয়ে যেতাম, শুধু ক্রিয়া করে মনে প্রাণে প্রভূত আনন্দ অনুভব করতাম। ক্রিয়া করার জন্য মনটা সর্ব্বদাই উসখুস করত অন্য কোন কাজ ভালই লাগত না, সদাই মনে হোত কখন ক্রিয়াতে বসব! বাবা প্রত্যহ গীতা পাঠ করতে বলায় আমি বলেছিলাম গীতা পাঠের আমার সময় নেই, ক্রিয়া করতে ভাল লাগে,— করি। বাবা চুপ করে গিয়েছিলেন মনে আছে। এই সময়ে বাবা আমার অনুভূতিতে এনে দিয়েছিলেন কেন তিনি গড়পারে নিয়ে যাননি — কেন জিহ্বাগ্রন্থি ভেদের খবরে শুধু উত্তর দিয়েছিলেন "জানি"— ঐটুকু একটা ছোট্ট উত্তর। ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে কালস্রোত, সর্ব্বজ্ঞতা, সব বাঁধা পড়ে আছে — তিনি তো স্পষ্ট দেখছেন আমার জিহ্বাগ্রন্থি ভেদের সময় আসন্ন, তিনি তো জ্ঞানদৃষ্টিতে জেনেছেন আমর গ্রন্থিভেদ হয়ে গেছে — তাই তিনি আমাকে সঙ্গে না নিয়ে মহাকাল হয়েও তাঁরই সৃষ্টি করা কালস্রোতকে বাধা দেননি — দিলে আমার জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হোত না আর পর পর পাঁচ পাঁচটা ক্রিয়াও পেতাম না। কারণ সময় পার হয়ে গেলে অথবা যখনকার যেটা না করলে অর্থাৎ কালকে বা সময়কে মূল্য না দিলে সঠিক ফসল গোলাতে উঠানো যায় না। তাই বলি সময়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে সর্ব্বদা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করা উচিত আর যদি তা করা যায় তাহলে আমার বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাই বল, তখন দেখবে যে ঘড়ি তোমাকে অনুসরণ করেছে। গুরুকৃপায় জীবনে কখনও ক্রিয়ায় বসে ঘুম আসে নি আর কখনও জীবনে কোনদিন এলার্ম দিয়ে ঘড়িতে ক্রিয়া করতে উঠতে হয়নি। বিয়েতে একটা এলার্ম ঘড়ি পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু এমন হয়েছে যে আমি উঠার পর এলার্ম বেজেছে অর্থাৎ আমি এলার্মকে ঘুম ভাঙ্গিয়েছি এলার্মকে আমার ঘুম ভাঙ্গাবার অবকাশ দিইনি।

☞ প্রত্যক্ষ অনুভূতি

এ সম্বন্ধে ছোটখাট দু একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ঘটনা উল্লেখ না করলে বাবার লীলা প্রকাশের সুযোগের অবমাননা করা হবে তাই উল্লেখ করছি।

প্রত্যহ আমার ক্রিয়া আরম্ভ করার সময় ছিল রাত ২টায়। ঐ সময়ে নিয়মমত উঠে হাত মুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আসনে বসতাম রাত্রি ২টা ৩০মিনিটে। উঠতাম সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গে স্নান, খাওয়া ৯-৫২মিঃ বালিতে ট্রেন ধরা, ১০-১০মিঃ মধ্যে অফিস পৌঁছান। ঐ ট্রেনটা বেলুড়, লিলুয়ায় দাঁড়াত না। গুরুদেব কৃপা করে এই সুবিধাটা করে দিয়েছিলেন যে মাঝে মাত্র এক ঘন্টা সোওয়া এক ঘন্টা স্নান খাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওদিকে ট্রেনটাকে দ্রুতগামী করে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক অফিসে পৌঁছে দিতেন এই আর কি। তারপর অফিস থেকে বাবার বাড়ী - ওখান থেকে রাত্রে কোনও কোনও দিন বেশী রাত্রে রওনা হয়ে বালীর বাড়ী পৌঁছাতাম।

সেদিন রাত তখন ১০টা বেজে গেছে। বাবার বাড়ীতে আমার সঙ্গে ফেরার কেউ নেই। তখন ঐ অঞ্চলটা সন্ধ্যার পর নিত্য খুন খারাপি লুঠ তরাজ চলে। প্রায় আণ্ডারওয়ার্ল্ড বলা যায়, মাস্তানদের স্বর্গরাজ্য। বাবা বললেন, "তাইতো! এত রাত হয়ে গেল, তুমি একা যাবে? ঠিক আছে আজ আর বেশী না করে ১৪৪ টাই টুক করে, করে নিও।" বোঝ ঠেলা! এখান থেকে ফিরব হেঁটে বালীতে, গাড়ী ঘোড়া কিছু নেই, তারপর ১৪৪টা ক্রিয়া করব, খাব, শোব, ঘুমোব, আবার ঠিক দুটোয় উঠতে হবে। যাই হোক সব শুনে আমি

বললাম। "একা কোথায়?" বাবা একটু মুচকি হেসে দরজা পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে শুধু মুখ তুলে একবার তাকালেন, পরে বললেন, "ঠিক আছে এসো।" অবশ্য আমার মনেও এ ব্যাপারে কোন ভয় ডর ছিলনা তবুও সেদিন দেখলাম রাস্তায় একটা কুকুর পর্য্যন্ত নেই - নির্ব্বিঘ্নে চলে এলাম — হাত মুখ ধুলাম। ক্রিয়া করে উঠে, দুটো শুকনো রুটি ঢুলতে ঢুলতে মুখে গুঁজে দিয়ে দেহটাকে বিছানায় এনে ১৫/২০ মিনিট শুধু একটু এ পাশ করেছি, গভীর ক্লান্তিতে চোখ দুটো কখন জানিনা বুজে গেছে। নীরব নিস্তব্ধ রাত — সারা পৃথিবী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হয়ে গেছে — হঠাৎ পিঠে পড়ল জোর ধাক্কা, ঘুমের ঘোরে অবসাদগ্রস্ত শরীর, আমল দিলাম না — আবার ধাক্কা, এবার একটু বেশী জোর লাগল, ক্লান্ত শরীর একেও আমল দিতে চাইল না, কিন্তু পরক্ষণেই আমার মুখ দিয়ে "উ:!" বলে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর মাঝে কে যেন জোর চিমটি কেটেছে, মনে হয়েছিল বোধহয় ইঁদুরে কামড়ে দিয়েছে। ছিটকে উঠে পড়ে বিছানায় বসে চোখ রগড়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত ২টা।

এভাবে কখনও থাপ্পড় পড়েছে পিঠে, ধাক্কা খেয়েছি কখনও জোর চিমটি কেটেছেন। কে মেরেছেন, কে ধাক্কা দিয়েছেন, কে চিমটি কেটে সন্তানকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে সদা সতর্ক অতন্দ্র প্রহরায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কখনও সময়ের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি। মহাকালরূপে কালের রশি টেনে ধরে সন্তানের ক্রিয়া করার পথের সব বাধাকে দূর করে, তার চলার পথকে উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে রেখে দিয়েছেন — তা বলতে পারি না শুধু এটুকু নিশ্চয় করে বলতে পারি যে — **সাধক ক্রিয়াকে ভালবাসলে, ক্রিয়ার প্রতি নিষ্ঠা থাকলে, গুরুচরণে সমর্পণ থাকলে এই থাপ্পড় মারার, চিমটি কাটার রহস্য প্রত্যক্ষ জানতে পারবেন।**

☞ ক্রিয়ায় পরোক্ষ সাহায্যপ্রাপ্তি

আমার সাধন জীবনে দয়াময় গুরুদেবের অসীম কৃপা, অনাবিল ভালবাসা, অফুরন্ত সাহায্য ছাড়া যে জীবনটা মরুভূমি হোত সে ত বলাই বাহুল্য কিন্তু এই দেহটা যাতে শুধু সাধনার পথে এগিয়ে চলতে পারে নির্ব্বিঘ্নে, তার জন্য দেহধারী করে পাঠিয়ে দয়াল গুরু যাঁদের মধ্য দিয়ে অকৃপণ সাহায্য উজাড় করে দিয়েছেন, সত্যি কথা বলতে যাঁদের লৌকিক সাহায্য ছাড়া, জাগতিক অবদান ভিন্ন আমার সাধন পথে বিঘ্ন ঘটতে পারত, তাদের কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রসঙ্গে না দিলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে, অকৃজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাই এই অবতারণা।

আমার সাধনজীবনে সকল গুরুভ্রাতা ভগ্নীর অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। কিন্তু এরই মধ্যে দুজন আমার সাধনজীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে তাদের একজন হলেন দিলীপদা — আর অন্যজন হলেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী, নাম ছিল হাসি, হাসতে হাসতেই এসেছিল আমার জীবনে, হাসতে হাসতেই চলে গেছে সে তার সাধনোচিত ধামে — রেখে গেছে মনের গভীরে জগদ্দল পাথরের মত বঞ্চনার কিছু ইতিহাস, সাধকের সাধন পথে প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর যোগ্যতার পরিচয়, কিছুদিনের লীলাসঙ্গিনীর ত্যাগ তিতিক্ষার মর্ম্মবাণী।

আমি তাকে মোক্ষদা বলতাম, কারণ মোক্ষপথের যাত্রীর প্রকৃত সহায়িকার নিখুঁত পরিচয় সে রেখে গেছে আমার জীবনে তার প্রতিটি কাজে, চিন্তায়, আচার, আচরণের মধ্য দিয়ে। সে ছাড়া জাগতিকভাবে আমার সাধনা হোত না বলা যায়।

বিয়ের আগে তাকে কখনও দেখিনি – বিয়ের পরেও তাকে তেমনভাবে দেখা হয়েছে বলতে পারব না – এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, না করলে আমার বলারও কিছু নেই, তবু কিন্তু এটা সত্যি কিনা ঈশ্বর জানেন যে বিয়ের পর থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত তার সাথে আমার কটা কথা হয়েছে বোধহয় তা হাতে গুনে বলা যায়। বিয়ের পরদিনই তাকে বলেছিলাম, "যদি আমাকে চাও, আমাকে পাবে, কিন্তু সব হারাবে। আর যদি আমাকে না চাও সব পাবে, সব বজায় থাকবে – বেছে নাও।" সঠিক পথই সে বেছে নিয়েছিল এবং আমৃত্যু সে তার সঠিক পথ থেকে এতটুকু সরে যায়নি।

আমার সাথে তার সদাই দেখা হোত কিন্তু কথাবার্ত্তা হোত না ক্রিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। অন্যদিকে তাকাবার সময়ও ছিল না মানসিকতাও ছিলনা। বিশেষতঃ ছোট বেলা থেকেই মায়ের শিক্ষায় মেয়েদের থেকে দূরে থাকাই অভ্যাস ছিল – একটা নিগূঢ় আড়ষ্টতা বোধ করতাম। আজ মনে হয় তার মনে বঞ্চনার কত পাহাড় জমেছিল সে কোনদিন বুঝতে দেয়নি, কত যন্ত্রণা সে নীরবে ভোগ করেছে এতটুকু জানতে দেয়নি। তখন কিন্তু এত সব বুঝতাম না কারণ ক্রিয়াকে ছেড়ে প্রতিকারের কথা মনেই আসত না। সে চিরকাল আমার কাছে শুধু অবহেলা নিয়েই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তাকে বলেছিলাম, "আমার মা আমার পরম আরাধ্যা, অনেক কষ্ট করেছেন জীবনে আমাদের জন্যে। সেই মা যদি কোনদিন দুঃখ পায় তোমার জন্য বা যদি তোমার নামে মার কোন অভিযোগ আমার কানে আসে তাহলে বাপের বাড়ীতে তোমার স্থান হবে।" আজীবন সে কথা সে মেনে চলে গেছে। এমন কি আমার মার কাছে অপ্রয়োজনে লাঞ্ছনা, র্ভৎসনা এবং আরও কিছু নীরবে সহ্য করেছে, কখনও জানায়ওনি আমাকে। অপরের কাছ থেকে এসব কথা পরে শুনেছি – আর তার কর্ত্তব্য পরায়ণতায় প্রকৃত স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ

হয়েছি, তৃপ্তি পেয়েছি। বেশীর ভাগ সময়েই আমাকে না পাওয়ার জন্য সে তার হক্ পাওনা ছেড়ে শাড়ি, গহনা ইত্যাদিতে মনটা ইচ্ছা করে ডুবিয়ে রাখত, মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী, বোনের বাড়ী গিয়ে থাকত, আমি কখনও কোন আপত্তি করিনি, বরং এতে আমার ক্রিয়ার সুবিধা হোত বলে মনে হোত। তার সঙ্গে আমার কোন জাগতিক সম্পর্ক ছিল না কিন্তু তবুও সে নীরবে মুখ বুজে সব সহ্য করেছে কোন দিনও এতটুকু অনুযোগ করেনি, ফলে আমারও ক্রিয়ায় কোনদিন সে বিঘ্ন ঘটায়নি। এ যে সাধকের জীবনে কি গুরুকৃপা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। যদি কোনপ্রকারে উল্টাগতি ঘটত তাহলে সাধকের কি অবস্থা হোত সে তো সহজেই অনুমান করা যায়। মজার কথা হোল এই যে তার প্রতি আমার ঔদাসীন্য, বঞ্চনা, অনাসক্তি তার মনে কতখানি ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার খবর সেই শুধু জানত আমি জানিনি, জানতেও চাইনি কারণ সে বলেনি। কিন্তু যার প্রতি ঈশ্বরের কৃপায় তার এই উদাসীনতা. অনাসক্তভাব আমাকে যে কি সুফল লাভে সাহায্য করেছে, তা তো আজ মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছি। তাই দয়াল ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে তার অবদানের কথা স্মরণ না করে পারি না। স্মরণ না করে পারিনা তার যাতনার কথা, তার বঞ্চনার কথা, তার প্রতি মুহূর্তের, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, নীরবে অশ্রুবর্ষণের সাথে শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেবার ইতিহাসের কথা। অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে অধিকার ত্যাগ করে আমারই শুভকামনায় শুধু বঞ্চনাকে, শুধু যাতনাকে সাদরে বরণ করেছে। দয়াল গুরু- "তার জন্য কিছু করা হয়নি, করতে পারিনি আমার এই আক্ষেপের নিরসন করুন"- আর তার সদগতির ব্যবস্থা করুন এই প্রার্থনা জানাই।

****

পঞ্চম অধ্যায়

ঃ ফেলে আসা দিনগুলি মোর ঃ

আবার একটু পিছনের দিকে তাকানো যাক্। কারণ বারবার তাগিদ আসছে - বাল্যকালের কথা আরো কিছু জানাবার জন্যে। তাই আবার ফিরে চলি বাল্যজীবনের দিনগুলোতে।

তখনকার দিনে একটু বেশী বয়সেই স্কুলে ভর্ত্তি করা হত। তাই আমার পিতৃদেব একদিন তাঁর পূজা পাঠ শেষ করে আমাকে বললেন, "চল আজ তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে আসি"। তখন আমার বয়স, সঠিক মনে নেই, তবে ৭/৮ বৎসর হবে। তখনকার দিনে এখনকার মত শিশুকাল থেকেই গৃহ শিক্ষকের রেওয়াজ ছিল না। তাই আমার প্রাথমিক শিক্ষা যা কিছু, বাবার তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল। একমাত্র জমিদার বাড়ী বা ঐ ধরণের অত্যন্ত বিত্তবানবাড়ী ছাড়া গৃহশিক্ষকের দেখা পাওয়া যেত না। আমার তো বেশ মনে আছে School final পরীক্ষার আগে Test পরীক্ষার সময় আমরা কয়েকজন ছাত্রবন্ধু একসঙ্গে একজন শিক্ষকের কাছে তাঁর বাড়ী গিয়ে একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়েছিলাম এবং তাও মাষ্টার মহাশয়ের আগ্রহে। তাঁকে হয়ত পারিশ্রমিক নয় প্রণামী স্বরূপ কিছু দিতে পেরেছিলাম, তাও জোর করে। এই মাষ্টার মহাশয়দের কোনরূপ চাহিদা ছিল না। ঘোর দুর্দ্দিন ও দারিদ্র্য এঁদের নিত্যসাথী ছিল কিন্তু এঁরা অত্যন্ত সৎ ও আদর্শের পূজারী ছিলেন। ছাত্রই তাঁদের কাছে সন্তানতুল্য ছিল-আর তাঁদের লক্ষ্যই ছিল উপযুক্ত করে সন্তানবৎ ছাত্রকে সবদিক থেকে তৈরী করে তাদের অভিভাবকদের কাছে সম্মান প্রাপ্তি। আর আজ! হায়রে কোথায় হারিয়ে গেছে কালিদাসের কাল! বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ এই সব শিক্ষকের সমাজে স্থান ছিল

অতি উর্দ্ধে। এঁদের কেউ কেউ দাদু থেকে. নাতি পর্য্যন্ত প্রায় সবাইকেই পড়িয়েছেন — একটা বাড়ীতে এমনও দেখা যেত।

যাই হোক সেদিন বাবা আদুর গায়ে কাঁধে উত্তরীয়, পায়ে তালতলার চটি, আমাকে নিয়ে চলেছেন স্কুলে - হাতে একটা ছাতা আর টাকাকড়ি সব ট্যাঁকে। রুমাল বা ম্যানিব্যাগের বালাই ছিল না। বিশাল ভুঁড়ি ছিল বাবার — দেখলে মনে হোত ভুঁড়িটাই যেন আগে আগে চলছে। আর কোমরের উপর থেকে চর্ব্বিযুক্ত যে স্থূল মাংস পিন্ড দুদিকে ঝুলে থাকত তাতে ২/৪ হাজার টাকা বাবা যদি ট্যাঁকে নিয়েও যেতেন হারাবার কোন ভয় থাকত না। কারণ ঐ ট্যাঁকের কাপড়ের উপরে দুই পাশ থেকে ঐ মাংস পিন্ডদ্বয় ঝুলে থাকায় বেশ একটা চাপা দেওয়ার কাজ হতো। তাছাড়া কাপড়ের খুঁট তো ছিলই। যাই হোক সেদিন বগলে একটা শ্লেট নিয়ে ২/১টা মাইনর ক্লাশের বই যা বাবা পড়াতেন, সেই সঙ্গে করে একটা কালো রঙের ইজের প্যান্ট ও বোতাম ছেঁড়া বুকখোলা ময়লা জামা গায়ে দিয়ে খালি পায়ে বাবার সঙ্গে স্কুলে ভর্ত্তি হতে রওনা হয়েছিলাম।

☞ স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কথা

স্কুলের নাম ছিল লাহিড়ী স্কুল। সেখানে হেডমাষ্টার ছিলেন অতি প্রাচীন, নাম বিমলা প্রসন্ন ভট্ট্যাচার্য্য - ধবধবে ফর্সা রঙ, মাথায় কদমছাঁট চুল বেশ মনে আছে। স্কুলগুলি ওখানকার সবই জমিদারের তৈরী এবং তাঁদের অনুদানেই চলত। এই স্কুলটা ছিল মাইনর স্কুল। অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত। তাই ঐ স্কুল থেকে পাশ করে আর একটা অন্য জমিদারের স্কুলে, যেটা ছিল সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত, সেই ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে চলে যাই এবং সেখান থেকে কোনক্রমে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অর্থাৎ S.F পাশ করে এই বঙ্গে চলে

এলাম। তখন দেশভাগ হয়ে গেছে — দেশের অবস্থা ছন্নছাড়া। দেখতে দেখতে সোনার বাংলা ছাড়খার হয়ে গেল। ঐ বাংলায় তখন পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসটাই ছিল সম্পদ, যেন সবাই সবাইকার আত্মীয় - কি আনন্দেই না ছিলাম। অবশ্য আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাবাকেও ওখানে দেখেছি হিন্দু মুসলমান উভয়েই ভালবাসত খুবই, কিন্তু আরও কিছুদিনের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। বড়দা তখন জেলে, আর এক দাদা গ্রামেই একটা স্কুলে কাজ করছেন। বাড়ীতে ছোট ছোট দুটো ভাই, অবিবাহিত একটা বোন, বেশীর ভাগ লোকই তখন এপার বাংলায় চলে আসছে। বাবা নিষেধ করেছিলেন, বলেছিলেন "যেও না কষ্ট পাবে।" আমি নাছোড়বান্দা, তাই ঐ দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোর কোন একদিনে বাবার এক বন্ধুর সঙ্গী হয়ে এপারে এসে হাজির হয়েছিলাম, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম সামান্য কিছু টাকা, পাথেয় হিসাবে, আর মনের গোপন মুকুরে চলে আসার সময় নিত্যসেবার জন্য পুষ্পচয়নে রত বাবার, আমার দেশ ছেড়ে চলে আসার পথের পানে চেয়ে থাকার নিষ্পলক ব্যথাতুর দৃষ্টির স্মৃতি । বাবাও আমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না আর আমিও ঠিক ঐ সময়ে বাবার মুখের দিকে তাকাইনি - তাকালে হয়ত আসতে পারতাম কিনা কে জানে।

☞ দুধ চুরির কথা ও চুরির ব্যাখ্যা

ছোটবেলার বদবুদ্ধির একটা ঘটনা বলি। চুরি করা কাকে বলে - না পরের দ্রব্য নেওয়াকে চুরি বলে তো? আচ্ছা মুশকিল তো? বলে নিলে অপরে কি তার দ্রব্য সে আমাকে সব সময় দেবে? অথচ আমাকে সেই জিনিষটা তো পেতে হবে। তাই অগত্যা চুরি করা। চুরি করার মজাই আলাদা। বিশেষ যদি খাওয়ার জিনিষ হয়। চুরি তাই আগেও করেছি - খুব চুরি করেছি — এখনও করছি — পরেও করব। মাঝরাতে খিদে পেলে ফ্রীজ খুলে আধখানা মিষ্টি এদিক

ওদিক দেখে নিয়ে টুপ করে মুখে ফেললে কি এমন দোষের হবে? ভগবানকেই তো লোকে বলে ননীচোরা, মনচোরা, ভাবচোরা - কত কথা বলে! বাহ্যিক জগতে না বলে অপরের জিনিষ নিলে না হয় দোষ হল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে চুরি তো তোমাকে করতেই হবে - নচেৎ ননী পাওয়া যাবে না, মনকে ধরা যাবে না। ভগবান জীবকে তো কোন স্বাধীনতা দেননি একমাত্র মনটাই স্বাধীন। সেই মনটাকেই তোমায় দিতে হবে তাঁকে পেতে হলে। কি করে দেবে? দেহধারী অবস্থায় দশ ইন্দ্রিয়ের প্রহরায় যে মন চঞ্চল হয়ে মহামায়ার খেলায় মত্ত হয়ে ডুবে রয়েছে তাকে তুমি ইচ্ছা করলেই কি ইন্দ্রিয়রা নীরবে তোমার মনটাকে তোমার হাতে তুলে দেবে ভগবানকে সমর্পণ করার জন্য। দেবে না। তাই তোমাকে কৌশল করে ইন্দ্রিয়দের বশে রেখে মনটাকে চুরি করে তাঁর চরণে সমর্পণ করতে হবে তবে তো অমৃত ভক্ষণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ভগবান হবে বা ভগবানকে পাবে। কি দাঁড়াল তাহলে? চুরি করতে হল কিনা? তাই বলি দুধ চুরি, মাখন চুরি খারাপ নয়। যাক্ ও সব ভারী ভারী কথা। আমার দুধ চুরির ঘটনায় আসি তাও আবার নারায়ণের ভোগের দুধ।

বাড়ীতে যে গরুটা ছিল খুব শান্ত. কিন্তু ওর মা খুব বজ্জাত ছিল। গরুটা দুধ দোহার সময় হলেই চেঁচাত আর আমিও অমনি বালতি নিয়ে দুইতে ছুটতাম। গরু দোহাই আর সঙ্গে সঙ্গে রোজ বেশ খানিকটা কাঁচা দুধ গোয়ালেই বালতি থেকেই চুমুক দিয়ে খেয়ে নিই। সেদিন মা নারায়ণের ভোগ দেবেন। গরু ডেকেছে, বালতি নিয়ে যথারীতি ছুটেছি। দুধ দোহার পরই সেদিন প্রায় অর্দ্ধেক সাবড়ে দিয়েছি। বাকী দুধ বালতি সমেত মায়ের হাতে দিতেই মায়ের তো চক্ষু স্থির। যথা রীতি জিজ্ঞেসা করেছেন, "কি রে এত কম কেন আজ?" আমারও যথারীতি উত্তর, "আমি কি জানি?" এই আমি কি জানি বলাটা চুরির মতই একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে যাই কিছু চুরি যাক বিশেষতঃ খাবার জিনিষ যেমন মুড়ি. খই, ঘি অমনি আমার ডাক পড়তো। বাবা কিন্তু এ

ব্যাপারে আমাকে সমর্থনই করতেন। বলতেন "খাওয়ার জিনিষ খেয়েছে তো কি হয়েছে? শেয়াল কুকুরে খেলে তোমাদের হুঁশ থাকে না।" সব চুপ হয়ে যেতো। তা সেদিন মা বললেন, "তোর ভয় ডর বলে কিছু নেই রে? নারায়ণের ভোগের দুধই চুরি করে খেলি?" আমি বললাম, "বললাম তো জানি না হয়ত বাছুরকে খাইয়ে দিয়েছে কেউ।" মনে মনে বললাম চুরি করে খাওয়ার কি মজা মা আমার যদি জানতো? আর নারায়ণের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম কি? মনে নেই ঠিক।

☞ শ্বাশুড়ী বৌ ঝগড়া বাধান ও উপভোগ

আমার চুরি করে খাওয়া বন্ধ করার জন্য মা চেষ্টা করেও হেরে গেছেন বারবার। একবার চুরি বন্ধ করার জন্য কাঠের বাক্স তৈয়ারী করালেন। কিন্তু আমাকে আটকানো কি অত সোজা? রান্না ঘরে ঢুকতে পারলেই ছোঁক ছোঁক করতাম কি পাই কি পাই! একদিন সকালবেলায় সর বেঁটে ঘি তৈরী হয়েছে, শিশিতে রয়েছে। পাশের কৌটায় দেখি রবিনসন বার্লি এককৌটা। ব্যস! তাই সই! কৌটার অর্দ্ধেক বার্লির সঙ্গে শিশির অর্দ্ধেক ঘি এককরে নিয়ে ঠাকুরমার নিরামিষ রান্নার ঘরে ঢুকে দেখি আখের গুড় এক বাটি! ওঃ চ্যাম্পিয়ন সংযোগ! তিনটে একসঙ্গে মিশে অমৃততূল্য হয়ে গলার ভিতর চলে গেল। এদিকে মা ঘুম থেকে উঠে রান্না ঘরে ঢুকে ঘি এর শিশি খালি দেখেই ভেবে নিলেন ওই বুড়ী শাশুড়ী নিশ্চয়ই দেবভোগ্য জিনিষটি দুপুরে ভাতে সদ্ব্যবহার করেছেন। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমার উদ্দেশ্যে চিৎকার, চেঁচামেচি, শাপ শাপান্ত। আর ঠাকুমা ইতিমধ্যে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করার জন্য বৈকালে তাঁর রান্নাঘরে ঢুকে দেখেছেন গুড়ের বাটি খালি। ভেবে নিয়েছেন ঐ বৌমাটিই নিশ্চয়ই প্রয়োজনে অধিকারবোধের পরিচয় দিয়েছে -

নিশ্চয়ই ওর কাজ। সঙ্গে সঙ্গে বুড়িরও সরবে গর্জ্জন চলছে, বাক্যবাণ চলছে, শাপ শাপান্ত চলছে, তুমুল বাকযুদ্ধ উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্দেহ করে, আর মাঝখান থেকে "সেই রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি''র মত সাচ্চা চোর আমি অন্তর্য্যামীর মত মিট্ মিট্ করে হাসছি আর তারিয়ে তারিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছি। ইতিমধ্যে বাবার খড়মের শব্দ! দৃশ্যান্তর ঘটল। দুই রণরঙ্গিনী নারীর মূর্ত্তির স্বরূপ ধারণ - চোররূপ বিদূষক আমারও রঙ্গভূমি তথা রণভূমি ত্যাগ করে বাবার অলক্ষ্যে সভয়ে নীরব প্রস্থান। সত্যি! আমি লোকটা মোটেই ভাল ছিলাম না কোনকালে, তাই নয় কি?

☞ ঠাকুমার মৃত্যু ও রঙ্গকথা

ঠাকুরমার তখন খুব অসুস্থ অবস্থা কিন্তু বুড়ি সেই অবস্থাতেও আমাদের মজার হাত থেকে রেহাই পায়নি। বয়স তখন ১০২ বছর কিন্তু দাঁত পড়েনি একটাও। সারা গায়ে শুয়ে শুয়ে থাকার জন্য আর মাঝে মাঝে অসাড়ে প্রস্রাব করার জন্য বেডসোর হয়ে গেছে। আমার আর দাদার উপর ভার পড়েছে রাত জেগে বুড়িকে দেখা, প্রস্রাব পালটান ইত্যাদি। বুড়ি তো সারারাত ঘুমোত না মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চেঁচাত। আর ঠিক সেই সময় আমরা দুভাই মজা করে তাঁর চৌকিটা ধরে জোরে নাড়িয়ে দিতাম। বুড়ি ভাবত খাট চৌকি দুলছে বোধহয় ভূমিকম্প হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল হরিবোল বলে চেঁচিয়ে উঠে বাবাকে জোরে জোরে ডাকতো। পাশের ঘরেই বাবা শুয়ে আছেন। মাতৃভক্ত ছেলে অমনি চেঁচাতে লাগলেন কি হয়েছে মা? কি হয়েছে? কি হয়েছে? বুড়ি বলতো "ভুঁইকাপ হচ্ছে বেরিয়ে আয় বাবা, ঘর থেকে বেড়িয়ে আয়।" বাবা বুঝতেন মনের বিকার। চুপ করে যেতেন। আমরাও তৃপ্তি পেতাম এই ভেবে - সারারাত তুমি জেগে চেচাঁবে আমাদের ঘুমাতে দেবে না? থাক সবাই জেগে। দেখ কেমন লাগে?

☞ দেহের অনিত্যতাবোধ ও কর্ম্মফল ভোগের কথা

সেই ঠাকুরমার কষ্টকর মৃত্যুই হল। কিন্তু যে ঠাকুরমা এতটুকু বয়সে বিধবা হয়ে সারা জীবন বার, ব্রত, উপবাসে দেহকে শীর্ণ করে ক্লিষ্ট করে পবিত্র জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে কামনা বাসনাকে নির্ম্মূল করে, সারাজীবন সাত্ত্বিকভাবে কাটিয়েছেন নানা ধর্ম্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ পূণ্যস্নান, তিথি নক্ষত্র অনুসারে সাত্ত্বিক আহার অথবা উপবাসের মধ্যে দিয়ে আদর্শ হিন্দু বিধবার শাস্ত্রোক্ত পূত পবিত্র পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও কি দেহভোগ এড়াতে পারলেন? বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ব্রতকথা, ঠাকুরপূজো কি তার কর্ম্মভোগ কমাতে পারল? পারেনি - তাই আজ আমাকে চিন্তা করায় যে দেহের কি পরিণতি! এই দেহ নিয়ে সারাজীবন কি ঘষামাজা, কি যত্ন, কি সাজান গোছান, কি অহংকার না আমরা করি। প্রারব্ধকে ঠেকানো যায় না, স্থিরত্ব ছাড়া জীবের কোন গতি নেই। আমার পিতৃদেবকেও দেখেছি যিনি ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলেন নি কখনও। কি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিয়মিত জপতপ, পূজা পাঠ, একাহারী জীবন যাপন কিন্তু তাঁকেও দেহের ভোগ নিতে হয়েছে। আমার মাতৃদেবী যিনি দান ধ্যান, গরীব দুঃখীর দুঃখে কাতরতা সব দেখিয়েছেন তিনিও দেখেছি দেহের ভোগের হাত থেকে রেহাই পাননি। বড়দা, মেজদা, ন'দা তাঁরা এ সবের মধ্যে ছিলেন না, রাজনীতি নিয়ে থাকতেন কিন্তু তাদের এরকম দেহের ভোগ নিতেই হয়নি। তাই বলি কর্ম্মফল অমোঘ। মানুষের বৃথা দর্প, বৃথা অহংকার, যা ঘটবার তা ঘটবেই।

বুড়ি দেহত্যাগের ৭দিন আগে একাধারে হাপর টেনে গেল। চরম শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিদায় নেবার আগেই বাবা খুব ভাবতে লাগলেন এই বর্ষা, ভয়ংকর কাদাজলে কি করে শবযাত্রা হবে? হুকুম হল ছেলে জোগাড় রাখ। ব্যস্ অমনি বড়দা, তিনি রাজনীতির সঙ্গেঁ যুক্ত জনাকয়েক ছেলে জোটালেন, দিনরাত বাড়ীতে রইল গিলল আর

তাস পেটাল। আমারও খুব মজা, লেখাপড়া করতে হচ্ছে না। তাদের খাওয়া দাওয়া দেখভাল করছি, জলখাবার বইছি, খিতমদগারী করছি। তারপর একদিন সকালে বুড়ি দেহ রাখল— মনে আছে সেই আমার প্রথম শবযাত্রী হওয়া। বুড়ির দেহটা নিয়ে যাবার সময় অন্ততঃ ২ মাইল অগুরু ছিটোতে হয়েছিল। দেহটার ক্ষত এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। বুড়ি চলে গেল রেখে গেল আমার মানসপটে দেহের করুণ পরিণতি ও কর্ম্মফল ভোগের নিশ্চয়তার জ্বলন্ত ছবি। পরবর্ত্তীকালে আমার বোধে আনতে সাহায্য করল, এই কথা —

"একমাত্র সেইজন পারে রোধিবারে নিয়তি শাসন,
যেজন নারায়ণে কর্ম্মফল করে সমর্পণ"।

☞ বীরত্বের গল্প

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই ব্যায়াম করা সুরু করি। এমনিতেই আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল কিন্তু রিপুদের তাড়নাও ছিল অকল্পনীয় ভাবে বেশী। তাই সৎগ্রন্থ পড়তাম, ব্যায়াম আরম্ভ করলাম যদি এদের হাত থেকে রেহাই পাই। ওমা! শরীর ভাল হতে লাগল, এদিকে রিপুদের দামালপনাও বাড়ল। তখন ওখানকার যোগব্যায়ামের শিক্ষক বললেন, আসন সুরু কর। তখন বিষ্টুঘোষের 'ব্যায়াম' নামক পত্রিকায় যোগব্যায়ামের উপকারিতায় ওর লেখা পড়ে নিষ্ঠাভরে আসন করতে লাগলাম। ব্যায়াম শিক্ষক দেবীপ্রসাদ বাজপেয়ী মহাশয়ের শিক্ষায় ও ছিলাম। কিন্তু ব্যায়াম যোগব্যায়াম কোন কিছুই রিপুদের দৌরাত্ম্য কমাতে পারল না। কিন্তু আমার মায়ের ও দাদার নীতিশিক্ষা আমার জীবনে চরম মূল্যবান ফল প্রদান করেছিল। মেয়েদের সঙ্গে কখনও কোনদিন কোনওভাবে দেহে বা মনে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়নি। মেয়েদের সামনে ঐ বয়স থেকেই খুব সাবধান ও সতর্ক থাকতাম।

এমনকি যৌবনেও কেউ কোন দিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মানসিক দুর্ব্বলতার কথা বলতে পারবে না। আমার সাক্ষী আমি নিজেই তাই জোর গলায় এ সব বলতে পারি। অবশ্য মনে মনে একটু আধটু যে হোত না তা বলতে পারব না কিন্তু সামনা সামনি হলেই মুখ তুলে ভাল করে দেখার সাহস হোত না। ভীষণ ভয় হোত আর মনে হোত আমার চেয়ে সকলেই তো ভাল। অপরে যদি আমার মধ্যে এ সব ভাব দেখে, কি বলবে? সকলে সৎ ও ভাল বলে জানে। ছিঃ ছিঃ। বাবা, দাদাদের সম্মান নষ্ট হবে। তাই মনে এলেই ঠাকুরের কাছে বলতাম। কখনও মন বলত ঠাকুর তো বলেছেন, "মনের পাপ, পাপ নয়।" কিন্তু তবুও মনে এলেই গীতা পাঠ করতাম। হয়ত কখনও একটু শান্তি পেতাম কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ করে মনের বিকার নষ্ট করা যায় না। **মানসিক স্থিতিই মোক্ষম ঔষধ, একমাত্র প্রতিকার। স্থিরতাই সৎসঙ্গ। স্থিরতাই অভ্যাস করো, সদগ্রন্থ পাঠ করো। তবে নিয়মিত অভ্যাস চাই।** কৈশোরে যদি রিপুদের অমন দামালপানা না থাকত, মনে হয় আমার ক্রিয়া পাওয়ার পথ প্রশস্ত হোত না। এদের অত্যাচারই আমাকে ঈশ্বর উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে। এরা আমার সাধন পথে বন্ধুর কাজ করেছে, ছদ্মবেশী বন্ধু এরা। আর এদের সঙ্গে লড়াই করার একমাত্র হাতিয়ার অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করা। ক্রিয়া হল স্থিতির উপায় আর স্থিরত্বই হল শিবত্ব, রিপুদমনের একমাত্র উপায়। ক্রিয়াই সৎসঙ্গ। ক্রিয়া না পেলে সৎসঙ্গ কি, তা আমার অজানাই থাকত। তাই মুক্ত ও উচ্চকণ্ঠে বলতে ইচ্ছা করে -

"ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর ভাই
ক্রিয়ার মত বান্ধব কেহ এ জগতে নাই।।

ইন্দ্রিয় সেবা, ইন্দ্রিয় চর্চ্চা জীবন করে ক্ষয়
আর ক্রিয়াটুকু করলে পরে জীবনের বৃদ্ধি হয়।।"

সেদিন বাড়ীতে বাবার এক মহল থেকে ধান এসেছে গাড়ী করে। একজন গাড়ী থেকে বস্তা পিঠে নিচ্ছে কুঁজো হয়ে, হেঁটে গিয়ে গোলার কাছে আর একজনকে দিচ্ছে। সে অনেক কসরৎ করে সেখান থেকে নিয়ে গোলায় ফেলছে। বড়দা বসে আছে সেখানে — বাবা তাকে ধানের হিসাব রাখতে বলেছেন। ঐ রকম ধান বওয়া দেখে গা জ্বালা করতে লাগল। আমার তখন ১৫/১৬ বছর বয়স। হেসে যাই বলেছি ওই ছোট বস্তাটা বইতে কত কসরৎ দেখান হচ্ছে? একাই তো যথেষ্ট। বড়দা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন - "কেরামতিটা তুই দেখানা দেখি।" বললাম কি খাওয়াবে বল? একা সব বস্তাগুলো গোলায় ফেলব - পেটভরে মিষ্টি খাওয়াবে কথাদাও। বড়দা বললেন, "কথা দিলাম - কিন্তু না পারলে কান ধরে ওঠবোস করাব।" ঠিক আছে তাই হবে বলে সেদিন ঐ বস্তা ধরে শূন্যে মাথার উপর তুলে একাই বস্তাগুলো গোলাজাত করে দিয়েছিলাম। মিষ্টি অবশ্য বড়দা খাওয়াননি কিন্তু ছোটখাট ভাইটার শক্তির গর্ব্বে সপ্রশংস তাকিয়ে আমার পিঠটা স্নেহভরে চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন "সাবাস্"! যে পেটটা আমার কখনও ভরত না, সেদিন সেটা মিষ্টিতে না ভরলেও দাদার ঐ সাবাস নামে ছোট একটা কথা পেটটার সঙ্গে মনটাকেও ভরিয়ে দিয়েছিল, তাই পুরস্কারটা সেদিন কম তো দূরের কথা, বেশী বলেই মনে হয়েছিল।

☞ মাছ চুরির গল্প

আগেই বলা হয়েছে আমি চিরকালের চোর — আর সেই চুরিটা ঘরেই শুধু নয়, বাইরেও চলত। বাবার মামার পুকুরে খুব বড় বড় মাছ ছিল। বুড়ো খুব মিষ্টভাষী ছিল, মাছ ধরার কথা বললে মাছ ধরতে দিত কিন্তু মাছটা দিত না। তাই ইচ্ছাহল চুরি করে বড় মাছ ধরতে হবে। ধরেও ছিলাম বড় একটা মাছ। অতবড় মাছ আমার

জীবনে আর কখনও ধরা হয়নি - কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাছটা খাওয়া ভাগ্যে জোটেনি। বিধিলিপি কে খন্ডাবে? মানতেই হবে। সেই প্রসঙ্গেই এই সত্যি কাহিনী।

ঠিক হল বাবা দুপুরে ঘুমোবার পর ধরব। বাবা দুপুরবেলা দিবানিদ্রা যেতেন ঘরে। ঐ ঘরে বাবার পা টিপে দিয়ে বাবার খাটের পাশে রাখা একটা চৌকিতে আমাকে শুয়ে পড়তে হত। বাবা ঘুমাবার সময় এত নাসিকা গর্জ্জন হোত - মনে হতো যেন বাঘ গর্জ্জন করছে। বাবাও ঘুমিয়েছেন যথারীতি আমিও মাছ ধরতে বেড়িয়ে পড়লাম। এমনটাই হোত। কি ফাঁকিবাজ ছিলাম বলা যাবে না - তেমনি বদবুদ্ধির চূড়ান্ত - কেমন করে জানিনা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় খেলে যেত। বাবা ঘুমাবার পর নিত্য বেরিয়ে যেতাম - খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে আমতলা, পেয়ারাতলা করে, না হয় রান্নাঘরে চুরি করে খেয়ে ঠিক বাবার ঘুমভাঙ্গার আগে দিব্যি চৌকিতে এসে শুয়ে পড়তাম - যেন কত বাধ্যছেলে বাবার। পড়তে বসে বাবাকে কি ফাঁকিই না দিতাম মনে হলে হাসি পায় আজও। বাবা আমাকে নির্দিষ্ট পড়ার পাঠ দেখিয়ে হয়ত বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর সঙ্গেঁ গল্পগুজব করছেন আর আমিও এদিকে লাট্টু, গুলি, ছবি এ সব নিয়ে মজাসে খেলে যাচ্ছি। বাবা বলেছেন জোরে জোরে পড়তে — তাই বাবা যাতে শুনতে পান, সেইজন্য একটা লাইন বা একটা কথা অনেকবার ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে বলে যাচ্ছি মুখে। হাত ও চোখ বা অন্যান্য সব ইন্দ্রিয় এবং মন কিন্তু সেই সময় অন্যত্র লিপ্ত। সেই সময়ে গ্রামবাংলার গুরুমশায়-এর পাঠশালায় এমন ছবি বিরল ছিল না। গুরুমশায় দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি সেরে পাঠশালায় ফিরে ছেলেদের দাঁড়িয়ে নামতা মুখস্থ বলতে বলে নাসিকা গর্জ্জন করছেন আর ওদিকে পড়ুয়ার দল আট দুগুণে ষোল বহুক্ষণ আওড়াচ্ছে। মাষ্টার মহাশয়কে একটু সজাগ হোতে দেখলেই বা আড়মোড়া ভাঙছেন দেখেই পড়ুয়ের দল সমস্বরে তখন তিন আট্টে চব্বিশ হাকতে শুরু

করল। ১৬ থেকে ২৪ আসা নির্ভর করবে গুরুমশায়ের তন্দ্রা ভাঙার উপর আর ওরই মধ্যে মুখের নামতা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও পড়ুয়াদের ইশারায় হাসি, মস্করা কিন্তু কখনই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত না। আমিও একই পথের পথিক হোতাম বাবা গল্প করতে বসলেই। চোখের সামনে ইতিহাসের বই খুলে লোক দেখানো ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করার ছলে অন্যদিকে মন থাকার জন্য ইতিহাস পড়ার নামে মুখ দিয়ে তখন হয়ত বাংলা কবিতা কখন মুখস্থ বলছি নিজেই জানতে পারা যেত না। মোহন সিরিজও ছিল। ফাঁকির রকম সকমও আলাদা ছিল। অনেকক্ষণ বাইরে মন টানছে - একবার পাক মেরে ঘুরে আসতে হবে কিন্তু সেইমাত্র কিছুক্ষণ আগে হয়ত বাবার অনুমতি নিয়ে মিছামিছি প্রস্রাব যাবার ছলে বাইরে থেকে সদ্য ঘুরে এসেছি অথচ বাইরে একবার যেতেই হবে - কি করি, কি করি? হঠাৎ জোরে বলে উঠলাম - "যাই!" আমার ঐ হঠাৎ চীৎকারে বাবা হয়ত সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন "কি হোল?" "মনে হল মা যেন ডাকলেন।" - উত্তর দিই। বাবা বললেন, "যাও দেখে এসো।" কি দেখে আসব সে তো আমিই জানি। যাই হোক বাবাকে ঐভাবে ঘুমোবার পর ফাঁকি দিয়ে পুকুরে গিয়ে ছিপ ফেলতেই বড় রুই গেঁথেছি। কোনরকমে জোর করে টেনেটুনে তুলে বুকে চেপে বাড়ীতে এনে মায়ের সামনে ধরাস করে ফেলে দিয়েই আবার নিজের চৌকিতে ভাল ছেলে হয়ে ঘুমাবার ভান করে পড়ে আছি মাছ শিকারের পর। পরের ঘটনা একটু চিন্তা করুন। কারণ মাছটা সবাই খেলেও আমার মা ও বাবার খাওয়া হয়নি। সেই কথাতেই আসি।

সেদিন সকাল থেকেই মনে মনে শুধুই জপ হচ্ছে - দুপুরে মাছের কালিয়া! বেশী খাওয়ার সুবাদে মা তো আমাকে একটু বেশীই দেবেন ঠিকই, খিদে বাড়াবার জন্য তার উপরে বেশ করে পুকুরে সাঁতারও কেটেছি। বাবা ও আমি খেতে বসেছি। আমাদের উভয়কে

থালায় ভাত দিয়ে দুটো মাছের বাটি বাবার সামনে বসিয়ে দিয়েছেন। বাবা বিশাল মুড়োশুদ্ধ মাছের বাটিটা হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, "চোরাই মাল খাই না।" দমবন্ধ হয়ে আসছিল আমার — মাছ তো খাওয়া হলই না — পেটভরে ভাতও সেদিন খেতে পারিনি। মাছ চুরির ব্যাপারটা বোধ হয় কেউ বাবাকে বলে দিয়েছিল। অবশ্য পরে আর বাবা কিছু বলেননি। কিন্তু অতি লোভের শাস্তিটা হাতে হাতে নীরবে পেয়ে গিয়েছিলাম।

☞ আমার একাদশী পালন

ঠাকুরমার দেহত্যাগের কিছুদিন আগে আমার পৈতে হয়েছিল। পৈতের সময় দন্ডীঘরে একবার একাদশী পড়েছিল। ঠাকুমা ও বাবাকে দেখেছি একাদশী পালন করতেন কি কঠোর ও নিষ্ঠাভরে। প্রায় উপবাস - কোন খাওয়া দাওয়া নেই - সর্ব্বনাশ! আমার কি হবে এবার তাহলে? মরেই যাব আমি। ঠাকুরকে ডাকছি প্রাণপণে, "হে ঠাকুর আমার পেটের জ্বালার ব্যবস্থাটা করো, নচেৎ মরেই যাব। পেটটা তো আমার কখনও ভরে না আমার তুমি জান!" যাই হোক সদ্য বামুন হওয়ার ব্রহ্মতেজের সুবাদে ঠাকুর ম্যানেজ করে দিলেন। দন্ডীর ঘরে প্রচুর ফলমূল তো ছিলই আর ঐ ঘরে একমাত্র বড়দার যাতায়াতের অনুমতি ছিল। তাছাড়া বড়দাও তো প্রচুর খেতে পারতেন - অতএব সে যাত্রা যা হোক করে উতরে গেলাম। বড়দা দন্ডীরঘরে আমার সঙ্গে ফলমূল সাবরাতে লাগল আর বাইরে থেকে আমার জন্য অন্যান্য খাবার সাপ্লাই করল। যৌথ উদ্যোগে একাদশী পালন নিখুঁত ভাবেই পুষিয়ে দিলেন ঠাকুর, কিন্তু মুসকিল হোল দন্ডীর ঘর থেকে বেরুবার পর পরের একাদশী তিথিতে। সেবার ঘরে থেকে কি করেছি কেউ না হয় বোঝেনি, এবার কি হবে? যদি ঠাকুমা ও বাবার সঙ্গে একসঙ্গে একাদশী করতে হয় তাহলে বাবার

মত সারাদিনে একবার মিছরীর সরবৎ ও ঠাকুমার মত নির্জ্জলা উপবাস করতে হবে - আমি পারবও না, বাঁচবও না। ঠাকুমাকে দেখেছি একাদশীর পরদিন পূণ্যলোভে দুধ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করতেন যার বেশীর ভাগটাই আমরা পেতাম আর ঠাকুরমার ঝুলিতে রাশি রাশি পূণ্যসঞ্চয় হতো। কিন্তু আমার তো পেটটা ভরান ছাড়া পূণ্যসঞ্চয়ের লোভ নেই। সকালে উঠেই মায়ের পিছনে লেগে রইলাম কারণ সকাল থেকেই কিছু জোটেনি, আর মা খালি বলছেন "একটু অপেক্ষা কর লক্ষ্মীসোনা আমার — কর্ত্তা পূজা সেরে উঠুক - জিজ্ঞাসা করি কি খাবে তবে দেওয়া যাবে। অবশ্য জল খেতে পারিস যতবার ইচ্ছা।" মাকে সেই মূহুর্ত্তে জগতের সবচেয়ে নিষ্ঠুরা মনে হল আমার। জল খেয়ে কতক্ষণ বাঁচবো? ইতিমধ্যেই আধমরা হয়ে গেছি - হাত পা চলছে না আর - কিন্তু অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাবা পূজা সেরে কাছাড়ী বাড়ীতে গিয়ে বসতেই মা বললেন, "যা জিজ্ঞাসা করে আয় কর্ত্তাকে, কি খেতে দেওয়া হবে তোকে।" সর্ব্বনাশ! বাঘের মুখে কে যাবে? জীবনে বাবাকে ভয়ে তো বাবা বলে ডাকতেই পারি না - কিন্তু এদিকেও তো না জিজ্ঞাসা করলে প্রাণসংশয়। মনে মনে ভাবলাম নিতান্ত সদ্য ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য পাপ পূণ্যের ভয়টা রয়েছে অ'নইলে এতক্ষণ অঘটন ঘটে যেত। মরীয়া অবস্থায় কোনরকমে বাবার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না শুধু মাথা নীচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খোঁটরাচ্ছি। বাবার নজর পড়তেই বল্লেন, "তুমি কি কিছু বলবে?" কোনরকমে প্রাণের দায়ে মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, "না, মানে, আজ তো একাদশী - আমি কি খাব?" তাৎক্ষণিক জবাব পেলাম বাবার কাছে "তুমি ভাত খাবে।" ব্যস! আর যায় কোথা? একদৌড়ে মার কাছে হাজির হয়ে আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় বলি, "বাবা ভাত খেতে বলেছেন। উপস্থিত কিছু খেতে দাও - আর সহ্য করতে পারছি না।" মা তাড়াতাড়ি কিছুটা চিঁড়ে, দুধ মেখে ধরে দিলেন, তবে শান্তি। আমার কখনও পেট

ভরত না। খিদে পেলে কেঁদে ফেলতাম। ক্রিয়া পাওয়ার পর গুরুভাইদের বাড়ীতে বাবার সঙ্গে গেলে বাবা পৌঁছেই বলতেন, "বিষ্টুকে কিছু খেতে দাও আগে।" গুরুদেব নিজমুখে বলছেন অতএব তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থালা ভর্ত্তি মিষ্টি ও অন্যান্য ভাল ভাল খাবার দিতেন আর আমিও পরমানন্দে নিমেষে গলাধঃকরণ করতাম। কোন কোন বাড়ীতে আবার ঐ সঙ্গে নারকেল মুড়ি, লুচি, আলুর দম জুটতো। অন্যান্য সঙ্গীরা ২/১টি মিষ্টি বা অল্প কিছু খেতেন — আমি কিন্তু একটু আধটুতে কখনই থাকিনি। একদিনের কথা আজও বেশ মনে আছে। বোধহয় বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীর বাড়ী যাওয়া হয়েছিল সেবার। সারাদিন ঐ ভাবে চর্ব্যচূষ্য খেয়ে রাত ৯টার সময় বোধহয় বাবার সঙ্গে বাবার বাড়ী ফেরা হল। হাত মুখ ধুয়ে বাবা সদ্য খেতে বসেছেন। রাত্রে বাবা তখন খুব দামী পাউরুটির সামান্য একটু ও একটু দুধ খেতেন। আমাকে সামনে দেখেই খেতে বসেছেন, কি বসেননি - মুচকি হেসে বললেন, "ওঃ, বিষ্টুর আজ কিছু খাওয়াইতো হয়নি" বলেই আবার বল্লেন "কি বিষ্টু ? কিছু খাবে নাকি ?" আমি বললাম, "বলেন তো খাই।" বাবা তখন অবাক হয়ে বললেন। "সেকি ! এখনও খাবে ?" "নিষেধ করেন তো খাব না"— আমি বললাম। বাবা তখন পাউরুটি থেকে সামান্য পরিমাণ কেটে নিয়ে ও দুধের বাটি থেকে একটু দুধ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আজ আর অন্য কিছু খেয়ো না।" আমিও বললাম, "আজ্ঞে আজ আর খাব না।"

দয়াময় বাবা যেখানে গিয়েছেন, সঙ্গে গেছি আর বাবা আমাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব জায়গায় প্রচুর খাইয়ে গেছেন। কিন্তু বাবার দেহত্যাগের পর আজ আর কিছুই খেতে পারি না - খাবার ইচ্ছা তো নেই-ই, ক্ষমতাও নেই। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, সেদিন তাহলে আমার অমন রাক্ষুসে ক্ষুধা কি করে ছিল ? আমার ভিতর দিয়ে কে ঐ সমস্ত খাবার, অত পরিমাণ খাবার, মুহুর্মুহু খেত ? আজ সে নেই দেহধরে

আমার সামনে, তাই কি খেতে পারি না? আজ সে খাবার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে, তাই কি আমার মধ্যেও খাবার ইচ্ছা জাগে না? হয়ত এ সবই সত্যি! দয়াময় গুরু আমার দেহের মধ্যে কত লীলাই না দেখিয়ে গেছেন — এখনও কত দেখাবেন কে জানে?

☞ চরম বিপদের মধ্যে আমার নির্ভীকতার পরিচয়

আমার জীবনে চরম দুঃসাহসের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। সব তো বলা যায় না, সম্ভব নয়। এই ঘটনা তারই একটা মাত্র পরিচয়।

তখন সবেমাত্র পূর্ব্ব পাকিস্তান তৈরী হয়েছে। মুসলমান লীগের তখন প্রচন্ড প্রভাব প্রতিপত্তি। তখন ওখানে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি থাকলেও সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি ছিল মুসলিম লীগের। আমি কিন্তু উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম। সকলেই ভালবাসত আমাকে এবং এইটাই আমার মনের জোর বাড়াতে চরম সাহায্য করেছিল। তাছাড়া বাল্যকাল থেকেই ভগবদ বিশ্বাস প্রবল ছিল এবং ভগবদ বিশ্বাসের কাছে আসুরিক শক্তি ম্লান হয়ে যায়, এইটাই আমার বলার উদ্দেশ্য। আমাদের পরিবারটা সকলেরই সুনজরে ছিল; জাতি, দল, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই অমাদের খুব ভালবাসত আর আমাদের পরিবারও সকলকে আপন করে নিয়েছিল। ওখানকার মুসলমান মেয়েরা ছিল পর্দ্দানসীন — বাইরের লোকের কাছে তারা বোরখা পরে থাকলেও আমি কিন্তু যখন তখন মুসলমান পাড়ায় গেছি তাদের ঘরের মেয়েদের মায়েদের সাথে অবাধে মিশতাম — কেউ কোনদিন আপত্তি করেনি।

ওখানে মুসলিম লীগের প্রায়ই মিটিং হত। ঐ মুসলিম লীগের একজন যুবনেতা, আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, নাম কাশেম আলি, ভয়ঙ্কর জঙ্গী স্বভাব, ভীষণ মারকুটে টাইপের হিন্দুদের একদম সম্মান

দিত না। যুবসমাজ যে কোন কারণেই বিশেষতঃ হিন্দু যুবসমাজ ওকে খুব ভয় করত, খুব সমীহ করে চলত। সেই কাশেম আলি একবার সেই সময়ে আমাদের ক্লাব অর্থাৎ ব্যয়ামাগার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা অপবাদ দেয়। ব্যায়ামাগারে একজন মাত্র মুসলমান ছেলে ছিল। ক্লাবের অন্যান্য ছেলেরা আমাকে বলল যে ও ক্লাবে আসতে ভয় পাচ্ছে - কান দিইনি। কিন্তু ছেলেটা নিজে একদিন বলল, "আমি আর ক্লাবে আসব না কাশেমকে খুব ভয় করছে। কি জানি কখন কি করে বসবে!" প্রচন্ড রাগ হল একথা শুনেই। মায়ের কথায় রাগলে আমি নাকি দুর্ব্বাসা! বললাম "দাঁড়া বিকেলে ক্লাব থেকে বার হয়ে কাশেমের কি করি দেখ!" অন্যান্য ছেলেরা তো ভয়েই সারা - বারবার নিষেধ করছে এ নিয়ে কাশেমকে কিছু বলতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? তখন আমার শরীর ভীষণ ভাল আর তাছাড়া আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে কোনদিন পিছু হঠিনি। ওদের বললাম, "তোরা কিছু ভাবিস না- যা কপালে আছে হবে! কিন্তু তাই বলে ক্লাবের নামে মিথ্যা অপবাদ সহ্য করা যায় না।" পাঠক! স্মরণে রাখতে হবে যে — সময়টা ছিল পূর্ব্ব পাকিস্তান গঠনের সময়, তার উপর মুসলিম লীগের যুবনেতা। সে তখন সেখানে প্রায় রাজার ছেলে বলা যায়। তখনকার পরিবেশে ঐ রকম একজন শাসকদলের ছেলেকে চ্যালেঞ্জ জানান রীতিমত হিম্মতের ব্যাপার।কিন্তু আমার কথা তো আগেই বলেছি — আমার জীবনে ভয় কাউকে পেয়েছি - একমাত্র পিতৃদেবকে ছাড়া — মনে হয় না। আর আমার ভগবদ বিশ্বাস এই সমস্ত আসুরিক শক্তিকে কোনদিন গুরুত্ব দেয়নি - আজও দেয় না। তাই সেদিন সবে সন্ধ্যা নেমেছে চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মুসলিম লীগের মিটিং চলছে। গ্রামের জমিদারের বাঁধানো পুকুরের নির্জ্জনতাকে বেছে নিয়ে সেই পুকুরের সিড়িতে বসে ক্লাবের মুসলমান ছেলেটাকে বললাম "কাশেমকে ডাক্ বল বিষ্টুদা ডাকছে।" ক্লাবের অন্যান্য ছেলেদের বললাম, "তোরা কিন্তু কেউ কিছু বলবি না, একদম একটা কথাও না - যা বলবার আমি বলব।" ছেলেটা তো ভয়েই আধমরা। জোর করে ডাকতে পাঠালাম। অত্যন্ত গুমোট

পরিবেশ — গম্ভীর হয়ে বসে আছি - অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা — কি হয়, কি হয় ভাব! হঠাৎ এরই মধ্যে কাশেম এসে আমাকে ঐ রকম প্রচন্ড গম্ভীর দেখেই একবারে ছুটে এসে কাঁপতে কাঁপতে ঝুপ করে আমার পায়ে পড়ে হাঁটু দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বিষ্টুদা ! আপনার ছোট ভাই-ই যদি অন্যায় করে তাকে কি ক্ষমা করবেন না? আমাকে এবারের মত মাপ করে দিন।" অঝোরে কাঁদতে লাগল কাশেম। সকলে তো বিস্ময়ে স্তব্ধ। সত্যি বলতে কি কাশেম এত দুর্ব্বল হবে, এতটা ভয় পেয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবে আমিও ভাবিনি। ওকে দিয়ে অন্যায় স্বীকার করিয়ে ছাড়ব এ বিশ্বাস ছিল আমার - তাই ওর এই চকিত ব্যবহারে অপরাধী সুলভ নম্রতায় আমারও মনটা নরম হয়ে এলো বললাম, "ওঠ! ওঠ বলছি।" কাশেম তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল, উঠে দাঁড়াল ক্ষমাপ্রার্থী আসামীর ভঙ্গিমায় কাঁপতে কাঁপতে। বললাম, "আমাকে যা বলার বলিস কিছু মনে করব না - কিন্তু খবরদার! কখনও ক্লাবের নামে কিছু বলবি না — যা বাড়ী যা।" এরপর থেকে কাশেম রাস্তা ঘাটে যেখানেই দেখা হোত একমুখ হেসে সালাম জানাতো - আর আমিও সস্নেহে তার পিঠটা একটু চাপড়ে দিতাম।

তাই বলছি, "ভগবদ শক্তিই হোল আসল শক্তি, যার কাছে পশুশক্তি চিরকাল হার মেনে আসছে। হার মানবেও চিরকাল, চিরদিনই।" এই ছেলেটার সঙ্গে আগে কখনও রাস্তা ঘাটে কথাও বলতাম না - অত্যন্ত বাজে ছেলে বলেই ওর পরিচিতি ছিল। আমার ছোট ভাই অশোকের সঙ্গে ও পড়ত - ওদের উপরই সদ্দারী করত। এইভাবেই তার মনে অহংকার বাসা বাঁধতে সুরু করেছিল - ক্রমে ক্রমে তারই পরিণতি হয়েছিল চরম সাম্প্রদায়িকতার দিকে রাজনৈতিক মদত পেয়ে। ঈশ্বর তাই হয়ত আমার ভিতর দিয়ে একাধারে যেমন দেখালেন তিনি কারও অহংকার রাখেন না কারণ নিজের অহংকারই তিনি নিজে ভেঙ্গেছেন তেমনি অন্যদিকে এও প্রত্যক্ষ করালেন যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখলে অতি প্রতিকূলতার মধ্যেও জয়ী হওয়া যায়। তাঁর লীলার মধ্যে সবই সম্ভব।।

রতনে রতন চেনে - ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে

এই জয়লাভের আর একটা বাস্তব ঘটনা মনে আছে। স্কুলে সেবার ছাত্র বনাম মাষ্টার মহাশয়দের দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা। আনসার বাহিনীর এক নেতা রহমান সাহেব ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক। সকলেই সমঝে চলে। সঙ্গে পিস্তল থাকত সর্ব্বদা, অবশ্য সেদিন খেলার সময় ছিল না। রোগা ছিপছিপে চেহারা ঢাকার মহামেডানে খেলতেন। খেলা সুরু হওয়ার সাথে সাথে রহমান সাহেব পরপর দুটো গোল দিয়ে দিলেন। আমাদের অবস্থা তখন গয়া। দলের ছেলেরা এসে বলছে, "বিষ্টু, যা হোক করে বাঁচা, মুখ রক্ষা কর।" ওরা জানত এমনিতে আমি যেমন ভদ্র, তেমনি দরকার হলে বদবুদ্ধিতে জোড়া মেলেনা। ক্রিয়া পাবার পর বাবার বাড়ীতে এর কত পরিচয় অনেকে পেয়েছে। কাছা খুলে দেওয়া, মুখে প্রস্রাব করা, সুধীর গিরি মহাশয়কে ফেন খাওয়ানো - এই রকম কতই বদ বুদ্ধির নজির আছে। বাবা দয়া করে জানাতে দিলে বাবার বাড়ীতে মধুময় দিনের কাহিনীতে পাঠক জানতে পারবেন। এমন কি তখন পঞ্চম ক্রিয়া করি - বাবার পায়ের কাছে চুপ করে বসে থাকতাম। কেউ হয়ত বাবাকে প্রণাম করতে হেঁট হয়েছে কি — তার কাছা গেল খুলে - পেন্নাম করার মনঃসংযোগ গেল উড়ে, কাছা সামলাবে না হেঁট হবে? রাগ করে আমার দিকে ফিরতেই দেখে মাথা নীচু করে অত্যন্ত শান্ত, গম্ভীর ধ্যানমগ্ন আমাকে। বাবা হয়ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হোল?" বাবাকে তো সে লজ্জায় বলতে পারতো না- শুধু "না বাবা কিছু নয়" বলে আমার দিকে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনে মনে গজরাতে গজরাতে জায়গায় গিয়ে বসে পড়ত। বাবা বুঝতেন সবই আর মুচকি মুচকি করে হাসতেন। এইরকম বদবুদ্ধি সেদিনও খেলার সময় মাথায় এসে গেল। রহমান সাহেবকে টার্গেট করলাম। খেলার কৌশল বলে তো আমার কিছু নেই, আছে

পেশীশক্তি - খেলাতে ওটাও দরকার — তাই ওটাই প্রয়োগ করলাম। রহমান সাহেব আক্রমণ ভাগে খেলছেন বল নিয়ে এগিয়ে আসতেই আমার অনেক যত্নে তৈরী করা ভারী শরীরটা সেই রোগা চেহারাটার সঙ্গে আলাপের জন্য এগিয়ে গেল - চকিতের স্পর্শ, ব্যস্! রহমান সহেবের শরীরটা ছিটকে পড়ল হাত কয়েক দূরে। কপট দরদী সেজে সাহেবকে তুলতে গেলাম, বললাম "খুব কি লেগেছে স্যার?" স্যার, একজন পাকা খেলোয়াড়। তাই রেগে না গিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে হাসতে হাসতে বললেন, "বাঁদর কোথাকার? মেরে ফেলবি তো দেখছি।" ব্যস! এক রতনকে আর এক রতন চিনে ফেলল - একজনের কৌশল অন্যজনের গায়ের বল। খেলার দৃশ্যান্তর ঘটল। রহমান সাহেবের আক্রমণভাগ ছেড়ে রক্ষণভাগে প্রস্থান। তারপর? তারপর আমাদের না জেতার তো কথা নয়। ফুটবলে আক্রমণ ভাগ না থাকলে যা হয় তাই হল। আমাদের বাহিনী ওদেরকে পুরোদমে চেপে ধরল আর আমাদের স্কোরার "খালেক" পর পর তিনখানা বল ওদের গোলে সহজেই পৌঁছে দিল। আমরা এক গোলে জিতে গেলাম। অবশ্য রহমান সাহেব আজকালকার শিক্ষকের মত পরীক্ষার খাতায় এর জন্য কোন প্রতিশোধ নেননি, প্রকৃত খেলোয়াড় তো?

☞ শিবরাত্রির বরপ্রাপ্তি

সেবারই পৈতে হয়েছে আমার - ঠিক করলাম শিবরাত্রির উপবাস করব। মা নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমি অনড়। দিদিও শিবরাত্রির উপবাস করবে বলল। বাবা সকালে উকিলবাড়ী কি কাজে বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেলেন, "নারকেল পাড়ালে কিছু ডাবও পেরে রেখো। বাবাও চলে গেছেন আমিও ভুলে গেছি। ফিরে এসে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাব পাড়িয়েছ?" সর্ব্বনাশ একদম ভুলে গেছি। মনে মনে ভাবলাম আমিই পাড়ব। কারণ তখন নারকেল

গাছে উঠা আমার কাছে ডাল ভাত - কোন ব্যাপারই নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বললাম, "আমিই পাড়ব।" চল তবে আবার কখন পাড়বে?" বলেই বাবা মাথায় জবাকুসুম থাপড়াতে থাপড়াতে এগিয়ে গেলেন আর আমিও দড়িদড়া নিয়ে গাছের নীচে গেলাম। খিদের ঠ্যালায় শরীর ঝিম ঝিম করছে। কিছুটা গাছে উঠছি আবার হুর হুর করে নেমে যাচ্ছি - আবার উঠছি আবার নামছি। উঠছি আর নামছি, নামছি আবার উঠছি। বাবা তখন মাথায় জমাকুসুম ঠেসছেন এদিকের ব্যাপার লক্ষ্যই করেন নি। এমনি করে গাছের মাঝামাঝি জায়গায় তখন কোন রকমে পৌঁছেছি - শরীর খুব অবসন্ন বোধ হচ্ছে - একদম গাছে নিজেকে রাখতে পারছি না। হতে হতেই ধপাস করে একটা শব্দ - বাবা তাকিয়ে দেখেন গাছের নীচে ডোবার ধারে নরম কাদার উপর ঠিক একটা কোলা ব্যাঙের মত উবু হয়ে বসে আছি। আর যায় কোথা? শিবরাত্রির বরদান সুরু হল - কিল, চড়, ঘুসি পড়ছে পিঠের উপর অজস্রধারায় আর বাবা মুখে বলে চলেছেন "মুরোদ নেই, খালি বাহাদুরি দেখাবার শখ? শূয়ার কোথাকার?" মার খেয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি আবার পড়ে যাচ্ছি ধপাস করে। গাছের উঠার মত অবস্থা। যতবার দাঁড়াচ্ছি পড়ে যাচ্ছি - চুলের মুঠি ধরে তুলছেন আবার মারের চোটে পড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে চলেছে অবিরাম বাক্যবাণ। মরেই যেতাম যদি না বাবার মামীমা ঐ অবস্থায় দূর থেকে দেখে ঘোমটা মাথায় আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে বাঁচাতেন। মামীমাকে দেখেই বাবা কিছুটা নিরস্ত হলেন। সরে গেলেন সেখান থেকে। আমার তখন উঠে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। চোখে জল বেরুচ্ছে। কিন্তু মুখে শব্দ করার জো নেই কারণ কাঁদলেই আরো মার হবে আর বলবেন অন্যায় করে আবার কাঁদা হচ্ছে। এদিকে যদি না কাঁদি তাহলে বলতেন,"দেখ দেখ এটা আর জন্মে চোর ছিল, এ জন্মেও তাই হবে। দেখ্, এত মার খেয়েও কাঁদে না।" শাঁখের করাতের অবস্থা। বাবার এই মামীমাকে আমি তখন বৌদি বলে

ডাকতাম কেন ডাকতাম জানি না তবে ডাকতাম — সেই বৌদির সামনে সেদিন শিবরাত্রির বরপ্রাপ্তি ভালই হয়েছিল।

☞ পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রী গুরুদেবের স্নেহছায়ার কথা

তখন সবে পূর্ব্ব পাকিস্তান হয়েছে, কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়েছে - আমার বড়দা সহ অনেক নেতাই তখন পলাতক। অনেক বড় বড় নেতার সাথে পরিচয় ছিল, খুব স্নেহ করতেন সবাই আমাকে। নির্দ্দেশ এল সেই রাত্রে পোষ্টার লাগাতে হবে। তখন স্কুল ফাইনাল টেষ্ট পরীক্ষা চলছে। মাকে মিথ্যা বললাম যে রাত্রে বন্ধুর বাড়ী ৯টার পর কিছু জরুরী কাগজ আনতে যেতে হবে। মা বললেন সাবধানে যাস্ আবার তাড়াতাড়ি ফিরবি নইলে চিন্তা হবে। রাজনৈতিক নেতাদের জন্য তাদের নির্দ্দেশে অনেক সময় অনেক মিথ্যা বলতে হোত। কোন উপায় ছিল না, কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই মিথ্যা বলাটাকে কোন অন্যায় বলে মনে হয়নি কখনও - বাবা, মাও জানতেন। তাই ভাবি গুরুদেব কত বিচিত্র পথেই না আমাকে ঘুরিয়েছেন। যা বলি সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। কিন্তু এত সব বিচিত্র পথে ঘুরেও কোথাও শান্তি পাইনি, পেয়েছি শুধু উত্তেজনা আর অবিশ্বাস। তাই স্বপ্নে গুরুকে পেয়ে তাঁকে স্থূল দেহে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কি দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ ঐ রোগা শীর্ণদেহ লোকটার, ঐ বৃদ্ধ লোকটার, বিষ্টু বলে একটা ডাক শুনলে মনপ্রাণ যেন শীতল হয়ে যেতো। কি প্রচন্ড ইচ্ছা জাগে ঐ ডাকটা শুনতে। এখন তাই ভাবি কি প্রচন্ড ভুল করেছি। অনুতাপ হয় এই ভেবে যে সারাজীবন ধরে তার ভালবাসার একটা কণারও যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারিনি। উজার করে তিনি শুধু দিয়ে গেছেন - আমার ভাঁড়ারে জমা

হয়েছে সামান্যই। ওঁনার অপার করুণার কত অপচয় না করেছি। কত অবজ্ঞা অবহেলা করেছি তাঁর মত বিরাট পুরুষকে। আমি তাঁকে কি দিতে পেরেছি? পেরেছি কি নিজেকে তাঁর চরণে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে? মনে হয় পারিনি। আফশোষ হয় কি ভাবে হেলা ফেলা করে কাটিয়েছি সেই দিনগুলো? নিজেকে অতি সহজ সাধারণ করে দয়া করে যে আমাদের ধরা দিয়েছিল, কখনও যে নিজেকে আমাদের কাছে বড় হয়ে ধরা দিতে চায়নি — নিজেকে সম্পূর্ণ গোপনকরে রেখে অত্যন্ত সাধারণ জীবনের মধ্য দিয়ে যে বুঝতে দেয়নি কখনও যে, সে ঘরের লোক না বাইরের লোক। সেই বিরাট মহান ব্যক্তিত্বকে আমরাও না বুঝতে পেরে, সারাজীবন অতি সাধারণ একটা আমাদের মত মানুষ মনে করে কি ভুলই না সারাজীবন করে এসেছি! অকাতরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তিনি আমাদের কাছে, পাননি কিছু - চানওনি কিছু। এর জন্য তাঁর মনে কোনদিন কোন বিরূপতা দেখিনি। দেহত্যাগের ৩/৪ দিন আগে তাঁকে একদিন যখন বলেছিলাম, "বাবা! আজ ১৬/১৭ বছর আপনার সাথে তো ছায়ার মত ঘুরলাম কিন্তু আপনাকে এতটুকুও বুঝতে পারলাম না"- হঠাৎ বাবা যেন ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুধু বললেন, "আমাকে জানার বা বোঝার চেষ্টা করো না। সে বড় বিষম ঠাঁই গুরুশিষ্যে দেখা নাই। ক্রিয়া করে যাও।" বলেই আবার শান্ত হয়ে গেলেন। তখন রোজ ডাক্তার আসছে - ইনজেক্শান চলছে। নেহাৎ খুব ভালবাসতেন কাছে ডাকতেন, না থাকলে ডাকাডাকি করতেন বলে কাছে যেতে পারতাম নচেৎ অন্যের, কাছে যাবার সাহস ছিল না। আমাকে কাছে পাবার জন্য কি কাতরতাই না ছিল। সেই ক্ষীণ দেহটার অভাবে এ অধমের আজ কতই না যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হচ্ছে - আর তাঁর দেহ থাকাকালে তিনি যেন আমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন।

☞ সাধকের কাছে গুরুদেবের স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে

আজ সেই দেহটা নেই - তাই তাঁর সমস্ত কিছু একে একে পরিমাপ করছি প্রতি মুহুর্ত্তে। আর একটা কথা আজ পরিষ্কারভাবে বোধ করছি যে — **গুরুদেব যে স্থূল দেহটা নিয়ে আমাদের কাছে নিত্য প্রতীয়মান ছিলেন সেই দেহটার গুরুত্ব অপরিসীম। বোধহয় আত্মজ্ঞান হওয়ার পরেও মোহন্ত গুরুর গুরুত্ব কমে না।** যদিও আমি আত্মজ্ঞানী হতে পারিনি তবু অনুমান করতে অসুবিধা হয়না যে— **যতক্ষণ গুরুদেবের স্থূল দেহটা ছিল ততদিন তার গুরুত্ব তেমন করে বুঝতে পারা যায়নি বা বুঝতে দেয়নি কিন্তু আজ বুঝতে পারা যাচ্ছে প্রতি পদে পদে। গুরুদেবের দেহটা থাকতে থাকতে যতটা জ্ঞানের পরিধি ও আনন্দ বাড়িয়ে নেওয়া সহজ হয় সেই দেহটা না থাকলে পরিস্থিতিটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।** সেই নিত্য দেহটার কাছে গেলে মনের যে অবস্থা হোত কৈ আজ তো তা হয়না। তখন মনে হোত এক বিশাল গগনচুম্বী পাহাড় যেন আমাকে সব কিছু থেকে আড়াল করে রেখেছে। কৈ আজ তো তা হয় না। আজ প্রতি মুহুর্ত্তে নিষ্ঠুর বাস্তব আমাকে আঘাত করছে। তখন সকল সময় প্রত্যক্ষ বোধ ছিল, "বাবা আছেন, আমার কোন চিন্তাই নেই", আজ সেই বোধ থাকলেও অতি সূক্ষ্ম সেই আনন্দ, সেই তৃপ্তি নেই। দেহ, মন যতকাল আছে ততকাল স্থূলবোধ কমবে না। এখনও যে স্থূল ক্ষুধা, তৃষ্ণার বোধ রয়েছে, তাই বাবার স্থূল দেহটার স্পর্শসুখ যাবে কোথায়? অনেক জনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, "আচ্ছা বাবার বাড়ী গিয়ে কি তোমরা এখন আগেকার সেই আনন্দ পাও?" সকলেরই এক উত্তর তেমন আনন্দ তেমন শান্তি পাইনা বাবার দেহ থাকতে যেমন পেতাম, ফাঁকা বোধ হয়। তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম চিরদিন ছিল, থাকবেও।

****

ষষ্ঠ অধ্যায়

☞ রিপুদের দামালপনা ও ক্রিয়াপ্রাপ্তি

আমাব ক্রিয়া প্রাপ্তির ইতিহাসটা এখনও বলা হয়নি, সেইটা বলার চেষ্টা করব।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৬০ সালের সুরু থেকেই জগৎ সংসারের অসারতার দৃশ্য ও নানারূপ ভাবভক্তি দেখে মনে হয়েছিল এ ভাবে জীবন ধারনের কোন মানে হয়না। আহার, বিহার, মৈথুন তো পশুতেও করে, তাহলে তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়? এই ধরনের চিন্তা ও গতানুগতিক জীবন ধারনের অর্থহীনতা একদিকে যেমন প্রবল আলোড়ন তুলল তেমনি আমার মধ্যেকার রিপুদের দৌরাত্ম্যও আমাকে পাগল করে দিতে লাগল। এই রিপুকে কিভাবে দমন করা যায় জানার জন্য আকুল হয়ে কি না করেছি? ব্যায়ামবিদ্দের কাছে গেছি, দেহতত্ত্ববিদ, জ্যোতিষ, কালীসাধক, তন্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ, কবজ সব দেখলাম কিছুতেই কিছু হল না। পরবর্ত্তীকালে বাবাকে বলতে শুনে ছিলাম - "ও এমন জিনিযই নয়, কোন 'বাবা'তে কুলোবে না। ক্রিয়া করে যাও।" ওঃ ! সত্যি ! এখন তাই ভাবি বাবা কি নির্ম্মম সত্য প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। তবে একটা কথা ছোট থেকেই বিশ্বাস করতাম যে ঈশ্বরের করুণা হলেই এদের হাত থাকে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কারণ একটা ঘটনার কথা মনে আছে - সেটা হল একবার দক্ষিণ কোলকাতায় প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে আমি ঘটনা চক্রে একা আছি। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিশুতি রাত - অতবড় চারতলা বাড়ীটার মধ্যে কেউ কোথাও নেই - শুধু একতলার একটা ঘরে ঐ বাড়ীর একটা মধ্য যৌবনা ঝি ঘরে খিল লাগিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে? মধ্যরাত্রে কামনা জাগল, রিপুর প্রাবল্য দেখা দিল। তখন

আমি পূর্ণবয়স্ক যুবক। নিজের শরীরের রক্ত তখন ফুটছে - প্রচন্ড আক্রমণে বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত মন অহঃরহ আমাকে ঐ নির্জ্জনতার সুযোগ নিতে প্ররোচনা দিচ্ছে। কপাট ভেঙ্গে ঐ পরিচারিকার দেহভোগে আমাকে পাগল করে তুলছে। অন্যদিকে আমার বিবেক বলছে, "এত বড় বংশের সন্তান হয়ে মা, বাবা, দাদার শিক্ষার অবমাননা ঘটাবি? লোকে জানলে বংশের তো অবমাননা হবে।" কুমতি সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে - সে জানাচ্ছে নির্জ্জন রাতের মলিন কাজের কথা জানবে কে? নিস্তব্ধ বাড়ীর কোথাও তো কোন সাক্ষী নেই। সুমতি চাবুক হাতে সাবধান করছে। একটু এগোই তো দশপা পিছিয়ে যাই। ঈশ্বরকে মিনতি করি এই জ্বালার অবসান ঘটাতে। শ্রান্ত ক্লান্ত মন নিয়ে নিদ্রাবিহীন রাত যাপন করি - অবশেষে একসময় প্রভাতের আলো দেখা দেয় - ক্রমে ক্রমে রিপুর দামালপনা শান্ত হয়ে আসে। তাই বলছি — ঈশ্বর কৃপা করলে সব হয়, দাবানলও নিমেষে নিভে যায়। মনে মনে তাই তখন মা কালীর ধ্যান করি, চতুর্ভূজ নারায়ণের মূর্ত্তির কথা মনে করি, নারায়ণ শিলা পূজো করি, কখনও বা মা দুর্গার ধ্যান করতাম। দেবতার রূপ মনে এনে তাদের ধ্যান করিতাম। এ সমস্ত করার জন্য নানাপ্রকারের অনুভূতি হোত ঠিকই কিন্তু প্রতিকার কিছু হোত না। খেয়ালের বশে বাগুইহাটিতে এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হোলাম না। কিছু হল না। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে তো প্রায়ই যাতায়াত করতাম। মায়ের কাছে করুণভাবে মিনতি জানিয়েছি, মাকে বলেছি রিপু দমনের জন্য। এমন কি ওখানকার প্রধান পুরোহিত মশায়ের কথায় নতুন কাপড়ের টুকুরো সঙ্গে নিয়ে ভোর রাত্রে মন্দিরে গেছি - তিনি বলেছেন ঐ কাপড় মন্ত্রঃপূত করে দেবেন - বিছানায় ঐ কাপড় রাখলে রিপুদমন হবে, তাই করেছি। সব নিষ্ফল, কাজের কাজ কিছু হয়নি। শুনলাম, ভাটপাড়ায় জ্যোতিষী মহাশয় ঐ ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন - ছুটেছি ভাটপাড়া, রিপুদের দাপটে ভাটা কিন্তু পড়েনি। এই রিপুদের তাড়না, এখন ভাবি, ভাগ্যি ছিল, তাই হয়ত আমাকে বাধ্য হয়ে

সৎজীবন যাপনের উপায় বার করতে উন্মাদনা যুগিয়েছিল। হ্যাঁ, উন্মাদই প্রায় হয়েছিলাম এদের আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। শুনলাম বামাক্ষ্যাপার প্রত্যক্ষ শিষ্য বসির হাটের তারাক্ষেপার কথা । অমনি ছুটলাম সেই ক্ষেপার সন্ধানে, তাঁর সঙ্গ করার জন্য। শেষে দেখলাম তারা মায়ের ক্ষেপা ছেলেও আমার রিপুদের ক্ষেপামি কমাবার সদযুক্তি এমন কিছু বাতলাতে পারলে না। আমাকে শুধু বললেন, ''অপেক্ষা কর বেটা, ভাল জায়গায় দীক্ষা পাবি''- হয়ত মনে মনে তাঁর সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম, হয়ত করিনি কিন্তু উত্তরকালে তাঁর কথা ফলেছিল বলতে পারি। রাত্রে ঘুম হয় না, কি করে কোন পথে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই এই চিন্তা জাগত - আর মনে হোত সংসারের অসারতার কথা। তবে একটা জিনিষ আমার ছিল, আজ খুলেই বলছি যে যৌবনে মেয়েদের সম্বন্ধে নানা রঙিন চিন্তা মনে এসেছে, তাদের নিয়ে মনে মনে নানা রকম ভাবতাম না বলা যাবে না কিন্তু তাদের সামনে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব আসত, কখনও কোনওরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেত না। তখন কত মেয়ের সাথে মিশেছি, কত রকম অবস্থায় পড়েছি, কিন্তু কেউ কোনদিন, আমার মধ্যে দুর্ব্বলতা দেখতে পায়নি কিন্তু সে সমস্ত মেয়েদের যে কখনও কাহারও মধ্যে দুর্বলতা দেখিনি তা বলা যাবে না। সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, সেই অভিজ্ঞতা কারও কারও পরে হয়েছে। যাই হোক, এই সমস্ত কিছুর জন্যই হয়ত মেয়েরাও আমার সঙ্গে অবাধে মিশত এবং তাদের মধ্যে এরজন্য একটা শ্রদ্ধার স্থানও ছিল আমার প্রতি। তাদের সঙ্গে মেশার সময় বেশীর ভাগ ধর্ম্ম আলোচনা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, যেমন রামকৃষ্ণ কথামৃত, গীতা পড়া ইত্যাদি হত - ফলে খুব বেশী রকমের উত্তেজনা জাগার অবসর ছিল না। শিশুকালে মায়ের কড়া শাসনে ও বড়দার নীতি শিক্ষার ফলে আমার মনে এই ধর্ম্মভাবের জাগরণ ঘটেছিল।

এদিকে আমার এই ধর্ম্মভাবের জন্য মায়ের মনে যথেষ্ট ভয়ও

ছিল। মা ভাবতেন আমি বোধহয় সংসারে আবদ্ধ থাকব না। কিন্তু সেটা হোলনা, কারণ আমার ছোট ভাই অশোক বিবাহ না করেও সংসারে থেকেও সংসারী সাজল না, সংসারে যুক্ত হতে চাইল না। সেও আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং মিশনের সেবায় নিযুক্ত। যাই হোক, এই সমস্ত অবস্থায় পড়ে গুরুর সন্ধান করতে লাগলাম। কারণ তখন অনেকেই বলছিল যে গুরুকরণ না করলে কিছুই হবে না।

আমার মাতৃদেবী আবার এই গুরুকরণ ব্যাপারে খুব কট্টরবাদী। তাঁর সেই এককথা। তুই কুলগুরুর সন্ধান কর - তাতে যদি দীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা তার নাও থাকে তবু তার অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। আমার মা ও বাবার কুলগুরু ছিলেন সাধক সর্ব্বানন্দের বংশধর। মায়ের গুরুদেবকে আমি দেখেছি। তখন তিনি খুব বৃদ্ধ। আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর আচার, আচরণ চেহারা অতিশয় মধুর ছিল। শরীরটি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালায় বিভূষিত থাকত। যদিও আমি তখন খুব ছোট তবুও তাঁর কথা আমার বেশ মনে আছে।

গুরুবংশের সন্ধান করে চলেছি দীক্ষাপ্রাপ্তির আশায় কিন্তু হায় সেই বংশের কারো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন বাধ্য হয়ে গেলাম ভাটপাড়া। ভাটপাড়া যাতায়াত করতে করতে যাকে গুরুপদে বরণ করার কথা ভাবলাম তিনি দীক্ষা দেবেন না বললেন না, কিন্তু ফলহারিণী পূজার দিন বললেন যে আমাকে দীপান্বিতা কালীপূজা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেই সময়ে বৈধী পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদিতে খুব আসক্ত ছিলাম। জীবনে সুখ বলতে তখন কিছু নেই দিনরাত ঈশ্বরলাভের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে আছে। শয়নে স্বপনে কেবল এক চিন্তা কি করে এই জাগতিক দুঃখ, রিপুর জ্বালা এই অনিত্য সংসারের বিষময় বন্ধন থেকে মুক্তি পাই। দিনরাত মনে

মনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে প্রার্থনা করি - এমন কি অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঠাকুরের ছবির সামনে কাঁদতাম আর বলতাম, "হে ঠাকুর! আমার একটা গতি করে দাও - বলে দাও আমায় সঠিক পথ।" কেন জানি না, এর পর থেকেই আমার জীবনে এমন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যা আমার জীবনের স্রোতকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করল।

☞ আমার স্বপ্নদর্শন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাথে গুরুগৃহে যাত্রা

হঠাৎই একদিন স্বপ্ন দেখছি যেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে একই নৌকায় দুজনে দাঁড়িয়ে ভেসে চলেছি - ঠাকুরের গায়ে কালো কোট কাঁধে একদিকের কাপড় উঠে আছে। পরেই দেখি একজনের কাছে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন - ওনার সাথে আমার পরিচয় করালেন, কি যেন সব বলে দিলেন। তারপরেই দেখি, আমি নৌকায় একাই ফিরছি সঙ্গে পন্নগ বলে একটা ছেলে আমার সঙ্গে রয়েছে কিন্তু রামকৃষ্ণদেব আর নেই। পাঠক জানেন পন্নগ মানে সাপের মাথার মনিরত্ন অর্থাৎ পরমহংসদেব আমাকে দীক্ষাগুরুর সন্ধান দিয়ে জানালেন যে ঐ দীক্ষায় আমি রত্নলাভ করে ফিরছি।

☞ কাকতালীয় গুরুদর্শন

এরপর একদিন দেখলাম যে আমি যেন একটা বাস থেকে নামলাম - নেমে একটা সরু গলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি - যেতে যেতে একটা ঝিল পড়ল - সেই ঝিলের ধার দিয়ে চলতে চলতে গিয়ে একটা বাড়ীতে পৌঁছালাম - গিয়ে দেখি একটা পাকা ঘরের জানালার সামনে হাজির হয়েছি - জানালা দিয়ে দেখছি যে ঐ ঘরটার মাঝখানে একজন প্রৌঢ় চৌকিতে বসে আছেন, মুখে দাঁত নেই, তাঁর হাতে

একখানা সান্যাল মহাশয়ের গীতাখন্ড। আমাকে দেখেই প্রৌঢ় যেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, ***"ওঃ তুমি এসে গেছ! এবার দীক্ষাটা নিয়ে নাও।" আমি যেন তাঁর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে দাঁড়িয়েই আছি। তখন যেন আবার বললেন "দিলীপকে জিজ্ঞাসা কর।'***

আমার প্রিয় দিলীপদার সঙ্গে গুরুদর্শনে যাত্রা

স্বপ্ন দেখার পর মনে খুব আনন্দ হোল। এই দিলীপ মানে বাবার দিলীপ মিত্তির ওরফে আমাদের দিলীপদা। তখন আমরা একসাথেই ব্যাঙ্কে চাকুরী করি। তাই পরদিন অফিসে গিয়েই দিলীপদাকে বললাম "দিলীপদা তুমি তোমার গুরুদেবের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?" দিলীপদা একটু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে তথা কাঠ কাঠ ভাবে বললেন, "পরে বলব। এখন কিছু বলতে পারব না।" পরের দিন অফিসে যেতেই দিলীপদার সঙ্গে দেখা, দিলীপদা আমাকে একখানা বই দিয়ে বললেন "এই বইখানা আগে পড়ে শেষ করুন পরে কথা হবে।" ব্যস্ দিলীপদার মুখে আর এ ব্যাপারে কোন কথা বেরুল না। তখন দিলীপদাকে আমি বলতাম বিনোবা ভাবে আর আমার ঐ রকম ভারিক্কি চেহারার জন্য দিলীপদা আমাকে খুব সমীহ করে কথাবার্ত্তা বলতেন। রোজ দিলীপদার সঙ্গে কত রসিকতা করি - সেই দিলীপদা আজ কিনা আমাকে কোন পাত্তাই দিচ্ছে না - খুব মজা পেলাম মনে মনে। ঠিক আছে! বইটা পড়ে শেষ করি একবার, তারপর দেখা যাবে। সুরু হল পড়া। যতই পড়ছি মনের ভিতর আলোড়ন বাড়ছে। মনে হচ্ছে এই তো পেয়েছি - এটাই তো খুঁজছিলাম। এই কাজ আমার চাই-ই-চাই।।

বইটা পড়ছি আর লেখকের সাথে দেখা করার জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করছে। প্রতিদিন দিলীপদাকে বলছি একবার নিয়ে যাওয়ার জন্য, "দিলীপদা আমাকে নিয়ে চলনা একদিন" খুব মোলায়েম

করে বলছি। দিলীপদার ধমক, "আঃ, বলছি তো, আগে বইটা শেষ করুন — পরে দেখা যাবে এখন হবে না।" ধমক খেয়ে ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকি। কি জানি বাবা, যদি না নিয়ে যায়?

☞ স্বপ্নে মহাপুরুষ দর্শন

এখন এদিকে বইটা তো আর সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনী নয় যে এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করব। ইতিমধ্যে প্রতিদিন স্বপ্ন দর্শন হচ্ছে। কত মধুর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি। একদিন এর মধ্যে ঋষি অরবিন্দকে দেখলাম। তারপর একদিন পন্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীশ্রীমাকে দেখলাম। শ্রীশ্রী মায়ের সাথে অবশ্য আগে থেকেই আমার পত্রালাপ হোত। বহুদিন পত্রলাপ হয়েছে - মা আমাকে আমার পত্রের উত্তরে ফুল আশীর্ব্বাদ পাঠাতেন। এরপর কিন্তু আর মাকে কোনদিন দেখিনি। কিন্তু ওই বই পড়ার পর দিন থেকে আমার মনে ব্যাকুলতা বেড়েই চলল। ইতিমধ্যে ঐ বইটা (বাবার লেখা 'সাধক ও সাধনা'), আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি ঐ রকম মধুর লেখা কোন বই ইতিপূর্ব্বে পড়িনি। তাই ঐ বইখানা পড়ে তখন আমার মনপ্রাণ ভরে গেছে, আর লেখকের সাথে দেখা করার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। মনে মনে ভীষণ ব্যাকুলতা যত বাড়ছে দেখা করার অনুমতি পেতে ততই বিলম্ব হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করছি। এই অবস্থা চলছে, অথচ দিলীপদাকে রোজ আর কতই বা জিজ্ঞাসা করি। করলেই তো সেই একই উত্তর। হঠাৎ সেই দিলীপদাই একদিন, আমি অফিসে যেতেই, আমাকে ডেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে; যাতে কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে,বললেন,"আজ অফিস ছুটির পর যদি আমার সঙ্গে যেতে পারেন তাহলে বাবা এই অফিসের কাছেই একটা বাড়ীতে আসছেন - ওখানে আপনি ইচ্ছা করলে দেখা করতে পারেন।" পারেন মানে? আমার তো তখন "ন্যাড়া খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি"— গোছের অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হোলাম কিন্তু বুকের ভিতরে কেন

জানিনা ঢাক ঢোল বাজতে আরম্ভ করেছে। আবার এদিকে মনে মনে ঐ গুরুদেবের উপর খুব রাগ ও অভিমানও জেগেছে। কেননা তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি এতবড় একজন ভাল ছেলে, ভদ্দর ছেলে, অফিসে সকলেই আমাকে এত ভালবাসে, খাতির যত্ন পাই, আর ব্যাঙ্কের পার্টিদের কাছে তো কোন কথাই নেই - একেবারে গুরুদেব ব্যক্তি। এহেন একজন সাচ্চা ভদ্দোর লোকের ছেলেকে এত ভোগান কি গুরুদেবের উচিত হয়েছে? ভাবছি, একবার যাই! তারপর কেমন করে চাট্টি কথা শুনাই দেখতে পাবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে তো এরকমই ঘটেছে। যত বড় সাধু, সজ্জন হোক, দেখা করতে গেছি - কিন্তু যখনই বড় বড় কথা আরম্ভ করেছে - সে যতবড় কথিত মহাত্মাই হোক - ছেড়ে কথা বলিনি। কত দাড়িওয়ালা ভুঁড়িওয়ালা, লোটা কম্বলওয়ালা সাধুদের গলতি দেখলেই চেপে ধরেছি, গলদ বাত শুনতে বা মানতে রাজী হইনি, সঙ্গে সঙ্গে লড়াই করেছি আর এ কি এমন লোক যে একবার দেখা করতে চাইলে এতদিন ধরে থাবাচ্ছেন - একটা ভদ্রতা বোধও তো থাকা উচিত ছিল। যাই হোক যতই সময় এগিয়ে আসতে লাগল, ততই উত্তেজনা বেড়ে চলল। এদিকে দিলীপদার বারণ আছে অফিসের কেউ যেন জানতে না পারে। তাই উপরে উপরে কোনরকমে চুপচাপ আছি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে চরম টান টান উত্তেজনায় ডুবে রয়েছি। যাই হোক, অফিস থেকে বেরিয়ে মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই খেল সুরু হল। কেমন যেন ভেতরে ভেতরে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করছি। এ রকম হচ্ছে কেন? এ কি ব্যাপার মনে মনে ভাবছিও। তখন আমার সুন্দর স্বাস্থ্য, বিশাল চেহারা, তার উপর তখন অফিসের কাজে অনেক সময় বিলাতী সাহেব সুবোর কাছে যাওয়ার সুবাদে পোষাক পরিচ্ছদ রীতিমত ভদ্রলোকের, সমবয়স্ক সহকর্ম্মীদের তুলনায় চেহারায় পোষাকে একটা বিশেষ তফাৎ ধরা পড়ে - সেই আমি কিন্তু একটুকু বাড়িয়ে বলছি না, সেদিন সেই বাড়ীর কাছে পৌঁছেই চরম দুর্ব্বলতার সম্মুখীন হলাম। তারপর সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই মনে হোল হাঁটু দুটো ভয়ঙ্কর

কাঁপছে, দুর্ব্বল লাগছে, মনে হচ্ছে গায়ে কোন জোর নেই - যাই হোক ঐ অবস্থায় কোনরকমে ঘরের ভিতর ঢুকলাম - ঢুকে দেখি অতি সাধারণ রোগা চেহারার একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছেন দরজার দিকে মুখ করে,— আমাকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখেই অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ওঃ! এই ছোকরা!" কথাটা শুনেই আমার অবস্থা কাহিল, ভয়ে বুক দুর দুর করছে, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। তাই উনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "বইটা পড়েছ তো?" কোনরকমে ঢোক গিলে গলায় স্বর না বেরুবার মত করে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" কি বুঝলে? উনি জিজ্ঞাসা করলেন। আবার কোনরকমে বললাম, "আজ্ঞে আমি যা চাই তা ওই বইটার মধ্যে আছে।" উনি বললেন "তবে তো আর কোন কথাই নেই।" দিলীপদা যে এতক্ষণ আমার ঠিক পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে মনেই আসেনি, লক্ষ্যও পড়েনি। উনি যখন দিলীপদার দিকে ফিরে বললেন, "দিলীপ! তুমি গুরুপূর্ণিমার দিন সকালে এই ছোকরাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে," তখন দেখি দিলীপদা দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে। তারপর আবার আমাকে বললেন, "তুমি সকালে স্নান করেও আসতে পার, না করেও আসতে পার, তবে আসার সময় একটা ধোয়া ধুতি পরে আসবে অথবা এখানে এসে ধোয়া ধুতিটা পরে নেবে।" আমি তখন মনে মনে ভাবছি সকালে উপবাসী তো নিশ্চয় থাকতেই হবে, কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে? তারপর এখানে এসে দীক্ষার পর কি খাব? কোথায় খাব? এই সব আবোল তাবোল চিন্তা মনে আসছে। কিন্তু ওঁর ভাবগতিক দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে একবার বেরুতে পারলে বাঁচি - তারপর ভেবে দেখা যাবে। এ সমস্ত চিন্তাগুলো কিন্তু দ্রুতগতিতে চলছে মনে মনে, এমন সময় হঠাৎই বলে উঠলেন, "তুমি সকাল বেলা কিছু জলখাবার খেয়েও আসতে পার - আর দুপুরে এখানেই কিছু খেয়ে টেয়ে বিকালে আর একবার কাজ দেখিয়ে নিয়ে একেবারে বাড়ী যাবে।

হ্যাঁ। একটা কম্বল কিনে নিও - কম্বল ছাড়া কাজ হবে না।'' বলেই হঠাৎ বলে উঠলেন, ''বিমলা, এই ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও তো।'' দয়াময় বাবার এই অন্তর্য্যামিত্ব শক্তির কথা সেদিন বুঝিনি - পরে অনুভব করেছি। অফিসে সেদিন জলখাবার খেয়েছিলাম কিন্তু নানারকম উত্তেজনায় খিদের ঠ্যালায় তখন নাড়ী বাপান্ত করছে! দেখলাম একজন বিধবা, অতি স্নেহময়ী প্রৌঢ়া মহিলা বলে উঠলেন, ''হ্যাঁ দাদা, এখুনি দিচ্ছি।'' বলেই মহিলাটি বাহিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুটো কলাপাতা করে গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল ও পানতুয়া এনে দিলীপদা ও আমাকে দিলেন। ঐ খাবারগুলো শেষ করে দিলীপদা ও আমি সেদিনের মত তাঁর কাছ্ থেকে বিদায় নিলাম। বাড়ী থেকে বার হয়ে রাস্তায় এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

জীবনে কত জনের সঙ্গে মেলামেশা করেছি কত বিচিত্র মনের, কত বিচিত্র চেতনার, কত বহুবিধ মানসিকতার ব্যক্তির সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়েছে কিন্তু এমন পুরুষ আর আগে কখনও দেখিনি। কি ভয়ানক সাধারণ দেখতে কিন্তু কি বিরাট শক্তির আধার? কত দেখেছি কিন্তু বাবার কাছে এসে দেখেছি তারাই সব যেন মিইয়ে যেত, কারো কোন বিদ্যাই বাবার কাছে খাটতো না - তাই ঐ বিরাট পুরুষের কাছে দাঁড়িয়ে আমার মতো একটা ব্যক্তিত্ব যে নিজের সত্তা বাহ্যিকভাবে হারিয়ে ফেলবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

মায়ের ভয় ও কান্না

যাই হোক ফেরার পথে কম্বল কিনে বাড়ী ফিরতেই আমার গর্ভধারিণী কম্বল দেখে এই কান্না কাঁদছেন আর বলছেন, ''ওরে তুই আর ঘরে থাকবি না বুঝতে পারছি - তুই ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবি।।'' মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য কম্বল কিনিনি - মা ততই কেঁদে চলেন। অনেক কষ্টে

মাকে বোঝালাম, "জান তো ব্যায়াম ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে - খেয়ে ভাল হজম হয়না - রাত্রে ভাল ঘুম হয়না। তাই আমাকে একজন যোগাসন শেখাবেন বলেছেন যাতে শরীর ঠিক থাকে - আর সেই যোগাসন কম্বলে বসে করতে হবে। তাই কম্বল কেনা হয়েছে বিশ্বাস কর, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।" যাই হোক গুরুবল মা বুঝলেন, কারণ মা, দাদা আমাকে বিশ্বাস করতেন, আমার কোন কাজে এঁরা বাধা দিতেন না - বলতেন, "ও কখনও কোন খারাপ কাজ করতে পারে না - কোন অন্যায় ও কখনও করেনি - করবেও না।" মায়ের এই বিশ্বাস আমায় ক্রিয়া পেতে সাহায্য করেছিল, নচেৎ মা জানতে পারলে আমার ক্রিয়া পাওয়ায় রাজী হতেন না।।

☞ বাবার বাড়ী ক্রিয়া প্রাপ্তির দিনের ঘটনা

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না, মহাকাল তার আপন গতিতে চলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে গুরু পুর্ণিমার দিন এসে গেল। ঐদিন সকালে স্নান করে বার হলাম ক্রিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। যতদূর মনে হচ্ছে 'হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে গিয়ে দেখি দিলীপদা রয়েছে - একসঙ্গে বাবার বাড়ী হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রথতলা বাস ষ্টপেজে নেমে রওনা হয়েছি বাবার বাড়ীর উদ্দেশ্য হঠাৎ রাস্তাটা আমার যেন চেনা চেনা বোধ হল, সেই রাস্তা, সেই ঝিলের ধার, এতো আমার স্বপ্নে দেখা সেই একই রাস্তা, মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম জানালাম। বাবার বাড়ী পৌঁছে দেখি বাবা তখনও পুজো সেরে উঠেন নি। বসে আছি আর মনে মনে ভাবছি দীক্ষাগ্রহণে মাত্র পাঁচটাকা। যাই হোক এই ভাবতে ভাবতেই বাবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল - দেখি বাবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অগ্নিমূর্ত্তি একেবারে, কাকে যেন উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "সকালে ছোলার ডাল এসেছে তো?" সকলেই নিরুত্তর কেবল মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে - অর্থাৎ ছোলার ডাল আসেনি। সকলে ভয়ে চুপ, নিঃশব্দ — বাবা

বললেন, "এই দিলীপ যাওতো ডাল নিয়ে এস।" "যাই বাবা" বলে দিলীপদা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল - আমিও অমনি দিলীপদার পেছু পেছু ছুটছি - এত মন খারাপ হয়ে গেল যে বলার নয়। ছুটছি আর ভাবছি "হে ভগবান! একি করলে? এত কষ্ট করে এত ঘুরে ঘুরে যদিও বা দীক্ষা পাবার সুযোগ এল, শেষে কিনা এমন একজন খিটখিটে বদমেজাজী লোকের কাছে তুমি পাঠালে দীক্ষা নিতে?" সকালে উঠে সেদিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল বাবার বাড়ী যখন আসি, দিলীপদাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম "দেখ! দেখ! দিলীপদা, আজ আমি দীক্ষা পাব তো, তাই দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছে। শেষে এই পুষ্পবৃষ্টির নমুনা! হায় হায়! কি আর করব?" ভেতরে তখন আমার যেন চিন্তার ঝড় বইছে। পরনে নূতন শান্তিপুরী ধুতি দীক্ষার জন্য মন প্রাণ একেবারে ব্যাকুলিত অবস্থা - ছুটছি আর ভাবছি, ভাবছি আর ছুটছি।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখা ভাল যে ঐদিনের ঐ নূতন শান্তিপুরী ধুতি পরেই বাবার কাছে পর পর পাঁচ বছরে পাঁচটা সোপানের ক্রিয়া পেয়েছিলাম। আর বাবার কাছে মিনতি জানাই যে বাবা যেন তার এই অধম অকৃতজ্ঞ, অবোধ, অক্ষম সন্তানকে তাঁর বাইরেটা দেখে তাঁকে বিচার করার জন্য ক্ষমা করেন। অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন এই সন্তান কোনদিনই তোমাকে চিনতে পারেনি - সেদিনও নয়, যেদিন সালকেয়া নেমে তোমার বাড়ী যাবার পথে মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ দেখে বৃষ্টিতে ভেজার আশঙ্কায় প্রাণপণে তোমার বাড়ীর দিকে ছুটছিলাম তুমি দরজায় দুটো পাল্লায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে দাঁড়িয়েছিলে, চোখ মুখে তোমার ছিল দুর্যোগের মধ্যে ঘরে না ফিরে আসা সন্তানের মায়ের উদ্বিগ্ন মুখের ছায়া - আমি হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছাতেই জিজ্ঞাসা করেছিলে "ছুটছ কেন? হাঁপাচ্ছ কেন?" আমি বলেছিলাম "বাবা ভয়ানক বৃষ্টি আসছে, ভিজে যাব তাই"- তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলে "উঁ, বৃষ্টি এলেই হোল?" সেদিনও সন্তানের কষ্ট লাঘব করতে তোমার বিভূতি প্রকাশিত দেখেও তখনও যেমন বুঝিনি আজও তোমার বাইরের রূপটাই তাই

বিচার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে তাই তুমি দয়া করে ক্ষমা করে দিও হে পূর্ণব্রহ্ম গুরুদেব।

দিলীপদার সঙ্গে ফিরে এসেই শুনলাম জায়গা তৈরী হয়ে গেছে, ক্রিয়া দেওয়া আরম্ভ হবে। অবাক হয়ে দেখছি সব, আগে শুনেছিলাম দীক্ষা দেওয়া এখন শুনছি ক্রিয়া দেওয়া হবে। জানিনা বাবা! কপালে কি আছে? এসে যখন পড়েছি, পালাবার তো পথ নেই। দেখাই যাক কি হয়?

☞ ক্রিয়া প্রাপ্তির সময়েই অনুভূতির বিকাশ

মাথা গুনতি করে আমাদের ঘরে ঢোকানো হল। সেদিন মনে হয় আমরা মোট বাইশ জন ক্রিয়া পেয়েছিলাম কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বাবার দেহ থাকাকালীন আর একজনকেও ও বাড়ীতে আসতে দেখিনি - শুধু বাবার দেহত্যাগের পরে একজনকে দেখেছিলাম একদিন বাবার ছোট ছেলে খোকনের কাছে আসতে।

বাবা খাটের উপর বসে তামাক খেতে লাগলেন আর বিভূতিকাকা ও শুকদেবদাকে বলে দিলেন কে কাকে ক্রিয়া দেখিয়ে দেবে। বাবার ঐ কথাতেই যে এত শক্তি ছিল ক্রিয়া পাওয়ার আগে তা কখনও বুঝিনি - বিভূতি কাকাকে শুধু দু হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুটো দেখিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং বিভূতি কাকাও বাবার নির্দ্দেশে তাঁরই শক্তিতে আমাকে দর্শন করিয়ে দিলেন। এত জ্যোতিঃ - জ্যোতির সমুদ্রে নীলের মধ্যে আর একটা জ্যোতিঃ - তার মধ্যে আমি যেন ডুবে যেতে থাকলাম। যেন কত অসহায়ের মত ডুবে যাচ্ছি - ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি। ছোট্ট বেলায় পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলাম কিন্তু জ্ঞান হারাইনি - ডুবে যেতে যেতেও ভেসে উঠার চেষ্টা করেছি, শেষে কাকা এসে আমাকে জল থেকে তুলে উদ্ধার করে কিন্তু এই

জ্যোতির মধ্যে যেন একেবারে অসহায়ের মত ডুবে যাচ্ছি। কখন সম্বিত হারিয়েছিলাম, কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানিনা যখন সম্বিত ফিরল, বোধহল কে যেন আমার মেরুদন্ড বরাবর অতি স্নেহে উপর থেকে নীচে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তারপর শুনছি খুব দূর থেকে কে যেন বলছে "মিলিয়ে গেছে কি?" অর্দ্ধচেতন অবস্থাতেই মনে হচ্ছে যে মিলিয়ে যাবে? কোথায় বা মেলাবে? তখনও আমার চারিদিকে জ্যোতি আর জ্যোতি। চোখ খুলতেই পারছি না। অনেক কষ্টে চোখ তাকিয়ে দেখি বিভূতি কাকা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন বলছেন। আমি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি বুঝতেই পারছি না। তারপর হঠাৎ খাটের দিকে নজর পড়তেই দেখি বাবা খাটের উপর বসে আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছেন। বিভূতি কাকাকে বললেন, "বুঝেছি বুঝেছি! ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। ওকে ভাল করে কাজটা ধরিয়ে দাও।" হে পুরাণ পুরুষ, আমার হৃদয়ে চিরজাগরূক থেকে সমস্ত সত্যের প্রকাশ কর এই লেখনীর মাধ্যমে — তোমার জয় হোক।।

বিভূতি কাকার মধ্যে যে কি দরদ ও স্নেহ ছিল তা বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। আর একটা সত্য সেদিন উপলব্ধি করলাম যে আমার প্রতীক্ষা বিফলে যায় নি, এ অভাগা প্রকৃত পুরাণ পুরুষকেই দেহধারী গুরুরূপে পেয়েছে। কি বিরাট পরাশক্তির আধার ওই রোগা দেহটা। পরে বুঝেছিলাম কি অপার স্নেহময় আমার গুরু। গুরুদেবের আদেশে কাকাবাবু দেহের মধ্যে অবস্থিত চক্রের স্থানগুলি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, নিজে প্রাণায়াম করে আমাকে করতে বললেন এবং আমিও প্রথম থেকেই অত্যন্ত পটুতা সহকারে যেন অত্যন্ত অভ্যাস করা আছে এমনভাবে প্রাণায়াম করতে লাগলাম। এবং ক্রমে ক্রমে গভীর তন্ময়তার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমার বোধ হতে লাগল যেন গলিত পারদের ধারা আমার মেরুদন্ডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ডুবে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ

পরে কাকা আমার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন অনুভব করলাম। তাকাবার পর উনি আমাকে থামতে বললেন এবং ক্রিয়ার অন্যান্য অঙ্গগুলি ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং একে একে করিয়ে নিলেন। এরপর উনি দর্শনের কাজ আমাকে দিয়ে করালেন। এবারেও খুব ভাল দর্শন হল বাবার দয়ায়। এরপর যখন পায়ের কাজ করার সময় এল, তখন কিছু কিছু অগ্রজ দাদারা বলাবলি করছিল, "এবার বোঝা যাবে কেমন মাল?" এর কারণ আমার স্বাস্থ্য তখন খুব ভাল আর ওঁরা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছেন যে ক্রিয়ার সব কটা অঙ্গই ভালভাবে ধরে ফেলছি। পায়ের কাজটা তো একটু শক্ত — বিশেষে ভারী চেহারা হলে কষ্ট হতেই পারে — তাই ওরা উদগ্রীব ছিলেন এবার কি হয় দেখা যাবে। আমি কিন্তু বাবার দয়ায় অতি সহজেই পায়ের কাজ করে বসলাম আর তাই না দেখে আমার অগ্রজ একদাদা (উচ্চ ক্রিয়ান্বিত) চাপা গলায় বলেই বসলেন, "ওরে বাবা! এ যে দেখছি একেবারে পাকা মাল।" যাই হোক, সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবার পর ঐ ঘরের দরজা খুলে গেল, বাইরে এসে বাবাকে প্রণাম করে ঘরের বাইরে এলাম ও দিলীপদার পিছু পিছু ঘুরতে লাগলাম কারণ আমি তখন একেবারে নূতন আর দিলীপদা ও বাড়ীতে পুরানো ক্রিয়ান্বিত। দিলীপদা এদিকে তাঁর পুরানো গুরুভাইদের সঙ্গে মজে রয়েছেন আর আমি সেখানে একটু দূরত্ব বজায় রেখে ওদের সঙ্গে ঘুরছি ফিরছি সব করছি তবে বোকার মত, কারণ ওরা তখন সিনিয়র আর আমি তো জুনিয়ার।

হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে মনে থাকতে থাকতে একদিনের একটা ঘটনা বলে রাখি এইখানে।

ক্রিয়া পাওয়ার কয়েকদিন পরে একদিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে সবেমাত্র শুয়েছি। **তখন একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে শুয়েই থাকি বা বসেই থাকি দুই ভ্রুর মাঝখানে দৃষ্টি রাখতাম বা দৃষ্টি**

চলে যেত একা একা থাকলেই। সেইদিন ঠিক সেই অবস্থায় দাদার ছেলেটা খুব কাঁদছিল বলে মা তাকে কোলে নিয়ে থামাবার চেষ্টায় আমার ঐ ঘরে এসে ঢুকেছেন। আমার তো তখন অবস্থা কাহিল। দুই ভ্রুর মাঝে দৃষ্টি রাখার জন্য মনটা কেমন যেন নির্জীব মত মনে হচ্ছে। কান্নার শব্দ কানে আসছে, মনটাকে ফেরাতে চাইছি সেখান থেকে। এমন সময় দেখলাম গলান রূপোর একটা স্রোত বইছে আর তার সঙ্গে মধুর স্বরে সেতারের বাজনা কানে আসছে। আস্তে আস্তে মনটা যেন কোথায়— কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে যেন আমি ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই স্রোতের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, আমার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি, চেতনা লুপ্ত হতে হতে অপূর্ব্ব একটা আনন্দ আর শিহরণের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম, ডুবে গেলাম বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না - সম্বিৎ যখন ফিরল, কখন ফিরল, কিভাবে ফিরল কিছুই মনে নেই।

পাঠক পাঠিকারা কে কি ভাববেন বা ভাবছেন জানি না। হয়ত তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হতে পারে। সেজন্য এ সমস্ত কথা কোনদিন কাউকে বলিও নি কিন্তু তাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন বিশ্বাস করেন এটুকু, যে কোন কোন ঘটনা হয়ত বাদ পড়ে যাবে আমার এ লেখার মধ্যে কিন্তু কোথাও বাড়িয়ে বলার চেষ্টা নেই বা এগুলো গল্প নয় - প্রত্যক্ষ ঘটনা। আমাকে যে এ সমস্ত ঘটনা লিখতে হবে জানতাম না - তাই সাল তারিখের ব্যাপারটা হয়ত আগে পিছু হতে পারে - আগের ঘটনাটা মনে পড়েছে, পরে লিখেছি বা পরের ঘটনা মনে পড়ায় আগে লিখেছি, হতে পারে কিন্তু অতিশয়োক্তি যে কোথাও নেই এ সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। ঠিক কোন ক্রিয়া করা কালীন কোন অনুভূতি এসেছে - আজ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর আমার পক্ষে এবং তারজন্য কিছুকিছু তারতম্য হবে হয়ত কিন্তু ঘটনার মধ্যে কোন গল্প নেই, সব প্রত্যক্ষ, সব বাস্তব, সবই জীবন্ত।

☞ বাজল এবার বিয়ের সানাই

ক্রিয়া পাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় ক্রিয়া পাওয়ার আগেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। দিন বা তারিখ আজ আর মনে নেই তবে মাসটা মনে আছে। বোধহয় জ্যৈষ্ঠ মাস। পাত্রী হোল বালী শহরের বাদামতলা বলে যে একটা পাড়া আছে সেই পাড়ার চক্রবর্ত্তী পরিবারের মেয়ে। এই বিয়েটাও একটা মজার ব্যাপার সেটাই বলছি।

আমার শ্বশুর মহাশয়কে আমি কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই চিনতাম (পাঠক যেন এর মধ্যে অন্য কিছুর গন্ধ খুঁজবেন না)। কারণ তিনি কাজ করতেন আমাদের ব্যাঙ্কের অফিসের পাশের অফিস একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। কাজে কাজেই রোজই ব্যাঙ্কে আসতেন, টাকা জমা দিতেন। আমি যেহেতু ব্যাঙ্কের ক্যাশ বিভাগে কাজ করি - আমার কাছেও তাঁকে টাকা জমা দেবার জন্য আসতে হতো। অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন কিন্তু উনি যে আমারই পাশের পাড়ায় বাস করেন তা জানতাম না। নিজের বাড়ী ছিল ওঁর। খুব বিষয়ী লোক। ওঁকে তখন আমি দাদু বলে ডাকতাম। একদিন দেখি 'ঐ' দাদু বলা লোকটা আমাদের বালির ভাড়া বাড়ীতে কড়া নাড়াচ্ছেন। আমি তখন বাড়ীতেই আছি। দোতালায় আমরা ভাড়া থাকতাম। নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে উল্লাসে বলে উঠলাম, "আরে দাদু যে? কি মনে করে?" একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন, বুঝিবা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। বললেন,"ইয়ে মানে, মানে শান্তিবাবু আছেন?" আমি বুঝলাম, উনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন, আরও বুঝলাম নিশ্চয়ই দায়গ্রস্ত হয়ত কন্যাদায়গ্রস্ত হবে। কারণ আমি তখনও জানতামই না ওঁর অবিবাহিতা কন্যা আছে। আর তখনকার দিনে আমাদের ঐ ধরনের চিন্তা ধারা ছিলই না। তাছাড়া আমার আবার ধাতটা তো অন্য রকমের। মেয়েদের সম্বন্ধে ও রকম কোন কৌতুহল ছিল না বাইরের থেকে, তবে ভেতরে ভেতরে একদম যে ছিল না

বা মেয়েদের কথাই মনে আসত না, তা কিন্তু নয়। তবে বর্ত্তমানকালে যেমন যুবকদের মধ্যে উৎকন্ঠাভাবে ঐ সব চিন্তা বা ক্রিয়াকলাপ দেখা যায় ঐ ভাবের ব্যাপার আমাদের পরিমন্ডলে ভাবাই যেত না। তার উপরে আবার সদ্য গুরুদেবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে অন্য নারীকে তথা নারীজাতিকে মায়ের মত জ্ঞান করব। যাই হোক, সেদিন ওঁর ঐ রকম হতচকিত ভাব দেখে মনে হোল ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন! আমি ওঁকে বললাম "একটু অপেক্ষা করুন, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি"। উপরে এসে দাদাকে ডেকে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরে মাতাঠাকুরানীর কাছে জানলাম যে উনি ওঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে দাদার কাছে এসেছিলেন এবং দাদাকে বেশ কব্জাও করে ফেলেছেন। মনে মনে ভাবলাম এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে? দাদা তো অত্যন্ত সাধাসিধে সরল প্রকৃতির লোক আর উনি হলেন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন ঝানু দালাল। বাকপটুতায় সুনিপুণ। তার উপর পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সুপারিশ নিয়ে এসেছেন, দাদাকে রাজি করিয়ে, কন্যা চাক্ষুষের ব্যবস্থা করে তবে গেছেন। দাদা মাকে দিয়ে আমাকে মেয়ে দেখতে যাওয়ার জন্য বললেন। আমার সাফ কথা, "ওসব আমার দ্বারা হবে না - তোমরা যাও তোমরা যাকে নির্ব্বাচন করবে, যেখানে নির্ব্বাচন করবে আমি তাতেই রাজী।" একে তো আমি বিয়ে করব না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিন্তু মায়ের কান্নাকাটিতে শেষে গুরুবাবাকে দিয়ে মা বলাবার পর অগত্যা রাজী হতে হোল। আমি তো মেয়ে দেখতে গেলাম না। মা, দাদা, বৌদি এঁরা সব গেলেন মেয়ে দেখলেন, পছন্দ করলেন, দিন ঠিক করলেন আর বিয়েটাও হয়ে গেল। বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে বাড়ী আসা হোল আর ঐ যাওয়াই শ্বশুর বাড়ীতে আমার প্রথম ও শেষবার অন্নগ্রহণ। কারণ এই সময়ে আমি কারও বাড়ীতে খেতে ভালবাসতাম না, ভাল লাগত না তাই ঐ বাড়ীতে পরেও ২/৪বার খেয়েছি তবে ভাত খাইনি। তখন ক্রিয়া নিয়ে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কি করে ক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া যায় দিনরাত তখন কেবল এক চিন্তা। তাই সেই ক্রিয়ার অনুভূতির

কথাগুলো বলে পরে আবার এই বিবাহ প্রসঙ্গে আসব।

লীলাময় বাবার লীলার কথা কোথায় সুরু করি আর কোথায় শেষ করি ভেবেই পাই না কারণ আমার এই অপরিসর ছোট্ট জীবনটাতে তাঁর লীলার শেষ নেই। এই অধমের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালবাসা, তার কোন কারণ খুঁজে পাই না। প্রথম ক্রিয়া পাওয়ার পর প্রথম দিকের কথা বলছি। দিলীপদার সঙ্গী হয়ে বাবার বাড়ী গেলাম। খুব সম্ভবতঃ সে দিন শনিবার কারণ শনিবার নইলে দিলীপদার সঙ্গ পেতাম না। আর একা যাওয়ার সাহসও হোত না। মনের ভেতর একটা ব্যথা অনুভব করি যে বাবা আমাকে একদম পছন্দ করেন না। হা ঈশ্বর! পরে এই ভুল ভেঙ্গেছিল আর সেই আপশোষের শেষ হয়নি আজ পর্য্যন্ত। সঠিকভাবে পরে বুঝেছিলাম এ সমস্ত তাঁর লোকদেখানো তাড়না, কোনটাই সঠিক নয়। যাই হোক সেদিন দোকান থেকে এক বাক্স ভাল সন্দেশ কিনে নিয়ে বাবার বাড়ী গেলাম। যথারীতি বাবাকে প্রাণাম করে সন্দেশের বাক্সটা বাবার হাতে দিলাম - মনে মনে ভাবছি বাবা হয়ত খুব প্রসন্ন হবেন। আমার যেমন চরিত্র সেইরকম তো ভাবনা হবে। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে একটু ভ্রু কুঁচকে বললেন, "ওটা কি"? "একটু সন্দেশ এনেছি বাবা"। আমি বললাম। বাবা সন্দেশের বাক্সটা হাতে করে যেন ওজন দেখার ভঙ্গি করে "এই তোমার ভক্তি?" বলেই অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার মাথার উপর দিয়ে বাক্সটা ছুড়ে ফেললেন আমার পিছনে। মনে হল, যেন একটা নেংটি ইঁদুর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল চকিতের মধ্যে। ঐ সময়ে বাবার ন মেয়ে ঠিক আমার পিছনে আসছিলেন, তিনি খপ করে বাক্সটা ধরে ফেললেন। দারুণ অভিমান হোল, রাগও হোল মনে মনে, তার সঙ্গে একটু দুঃখও হোল। মনে হল একবার জিজ্ঞাসা করি, "কতটা সন্দেশ আনলে ভক্তির প্রমাণ হবে?" কিন্তু মূহুর্ত্তের মধ্যে সেই ইচ্ছাটা চলে গেল কেন জানিনা ? দয়াময় বাবাকে বুঝে উঠা খুবই কঠিন ছিল - যতদিন দেখেছি

কোনও দিনই বুঝে উঠতে পারি নি। তিনি আমার নিকট চিরদিনই চিররহস্যময় পুরুষ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বুঝেছি কি গভীর ভালবাসা কি অপার স্নেহ তাঁর আমার জন্য তিনি অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন, যা কোন কালেই পরিমাপ করা যায়নি - যাবেও না। বাবাকে একদিন বলেছিলেম, "বাবা অনেক মেয়ের সাথে জীবনে মিশলাম, কোনকালেই কোন মেয়ের প্রেম বলতে যা বোঝায় তাতে পড়তে পারলাম না, কিন্তু বাবা আপনাকে না দেখে থাকা যায় না। আপনার সাথে অন্য কাউকে দেখলে পর্য্যন্ত রাগ হয়।" বাবা শুনে শুধু মিট মিট করে হাসলেন। গভীর রহস্যময় সে হাসি। মুখে কিছু বললেন না। পরে অপরের কাছে শুনেছি যে বাবাও নাকি আমাকে না দেখলে বা যেতে দেরী হলে ছটফট করতেন কিন্তু সেটা আমার আড়ালে সামনে নয়।

☞ গুরুবাবাদের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ

এ সমস্ত ঘটনা কত বছর আগের কথা। ক্রম অনুসারে মনে পড়ে না। তবে যেগুলো বাস্তবে ঘটেছে আর দয়াময় বাবা যে যে ঘটনা মনে এনে দেবেন, যেমন যেমন লেখনীতে আনাবেন সেগুলোই বলব — কোনটাই বাড়িয়ে বলা নয়. সব বাস্তব, সব প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা। ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কোথায়? তাই মনে হয় তাঁর লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে ছোট না করে বসি। অনেক হোঁচট খাচ্ছি মনে করতে গিয়ে তাঁর অপার লীলার কথা — তাঁর মহিমার কথা। এমন আর একদিনের ঘটনার কথা বলছি।

ক্রিয়ার কথা অপরকে তো নয়ই বাবাকেও কোনদিন নিজে থেকে বলতে চাইনি। মনে ভয় হতো সঠিক যদি বলতে না পারি। তাই বাবা নিজে থেকে জানতে চাইলে খুব সংক্ষেপে বলতাম ভয়ে ভয়ে। এই ঘটনাটা বিবাহের পূর্ব্বে ক্রিয়া পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ঘটেছিল।

রাত্রের ক্রিয়া শেষ করে খেয়ে দেয়ে শুয়েছি। বেশ ঘুম মত এসেছে অথচ গাঢ় ঘুম আসেনি এমন একটা অবস্থা। মনে হল চার বাবা অর্থাৎ আমার গুরু বাবা, বলাগড়ের বাবা, দেওঘরের বাবা এবং কাশীর বাবা আমার মাথার কাছে বিছানার উপর বসে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, স্পষ্ট দেখছি - অথচ চোখ দুটো আমার বোজা - তাঁদের কথাগুলো কানে আসছে কিন্তু কি বলছেন, কি বিষয়ে বলছেন যেন ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে দেখছি আর অত্যন্ত স্পষ্ট গলার স্বর কানে বাজচ্ছে। ঘুমের আবেশটা চট করে ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে পড়লাম। কেউ কোথাও নেই অথচ আমার অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ দর্শন হল - স্পষ্ট কথা শুনলাম। খুব আনন্দ হোল বাবাদের প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে তাঁদের কথা শুনে, মনে মনে ভাবলাম, "কি সৌভাগ্যবান আমি।" এ কথা কাউকে কোনদিন বলিনি। বাবা মাঝে মাঝে বাজারে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, প্রায় প্রত্যহই বলা যায় - কখনও ক্রিয়ার কথা জানতে চাইলে তখন সংক্ষেপে হয়ত একটু আধটু বলেছি এই পর্য্যন্ত।

☞ মোক্ষদার প্রাথমিক সংসার জীবনের কথা

বিয়ে হয়ে গেল। মোক্ষদা এল এ বাড়ীতে, ওকে প্রথমেই বলে রাখলাম, "দেখ! ক্রিয়া আমার সুয়োরানী আর তুমি দুয়োরানী। ছেলে পুলে চাইবে না।" বললেই কি আর হয়? সব মেয়েই বিয়ের পর স্বামীকে, সংসারকে নিজের করেই পেতে চায় - এ তো খুবই স্বাভাবিক। মেয়েরা ছোট বেলায় পুতুল খেলার মধ্য দিয়েই পরবর্ত্তী জীবনের জন্য তৈরী হতে শেখে এ ঈশ্বরের বিধান। তাছাড়া মা মাসি, দিদি বা অন্যান্য গুরুজনদের তথা বড়দের থেকে মেয়েরা নিজেদের সংসারের শিক্ষা পেয়ে যায়। একটা উকিলের ছেলেকে দেখা যাবে

ছোট্ট বেলায় বাবার চেয়ারে বসে বাবার মত কোট পড়তে, বই নিয়ে বাবার মত খেলার ছলে মক্কেলদের সঙ্গে যেন কথা বলছে আবার ঐ উকিলের মেয়েটাকে দেখা যাবে ছোটছোট হাঁড়ি, কড়াই সাজিয়ে মায়ের মত রান্না রান্না খেলায় মেতে আছে।

মোক্ষদার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটল। বাপের বাড়ী থেকে একটা ট্রেনিং সব মেয়েরই যেমন থাকে সেই রকম একটু আধটু ফোঁস ফাঁস করতে লাগল। কিন্তু ঐ সব শেখানো কথা তো বেশীদিন ধোবে টিকে না, এখানেও টিকল না। শেখান বাণী কিছুদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল, দমও ফুরিয়ে গেল। ক্রিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকি তার দিকে তাকাবার সময়ই নেই, তার উপর গুরুবাবার দিনরাত নতুন বৌকে নিয়ে রসিকতার জ্বালায় অস্থির। এ ব্যাপারে বাবার জুড়ি মেলা ভার ছিল। বাবা যেন একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কথা বলতেন - একেবারে সমবয়স্ক বন্ধুর মত।

এই ফোঁস ফাঁস কথাটার মধ্যে যেন কেউ অন্য কিছু বোঝার চেষ্টা না করেন। ব্যাপারটা খুব সোজা। কোথাও কোনদিন তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম না, সিনেমা থিয়েটার দেখান আমার পক্ষে তো দুর অস্ত্। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই এ সব নূতন নূতন থাকেই, কাজেই আমার কাছে এই নূতন বৌএর অভিমান স্বাভাবিকভাবে আসতেই পারে। এই আর কি ? এই সমস্তর জবাবে একদিন বলল, "তোমার বিয়ে করাটাই অন্যায় হয়েছে।" জবাবে বললাম, "আমি বিয়ে করতে যাবার সময় মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা কোথা যাচ্ছ" বলেছিলাম, "দাসী আনতে।" ও তখন বলল, "তাহলে তোমার একটা গরীবের মেয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল।" তখন ওর বড় বোনের অবস্থা খুব ভাল। অবশ্য তাদের সঙ্গে আমিই কোন যোগাযোগ রাখিনা। ক্রিয়ার সঙ্গেই আমার সব সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলল। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আমার

তখন সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই - পাড়া প্রতিবেশীদের সাথেই হোক বা আত্মীয় পরিজনের সঙ্গেই হোক যোগাযোগ রাখা হোতই না ঠিক। এই রকম সময়ে একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

☞ মহাত্মা কবীর সাহেবের দর্শন লাভ ও আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তি

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে আছি, সেই আগের মতই কুটস্থে দৃষ্টি রেখে যা আমার ক্রিয়া পাওয়ার পর থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে বিয়ের ঠিক কিছুদিন পরে। কুটস্থের মধ্যে একটু আলো ফুটে উঠল, তারপর আরো, আরো, উজ্জ্বল আলো। শেষে আস্তে আস্তে জ্যোৎস্নারাত্রির শুভ্রতার মত এক উজ্জ্বল আলো আকাশে প্রকাশ হল, দেখি তার মধ্যে এক অপূর্ব্ব পুরুষ, লম্বা গড়ন, শ্বেতশুভ্র দাড়ি, সাদা ধবধবে আলখাল্লা, মাথায় টুপি - টুপিটা বাঁদিক হতে ডানদিকে না ডানদিক থেকে বাঁদিকে লাগান রয়েছে আজ আর ঠিক মনে নেই, আমার সামনে আকাশে ভেসে ভেসে চলেছেন। প্রসারিত হাত, হাতে আশীর্ব্বাদের মুদ্রা। প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় রবীন্দ্রনাথ। মনে সন্দেহ হওয়ায় পরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাবা বললেন, **"চিনতে পারলে না? তোমার সাথে যে ওনার পূর্ব্বেই পরিচিতি ছিল।"** মনে মনে ভাবলাম কি জানি বাবা! এও কি সম্ভব? কবীর সাহেব কবেকার লোক আর আমি কেনা কে? পরে অবশ্য একটু আধটু বুঝেছিলাম সে কথা পরে লেখা হবে।

****

সপ্তম অধ্যায়

☞ বাবার পূণ্যময় সঙ্গলাভ, বাবার রসিকতা ও তার অর্থ

লীলাময় বাবার প্রতিটি কথা মধুময় স্পর্শ নিয়ে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে আমার জীবনে। সেই মধুময় দিনগুলো তো আর ফিরে আসবে না এ জীবনে, তাই তার স্মৃতি চর্চ্চাকরে একটু আনন্দ পাবার চেষ্টা করছি।

আমাকে, বাবা যখনই কোন ক্রিয়ান্বিত/ক্রিয়ান্বিতার বাড়ী যেতেন তখন তো সঙ্গে নিয়ে যেতেনই - রোজই বাবার সঙ্গে বাজার যাওয়ার সৌভাগ্যও ঘটেছিল। আর বেরুবার সময় আমার কাজই ছিল ঘোড়া ধরে আনা - মানে রিক্সা ধরে আনা। বাবা বেশ মজা করে বেরুবার সময় ঠিক বলবেনই, "বিষ্টু! যাও - একটা ঘোড়া ধরে নিয়ে এস।" বুঝতাম রিক্সা আনতে হবে। আবার হয়ত মহাযোগীর কোনদিন খেয়াল হোল - দাড়ি কাটতে সেলুনে যাবেন - কাছেই সেলুন - ডাকলেই তারা চলে আসত, বাবাকে ওরা যথেষ্ট ভালবাসত, শ্রদ্ধাও করত - কিন্তু হলে কি হবে? খেয়াল হয়েছে বলে বসলেন, "ঘোড়া বোলাও।" অবশ্য এঁরা কখন কি করেন কেন করেন, আমরা জাগতিক জীব, আমাদের কাছে তো দূরের কথা, ঐ সমপর্য্যায়ভুক্ত যোগী ছাড়া এই সমস্ত কাজ বুদ্ধির অগম্য। তবে মনে হয় এঁরা প্রতিটি কাজ ও কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে করে থাকেন। সেইজন্য কার্য্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এরা কোন কাজ করেন না, কোন কথা বলেন না — যা আমাদের কাছে বুদ্ধির অগম্য তাই আমরা বুঝিও না বা বুঝতে গেলে ভুল বুঝি। আমাদের মত ব্যক্তির তাই অবনতমস্তকে কোনরূপ প্রশ্ন মুখে তো নয়ই এমন কি মনের মধ্যেও না এনে এঁদের আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। মনে হয় তার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত থাকে। কারণ এমন

ঘটনা দেখেছি - বিশ্বের ধনভান্ডার যার কাছে ইচ্ছামাত্র পদানত হতে পারে, যিনি জাগতিক ধনসম্পদকে অতি তুচ্ছ মাটির ঢেলার মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন না "সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন" জ্ঞান যার মধ্যে সতত জাগ্রত হয়ে বিরাজ করছে - তিনি বাজারে গিয়ে সামান্য কিছু আম কিনে বাজারওয়ালার সঙ্গে এক আধ পয়সা দাম কমাবার জন্য কি প্রচন্ড দরকষাকষি করছেন, মনে হবে এতবড় সংসারী বোধহয় আর কেউ নেই। কখনও বা কারও পকেট থেকে হাত ঢুকিয়ে জোর করে দুটো মাত্র টাকা তুলে নিচ্ছেন - সেই ক্রিয়ান্বিত ভাইটি হয়ত যোগীর এই কাজে খুশী হলেন না কিন্তু কি করবেন "বাবা" নিচ্ছেন - তাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মুখে কেউ কেউ বলেছেন গুরুদেবকে, কেউ বা গুরুভ্রাতাভগ্নীদের — যে ভাগ্যি বাবা এটা করেছিলেন - বেচে গেলাম - অর্থাৎ ঐ অদ্ভুত আচরণের পরবর্ত্তীকালের ঘটনায় সকলেই প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতির এমন কি জীবন হানির হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন। তপোবনের শিক্ষায় মহর্ষিরা যেমন শিষ্যদের গুরুসেবার মধ্যদিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান দান করতেন, বাবাও তেমনি আমাদের দয়া করে রসিকতার মধ্যে দিয়ে এমন এমন নীতিশিক্ষার প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়ে গেছেন, যার কথা ভাবলে আজ চোখে জল আসে তাঁর মহত্ত্ব স্মরণ করে। প্রথমদিকে বাবার বাড়ী, সারাদিন অঁফিস করে গিয়েই আমার কাজ ছিল বিশাল বিশাল বালতিতে জল তুলে উপরে দোতলায় রাখা, নীচের বিশাল চৌবাচ্চায় জল ভর্ত্তি করা, গরু বাঁধা, গরুর জাব দেওয়া, জল দেওয়া, গরু আনা মাঠ থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কলের জল উঠার কি ছিরি। আমার মত বলশালী যুবক জোরে পাম্প করতাম আর জল উঠত ছিরিক ছিরিক করে। ঐ জলে ঐ বিশাল চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করতে হোত - আর গরু আনতে গিয়ে তো নাকালের একশেষ হোতাম। খুঁটো থেকে দড়িটা খুলেছি কি ব্যস, নিমেষে গরুটা চারপা তুলে লাফাতে লাফাতে চোঁচা দৌড়। সারা হাওড়া যেন হারামজাদা গরু দৌড়াবার কনট্রাক্ট করে নিয়েছিল। বাবার বাড়ীর পাশেই কারখানার লোকজন থেকে প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত হাঁ করে দেখছে সাদা গ্যাভার্টিনের প্যান্ট পরা ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক গরুর পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে গলদঘর্ম্ম

হয়ে, গরু ধরার জন্য। ব্যাটা আমার দমশেষ করে তবে ছাড়ত। মনে হোত ব্যাটা যেন বাবার কাছে ঐরকম করবার ট্রেনিং পেয়েছে। পরে মনে হয়েছিল বাবা আমার পোষাকের অভিমান ভাঙ্গার জন্য আর তার সঙ্গে গুরুর কাজে ধৈর্য্য ও সহনশক্তির পরিচয় জানার জন্য এ সব করেছেন। বাবার সঙ্গে বাজার গেছি – বাবা এক আমওয়ালাকে বলছেন, "আম ভাল তো?" হঠাৎ বাবা দুকেজি আম কিনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "খুব ভাল আম – টকাটক খেয়ে নাও" – বলেই একটা সিগারেটকে ভেঙ্গে আধখানা মুখে দিয়ে পর পর দেশলাই জ্বালছেন সিগারেট ধরাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। একহাতে বাজার ভর্ত্তি ব্যাগ অন্যহাতে বাবার আম। কি করি? বসে পড়ে ঐ আম মুখে দিয়েই দেখি এত টক্ যে বলার নয়। কি করব গুরুবাক্য – ফেলে দিতেও পারছি না, খেতে খেতে চোখে জল এসে যাচ্ছে, তাও আবার টকাটক্ করে। মনে মনে গরুটার মত বাবার উপরে রাগে ফুস্‌ছি কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না। ওদিকে সিগারেট ধরানো দেখে ভাবছি কি রকম যোগীরে বাবা, একটা সিগারেট ধরাতে দেশলাই শেষ হয়ে গেল তো? হঠাৎ দেখি বাবা দেশালাই জ্বালান বন্ধ করে দিয়েছেন আর সিগারেটটা মুখে জ্বলছে – বাবা মিট্ মিট্ করে হাসছেন। এভাবে রসিকতা করে একদিকে যেমন গুরুবাক্যে মর্য্যাদার পরীক্ষা নিলেন অন্যদিকে তাঁর সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়ও দিলেন। গুরু যে সর্ব্বদাই শিষ্যের মঙ্গল করেন এ তো তার অকাট্য প্রমাণ। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মিষ্টির দোকানে ঢুকে দোকানদারকে অর্ডার দিয়ে আমাকে প্রচুর খাওয়াতেন আর বলতেন, "এখন যত পার খেয়ে নাও, পরে তো আর খেতে পারবে না।" আজ ভাবি সর্ব্বজ্ঞ বাবা রসিকতার মধ্য দিয়ে কি অসম্ভব বাস্তবকে সেদিন আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আজ ঘরভর্ত্তি খাবার থাকলেও কিছু খেতে পারি না। খাওয়ার ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও এখন আর জাগে না অথচ আগে খেতে পেলে যেন বেঁচে যেতাম, নইলে চোখে জল আসতো। দেখেছি কেউ বাবাকে প্রণাম করে হয়ত বাড়ী যাবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। বাবা তাকে বলছেন, "কেন এখনি যাবে কেন?" সে হয়ত বলছে, "বাবা শরীরটা ভাল লাগছে না – প্রচন্ড

জ্বর এসেছে''। বাবা বললেন, ''আচ্ছা একটু বস না''। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বসে থেকে দেখল, কি আশ্চর্য্য! জ্বর নেইই প্রায়, বেশ ভাল লাগছে - সুস্থ দেহে সুস্থ মনে বাড়ী ফিরল। কাউকে আবার দেখা গেল সেও বাড়ী যাবার জিদ করছে বাবাও ছাড়ছেন না, মজা করছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি আর করা যাবে ভেবে অসুস্থ মন নিয়ে সে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর তাকেই আবার, অন্য আর একজনকে যখনকোন জিনিষ আনতে ছল করে পাঠালেন ঐ লোকটির সঙ্গী করে পাঠালেন। কোন প্রয়োজন নেই। সঙ্গী করে দেওয়ার কারণ, যাকে তিনি জিনিষটি কিনতে পাঠালেন সেই যথেষ্ট, তবু দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে সঙ্গী করে দিলেন। রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল প্রায় উড়ন্ত দুটো মোটর সাইকেল এসে প্রথম ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে বাড়ী যেতে জিদ করছিল তাকে প্রচন্ড গতিতে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিল। অবধারিত মৃত্যু - কোন উপায় নেই। কিন্তু বিস্ময়করভাবে দেখা গেল দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কোনই আঘাত পায়নি আর প্রথম ব্যক্তির আঘাত এত সামান্য যে সে হাত দিয়ে শুধুমাত্র গায়ে লাগা গাড়ীর ধুলোটুকু ঝেড়ে ফেলে, বাবাকে এসে বলছে, ''বাবা! জোর বাঁচিয়ে দিলে - আজ মৃত্যু অবধারিত ছিল।'' মজার ব্যাপার হোল ঐ ব্যক্তিটি কিন্তু কিছুসময় পূর্ব্বে দয়াময় বাবার কথা অগ্রাহ্য করে বাড়ী ফেরার জন্য জেদাজিদি করছিল আর দয়াময় বাবা অলৌকিক শক্তি প্রভাবে সেই ভক্তের চরমতম দুর্ঘটনা, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে, সেই সময়টুকুর অপেক্ষা যেন সেই ভক্তের কাছে দয়া করে চেয়ে নিলেন, রক্ষা করলেন তার জীবন — তার সংসার। এত দয়ার ঠাকুর এঁরা! তাই বলছি অকৃতজ্ঞ, অধম, অজ্ঞান, সন্তান আমরা - এদের কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, কখন কি করেন, কখন কি বলেন, কেন করেন, কেন বলেন, কি বলেন বুঝতে যাওয়া, জানতে চাওয়ার মত মূর্খামি আর কিছু নেই। তবু সেই ভুলই কিন্তু আমরা বার বার করি।

হয়ত কখনও কাউকে বার বার বলার পরও চাকুরীস্থলে ঘুষ খাওয়া, অসৎ পথে পয়সা উপার্জ্জন বন্ধ করছে না। সুদ খাওয়া পয়সা নিতে বারণ করছেন শুনছে না। বাবা কিন্তু সব দেখছেন -

দেখছেন তার আধ্যাত্মিক ক্ষতির পরিমাণ কত বাড়ছে। সে ভাবছে বাবা তো আর এসব জানতে পারছেন না, ন্যায্য পথের উপায়ে সংসার চললেও বাড়তি উপায়ে ক্ষতি কি? এভাবে চলতে চলতে একদিন হয়ত কালপূর্ণ হলে দেখা গেল যে বাবা তাকে প্রণামীর পয়সাটুকুও সকলের সামনে অপমান করে, তিরস্কার করে ফেরৎ নিতে বাধ্য করলেন। কখনও বা এও দেখা গেছে যে কোন ক্রিয়ান্বিত চোখের জল ফেলে ভিটে বেচা সুদের পয়সা পকেটে নিয়ে বাবার বাড়ী এসেছে। বাবা তাকে সকলের সামনে বলছেন, "বের কর শালা - সব পয়সা পকেট থেকে বার কর বলছি।" পকেট থেকে পয়সা বার করে সে দেবার পর বাবা আবার বলছেন "শালা কোমর থেকে গেঁজের মালটা বার কর।" সমস্ত পাপের কড়ি বার করে নীলকন্ঠ সব বিষ নিজে হজম করেছেন, পাছে ঐ পাপ সন্তানকে স্পর্শ করে তাই। পরে তাদের নিজের মুখে স্বীকার করতে শুনেছি "বাবা, ভাগ্যিস পয়সাগুলো জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন - বেঁচে গেলাম নইলে অনিবার্য্য জেল হোত, বা কেউ বলেছেন অনিবার্য্য চাকরী যেত, কোন উপায় ছিল না বাঁচার।" কেন বলবে না? তারা তো জানে কি পাপের পথে উপায়ের পয়সা ওগুলো - কারও বা আমদানী শুল্ক ফাঁকির পয়সা ছিল, কারও হয়ত বা ছিল বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছে আদায় করা ঘুষের পয়সা, যে পয়সা সংসারে ঢুকলে পরিবারের সকলের হয়ত চরম ক্ষতি হোত। দয়াময় বাবা তাই তাঁর অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি বলে সন্তানকে তার পরিবারসহ আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন তাঁর অহৈতুকী করুণা দিয়ে, শিক্ষা দিলেন সকলকে সৎপথে জীবন যাপনের, উন্মুক্ত ও আলোকিত করে রাখলেন তার আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে চলার পথকে।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনাই শিক্ষামূলক। কোনটিই যোগবিভূতি বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়। কারণ যোগবিভূতি সাধনার ক্ষতিকারক, সাধনপথে সাধকের অহং বাড়ায়. কামনা জাগায়। বাবাও পছন্দ করতেন না। আমিও বাবাকে বলেছিলাম, "দয়া করে ওগুলো আমায়

দেবেন না - আমি একদম চাই না।'' তবে মহাত্মাদের ক্ষেত্রে, এ সব ব্যাপার তো খাটে না। তাদের ক্ষেত্রে এগুলো আপনাআপনি এসে যায়। বলতে চেয়েছি তাঁদের অলৌকিক রসিকতার মধ্যে দিয়ে কল্যাণ হস্ত প্রসারণের কথা, যার ব্যাপকত্ব, যার অসীম সুদূর প্রসারী ফল আমাদের তো দূরের কথা মহর্ষিদেরও বুদ্ধির অগম্য। কত কথা, কত প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা বলব - শেষ নেই, সীমা নেই। কোনও বাবাদের কাজের দিন হয়ত দেখছি বাবা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন, মনে হচ্ছে যেন এ জগতেই নেই। হাজার লোক লাইন দিয়ে প্রণাম করছে, প্রণামী দিচ্ছে, কেউ পায়ের কাছে রাখছে, কেউ বাক্সে, বাবার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, স্থির অবিচল, সমাহিত। ওরই মধ্যে কোন অক্রিয়ান্বিত প্রণামের পর প্রণামীর উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই দেখি বাবা ঠিক তার হাত চেপে প্রণামী নিতে অস্বীকার করছেন। তাজ্জব ব্যাপার। চোখ তো বন্ধ ছিল, এরই মধ্যে কখন চোখ খুললেন, নিমেষের মধ্যে অত ভীড়ের মধ্যে কেমন ভাবে অক্রিয়ান্বিতকে চিনে তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দিলেন সমস্ত ব্যাপারগুলো কখন, কি করে, কেমন ভাবে পলকের মধ্যে ঘটে গেল পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ঘটার পূর্ব্ব মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। অবাক বিস্ময়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে শুধু প্রণাম জানান ছাড়া কিছু করার ছিল না।

"৩০২ ধারা এ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার কেস''। অবধারিত ফাঁসি। অন্ততঃ কয়েক বছর ঘানি ঘরে থাকা তো বটেই, কেউ রুখতে পারবে না। বউকে ঝগড়া করতে করতে ভোজালি দিয়ে কোপ মেরেছে। মরেনি তবে একটা কান একেবারে নেমে গেছে। বাবার কাছে কেঁদে কেটে সব কিছু স্বীকার করেছে। তাকে হয়ত সে সময় সংসার থেকে দূরে সরালে ছোট ছোট শিশুরা না খেতে পেয়ে মরে যাবে ভেবে অন্য কিছু কারণে জাগতিক শাস্তি রেহাই প্রয়োজন মনে করে, বাবা তাকে তুড়ন্ত তিরস্কার করেছেন, মানসিক শাস্তি দিয়েছেন,

চোখের জলে শুদ্ধ করে তাকে দিয়েই আবার "ভাবনা কাজীর" ভূমিকা অভিনয় করিয়ে সারাদিন আটকে রেখে আনন্দ করিয়ে, খাওয়া দাওয়া করিয়ে "এরেষ্ট" হওয়ার সময়সীমা পার করিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এও দেখা গেছে কোন সন্তানকে হয়ত জাগতিক কোন কাজে খুব প্রয়োজন অথচ তার শারীরিক অসুস্থতা এত যে সে উঠে ঠিকমত বসতে পারছে না। পাছায় এত বড় বিষ ফোড়া যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অথচ তাকে হয়ত সারাদিন সারারাত রান্নার কাজে বাবাদের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন। দেখা গেল কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই বিষফোড়া, বসে থাকলে চলবে এখন একজনের পাছায় চালান হয়ে গেল। রান্নার প্রয়োজনের লোকটি একদম সুস্থ অবস্থায় বাবাদের কাজ তাঁদের দয়ায় শেষ করতে সক্ষম হল। এ সবই তাঁদের লীলা। কার হল, কেন হল, কি করে সম্ভব হল, কেমন করে কার ভিতর তিনি এতটুকু কষ্টের মধ্য দিয়ে, কার কি বিশাল দুর্ঘটনা খন্ডন করে দিলেন এ চিন্তা আর যেই হোক মুর্খ ছাড়া করে না, করবে না, করা উচিতও নয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের এই রসিকতার গূঢ় অর্থ, যেমন আমরা বুঝি না, তেমনি এটাও অবশ্যই মনে করা দরকার যে তাঁরা কার্য্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া প্রয়োজন বোধে রসিকতার সাক্ষীও সকলকে রাখেন না। যে ঘটনার সাক্ষী থাকে সে ভাগ্যবান। তাই বাবা কাকে কখন কি বলেন, কেন বলেন সেই মানে খুঁজতে যাওয়া অনুচিত। অথচ, আমরা প্রতি মুহুর্ত্তে তাই করি, কোন নিষেধ তাঁর মানি না, কোন সাবধান বাণীও শুনি না। এমন কি গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো করার মতো তাঁরই দেওয়া অর্থ থেকে সামান্য কিছু প্রণামীটুকুও অহংজ্ঞানে তাঁর মত বিশ্ব সম্রাটের পায়ের নীচে নীরবে, নিভৃতে অতি সঙ্গোপনে, দীনভাবে সঙ্কুচিত চিত্তে মনে মনে

ভক্তিভরে "কৃপা করে আপনারই জিনিষ আপনি গ্রহণ করুন" বলে পৌঁছে দেওয়ার বদলে তার হাতে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। মনে করি, শুধু মনে করি কেন, তৃপ্তি পাইও এই ভেবে যে "বাবাকে দিলাম।" এটা তো চরম অহংকার। এটা তো আরেকটা মূর্খামির পরিচয়। অথচ প্রতি পদে পদে আমরা তা জেনেও করি।।

এই মহাযোগীরা কত ভয়ঙ্কর শক্তি ধরেন আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। রসিকতাচ্ছলে গুরুবাবাকে তার এক নাতিতূল্য ভক্ত একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, "আমেরিকা পাকিস্তানকে বোমা সরবরাহ করছে, শুনেছ তো? তোমার যোগ পাছা দিয়ে বের করে দেবে।" বাবা উত্তরে তাকে পরম স্নেহভরে বলেছিলেন, "না রে দাদা! না! ভারতবর্ষ চিরকালই যোগী মুনিঋষিদের দেশ। এর গুহা, পর্ব্বত কন্দরে কত যোগী, মুনি যুগ যুগ ধরে জগতের মঙ্গলকামনা করে যাচ্ছেন। এখানে ও সব বোমা টোমা পড়বে না, তার পড়ার আগেই হয় ফেটে যাবে, নইলে এরা ও সমস্ত হাঁ করে গিলে রসগোল্লার মত খেয়ে নেবে জানবি। এখানে কোন ক্ষতি করতে এঁরা দেবেন না।" মনে মনে ভাবি, "এরা তো বিশ্ববিধাতা - এটুকু করা এঁদের কাছে তো কোন ব্যাপারই নয়।"

তাই বলছি এঁরা, এঁদের কথাবার্ত্তা, রসিকতা, চলাফেরা, আচার ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ জীবের কাছে দুর্ব্বোধ্য। এঁদের প্রতিটি কথাই ব্রহ্মবাক্য, হাজার বছর পরেও যোগীর কথা ফলতে বাধ্য। এঁদের কথার মানে খোঁজা বাতুলতা, রসিকতা বুঝতে চাওয়া মূর্খতা, আচার আচরণ ধরতে যাওয়া চাঁদ ধরার সামিল। শুধু কায়মনোবাক্যে এদের নির্দ্দেশ মানতে পারার প্রার্থনা করা ছাড়া, আকুল হৃদয়ে প্রতিনিয়ত তাঁরই কাছে তাঁরই শক্তির জন্য ভিক্ষা ছাড়া, খেঁকী কুত্তার মত এঁদের দুয়ারে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেও যদি কখনো একটু কৃপাদৃষ্টি করেন এই আশায় অনবরত পড়ে থাকা

ছাড়া সাধারণ জীবের মুক্তির কোন উপায় নেই। মূর্খ আমরা, দেহসর্ব্বস্ব আমরা, অহংজ্ঞানী আমরা, আমরা তা পারি কি? তাই দুর্ভাগ্যও আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। নইলে সন্তানের একটু ডাক শোনার জন্য যে আকুল হয়ে বসে আছে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য সব বিষ নিজে খেয়ে নীলকন্ঠ সেজে, প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে সন্তানের সমস্ত রোগ জ্বালা, প্রয়োজনে নিজ পূত পবিত্র দেহে ধারণ করে তার সমস্ত রোগ যন্ত্রনায় নিজের শরীরটাকে যে ধুপের মত জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাকে সামনে পেয়েও আমরা তাকে চিনছি কৈ? জানছি কৈ? মানছি কৈ? দুর্ভাগ্য আমাদের সঙ্গী হবে না তো কার হবে?

শিশুভাবে বাবা

শ্রীশ্রী বাবার কতরূপ, কতরকমের ভাব যে দেখেছি কি বলব। - রিক্সওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে গাড়ীতে চাপার পর কি মধুর রঙ্গ করতেন বলার নয়। আর তারাও সমানে ঐ দয়াময় রসময় পুরুষের সঙ্গে সমানে মজা করতো। আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঐ মানুষকেই ঐ বাড়ীর আশপাশের লোকেরা কিন্তু এ সব ব্যাপারে কিছু জানতেই পারতো না। সকলের সঙ্গেই বাবার ভাব ভালবাসা ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বাবা রাস্তায় চলার সময় ওখানকার পাড়া প্রতিবেশী, কারখানার মালিক বা ব্যবসায়ী যার সঙ্গেই দেখা হোক বাবা আগে সবিনয়ে 'দুহাত তুলে নমস্কার করবেনই করবেন, কুশল সংবাদ নেবেন। এতবড় একজন শক্তিধর পুরুষ কাউকেই এমন কি বাবার অত ভক্তরা তাঁর কাছে যাতায়াত করলেও বুঝতেই দিতেন না এমন কি কেউই তাঁর ঐশী শক্তির সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা করারও অবকাশ পেতো না - এ এক অবাক কান্ড। পোষাক পরিচ্ছদও তেমনি অদ্ভুত। অতি সাধারণ বরং অসাধারণ বিপরীত। কেননা ধুতিটা ফর্সা তো জামাটা অতীব ময়লা, আবার কোনদিন পাঞ্জাবীটা দুধের মত

ফর্সা তো ধুতিটার দিকে তাকান যায় না এত ময়লা। আর সেটা পাল্টাবে কার সাধ্যি ! মা ঠাকুরণ চেষ্টা করতেন, পারতেন না রাগে গজ গজ করতেন কিন্তু বাবা গ্রহ্যের মধ্যেই আনতেন না - এমনই এক বিচিত্র পুরুষ। আমাদের কিন্তু বাবাকে পেলে মন ভরে থাকত। তাঁর চিন্তাতেও মন পবিত্র থাকত আর তাতেই যেন ক্রিয়াটা হয়ে যেত। ক্রিয়া কম করেও (অবশ্যই বাবার আদেশে) সমান আনন্দই পেতাম। বাবা হয়ত বলতেন "অনেক রাত হয়ে গেছে আজ একটু কম করেই করো, কাল সকালে পুরোটা করবে।" যদি বলতাম "বাবা, আজ তো সব হবে না, কাল সকালে কি আজ আর কালকের ক্রিয়াটা একসাথে করবো?" বাবা বলতেন "ওরে পাগল! আজ যদি রাত্রে না খাও তাহলে আজ রাতের খাবার আর কালকের খাবার কি একসঙ্গে খেতে পারবে? আগামীকালের ক্রিয়াটা ফাঁকি দিও না, পুরো করলেই হবে।" ক্রিয়ায় ফাঁকি কখনও দিইনি তবে দ্বিতীয় ক্রিয়াটা আমার কাছে কয়েকদিন রসকসহীন শুষ্ক মনে হলেও সময়টা বেশী লাগত আর সময়টা আমার কাছে খরা মরসুম মনে হোত।

☞ শিশু ভোলানাথের রাজত্বে

যাই হোক শিশু ভোলানাথ বাবার কথা যা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ে। তখন বাবার বাড়ীতে আমার নানান কাজ। অফিস ফেরৎ বাবার বাড়ীতে গিয়েই এক চৌবাচ্চা জল ভর্ত্তি করা আর কলের জল উঠার অর্থাৎ যত পাম্পই কর সেই ছিড়িক ছিড়িক, তারপর গোয়াল পরিষ্কার করা, বাড়ীর কাছেই কারখানার মাঠে বাঁধা থাকা তিনটে চার পা তুলে লাফানো হাওড়া জেলা দৌড় করানো গরু আনা, খাটাল থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে সঙ্গে বাজার যাওয়া, বাজার থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে বাবা বিছানায় বসলে বাবার তামাক সাজা, এই সব করতে করতে দম ছুটে যেত।

সময়ও চলে যেত হু হু করে, তারপরেও বাবা সহজে ছাড়তেন না। ক্রিয়ায় বসতে হবে, রাত হচ্ছে - ভোলানাথ কিন্তু নির্ব্বিকার। এক একদিন মনে হোত - এ কি রে বাবা? নিজেই এদিকে ক্রিয়া ঠিক সময়ে করবে, ক্রিয়ায় কোনরকম ফাঁকি চলবে না বলেন আর ক্রিয়ার জন্যে বাড়ী যেতে চাইছি যেতে দিচ্ছে না — কি আর করব? মুখ বুজে বসে আছি। খানিক পরে আবার হয়তো বলাম, "বাবা, এবার বাড়ী যাব?" কোনদিন কি মেজাজ রইল হয়ত বললেন "এসো এসো।" আবার কোনদিন কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, "এসো এসো - তুমি থেকে কি আমার বাড়ীটা তিনতলা করে দেবে?" হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতাম — **তখন বুঝিনি কিন্তু পরে মনে হয়েছে ক্রিয়া করার চাইতে গুরুর আদেশ পালনে আরো বেশী আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে।**

তাই ক্রিয়া করতে ভাল তো বাসতামই, বাবার আদেশ পালন করতে পারলে বেশী আনন্দ পেতাম। আর দয়াল বাবা কৃপা করে আমাকে দিয়ে খাটিয়েছেনও প্রচুর। ড্রেন পরিষ্কার করা থেকে সুরু করে বাবার বাড়ী দোতালা হওয়ার সময় ছাঁদে ইঁট তোলা, ছাদ হল তো জলছাদের সময় খোয়া তোলা, সুড়কী তোলা, মায় কচুরীপানা এনে জলছাদে দেওয়া ইত্যাদি কাজ যত করেছি ক্রিয়া করার সময় আনন্দ পেয়েছিও অভূতপূর্ব্ব। চরম স্থিরত্ব অনুভব করতাম ক্রিয়া করার সময়। যত রকমের দুরূহ কাজ সব বাবা আমাকে দিয়ে করাতেন - এমন কি লোহা কাটা পর্য্যন্ত। আনন্দও পেয়েছি দুরূহ ভাবে। কি যে অদ্ভুত অনুভূতি হোত ক্রিয়া করে, সেটা বলা আরও দুরূহ। আমাকে ঐভাবে খাটাতে দেখে একদিন তো এক ক্রিয়ান্বিত বাবাকে বলেই ফেললেন, "আচ্ছা বাবা! এই ছেলেটিকে এত খাটান কেন?" বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, "নইলে আমাকে পাবে কি করে? শুধু ক্রিয়া করে? এ্যাঃ!" এইটা বলে হাতের দুটো বুড়ো আঙ্গুলে মুদ্রা করে দেখালেন। তাই তো আগেই বলেছি যে যোগীদের

কার্য্যকলাপ এত বিচিত্র, এত অদ্ভুত, এত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যুক্ত যে সাধারণের জ্ঞানের সীমার বাইরে। মনে হয় শিষ্যের প্রাক্তন কর্ম্মফল খন্ডনের জন্যই এরা এ সব করে থাকেন।

যে কথা বলছিলাম - বাবার বাড়ী ছিল আমাদের কাছে আনন্দধারা। বাবার সঙ্গলাভে আনন্দ, কথাশুনে আনন্দ, আদেশ পালনে আনন্দ, রূপে, রসে, গন্ধে সবেতেই শুধু আনন্দ আর আনন্দ। বড় ছেলে গোপালদা, বয়সে ছোট হলেও গোপালদা বলতাম, ভাই খোকন, দিদিরা, বৌদি আর বাবা মা তো আছেনই - ভোলানাথের সংসারের সকলের স্নেহ ভালবাসা চিরদিন মনে থাকবে। খোকন যে লুকিয়ে লুকিয়ে কত আম ও মিষ্টি খাইয়েছে ইয়ত্ত্বা নেই। তবে যন্ত্রণা এই যে সেই সংসারটার সঙ্গে বাবার দেহত্যাগের পর (মা ত পূর্ব্বেই দেহ রেখেছেন) আর কোন যোগাযোগ রইল না বা রাখা গেল না। ওদের সঙ্গে নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে ঐক্যমতে পৌঁছানো গেল না - পর্ব্বত প্রমাণ ভুল বোঝাবুঝি রয়েই গেল।

☞ ক্ষেপামায়ের মন্দিরে রুদ্ররূপে ভোলানাথ

এই মহাযোগীরা যে কখন কি রূপ ধরেন বলা যাবে না। তুচ্ছ কারণেই হয়ত রুদ্ররূপ। এরা আবার পরক্ষণেই সকলের ধারণারও অতীত। যখন সত্য সত্যই রুদ্ররূপী হওয়ার কথা, দেখা গেল ক্ষমার অবতার সেজে মিট্ মিট্ করে হাসছেন। এমনই একটা ঘটনার কথা বলছি।

বালীতে তাঁরকদার বাড়ী দেবীধামে বাবা সেবার এসেছেন। একদিন বললেন, "চল দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যাক। ওখান থেকে নৌকা করে বেলুড় হয়ে বালিতে ফেরা যাবে।" যেমন কথা তেমন কাজ। বাসে করে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল। ১০/১৫জন আছি আমরা দলে।

বাবাকে আবদার করলাম "বাবা সন্দেশ খাব।" বাবা বললেন, "বেশ তো খাওয়া যাক"— বলেই ওখানকার নামকরা মিষ্টির দোকান, যেখান থেকে সকলেই মায়ের পূজার মিষ্টি নেয়, বাবা একটা শালপাতার চ্যাঙারিতে এক চ্যাঙারী মিষ্টি নিয়ে, একটা মুখে পুরেই মুখটা বিকৃত করে থু থু করে মিষ্টিটা ঘরময় খুতু সুদ্ধ ফেলছেন ছিটকে ছিটকে। দোকানী ত গায়ে পড়ার ভয়ে যত ছিট্‌কে সরে যায়, বাবাও তত থু থু করেন আর থুতু শুদ্ধ মিষ্টিটা ঘরময় ফেলছেন আর বলছেন, "শালা জুয়াচোর সব, এই মিষ্টি মাকে খাওয়াচ্ছ? এডা তো মিষ্টির জাতই নয়, এডা তো মানুষের খাদ্যই নয়।" দোকানী তো হাঁ করে পৃথিবীর বিস্ময় নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলার শক্তিই নেই। তারই দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিষ্টি পছন্দ হয়নি বলে এইভাবে শালা বলে তারই দোকানে তারই মিষ্টি থুতু শুদ্ধ থু থু করে ছিটানো সে তার বাপের কালেও কল্পনা করেনি। যাই হোক আমরা তো সেই সব মিষ্টিগুলো (অবশ্যই চিনির ডেলা) প্রসাদ ভেবে সাবড়ে দিলাম। আর সন্দেশ খাওয়া? বাবার ঐ রূপ দেখার পর আর থাকে? বাবা বললেন, "তোমরা তো মাকে দর্শন করবে এখন, না কি?" সকলে মিলে এবার মার মন্দিরে যাওয়া হোল। জুতো বাইরে রাখতে হবে। জোড়া পিছু দশ পয়সা লাগবে। শুনেই তো বাবা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। "হে গুরুদেব, সব শালা জোচ্চোরগুলো জমায়েত হয়েছে এখানে"। আস্তে আস্তে যে বলছেন তা নয়, বেশ জোরে জোরে বলছেন। সব লোক যে যাচ্ছে পথ দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হলো বলে উঠলেন, "ঠিক আছে তোমরা মাকে দর্শন করে এসো, আমি জুতো পাহারা দিচ্ছি" — বলেই ঘাটের দিকে ছাদওয়ালা যে ঘরটা আছে তার রকে তিনি বসে পড়লেন আর জুতোগুলোকে সেখানে রাখতে বললেন। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা আমি ওর কাছে বসে গেলাম, ঠাকুর দেখতে গেলাম না। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে এক ব্যাটা জটাধারী সাধু সেখানে কেন

যে মরতে এসেছিল সেই জানে। সে ব্যাটা, এবার কি তার মতিচ্ছন্ন— বলে উঠেছে বাবাকে, কি মশাই আপনি মাকে দর্শন করবেন না? বাবা দেখলাম খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন "বুড়ো মানুষ আমি আর কি দেখব? ওরা ছেলে মানুষ ওরা দেখুক।" "সে কি মশাই? আপনার বয়েস হয়েছে আপনার তো আগে দেখা উচিত? কি রকম লোক মশাই আপনি জানি না।" বলেই গজ গজ করে কি বলতে লাগল জ্ঞান দেবার মত। শান্ত ভোলানাথ এবার মহাকালরূপ ধারণ করলেন বোধ হয়, কেননা বাবা ওর গজ গজ করার মধ্যে একবার শুধু তার দিকে তাকিয়েছেন আর লোকটা প্রচন্ড ইলেকট্রিক শক্ খাওয়া ব্যক্তির মত চটাস করে উঠে দাঁড়িয়েই চোঁ চোঁ করে দৌড়তে আরম্ভ করল। খানিক দৌড়ে পিছন ফিরে একবার বাবার দিকে তাকায় আর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায় রাস্তা ধরে। দৌড়ায় আর তাকায়, তাকায় আর দৌড়ায় - দেখলে মনে হবে বোধহয় তাকে যেন একটা পাগলা ষাঁড়গোছের কোনকিছু তাড়া করেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটা দৃষ্টির আড়ালে গেল বাবা একদৃষ্টে তার দৌড়াবার রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। দৃষ্টির আড়াল হতেই বাবা হো হো করে হেসে কুটিপাটি আর বলছেন "শালা! শালা আমাকে মা দেখাতে এসেছে। এসেছিলি তো পালালি কেন, দেখা?" আমি তো এসব দেখে কিছুই ভেবে পাচ্ছি না - সবে বছর দেড়েক এসেছি বাবার কাছে। কোথা থেকে কি ব্যাপার হয়ে গেল। এদিকে একে একে সবাই মাতৃদর্শন করে আসতে সুরু করল। আমি কিন্তু তখনও মনে মনে ভাবছি কি দেখলাম? আজ মনে হচ্ছে এই সব সিদ্ধমহাপুরুষেরা যখন যেমন প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছু করেন না, বলেন না, তেমনি সব লীলার সাক্ষীও সবাই হতে পারে না, এমন কি কাছে থেকেও না। বাবা বলতেন, দুরে থেকেও কাছে থাকা যায়, আবার কাছে থাকলেও দুরে পড়ে থাকে। অতজন ভক্তের মধ্যে মহাকালীর মন্দিরে মহাকালের রূপদর্শন সেদিন বাবা শুধু এ অধমকেই দেখিয়েছিলেন। এ শুধু তাঁরই কৃপা, তাঁরই করুণায় সম্ভব হয়েছিল। আর ভয় পেয়েছিলাম

কিনা? না, না ভয় পাব কেন? ভয় পাইনি একেবারে। সে ব্যাটা ভন্ড সাধু দন্ড পেয়ে বাবার ষন্ডের ভয়ে দু দন্ডও না দাঁড়াতে পেয়ে লন্ড ভন্ড হয়ে দুর্দান্ত বেগে ছুটতে ছুটতে প্রচন্ড নাকাল হয়েছিল হয়ত সেদিন, আমি কিন্তু আমার অখন্ডমন্ডলাকার দর্শনকারীর পাশে একখন্ড কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত সেঁটে দাড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে দৃশ্যটা সেদিন ভালভাবেই উপভোগ করেছিলাম। বিশ্বাস ছিল হাজার পাষন্ড হলেও বাবা কখনো আমাকে গুঁতোবে না। কারণ! বাবার ছেলে তো আমি!

☞ মৌনীবাবা

বাবা বলতেন "সব দেখবে, জানবে, বুঝবে" আর মুখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেন, "চুপ করে থাকবে।" তাই পাঠককে জানাই পূর্ব্বের ঘটনাগুলোর কার্য্যকারণ সম্পর্কে অর্থাৎ "মিষ্টির দোকান মালিককে" ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের জন্য লাঞ্ছনার শিক্ষা, ভন্ড সাধুকে ধর্ম্মের পোযাক পরে ভন্ডামির জন্য দন্ডদান ইত্যাদির কথা লিখলেও এবারের ঘটনাটার তাৎপর্য্য "যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ" এই ভাবেই তিনি নিজে বুঝে নেবেন। এ ঘটনাতেই আছে "পিছন ফিরে তাকিও না" তাই যেমন লেখাবেন সেই ঘটনাটাই শুধু লিখছি -

. দক্ষিণেশ্বর থেকে বেরিয়ে বেলুড়মঠ যাওয়া হবে তাই ঠিক ছিল। সেজন্য আমাদের সঙ্গে যাঁরা ২/৩জন পুরানো ক্রিয়ান্বিত ছিলেন তাঁরাই সব ঠিকঠাক করলেন নৌকা টৌকো। মঠে পৌঁছান হল। ওমা! এখানেও বাবা সেই জুতো আগলাতে লাগলেন, আমিও যথারীতি বাবার সঙ্গে রইলাম। পেট তো সকলেরই এদিকে চাঁই চাঁই করছে। তাই সকলেই তাড়াতাড়ি ফিরে এল। এবার মঠ থেকে বেরিয়ে জি.টি রোডে আসা হচ্ছে। হঠাৎ বাবা রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একজন কুষ্ঠ রোগীর পাশে বসে পড়লেন। তার পাশে রাস্তার উপর হাতে করে কি

সব আঁকিবুকি করলেন। তারপর নিজের হাত দুটো চাপড়ে ঝেড়ে ফেলে আমাদের বললেন, "চল সব এগিয়ে চল, পিছনে তাকিও না।" বলেই বাবা হঠাৎই একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন - আর লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা আমিও পড়ি কি মরি করে ঐ বাসেই বাবার সঙ্গে কোনরকমে উঠে পড়লাম। ঐ অবস্থাতেই অন্যদের বললাম নিজে নিজে বাস ধরে চলে আসতে। রোগীটার কি হল কেমন রইল, থাকল না টেঁসে গেল, কি করে বলব? আগেই তো বলেছি বাবার নির্দ্দেশে "পিছনে ফিরে তাকিও না" তাকাইও নি। শুধু ঘটনাটা জানালাম, আপনারা নিজ নিজ ভাবে বুঝুন।

কল্পলোকে গল্পের নায়কের সঙ্গে -
স্বল্পআলোয় অকল্পনীয় ব্যাপার-স্যাপারে -

☞ ঝুলি থেকে কিছু কিছু প্রকল্পের প্রত্যক্ষ বর্ণনা

হ্যাঁ প্রকল্প বলাটাই বোধহয় ঠিক হবে কারণ প্রকল্প কথাটার মধ্যে যেমন বিশেষ চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে ঠিক জিনিষ সঠিকভাবে হাজির হয়, যেটা যেমন যেখানে মানায় সাজান হয় বা করা হয় বাবার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহ সিনেমা দেখা, সপ্তাহে কম করেও ৫দিন তো বটেই, আর সেই সিনেমা দেখার মধ্য দিয়ে দয়াময় বাবা এমন সমস্ত কান্ড কারখানা ঘটাতেন বললে আজকের দিনে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। অথচ বাস্তবে সেগুলো ঘটেছে। এই তো কিছুদিন আগে মাত্র আর আমরা তাঁর অধম সন্তানরা সেই মহামুনির সমস্ত অকল্পনীয় যোগবিভূতির জীবন্ত সাক্ষী। সেই ঝুলি থেকেই কিছুকিছু বের করে আনছি। পাঠক লক্ষ্য রাখবেন, সম্রাট শুধু তাঁর ঐশ্বর্য্যই দেখাননি, তার ভিতর দিয়ে যোগপথের পথিকের কেমনভাবে চলতে হয়, কি কি পরীক্ষা দিতে হয় এই সবও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

বাবা যখনই সিনেমা যাবেন — রিক্সায় যাবেন, আর রিক্সায় তিনজন তো উঠবেই। বেশীর ভাগ সময়ে চারজনও হতে পারে - আর আমার কপালে জুটতোও সেইরকম।

আমার স্থান বেশী সময়েই অগত্যা সকলের পায়ের কাছেই হোত। কারণ একে স্বাস্থ্যবান আমি, পাশে বসলে আর একজনের অসুবিধা, তাই অগত্যা ঐটাই ছিল সকলের কাছে আমার সুবিধার জায়গা আর আমার কাছে ছিল চরম অস্বস্তির জায়গা। কেননা তখন তো প্যান্ট পরি আর প্যান্ট পড়ে মোটা লোকের হাঁটু মুড়ে রিক্সায় বসা মানে কি কষ্ট সকলেই অনুমান করতে পারে। প্যান্টের সেলাইগুলো ফেটে যেতো। কি করা যাবে উপায় নেই। তার উপর সেদিন আবার গোদের উপর বিষফোড়ার মত বাবা ১২/১৩ বছরের একটা মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে জায়গা নেই বলে বললেন, "এই বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে নাও।" আমার চোখ তো কপালে ওঠার জোগাড়। মনে মনে ভাবছি হে ঠাকুর তোমার না হয় জাগতিক কোন সম্পর্কের খেয়াল নেই, ওই অত বড় একটা মেয়ে তোমার কাছে বাচ্ছা হল? আর তাও পাঠালে, পাঠালে কিনা আমারই কাছে, আবার কোলের উপর বসিয়ে, রিক্সায় নিয়ে যেতে? তাছাড়া একটা সামাজিক ব্যাপার-স্যাপার তো আছে, না কি ? লোকে দেখলে রাস্তায় কি বলবে? কেই বা বলবে আর কেই বা শুনবে? বাধ্য হয়ে ঐ মেয়েটাকে কোলে বসাতেই হোল, নইলে কোন তো উপায় নেই। মনে মনে প্রচন্ড রাগ হচ্ছে - রাস্তার লোকজন হাঁ করে দেখছে। তা দেখছে তো দেখছে বাবার কোনদিকেই কোনরকম ভ্রূক্ষেপই নেই। যাই হোক সিনেমা হলে যাওয়া হল কোন রকমে, তখনও কি ছাই জানি আরও কি সাংঘাতিক অস্বস্তিকর অবস্থা আমার জন্য অপেক্ষা করছে?

সিনেমা সুরু হয়েছে, লাইটগুলো নিভে গেল, দরজা বন্ধ হল, বাবার পাশে পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। হঠাৎ দেখি আমার পাশের সিটে বসা একটা যুবতী মেয়ে পাশ থেকে তার একটা হাত আমার উরুর উপরে রেখে দিয়েছে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি, হাতটা সরাতেও পারছি না বাবা দেখে ফেলবে। হা ঈশ্বর ! কেন মরতে বাবার সঙ্গে সিনেমায় এলাম ভাবছি। অন্যদিন বাবাকে দেখতাম তবু সিনেমা দেখতে দেখতে রঙ্গ রসিকতা করেন, আজ দেখি বাবা যেন একেবারে তন্ময় হয়ে সিনেমা দেখছেন। প্রচন্ড রাগ হোল মনে মনে - ভাবলাম সবের বেলায় দেখতে পাও আর এটা পাচ্ছ না। সারা রাস্তা তো এক অস্বস্তিতে কাটিয়েছি, আবার এখানে সিনেমা হলেও তাই। অন্য সময় তো কত ফষ্টি নষ্টি কর, আজ দয়া করে একবার আমার দুর্গতিটা দেখ না ? এইসব মনে করছি আর খুব ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে একটু একটু করে মেয়েটার থেকে সরে সরে বাবার সিটের দিকে চেপে বসছি হঠাৎ দেখি মেয়েটা আমার দাপনাটা থামচে ধরেছে। এই মরেছে রে ! সর্ব্বনাশ আর দূরে নেই। প্রাণমন ঢেলে মনে মনে বাবাকে পরিত্রাহি ডাকছি - হে ঠাকুর রক্ষা কর। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। এমন সময় কখন যেন মনে হোল, মেয়েটা বোধহয় একটু বাধঁন আলগা করেছে - সেরকম ভাব আর নেই। তার দিকে তাকাতে তো সাহস করছি না - যদি আরও কিছু ঘটিয়ে বসে! এইভাবে সময়টা শুধু অস্বস্তিতেই কেটে গেল আর সিনেমা দেখা গেল গোল্লায়। কোনরকমে সেদিন সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। কিন্তু কি দয়াময়ের লীলা! মেয়েটা ওই রকম কান্ড করলেও আমার মনে কিন্তু কোন বিকার আসেনি। পরে বুঝেছিলাম এ সমস্ত ঐ বাবারই খেলা, পরীক্ষা নিচ্ছিলেন আমার। পাঠক লক্ষ্য করবেন যিনি পরীক্ষা করলেন তিনি কিন্তু আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বাঁচিয়েও দিলেন সেদিন।

☞ অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতি

হলে Opening day দারা সিং এর বই চলছে। আর যায় কোথা? দারা সিং এর বই হলে আর রক্ষা নেই - বাবা রোজ দেখবেন। তা সেদিন দারা সিং এর "ভীমসেন" বই দেখতে যাওয়া হয়েছে কিন্তু গিয়েই দেখা গেল 'হাউস ফুল' বোর্ড ঝোলান রয়েছে। বাবা কিন্তু বই দেখবেনই ফিরে যাবেন না। সঙ্গে আবার আমরা ১৫/১৬জন লোক আছি। বুঝুন কি অবস্থা। হাউস ফুল। একটাও টিকিট নেই। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন তখনও ১৫/১৬জনকে নিয়ে সিনেমা দেখবেনই দেখবেন। বাবার এটা জিদ। আমরা তো মজা দেখছি। হঠাৎ দেখি একজন একজন করে লোক এসে যারা সিনেমা দেখার টিকিট কেটেছিল, তারা তাদের টিকিট বিক্রী করে যাচ্ছে। তারা সেদিন সিনেমা দেখবেন না। বাবাও নিশ্চিন্ত মনে একটা একটা করে টিকিট কিনে নিচ্ছেন। আগেই বলেছি আমরা ১৫/১৬জন সংখ্যায় ছিলাম। আর আশ্চর্য্যজনক ভাবে সেদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে আমরা সংখ্যায় যতজন ছিলাম ঠিক ততগুলো লোক এসে ততগুলো টিকিট বাবার হাতে জমা করে দিল। আরও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল যখন দেখলাম যে টিকিটগুলো ঠিক ঠিক পাশা পাশি বসে দেখার জন্য ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী হিসাব করে যেন বিক্রী করে গেল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরলাম। আজ মনে হয় এঁরা কি পারেন আর কি পারেন না? অঘটন ঘটন পটিয়সী এই সব সিদ্ধযোগীরা যখন যা মনে ভাবেন সঙ্গে সঙ্গে সেটি ঘটে। এই রকম কত ভাগবৎলীলা যে বাবা এই অধমকে দেখিয়েছেন বলে শেষ করা যাবে না।

☞ ও শালারা কি ধরবে আমাকে ?

সিদ্ধযোগীর আর এক দিনের সিনেমা দেখার বাস্তব ঘটনা বলছি। এসব কথা মনে হয় এখনকার কেউ বিশ্বাসই করবে না। আর সত্যি কথা বলতে কি এই যোগবিভূতি যারা দেখে বা যারা উপলব্ধি করে তারা তো একদিক থেকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বটেই নচেৎ ভাগবৎলীলা তো সাধারণের প্রত্যক্ষ করার জিনিষই নয়।

সেদিন বাবা সিনেমা দেখতে গেছেন সঙ্গে টিকিট আছে ৪০ খানা। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা হঠাৎ ৪১/৪২ দাঁড়িয়েছে সিনেমা দেখার। কি করা যাবে ? বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন "ঢুকিয়া পর"- কি ব্যাপার বুঝুন ? টিকিট ৪০খানা, লোক ঢুকছে ৪২ জন। তাও কোথায় ? না সিনেমা হলে ? যেখানে নির্দ্দিষ্ট লোক নির্দ্দিষ্ট আসন। এমন নয় যে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে। আমি বললাম "বাবা! ধরে ফেলবে তো ?" বাবা ছেলেমানুষের মত বলে উঠলেন, "ও শালারা কি ধরবে আমাকে"। সিনেমা আরম্ভ হয়েছে - টিকিট চেকার এসে ধরেওছে। বলছে — আপনাদের লোক বেশী আছে। বাবা নিজের সিটের উপর বসে বসেই বলে উঠলেন, "ভাল জ্বালা, দেখিয়া লইতে বল না ?" চেকার এসে প্রতিট্যা টিকিট দেখে ধরে ধরে চেক্ করতে লাগল। ভাবছি এবার তো নির্ঘাত ধরল বলে। কিন্তু দেখছি গুনছে তো গুনছেই - গুনতে গুনতে কেমন যেন সে গুলিয়ে ফেলছে আবার গুনছে। কিন্তু নাঃ! বেশী লোকটাকে ধরতে পারল না। অবশেষে হতাশ হয়ে বাধ্য হল ফিরে যেতে আর এদিকে আমরা বাবার যোগবলে ৪০খানা টিকিট নিয়ে ৪২জন সিনেমা দেখে এলাম। মহাযোগীর এই ছলনা করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। কিন্তু সেই কারণটাই তো আসল ব্যাপার যা আমাদের বোধগম্য ছিল না।

ত্রিকালজ্ঞ এই সব মহাযোগীর চোখের আড়ালে কোন কিছু অজানা থাকে না - থাকতে পারে না। আমরা সাধারণ জীব - দেহসর্ব্বস্ব মন নিয়ে চলার জন্য ভাবি দেহটাই সব। দেহটার আড়ালে কোন কিছু ঘটার খবর আমরা যেমন রাখার ক্ষমতা রাখিনা, বাবার কাছ থেকে দূরে থাকলেই ভাবি বাবা তো আর দেখতে পাচ্ছেন না বা এখান থেকে যাই বলি শুনতে পাচ্ছেন না - তাই চোখের আড়ালে গেলেই আমরা জীব ভাবে স্বমূর্ত্তি ধারণ করি এটাই আমাদের স্বভাব। কিন্তু বাস্তবে তা তো নয়। তিনি সব দেখেন, সব জানেন, সব শোনেন। কোন কিছুই তাঁর আড়াল করতে পারে না এই কথাটাই আমাদের স্মরণ থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গেই ঘটনাটা উল্লেখ করছি।

সেদিন কি কাজে, বোধহয় বাবারই কাজে, বড়বাজার গেছি। তখন সিগারেট খেতাম — মনে করছি ছাড়ব ছাড়ব। দোকানে কাজ মিটিয়ে রাস্তায় নেমে সিগারেট ধরিয়েছি। দামী সিগারেট, হঠাৎ প্রত্যক্ষ বোধ হল সামনে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলাম। তারপর বাবাকে আর দেখতে না পেয়ে ভাবছি মনের ভুল। বাবাকে দিনরাত স্মরণ করি, তাই হয়ত মনে হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে বড়বাজারের মুখের কাছে হাওড়া ব্রীজের দিকে এগিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে টান দিতেই দেখি আবার সামনে বাবা, প্রত্যক্ষ বোধ হল দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি, কই কেউ কোথাও নেই। মনে মনে ধিক্কার এল খাবই না সিগারেট। এত ভাল জ্বালা দেখছি। মনে হচ্ছে সিগারেট খাওয়া বাবা পছন্দ করছেন না। ছেড়ে দিলাম সিগারেট খাওয়া।

সিনেমার কথায় ফিরে আসা যাক। তখন বোধ হয় আরাধনা বইটা চলছে। এই আরাধনা বইটা বাবা যে কতবার দেখেছেন ঠিক

নেই - আবার নিয়ে গেছেন আমাদের বইটা দেখতে। বাবার পাশে আমি ও আমার পাশে একজন শিক্ষিতা ভগ্নী। বয়সী গুরুভগ্নী। সামনের সিটে বসা এক নবদম্পতির দিকে তাকিয়ে বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন, "আচ্ছা বিষ্টু! ওই মেয়েটিকে গলা জড়িয়ে ধরে তুমি যদি বল, "ওগো চন্দ্রবদনা তোমাকে কি ভোলা যায়? তাহলে কি হবে?" আমি বললাম,"ওরে বাবা! মেরে ফেলবে একবারে।" "কেন মারবে কেন? তোমাকে একথালা ক্ষীর লুচি ও সন্দেশ খেতে দেবে না?" বাবা বললেন। আমি বললাম, "তা হয়ত দেবে কিন্তু খাবে কে? যে খাবে সে তো তখন নেই" — বাবা হো হো করে হাসতে লাগলেন। পাশে বসা গুরুভগ্নী ও আমি আর মাথা তুলতে পারছি না লজ্জায়। এমনি মজার মানুষ শিশু ভোলানাথ এঁরা। জাগতিক নিয়ম কানুন, আচার আচরণের বাইরের বাসিন্দা এঁরা। অবশ্য সবটাই করেন, মঙ্গল করার জন্যই।

এমনও ঘটনা দেখা গেছে যে বাবা সিনেমা হলে রয়েছেন, পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে নেই, মাথা নীচু করে বসে আছেন। খুবই নাচ গানের দৃশ্য চলছে, বাবা বলে উঠলেন, "বাঃ! বাঃ! বেশ হচ্ছে — বেশ হচ্ছে।" সামনের সিটে বসা কিছু যুবক বাবার এই উক্তিতে মজা পেয়েছে, বলছে — "উঁঃ বুড়োর রস দেখ।" জাগতিক ভাবে তারা বাবাকে ঠিকই দেখছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তখন চলছে— বাবার বাড়ীতে ক্রিয়ারতা কোন ক্রিয়ান্বিতার ক্রিয়ার পরীক্ষা, যাকে বাবা সিনেমা যাবার আগে তাঁরই ঘরে বসে ক্রিয়া করতে বলে গেছেন। ঐ সিনেমা হলে বসে বহির্জ্জগতের ঐ নাচ গানের সৌন্দর্য্যকে তিনি মিলিয়ে দিলেন অন্তর্জ্জগতের সুন্দরের সাধনার সঙ্গে, ঘটিয়ে ছাড়লেন স্থূল ও সূক্ষ্মের কি অপূর্ব্ব মেলবন্ধন। ব্রহ্মবাক্য সত্য হল, "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভও হল।" যুবকরা পেল অনিত্য আনন্দের আস্বাদ, কারণ, তারা সেই ভাবেরই ভাবী হয়ে সিনেমা হলে এসেছে, আর ক্রিয়ান্বিতা ভগ্নীটি পেল নিত্য পথের আনন্দকে অর্থাৎ নিত্যানন্দকে, কারণ সে সেই ভাবেই ভাবিতা ছিল। একই

কথা দুটি স্থানে ভিন্নরূপে ফুটে উঠল। বাবা যে সিনেমা হলে বসেও ঐ গুরুভগ্নীর ক্রিয়া দেখেছেন প্রমাণ পাওয়া গেল সিনেমা থেকে ফিরে বাবা যখন বিমলা পিসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বিমলা তোমার সব ক্রিয়াই সুন্দর হোল কিন্তু দ্বিতীয় ক্রিয়ার ঘোরটা ঐ ভাবে দিলে কেন?" আমরা তো শুনে হতবাক্, বাবা ঐখানে বসে তাহলে সিনেমা দেখার নাম করে আসলে ক্রিয়া দেখেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে বাবা কেন সিনেমা যান তাহলে?

☞ বাবার সিনেমা যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ

এই সিনেমায় যাওয়ার জন্য খরচ হোত অনেক। আমরা কয়েকজন মিলে বহন করতাম। কিছু সংখ্যককে দেখতাম এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলছে। বাবা তাদের পিশাচকল্প বলতেন। ক্রমে ক্রমে তারা অবশ্য সবাই বাদই পড়ে গেল। শ্রীশ্রীবাবার ক্রিয়াকলাপ বোঝে কার সাধ্য। সিনেমা গেলে, বাজারে গেলে প্রচুর খাওয়াতেন আমি তো এ ব্যাপারে সিদ্ধ হস্ত। বাজারে গিয়ে ছড়া ছড়া পাকা কলা আর মিষ্টির দোকানে বাবা গেলে ৮/১০টা কচুরী, প্রচুর মিষ্টি খেতাম, অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠতাম। অবশ্য আমি কিছু মনে করতাম না, কারণ আমার মনে হোত বাবা যা করাচ্ছেন, করাবেন, করিয়েছেন সব তো আমারই মঙ্গলের জন্য। সিনেমা দেখে হয়ত সবাইকে নিয়ে মিষ্টির দোকানে ঢুকলেন। গরম গরম কচুরী ভাজা হচ্ছে। তখন ২০ পয়সা করে কচুরী। দোকানদার বাবাকে খেয়ালী গুরুদেব বলে জানত ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই বাবুদের জায়গা করে দে বলে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের আধখানা জুড়ে শালপাতার উপর ১০খানা করে কচুরী কুমড়োর তরকারী পড়ে গেল। বাবা হয়ত বলে উঠলেন "এই আর একটা কার্ড দে আর আরও দুই টাকার পানতোয়া দে" দোকানী চাপে পড়ে দিতে বাধ্য হল। দোকানের অন্যান্য খদ্দেররা হাঁ করে মজা দেখছে! হঠাৎ বললেন "আমাকে ২০০গ্রাঃ সন্দেশ দাও" বলেই

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আবার লোভ করো না যেন!" সন্দেশ এল। একটু তুলে মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিয়ে ঠোঙ্গাটা আমার পাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "আরে এ যে চিনির ঢেলা - এ মানুষে খায়?" আর একদিকে আমাকে বললেন, "নাও! টকাটক্ খেয়ে নাও।" বলেই চিরাচরিত ভাবে আধখানা সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগলেন। বন্ধুভাবে কি সঙ্গদান। দোকানের নারী পুরুষ সকলের দৃষ্টি আমাদের দিকে আর বাবা ঐ মজা করছেন। দল বেঁধে সিনেমা যাওয়া, দোকানে খাওয়ার সেই সব অপূর্ব্ব এক মিল মেলার দৃশ্য আজও যেন চোখে ভাসে। এ ছিল অপূর্ব্ব ভাবের ব্যাপার, লীলাময়ের লীলা দৃশ্য, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করতেন, এক ভাব। নইলে ইংরাজী বই দেখতে আমাদের সঙ্গে নেবেন কেন? যে সব নগ্ন দৃশ্য বন্ধু বান্ধব ছাড়া দেখতে সঙ্কোচ জাগে এই মহানযোগী আমাদের ছেড়ে সেই সব দৃশ্য কখনও একা উপভোগ করেন নি। আর প্রথম প্রথম সঙ্কোচ হলেও পরে বাবা সিনেমা দেখতে দেখতে যে আনন্দঘন অবস্থার সৃষ্টি করতেন তাতে জাগতিক সঙ্কোচ, দ্বিধা কিছু থাকত না - ঠিক যেন কতযুগের পরিচিত বান্ধব। যেন বৃন্দাবনের লীলামাধব - সব ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিতেন সব লজ্জা সঙ্কোচ ভয় দূর করে নিজেকে আমাদের মত করে আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মনটাকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। কি সাংঘাতিক ক্রিয়া হোত এরপর, কি অনুভূতি জাগাতেন ক্রিয়াতে কি বলব? এমন পরমানন্দ মাধবকে গুরুরূপী এমন বন্ধুকে, আত্মীয়ের আত্মীয় অথচ মহাযোগীকে এমন আপন করে কোন কালে কেউ পেয়েছে? মনে হয় না। মোহান্ত গুরু যতকাল দেহ ধরে থাকেন ততক্ষণ তো ধরাকে সরা জ্ঞান হয়, এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেই দেহটা যখন থাকে না তখন তাঁর নিত্য দেহ কজন দেখতে পায়? যারা পায় না তখন তাদের হালুয়া অবস্থা। তারা তখন ভাবে,যাকে ভয় ছিল সে তো নেই, তাই তাদের আসল রূপ তখন বেরিয়ে পড়ে। স্ব স্ব প্রধান হয়ে তারা তখন যাইচ্ছা তাই

করে, যাইচ্ছা তাই বলে ক্রমে ক্রমে আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। গুরুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে ক্রিয়া হবে না, কারণ ক্রিয়া হচ্ছে দেবকার্য্য। গুরুকৃপা ছাড়া হয়না আর গুরুতে মনপ্রাণ অর্পণ না করলে গুরুকৃপাও আসে না। কারণ গুরুদেব তো এই দেহেই বাস করছেন। তাই লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিন থাকতে গুরু সমর্পণ হয় না। আমাদের বাবা সিনেমা দেখানোর মাধ্যমে বহিরঙ্গ সাধনা করাতেন, নিজে লীলা করে আমাদের মন প্রাণ সমর্পণের সুযোগ দিতেন। পরীক্ষা করতেন আমাদের মনের প্রসারতার, সঙ্কীর্ণতার গন্ডি। মাপ করতেন কামনা বাসনার কামড় আর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করে নানাভাবে নানালীলা দেখিয়ে মনটাকে কাছে টেনে নিতেন কৃপা করে। রিপু দংশন কম হোত, আসক্তি আসত অন্য বস্তু ছেড়ে তার সঙ্গ করতে, উন্মুখতা বাড়ত তার লীলা দেখার। সিনেমা দেখা তাই ছিল তাঁর কাছে ভক্তদের বহিরঙ্গ সাধনার অঙ্গ, সখ্যভাবের লীলাখেলা, শিষ্যের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য শিশুদের সুযোগদান। এত কৃপা এঁদের, এত করুণার প্রতিমূর্ত্তি এঁরা। অথচ সাধারণ জীব এদের এই সব ক্রিয়াকলাপের গূঢ় অর্থ না ধরতে পেরে কত উপহাস করেছে, ভুল বুঝেছে, ব্যঙ্গ করেছে আর এঁরা তাদেরই মঙ্গলের, বলা যায় সদা সর্ব্বদা মঙ্গলের জন্য নিজের দেহটাকে পর্য্যন্ত ধূপের মত জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। কি অকৃতজ্ঞ আমরা, কি কৃতঘ্ন আমরা, আমরা কি পাষন্ড।

☞ তৃতীয় ক্রিয়াপ্রাপ্তি ও মোক্ষদার কিছু কথা

আমার তৃতীয় ক্রিয়া প্রাপ্তির সময় বাবা একদিন বললেন, "তোমার তৃতীয় সোপানের প্রাপ্তির ইঙ্গিত বাবা বোধহয় দিচ্ছেন মনে হচ্ছে।" এ সব পরে জানান হবে। তার আগে মোক্ষদার অবদানে

ভরে আছে। সে ছাড়া এ জগতে আমার অস্তিত্ব থাকত না। কবীর সাহেব দর্শন দেবার পর বাবা বলেছিলেন চিনতে পারলে না? তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনের পরিচয়। ভেবেই পাইনি কি করে সম্ভব? কবীর সাহেব কবে কার লোক আর আমি ---। পরে বুঝেছিলাম যে বাবার কথা কত সত্যি - আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বোধে এসেছে যে মোক্ষদাও এ যুগের মেয়ে ছিল না। আমি কখনও কখনও তাকে বলতাম মুসলমান ঘরের বেগম অথবা বাঈজী ছিলে তুমি। কেননা সে খেতে খুব ভালবাসত আর গহনা পরতেও খুব ভালবাসত। এমন অদ্ভুত চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। আমার সঙ্গে অর্থাৎ নিজের স্বামীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। তার জন্য কোন মান অভিমান নেই। আমি অফিস করি তারপর বাবার বাড়ী। রাত করে বাড়ী ফিরি তারপর ক্রিয়া করি, খাই, সবশেষে ঘুম। তার কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না - কোন প্রশ্ন ছিল না - কোন অভিযোগ ছিল না। স্ত্রী হয়ে স্বামীর এই উদাসীনতায় কোন রকম অভিযোগ নেই। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যেত। আর এখানে থাকলে খাওয়া দাওয়া আর সবশেষে ঘুম। সংসারে থেকেও কোনদিন কারও সাথে গালমন্দ, ঝগড়া এমন কি মনোমালিন্যও ছিল না। ঘুমটা খুব পোষা ছিল আর বাড়ীতে শত ঝড় ঝঞ্জা বইলেও তাকে কারও কোনপ্রকার সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সে জানত আমার স্বামী উদাসীন অতএব সেও সবেতেই উদাসীন থাকতো। খেয়ে এসে বিছানায় বালিশে মাথা ঠেকান মাত্র নাক ডাকতে সুরু করতো। এই নির্ব্বিকার ভাব আজকের সাধন জগতে খুব দরকার। ওকে রাগাবার জন্য বলতাম খাওয়া ও ঘুমের ব্যাপারে তোমার অশেষ গুরুকৃপা আছে নচেৎ কোন সুস্থ ব্যক্তি এমন ভাবে খাওয়া ও ঘুম নিয়ে নির্ব্বিকার থাকতে পারে

না। দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঘুমটা চলে গিয়েছিল আর খাওয়া গিয়েছিল আরো আগে। বিয়ের পরে আমাকে সে বলেছিল কখনও তোমাকে বিরক্ত করব না, তোমার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এমন কাজ কখনও করব না। কখনও করেও নি সে। দেহত্যাগের আগে একদিন শুধু কাছে ডেকেছিল, বলেছিল আমার কাছে একটু বসো না, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও না। বুকের ভেতরে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ওর ধারণা আমি হাত বুলিয়ে দিলে ওর কষ্ট কেটে যাবে। ও ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ওর কথা রাখতে পারিনি। কেন পারিনি, কি জন্য পারিনি সে সব কথা পাঠক পরবর্ত্তীকালের দিনগুলোর কাহিনীতে জানতে পারবেন। এখন শুধু এটুকু জেনে রাখুন পারিনি। পারলে ও হয়ত বাঁচত কিন্তু আমাকে হয়ত দুঃখ পেতে হোত আরও। তাই মৃত্যু পথযাত্রী মোক্ষদার কথা রাখা হয়ে ওঠেনি। মরার আগে দুঃখ করে ক্রিয়ান্বিতাদের বলেছিল, "তোদের বাবা আমাকে ভাল করবে না, বাঁচাল না আমাকে।" বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিয়ে সে চলে যেতে বাধ্য হল, ওর কাছে বসা আর হোল না। সেদিনের সেই বাধাটুকু, যা আমাকে ওর কাছে যেতে দেয়নি, তা যদি সেদিন ছোট করে দেখতাম তাহলে এখনকার চিত্র হোত অন্যরূপ। মোক্ষদার মৃত্যু একটা ঘটনা একটা ইতিহাস। আজ যখন পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, দেখি শুধু তার নিজেকে আমার সাধনার পথে এগিয়ে যাবার, আমার সাধনার এতটুকু যাতে কোন বিঘ্ন না আসে তার জন্য নিজেকে ধূপের মত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করার ছবি - তার আত্মদানের ছবি, তার নীরবে সব কিছু লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, প্রতারণা, অপমান সহ্য করার ছবি। মোক্ষের পথে এমনি করে লীলা সঙ্গিনী না হলে সাধনা যে হয় না

এমনভাবে সকল জাগতিক দুঃখ, যন্ত্রণার গরল নিজে পান না করলে অপরকে সাধনপথে সাহায্যদান যে হয় না - এমনি করে আড়ালে চোখের জল ফেলে জাগতিক ও সাংসারিক উত্তাপকে নিজের বুকে না গ্রহণ করলে অন্যে যে সাধনায় অগ্রসর হতে পারে না একথা মোক্ষদা তার জীবন দিয়ে আমাকে সহায়তা করে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। কুমতির প্রভাবে পড়ে, ঘটনা চক্রের আবর্ত্তে পড়ে, নিতান্ত নিরীহ অসহায় নারীর যোগ্য প্রাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে, যে কার্য্যকলাপের মধ্যে দুঃসহ অতীতকে বাধ্য হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছি, সেই দিনগুলোতে মোক্ষদার মত সহধর্ম্মিণী আমার বাধ্য হয়ে কুটিল চলার পথকে তার অসীম ধৈর্য্যের, অনন্ত অপার সহ্য শক্তির আলোয় আলোকিত করে রেখেছিল। অতীতকে স্মরণ করতে গেলে এটা তো ঘটনা, এটা তো চিরসত্য যে মোক্ষদাকে বিয়ের পর থেকে দেহ ছাড়ার দিন পর্য্যন্ত দেনাপাওনার হিসাব মেলাতে গেলে আমাকে অকুন্ঠ চিত্তে স্বীকার করতে হবে সে শুধু নিজেকে আমার জন্য বিলিয়ে গেছে আমি নিয়েছি, সে আত্মোৎসর্গ করেছে, ত্যাগ করেছে, অপরের আত্মিক উন্নতিতে নিজের সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছে জাগতিক কামনা বাসনার টুঁটি চেপে নিজেকে বঞ্চনার শিকার করে, ইচ্ছা করে কাপড়, গহনা, শাড়ি বাপের বাড়ির মধ্যে ছল করে ঢুকে থেকে তার মধ্যে দিয়ে সব কামনার ইতি ঘটিয়ে, আপাত সুখী সেজে অপরকে বা অন্যদের সারাজীবন সুখী করেছে। এটা তো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে রোগশয্যায় যন্ত্রণাকাতর কোন মুমূর্ষুও যদি কারও স্পর্শ পেয়ে, কাউকে পাশে পেয়ে চিরদিনের জন্য পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত্তে নিজের রোগ যন্ত্রণার ব্যথা ক্ষণেকের জন্য

ভুলে যেতে চায়, পরমাত্মীয়ের ক্ষণিকের সান্ত্বনা, ক্ষণিকের স্পর্শ, ক্ষণিকের সহানুভূতি যদি তার অনন্তের পথে একটু শান্তি আনতে পারে সেটুকু তার নায্য প্রাপ্য। কুমতির প্রভাবে আমি তার সে প্রাপ্যটুকুও সেদিন দিতে পারিনি। তবে এটুকু সান্ত্বনা, চিরদিন তো তোমাকে স্মরণ করেছি, হয়ত অবিচ্ছেদে পারিনি। কিন্তু স্মরণ মনন তো বন্ধ ছিল না। রোগীর সেবা করিনি কিন্তু স্থির বিশ্বাস, তোমার সেবা করেছি। তাই কখনও যা কল্পনাও করিনি সেই অকল্পনীয় ব্যপার ঘটার পরেও আজ মনে করি যে সবই আমার কর্ম্মফল। এমনটাই হয়ত ঘটে, সবদিক রক্ষা হয় না। কাউকে কোন দোষারোপ করি না, কাউকে দায়ী করি না, কারও 'পরে কোন অভিমান অভিযোগ রাখি না। ক্রিয়া করে তোমার অনেক লীলা দেখেছি। ঠাকুর অনুভবে বুঝিয়েছ সবেতেই তোমার পরশ আছে। স্থল, জল, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষ, লতায়, গুল্মে, কীট পতঙ্গ হতে মানুষের সমস্ত কাজ কর্ম্মে, তার অন্তরে, তোমারই স্পর্শে সব কিছু প্রাণময় হয়ে আছে। তাই আমার জাগতিক লীলা সঙ্গিনী, আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্যকারিণী, মুক্তি পথে চলার আলোকদায়িনী মোক্ষদার জীবন ইতিহাস আমার হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো নিয়ে ফুটে উঠুক, আর তোমার মধুর স্পর্শে তার অমর আত্মার সদ্‌গতি হোক। তোমার জয় হোক।

****

পরম পূজনীয়া মা ওঁ হাসি ভট্টাচার্য্য

অষ্টম অধ্যায়

☞ চাকুরী ক্ষেত্রের কিছু ছবি ও তৃতীয় ক্রিয়াপ্রাপ্তির ঘোষণা

দ্বিতীয় ক্রিয়ার দুইশত সংখ্যা পূরণ করার সাথে সাথেই বাবা বললেন, "আরও কিছুদিন ক্রিয়াটা কর দেখি - দেখি বাবারা কি করেন।" আগেই বলেছি যে ক্রিয়া করে এত নেশা হোত যে অফিসে গিয়ে কাজ কর্ম্ম করাই অসুবিধা হোত। কিন্তু এটা অবশ্য সত্য যে ক্রিয়া করলে নেশার অনুভব হয় আর সেই অবস্থা নিজবোধগম্য, যার হয় সে বোঝে, অপরকে বোঝান যায় না। আমার নেশা হোত তাই লিখলাম। অফিসে কাজকর্ম্ম করার অসুবিধা সত্য সত্যই হোত। কোন মিথ্যা বলছি না, তবে আমার সহকর্ম্মী দাদারা অত্যন্ত ভালবাসতেন আমাকে, তাঁরা সব কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক করে দিতেন। ভুল ত্রুটি হলে অত্যন্ত ভালবাসা দিয়ে সব সময় প্রায় বলা যায় বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধরে দিতেন। নইলে চাকরী রাখা যেত নাকি ? অসম্ভব ব্যাপার। আমার এক দাদা তো আমাকে 'ঢোঁড়া' বলে ডাকত। কেননা আমি তখন ক্যাশে কাজ করি। যেখানে কাজ করতে স্কুল ফাইনাল পাশেরও দরকার হোত না সেখানে আমি তখন ইনটারমিডিয়েট পাশ করেছি অর্থাৎ ওদের থেকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বেশী। শরীর স্বাস্থ্যও ওদের থেকে অনেক ভাল। কাজ জানিনে তাও নয় কিন্তু কি জানি কেন বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে 'ঢোঁড়া' সাপ হয়ে যেতাম। তাই ও দাদা আদরছলে ঢোঁড়া বলে সস্নেহ তিরস্কার করত। আমার কিন্তু দারুণ আনন্দই হোত আর আমার চাকুরী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ সুবিধাটা আমি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে এসেছি। এ শুধু বাবার অসীম করুণায় সম্ভব হয়েছে নইলে সাধারণ ভাবে সহকর্ম্মীর জন্য এত দরদ স্থূল জগতে কে কবে কোথায় দেখেছে ? অফিসে তখন প্রচন্ড কাজের চাপ, এত চাপ যে বলা যায় না। আর ঐ চাপের মধ্যে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে হোত তাহলে বাবার

হুকুম মত চলা সম্ভব হোত না। কারণ বেলা দুটোর অনেক আগে অফিস থেকে বারো মাস ৩৬৫ দিন, কে আমাকে অফিস থেকে ছেড়ে দেবে? সম্ভব নয়। কিন্তু ওদিকে বেলা ২টার মধ্যে আমাকে বাবার বাড়ী পৌঁছতেই হবে, কোন উপায় নেই - শাঁখের করাত অবস্থা। একদিকে চাকরী করছি ক্যাশে, হাজার হাজার টাকার হিসেব নিকেশ। সেই সমস্ত ফেলে ২টার আগে অফিস পালান মানে নির্ঘাত চাকুরী যাবে আর ওদিকে ২টার মধ্যে যদি বাবার কাছে না পৌঁছাই তাহলে বাঘের পেটে যেতে হবে। কি যে দোটানা অবস্থা সে একমাত্র ভুক্তভোগীই বুঝবে। আমি তাই মরি তো বাঘের পেটেই মরব ভেবে যখন খুশী অফিস থেকে বের হয়ে পড়তাম। আর দাদারা আমার সেই সমস্ত কাজ, হিসেব পত্র, টাকা কড়ির এডজ্যাস্টমেন্ট অম্লান বদনে, হাসি মুখে দায়িত্ব নিয়ে করে দিয়ে, সুযোগ করে দিত আমার আত্মিক পথের যাওয়ার, অগ্রগতি এনে দিত আমার আরাধ্য দেবতার চরণ বন্দনার সুযোগ। নিত্য রোগী কেউ দেখে না। নিত্য অফিস পালানো সহকর্ম্মীর কাজ স্থূল জগতে নিত্য নিত্য কোন সহকর্ম্মীর করাও সম্ভব নয়। কিন্তু এই অনিত্য জগতে আমার ক্ষেত্রে এটা নিত্যই ঘটত, ঘটেছে, ঘটিয়েছেন কেউ। তাই বলছি গুরুদেবের কৃপাতেই এই অসম্ভব ব্যাপার নিত্য সম্ভব হয়েছে। এঁরা তো অঘটন ঘটন পটিয়সী না?

অফিসে তখন রোজ ওভারটাইম চলছে ৪ঘন্টা করে। কাজের এত চাপ। আমি? দুর! দূর! অফিস টাইমেই কাজ করি না তো আবার ওভারটাইম? সম্ভব নাকি? টিফিন হলো কি ব্যস! অফিসারের সাথে রোজ ঝগড়া। রোজ রোজ। একদিন তো সোজা বলেই ফেললাম, "এটা কি হিটলারের রাজত্ব নাকি যে থাকতে হবে? আমি থাকব না - যা পারেন করবেন।" থাকিওনি কোনদিন, থাকাতে পারেওনি কোনদিন। অবশ্য এতে কিন্তু প্রতিদিন আমার দিলীপদার সাহায্যের হাত থাকতই। দিলীপদা আমার চিরকাই রোগা কিন্তু ঐ রোগা লোকটার হাত দিয়ে কি অসাধারণ গুরুকৃপা যে এসেছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

গুরুকৃপায় অফিসে সকলেই আমায় ভালবাসত। গুরুকৃপায় সেই ভালবাসার প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা বলছি।

আমি খুব দ্রুত কাজ করতে পারতাম। হুড় হুড় করে কাজ করতাম আর হুড় হুড় করে ভুলও করতাম। ভুল আমার নিত্যকার সঙ্গী বললে ভুল বলা হবে না। একদিন অফিসার বল্লেন, "আপনি কি করে এত ভুল করেন? কোথায় মন থাকে আপনার?" কোন কথা নয় খুব গম্ভীর ভাবে বলে উঠলাম, "আপনারা আমায় কি ভাবেন বলুন তো, মানুষ না জানোয়ার? এ্যাঁ?" অফিসার তো হতবাক্। একি রে বাবা? অন্যায় করে আবার চোটপাট? থতমত খেয়ে বল্লেন, "এ কি বলছেন কি? আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, কি কথায় কি বলছেন?" আমি বললাম, "ভদ্রলোক কিনা জানি না তবে সত্য সত্যই যদি আমায় মানুষ মনে করেন তাহলে ভুল আমার হবেই আর সেটা আপনাদের মেনেও নিতে হবে কারণ মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, হবে, হয়েছে - এটা প্রবাদ বাক্য। আর ভুল হয়না জন্তু জানোয়ার আর শয়তানের।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল। হাসবে না? কারণ আমি প্রমাণ দিলাম যে আমিই মানুষ। যেহেতু মানুষের ভুল হয় আর ভুল হয় না যাদের তারা - - - । অর্থাৎ ঐ অফিসারটি কি দাঁড়াল আমার চোখে? এই রকম সব চলত।

একদিন একজন অফিসার বললেন, "বিষ্টুবাবু, একটা কথা বলছিলাম যদি কিছু মনে না করেন।" আরে না না, কিছু মনে করব না, বলুন — আমি বললাম। অফিসার বললেন, "না মানে ইয়ে- - " খুব সঙ্কুচিত হচ্ছেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলুন কিছু মনে করব না, বিশ্বাস করুন।" "বলছিলাম কি," অফিসার বললেন, "বলছিলাম কি আজ আপনি সকাল সকাল অফিস ফেরৎ বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। একটু অসুস্থমত মনে হচ্ছে।" কই না তো আমি তো দিব্যি সুস্থ রয়েছি - বিশ্বাস করুন,

এতটুকু অসুস্থ নই আমি — আমি বললাম। অফিসার বললেন, "না না, সেরকম নয় তবে মানে ইয়ে, কিছু মনে করবেন না, আজ একটু বেশী মাল টেনেছেন বলে বলছি। ব্যাপারটা বুঝে হো হো করে হেসে বললাম, "ও রকম তো রোজই টানি তবে হ্যাঁ আজ বোধহয় একটু বেশীই হয়ে গেছে। আপনি ঠিকই বলেছেন।" অফিসার তো হতবাক্। আমিও আর বেশী না ঘাঁটিয়ে টুকটুক করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ক্রিয়ার নেশা সেইদিন অফিসারেরও চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল অবশ্য অন্যরূপে।

পাঠক সহজেই এ সমস্ত ঘটনা থেকে মনেই করতে পারেন যে তখন আমি একটু গায়ের জোরেই চলতাম। হ্যাঁ চলতামও, কারণ আমার মনে হোত আমি তো বাবার হুকুমেই চলি তবে আর কি? ক্রিয়া তখন আমাকে এত অভিভূত করে রেখেছে যে ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন চিন্তাও আমার মনে স্থানই পেত না। একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে অর্থের উপর লোভ ছিল না — যদিও তখন অর্থের প্রয়োজন ছিল। নারীদেহ আমার মনকে টানতে পারত না যদিও নারী লোলুপতা মনে একেবারেই ছিল না একথা হলফ করে বলা যাবে না। কিন্তু এখন যেমন ট্রেনে, বাসে, ট্রামে ছেলেরা, এমন কি বয়স্ক প্রৌঢ়ও সুযোগ পেলে কায়দা করে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের দেহটাকে একবার কোন নারীদেহকে একটু ওরইমধ্যে অন্যের চোখে না পড়ে এমনভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে বা একটু জোর করে চেপে ধরার ভদ্রভঙ্গী করে, ছোটবেলায় মা বাপের শাসন ও শিক্ষায়ই হোক বা উপদেশেই হোক, ও রকম কাঙালপনা স্বভাব আমাদের ছিল না। মনেও হোত না, ঐসব ব্যাপারে আমরা প্রায় উদাসীন ছিলাম। এই উদাসীনতাই তো ক্রিয়া করার আসল লক্ষ্য, এই উদাসীনতার কথা এলেই তাই আর এক উদাসীনার কথা আপনিই মনে পড়ে যায়। সেও তো এমনই উদাসীন ছিল - উদাসীনা ছিল আমার প্রতি সংসারের সব রকম প্রলোভনের প্রতি - তার নায্য

পাওনা, হক পাওনার প্রতি সে এমন উদাসীনা নারী ছিল বলেই তো ক্রিয়া করতে পেরেছিলাম - তাই ক্রিয়ার কোনরূপ সাহায্য, কারও অনুপ্রেরণা কারও অবদানের কথা অবশ্য গুরুদেব ছাড়া লিখতে গেলেই যা সর্ব্বাগ্রে আমাকে স্মরণ করায় তার অতীত ইতিহাসের কথা, তার চরম উদাসীনতার কথা আর তাই আজ যখন পিছনের দিকে তাকিয়ে ক্রিয়ার কথা লিখতে যাই, আপনিই লেখনীতে চলে আসে তার কথা - যেন তার প্রতি পূর্ব্বেকার সেই ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা বা বঞ্চনা আমার লেখনীকে চেপে ধরে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করায়। সে ছিল সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। পুকুর চুরিও নয়, পকেট থেকে ২/৪ টাকা ছিচকে চুরি করার জন্য আমার কাছে গালমন্দ খেলেও গায়েই মাখত না। ক্রিয়া করতে বসে জিভের কাজ করতে করতেই ঘুমোচ্ছে। ধমক দিয়েছি তো প্রাণখোলা হাসি হেসে বলত, "তুমি তো অতো ক্রিয়া কর - ওতেই হবে। এ এক অসাধারণ ভাব। হাসির কোন স্থান কাল পাত্র ছিল না। নামের সাথে কাজের এক অপূর্ব্ব মিল। সন্তান ছিল না বলে কোন খেদ নেই, অপমান সূচক কথা বলে দেখেছি, ঘায়েল করা যায়নি। সংসারের ঝুট ঝামেলাতে নেই, অহংকার নেই, সাংসারিক আসক্তি নেই, সবেতেই নির্ব্বিকার অনাসক্ত ভাব। এ এক অসাধারণ সংস্কার। ক্রিয়া করাতে যা যা উদ্দেশ্য সে তো সব নিয়েই জন্মে ছিল - আমি তো তার মূল্যায়নই করতে পারিনি সেদিন। তাই মোক্ষদা নামটা অনেকের কাছে সেদিন বিদ্রূপের খোরাক হলেও আজ মনে হয় নামটা নির্ভুল দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র গুরুদেবই এর মূল্য দেবেন এই প্রার্থনা জানাই। দেহ থাকতে শেষের দিকে ভালকথা তার ভাগ্যে জোটেনি- জুটেছে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অবহেলা, রোগশয্যায়ও সহানুভূতি সান্ত্বনার বদলে পেয়েছে উপেক্ষা আর ব্যঙ্গোক্তি, এমন কি দেহান্তরের পরেও তাকে আমরা অনেকে অনেক কিছু যখন বলছি - উদাসীনতার মোড়কে নিজেকে ঢেকে রেখে দূরস্থিত কোন জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য থেকে সে তো বলতে পারে "তোমাদের সামনে আছে অখন্ড আত্মসমীক্ষার

সময়, আত্মসমীক্ষা করো, রেখে এসেছি অনন্ত স্মৃতিচর্চ্চার খোরাক স্মৃতিচর্চ্চা করো, ফেলে এসেছি অনেক হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত্তের লাঞ্ছনার বঞ্চনার, মিথ্যা অহংবোধের ছবি অনেক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অত্যাচারের দলিল। পাতা খুলে দেখ। মন তাই আজ অব্যক্ত যন্ত্রণায় পিছনে তাকালেই যেন বলতে চায় "তোমার কাছে সত্যই ঋণী, তোমার অবদান ভোলার নয়, ভোলা যায় না।"

ভোলা যায় না আমার ক্রিয়ার জগতে আরও একজনের অবদানের কথা, যার নিষ্পাপ মন ও নিস্পৃহতার কথা চিরকাল মনে করার কথা। সে আমার দিলীপদা। অমন অন্তরঙ্গতা বাবা ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার ছিল না, আজও নেই। অমন জন্ম জন্মান্তরের আপনজন বলে আর কাউকে মনে হয়না। জীবনে নিজের চর্চ্চা ছাড়া, নিজের দোষ দেখা ছাড়া, নিজেকে ছোট করে দেখা ছাড়া, কখনও অপরের চর্চ্চা করতে, দোষ দেখতে, ছোট ভাবতে দেখলাম না। বাবা বলতেন ক্ষণজন্মা পুরুষ, আরও অনেক বিশেষণ বলতেন। আমার ক্রিয়ার জগতে তার অবদান ভোলার নয় বিনিময়ে সে চায়নি কিছুই। শরীরের অপটুতা তাকে কাবু করে রেখেছে। অমন মনপ্রাণ, অমন উদারতা দেখিনি। বাবা যেন তার মঙ্গল করেন।

☞ আমার তৃতীয় ক্রিয়াপ্রাপ্তি ও ক্রিয়ার অনুভূতি

আগেই বলেছি যে দ্বিতীয় ক্রিয়া সমাপ্তির কিছুদিনের মধ্যেই বাবা ঘোষণা করলেন, বাবা যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তোমাকে তৃতীয় সোপানের ক্রিয়াটা দিতে হবে। ভয়ানক কঠিন ক্রিয়া। একে সমুদ্র মন্থনের ক্রিয়াও বলা যায়। সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে একে সমাধা করতে হবে। আর এই ক্রিয়ায় সাড়ে ৩/৪ মিনিট স্থিতি দেখাতে পারলে তবে পরের সোপানের ক্রিয়া পাওয়া যায় বা যোগ্যতা অর্জ্জন

করা যায়। সময় লাগে, সহজে কেউই এই সোপান অতিক্রম করতে পারে না। আগেও আমি এই ক্রিয়ার বিভীষিকার কথা অনেক শুনেছি- আবার বাবাও এই কথা বললেন। আমার ভেতরে তখন মনে হোল, "পাইতো আগে তারপর দেখা যাবে কি করে তোমার কৃপা আদায় করা যায়। কৃপা মানে তো করে পাওয়া।" মনটা এই সব কথা যত শুনতাম ততই কঠিন হোত - ভেতরে ভেতরে একটা জেদ গর্জ্জন করতে লাগল। গুরুদাদাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বললেন, "আমরা তো পেয়েছি - দেখেছি তো আমরা — ভয়ানক কঠিন ক্রিয়া, এই ক্রিয়া করতে করতে আমাদের কাপড় নষ্টও হয়ে গেছে।" সব শুনলাম কিন্তু আমার ভিতরে কে যেন বলছে "আরে ধ্যেৎ! বাদ দে ত ওসব কথা! এরা ক্রিয়ার কৌশলটাই জানে না। ওরা ভয় দেখাচ্ছে নিজেরা ঠিক ঠিক জানে না তাই। ক্রিয়া কি গায়ের জোর নাকি? ক্রিয়া তো কৌশল। প্রথম প্রাণায়ামই হল শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সঠিক স্থিরত্ব এলে ও রকম হবে কেন?" অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপদাকেও এ কথা বলতাম। বলতাম দিলীপদা "এরা স্থিরত্ব কাকে বলে জানে না।" বাবা বলতেন প্রথম প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ - ওটাই হোল ডাল, ভাত। অন্যান্য ক্রিয়া অর্থাৎ উপরের যত ক্রিয়া, সব হোল আনুসঙ্গিক উপকরণ অর্থাৎ নানা রকমের ব্যঞ্জন। শুধু মাত্র ডাল, ভাত খেয়ে, অন্যান্য কিছু না থাকলেও যেমন জীবন ধারণ করা যায়, এমন কি দেহের পুষ্টিও হয়, এও ঠিক তাই। আর তার প্রমাণ আমি তো নিজেই। ছোট বেলায় যখন ব্যায়াম করতাম, তা ধরুন দু বারে অন্ততঃ চার ঘণ্টার কম নয়, তখন কি খেতে পেয়েছি? শুধু তো ডাল ভাতই পেটপুরে খেয়েছি। অবশ্য প্রচুর পরিমাণে খেতে গিয়ে অনেক সময় মায়ের হাতে চেলা কাঠের পিটুনিও যে কত খেয়েছি - বৌদি, দিদি সব খাওয়ার ঠ্যালায় হাঁপিয়ে উঠতো। সকাল, দুপুর, রাত্রি তিনবার তো ডাল ভাত খেতামই আবার বাবা-মায়ের পাতে প্রসাদের নাম করে আর একবার মোট ৪বার এই ডাল, ভাতই তো খেয়েছি। এমন কি পৈতে হবার পরেও খেয়েছি। তা এই ডাল ভাতের গুণেই

তো শরীরটা অমন শক্ত পোক্ত হয়েছিল - শরীরে শক্তিও ছিল প্রচুর - সবই তো ডাল ভাতের গুণেই। তাই যে যাই বলুক গুরুবাবার কথাটাই বিশ্বাস করেছিলাম যে ক্রিয়ার জগতে প্রথম প্রাণায়ামই আসল। যখন তৃতীয় ক্রিয়া পাচ্ছি সেই সময় দুবেলায় প্রথম প্রাণায়াম করছি দুবারে ছয়শো। পরে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এ সেটা আটশোতে উঠেছিল। বাবা বলতেন প্রথম প্রাণায়াম যত খুশী করবে। তার ফলও হাতে হাতে পেয়েছি। ক্রিয়ার ভেতরে এত ঐশ্বর্য্য আছে কেউ ধারণাই করতে পারে না। যদি আন্তরিকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠান কেউ করতে পারে তবে ফল হতে বাধ্য। ক্রিয়া কখনও কাউকে ঠকায় না। **ক্রিয়াকে ভালবাসলে ক্রিয়াও ভালবাসবেই। ক্রিয়া কখনও পাওনা গন্ডা বাকী রাখে না। নিষ্কামভাবে তার সেবা করলে তার অদেয় কিছুই নেই।** তবে কামনা বাসনা নিয়ে ক্রিয়া করলে ঠকতেই হবে। সামান্য আনন্দ সামান্য তৃপ্তিও পাওয়া যায় না। আমার তাই ওদের ওই সব কথা যত শুনতাম, বিশ্বাসই হোত না যে ক্রিয়া করতে গিয়ে কাপড় নষ্ট হয়। ভাবতাম চক্রে চক্রে ঠিকমত মন্ত্র যদি স্মরণ করে ক্রিয়া করা যায় তাহলে মনে তো কোন দৌরাত্ম্য থাকার কথাই নয়। স্থিরত্ব আসতে বাধ্য। মনে মনে গজরাতে লাগলাম, "একবার পাই আগে, তারপর দেখব গুরুকৃপা আসে কিনা?" (কৃপা মানে তো করে পাওয়া) তা ক্রিয়া করেই কৃপা আদায় নেব। গুরু তো পিতামাতা উভয়েরই সমন্বয়। পিতা আমার না হয় নির্ব্বিকার ভোলানাথ কিন্তু মা কি মা হয়ে সন্তানের গ্লানি সহ্য করতে পারবে? কখনও নয়। তাই ভেবে ঠিক করলাম - "আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে?" নির্দ্দিষ্ট দিন এলে বাবা আমাকে অর্থাৎ এই অধমকে তৃতীয় সোপানের ক্রিয়া দান করলেন আর সেই দিনই আমিও মনে মনে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম। বাবার কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলাম, "হে দয়াল গুরু, তোমার কাছে আমি কিছু চাই না - প্রার্থনা শুধু এইটুকু যে যেন তোমার সেবাটা যে কোন প্রকারে আমি ঠিক ঠিক করতে পারি -

এতে যেন কৃপা করে আমায় নিরাশ করো না। আমি বড়ই অকৃতী অধম সন্তান তোমার, অজ্ঞান, অবোধ দয়া করে এটুকু দেখো যেন তোমার সেবায় তোমাকে তুষ্ট করতে পারি, তোমার মান সম্মান আমার দ্বারা যেন খর্ব্ব না হয়, নষ্ট না হয়। যেন তোমার এক অক্ষম দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি, কোন নাম যশের প্রত্যাশা না থাকে, কোন কামনা বাসনা যেন না জাগে। তোমার কাছে মিনতি করছি তৃতীয় ক্রিয়ার ২০০ সংখ্যা যেদিন শেষ হবে সেদিন আমার স্থিরত্ব যেন ৫ মিনিটের কম না হয়। যদি হয়, তাহলে আমার এই দেহটা যেন তোমার ঐ ক্রিয়ার আসনেই পড়ে থাকে। উঠে তোমাকে মুখ না দেখায়।''

কারণ ৫ মিনিটে শেষ না হলে ৪ মিনিট স্থিরত্ব দেখানো তো যাবে না আর আমার অত সাহসই নেই যে বাবাকে সামনে বসিয়ে রেখে দ্বিতীয়বার ক্রিয়া করে দেখাব কেননা বাবা দেখবেনই বা কেন? আমার মনে হোত যে আমার চেয়ে কত ভাল ভাল ছেলে রয়েছে, বাবা তাদের কত ভালবাসেন আর তারাও এক একজন কত ভাল ক্রিয়া করে - তাদের তুলনায় আমি অতি নগণ্য। তাই ক্রিয়া পাওয়ার পর প্রতিদিনের প্রতি মূহুর্ত্তের চিন্তা হোতে লাগল কি ভাবে কেমন করে স্থিরত্ব বাড়ান যায়। এই ক্রিয়ার প্রতিকূলতার কথা যতই শুনি ব্যাকুলতাও ততই বাড়ে, জেদও চাপে তত বেশী। **আর সেই সময়টায় দিনরাতের হিসেবই ছিল না বলা যায়। রাত্রি ২টায় ক্রিয়ায় বসি, সকাল ৮টায় উঠি। কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজে ১ঘন্টার মধ্যে স্নান খাওয়া শেষ করে ট্রেন ধরে ১০টায় অফিস। অফিস থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বাবার বাড়ী, বাবার বাড়ী কাজকর্ম্ম সেরে, বাবাকে তামাক সেজে দিয়ে কোন কোন দিন বাড়ী ফিরতে ১১টা সাড়ে ১১টা হয়ে যেত। সেদিন বাবার আদেশেই অল্প ক্রিয়া করতাম নচেৎ অন্যদিন বাড়ী ফিরেই হাত মুখ ধুয়ে একটু সামান্য কিছু মুখে দিয়েই ক্রিয়ায় বসি। কারো সাথে কোনরকম কথা**

বলার সময়ই নেই - একমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনে দাদা ও মা ছাড়া। ক্রিয়া থেকে উঠেই খাওয়া, যদিও রাত্রে খুবই কম খেতাম। তারপর ১০টার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ১০টার খবর শুনতে শুনতেই ঘুম। তারপর রাত্রি ঠিক দুটোয় আবার উঠে আড়াইটার মধ্যে ক্রিয়ায় বসা - সকাল ৮টা পর্য্যন্ত। ওরই মধ্যে যেদিন রাত হতো ফিরতে, সেদিন ঢাকা দিয়ে রাখা দুটো শুকনো রুটি মুখে দিয়ে আর একটু দুধ খেয়ে শুতে শুতে রাত্রি ১২টা বাজত। এক থেকে দেড় ঘন্টা এপাশ ওপাশ করেই আবার দুটো থেকে ক্রিয়ায় বসার তোড়জোর চলত। বাবা কিন্তু ঠিক সময়ে রোজ ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। তখন প্রতিদিন বাবা জিজ্ঞাসা করতেন কখন ক্রিয়ায় বসেছি ও কখন উঠেছি। আমাকে ঘুম থেকে তোলাও যেন বাবার কাজ ছিল। কতদিন অনুভব করেছি জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। তবে ক্রিয়ায় বসে গেলে আর ঘুম আসতো না। কোন কোন দিন এমনই ওঁর দয়া আর কৃপাদৃষ্টি ছিল যে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারছেন না দেখে দুটো আঙুলের মাঝে জোর চিমটি কেটে দিয়েছেন। হাতে নখের দাগ পর্যন্ত দেখেছি। তাই বলছি, আমার যতটুকু ক্রিয়া হয়েছে সবই বাবার অসীম করুণাতে সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কৃপায় সব সম্ভব হয়েছে।

☞ তৃতীয় ক্রিয়ার বাধা ব্যাখ্যা ও অনুভূতি

এই তৃতীয় ক্রিয়ার ভিতরে এত ঐশ্বর্য্য আছে তার কোন ধারণাই ছিল না, কারও থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন যতক্ষণ না তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে ভেতরে ও বাইরে নিষ্কাম ভাব দরকার। যে দিন মনে এতটুকু কামনার ভাব জাগত সেই দিনটাই মাটি হয়ে যেত। এমন কি বাবার কাছে শুধু

মাত্র নির্ভেজাল প্রার্থনা জানিয়েছি, "বাবা! দয়া করো ক্রিয়াটা ভাল করে যেন করতে পারি দেখো।" ব্যস! সেই দিনই মাটি হয়ে যেত। শুধু মনটাকে স্থির করে গুরুদেবকে দেহমন অর্পণ করে বসেছি- বলেছি এবার তোমার ব্যাপার যেমন করাবে তেমন হবে ঠিক ঠিক হয়েছে। গুরু প্রণাম থেকেই গুরুতে মন দিয়ে প্রাণ ঢেলে ক্রিয়া করতে পারলে কোন চিন্তা নাই। একটা প্রাণায়ামও চক্রে চক্রে স্মরণ করা যাবে না যদি তাঁর করুণা না হয়। আমার অভিজ্ঞতা বলে - ভঙ্গি দিয়ে কোন কাজ হয় না - ভাবের গভীরতা চাই আর সেটা হবে নির্ভেজাল। এক কণা ভেজাল থাকতে তিনি আর ক্রিয়াতে থাকবেন না। **কতদিন বাবা আমার হয়ে ক্রিয়া নিজে করে দিয়েছেন। বাবার দিব্যি বলছি - এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না - এটা আমার খাঁটি সত্য বোধের কথা।** কোন কোনদিন দেখেছি আমার দেহটাই বাবার দেহ আবার কোনদিন দেখেছি বাবাই আমার ভিতরে বসে রয়েছেন এবং তিনিই ক্রিয়া করছেন। এ রকম দিনগুলোতে অভাবনীয় আনন্দ পেয়েছি এবং একরকম নেশাতে দেহটাকে যেন অবশ অচল করে দিয়েছেন। তিনি ক্রিয়া করেছেন আর ফসল উঠেছে এই অধম সন্তানের গোলায়। তিনি এত ভালবাসেন তাঁর এই গোঁয়াড় ছেলেটাকে।

☞ তৃতীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যা

তৃতীয় ক্রিয়ার সময় আমার কাছে বহুভাবে ঘটনা বহুল, কি ভাবে লেখনীতে আসবে তিনিই জানেন। কাম রিপু হচ্ছে ক্রিয়ার জগতে এই সাধন সমরে এক চিরন্তন শত্রু, দুর্দ্দমনীয় দুর্য্যোধন, এর মৃত্যু নেই। এ আত্মগোপন করে থাকে মাত্র। আচমকা আক্রমণ করে বল বুদ্ধি হরণ করে, চোরা গোপ্তা হানা দিয়ে বুদ্ধিভ্রম করতে সুনিপুণ। মেঘনাদ যেমন মেঘের আড়াল থেকে আক্রমণ করে জীবরূপী লক্ষ্মণকে হতবল করে ফেলেছিল এও সাধককে তাই

করে। নানারূপ ছদ্ম প্রলোভনে আকৃষ্ট করে সাধকের পতন ঘটায়। আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সাধনাটা মূলতঃ এই কামরূপী দুর্য্যোধন ও মনরূপী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ সহায় না থাকলে এই সমর বিজয় সম্ভব নয়। আর কিছু যদি নাও হয় অপমান লাঞ্ছনা ভাগ্যে জুটবেই। এই কামরিপু অতি সাংঘাতিক, সাধকের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বিবেক বুদ্ধি দিয়ে উপরে উপরে ঢাকা দিতে দিতে সাধক এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উপরে প্রকাশ না পেলেও মনটাকে এত চঞ্চল করে তোলে যে চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ হয় না - মন বসতেই চায় না, স্মরণে ভুল হয়, দর্শন হতে চায় না। সাধক সাধিকারা ভাবে এ কি ব্যাপার, কিছুতেই মন বসাতে পারছি না কেন? কারণ ঐ, একমাত্র কামনা, যেন বেনো জল ঢুকে ফসল নষ্ট করে দেয়। যেন বুনো হাতী ঢুকে ফসল খেয়ে ফেলে পাকা ধান নষ্ট করে। এমন কি একের পর এক বাধা বিঘ্ন এসে সমস্ত ক্রিয়াকে একেবারে শেষ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে সাধককে অধৈর্য্য হলে হবে না। তাকে মনে রাখতে হবে আমার জয় অনিবার্য্য, সাধনায় হতাশার কোন স্থান নেই। এই সংগ্রামে যুদ্ধের কৌশলগত ভাবে কখনও কখনও হয়ত পিছু হটতে হয় ঠিক, কিন্তু সেরূপ কামজয়ী পুরুষ/ রমণী হলে আবার প্রতিআক্রমণও ঘটাবে। মনে থাকে যেন-যে এই কামরূপী দুর্য্যোধন কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত থাকবে, থাকুক, সাধকের কিন্তু কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই কারণ শ্রীকৃষ্ণ সহায় রয়েছেন তাই ধর্ম্মের জয় হবেই। এই দুর্য্যোধন যদি না বাঁচত তাহলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠারদিন চলত না তার আগেই শেষ হয়ে যেতো আর মহাভারত আঠারটা খন্ডে বিভক্ত হোত না।

মানুষের দেহে পাঁচটা প্রধান তত্ত্ব আবার সবকটা মিলে একটা এবং প্রতি চক্রে তিনটে করে গুণ আর এই গুণ যতকাল থাকবে কামনা বেঁচে থাকবে, কামনা থাকলেই মনকে বেঁচে থাকতে হয় তাই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের শেষ দেখতেই হল।

এই তৃতীয় ক্রিয়া 'সমুদ্র মন্থনের ক্রিয়া' দেবাসুর সংগ্রামের ক্রিয়া। একদিকে ইন্দ্রিয়রূপী অসুরদল ও অন্যদিকে সাধকের দৈবীভাব এই দুয়ের লড়াই হল এই তৃতীয় ক্রিয়ার চিত্র। দেবতারা যেমন কৌশল করে দানবদের কাছ থেকে অমৃতভান্ড কেড়ে নিয়েছিল, তাদের হতবল করে চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিয়েছিল তাদের অমৃত হরণের ইচ্ছাকে, ঠিক সেইভাবে এই ক্রিয়াতেই মন ও ইন্দ্রিয়রূপী অসুরেরা চিরদিনের জন্য হতবল হয়ে যায়, মুছে যায় তাদের অমরত্বের সম্ভাবনা, চিরকালের অমরত্ব, অমৃতপান করে সাধক বিজয় মুকুট পরিধান করে। অতএব সাধক - মাভৈঃ ! কোমর বেঁধে লেগে পড়। এই গাঁট পার হতে পারলে তুমি চিরবিজয়ীর সম্মান পাবে ভবিষ্যতে আর কোন ভয় রইল না। অন্তিম সাধনার পথে আর কোন বাধা রইল না। যারা অত বিক্রম দেখিয়ে সারাজীবন তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটিয়ে অগ্রগতি রুদ্ধ করতে চেয়েছে তারা আজ হতবল, হতশ্রী, তারা তোমার পদানত, তোমার ইচ্ছাধীন দাসে পরিণত হবে, তুমি জয়ী হবে, অমরত্ব লাভের অধিকারী হবে জন্ম জন্মান্তরের জ্বালা ও দুঃখের অবসান হবে। খবরদার যেন রণে ভঙ্গ দিও না, এতটুকু হতাশ হয়ো না, শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহায়, তুমি শুধু কায়মনোবাক্যে গুরুর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করে, দাঁতে দাঁত চেপে যেমন করে হোক যুদ্ধ করে যাও। বিজয় রথের চক্রে মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে শত্রুদল বিপর্য্যস্ত হবে মথিত হবে - সব রকমের অস্ত্র তোমার বিক্রমে তাদের হাত থেকে খসে খসে পড়বে। তোমার অমিত তপস্যা প্রভাবে তাদের ভ্রুকুটি কুটিল ভয়াল মুখগুলো, যা তোমার চিরদিনের ভীতি উৎপাদন করে এসেছে সব ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণরূপী অজপা তোমার সহায় রয়েছেন, ভয় কি ? কিছু না হলেও স্বর্গবাস তোমার কেউ রুখতে পারবে না।

তৃতীয় ক্রিয়া তাই হৃদয় গ্রন্থি ভেদের ক্রিয়া, কর্ম্মাশয় নাশের ক্রিয়া, সংশয় নাশের ক্রিয়া। এই ক্রিয়ায় বিশ্বাস আসবে যে "আমি

কর্ত্তা নই অকর্ত্তা, কর্ত্তা তিনি। আমার এই দেহ অনিত্য, নিত্যসুন্দর তিনিই নিত্য, আমি আত্ম। দেহ নয়, আমি আত্মা মধুময়। আমার নাশ নেই আমি চিরন্তন। আমার রিপুদেরও নাশ নেই, তবে তারা হতবল। প্রতি চক্রে চক্রে নিবিষ্ট মনে মন্ত্র স্মরণ করে চল — একবার যদি অভ্যাস হয়ে যায়, একবার যদি অজপা সদয় হয়, তাহলে যেদিন সে দেহঘট ত্যাগ করে যাবে, সেদিন সে তোমাকে সিদ্ধ মুক্ত করে, তোমাকে জন্ম মৃত্যু রহিত করে চিরন্তন সঙ্গী করে নিয়ে যাবে। এই মন্ত্রটুকুই যেন দয়াময় বাবা আমাকে তৃতীয় ক্রিয়ায় দিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাই, আমিও ঐ ক্রিয়াতে মরণপণ করে লেগেছিলাম যুদ্ধজয়ের জন্য। তা নাহলে, পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাঁচব কি করে? আমার দ্বারা ক্রিয়ার যদি অমর্য্যাদা হয় তাহলে অতি লজ্জার কথা। অজপার গতিকে ফিরিয়ে যদি স্থির বায়ুতে মেলানো না যায় তাহলে কি অবস্থা হবে আমার? যদি কেউ পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন মন্দিরের শেষ পর্য্যন্ত স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়গুলোকে দেখান হয়েছে। শেষে একটা তারার মতো, তাতে একটা ফুটো, সেই নক্ষত্র ভেদ করে তবে পুরুষোত্তমের সাথে মিলতে হয়। নক্ষত্র ভেদ হলে তবে সুষুম্নার দ্বার দেখা যায়। সেই সুষুম্নায় প্রবেশ করলে তখন জগন্নাথ দর্শন হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যা বোধ করেছি তা হোল প্রথম ক্রিয়া দেহক্ষেত্রকে শোধন করে আবাদ করে, যত আগাছা, যত জন্ম জন্মান্তরের জমা আবর্জ্জনা সব পরিষ্কার করে। তবে চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ না হলে স্থির বায়ুর জন্ম হবে না এবং শোধনও হবে না। প্রথম ক্রিয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে পাওয়ার কথা, প্রথম ক্রিয়াতেই প্রত্যাহার, প্রথম ক্রিয়াতেই ধারণা, ধ্যান সব অবস্থা পাওয়ার কথা, ইহকালের সব কাজ শেষ হয়ে শূন্য তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার কথা। বাবা বলতেন,"আকাশ প্রকাশিলে প্রকাশিবে সব, আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।" বাবা আমাকে প্রায়ই শোনাতেন "প্রথম ক্রিয়ার মধ্যেই সব কটা ক্রিয়া আছে। প্রথম ক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ। আমিও অন্তর দিয়ে বুঝেছি প্রথম ক্রিয়া ঠিক না হলে

উচ্চতর সোপানের ক্রিয়াগুলো খোলে না। আর একটা কথা বুঝেছি, ক্রিয়া করার চাইতে বাবার আদেশ পালন করলে অনেক বেশী আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে। তাই ক্রিয়া করতে তো ভালবাসতামই, বাবার আদেশ পালন করতে পারলে বেশী আনন্দ পেতাম। যাই হোক বাবা ক্রিয়া পাওয়ার সময়কার প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছিলেন - ক্রিয়ার স্থিতিও যথাযথ তো হয়েছিল বটেই। বাড়িয়ে বলছি না, দয়াল বাবা তাঁর নিজ মুখে তাঁর তৃতীয় ক্রিয়া করা কালীন স্থিতির সঙ্গে আমার স্থিতি প্রাপ্তির তুলনা করে প্রশংসা ও উৎসাহ দানের জন্যই হয়ত হবে কিন্তু সত্যই বলেছিলেন যে "আমিও বিষ্টুর মত তৃতীয় ক্রিয়ায় অত সহজে স্থিতি দেখাতে পারিনি।" বাবাকে বলেছিলাম "বাবা তৃতীয় ক্রিয়া, ক্রিয়া যোগের রাজতোরণ, এটা অতিক্রম করতে পারলেই রাজবাড়ীতে প্রবেশের বোধহয় আর কোন বাধা থাকে না এই আমার বিশ্বাস। রাজদর্শনও কেউ আর আটকাতে পারবে না।" বাবা সস্নেহে আমার কথাগুলো সমর্থন করেছিলেন। সত্যি বলছি এখনও বিশ্বাস করি যে কেউ যদি খেটে খুটে তৃতীয় ক্রিয়ার গাঁট ভাল ভাবে পার হতে পারে তাহলে আর কোন চিন্তা নেই। উপরের ক্রিয়া প্রাপ্তি হোক বা না হোক। অবশ্য গুরুকৃপা পাওয়া চাই-ই নচেৎ সবই জলে যাবে। তাই গুরুকে সর্ব্বদা হৃদয় আসনে বসিয়ে রেখে অবিরত কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করে ঠিক ঠিক চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ করে ক্রিয়া করে গেলে নিষ্ঠাবান ক্রিয়ান্বিত হওয়া যায় - জীবন সফলতায় ভরে ওঠে বলে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস।

☞ মোহন্ত গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও লীলা রহস্য

ক্রিয়াতে গুরুর প্রতি অবিশ্বাস আসলে অগ্রগতির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে একথা বলাই বাহুল্য। এমন কি অনিবার্য্য শাস্তিও

নেমে আসতে পারে। তাই সাধক সাধিকার একান্ত ভাবে মনে রাখা উচিত গুরুর মত এত দয়ালু ও ক্ষমাশীল আর কেউ নেই। গুরুতে ও গুরুবাক্যে অবিচল বিশ্বাস রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই। তিনি পরীক্ষা করবেন, শাসন করবেন, কিন্তু ধ্বংস কখনও করবেন না। সবই করবেন আমারই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু আমরা অন্ধ, আমরা অধিকাংশই মর্কট ভক্তিতে ভক্তিমান বলে তাঁর মহিমা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে না। গুরুতে ঈশ্বর জ্ঞান হলে তার বেশী ক্রিয়া করার দরকার নেই - দরকার হয় না। কারণ তখন আপনা আপনি প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্র স্মরণ হয়ে ক্রিয়া আপনিই হতে থাকে। ক্রিয়া করে বুঁদ হয়ে যেতে হয়। গুরুগত প্রাণ না হলে ক্রিয়া হয় না।

☞ মোহন্ত গুরুর লীলা প্রসঙ্গে

ক্রিয়া তো আমি করি না করেন গুরুদেব। এ আমার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। শুধু সত্য নয়, এত বড় সত্য আর নেই। তাই মোহন্ত গুরুর লীলা যেমন যেমন দেখেছি তার দু একটা ঘটনা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ক্রিয়ার সব চাইতে বড় শত্রু হল কাম। এই কামরিপু যে দুর্যোধন আগেই বলেছি। এ মরে না, হৃত বল হয়ে থাকে আবার মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে গেরিলা আক্রমণ করে। তখন পারের কান্ডারী গুরুদেব ছাড়া আর কেউ থাকে না। এই মহারিপুর দংশন দুর্ব্বিসহ। এ সমস্ত যোগ বিঘ্নকারী অবস্থা থেকে সে সময় কে রক্ষা করবে সাধককে? আর গুরুর মত ক্ষমাশীলই বা কে আছে? বাবা মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, পীড়ন করেন তারই মঙ্গলের জন্য আর সে সময় যদি সন্তান সেই বাবা মাকেই জড়িয়ে ধরে কাঁদে, ভিক্ষা চায় মুক্তির জন্য - বাবা মা কি সেই সন্তানকে আর পীড়ন করতে পারে? জাগতিক পিতামাতাই যদি এত স্নেহশীল ও দয়ালু হতে পারে, বিশ্বের

পিতামাতার স্নেহ বক্ষে নিয়ে সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা তাহলে কত দয়ালু, কত ক্ষমাশীল পাঠক অনুমান করুন।

ক্রিয়া পাওয়ার পরে পরেই একটা ঘটনার কথা আজও মনে আছে। তখন আমরা মা ও তিনভাই একটা ঘরে থাকি। দুপুর রাত্রে উঠে আমি ক্রিয়া করার জন্য চিলে ঘরে চলে যেতাম। ঐ ঘরে মা রান্না করতেন আর নারায়ণের পূজা হোত। ঐ নারায়ণ পূজা প্রথম প্রথম আমিই করতাম - এখন দাদা করেন। রাত তখন প্রায় তিনটে বেজেছে। ক্রিয়া করার জন্য উঠে পড়েছি। মুখ হাত ধুয়ে চিলের ঘরে ক্রিয়া করতে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, কয়েকটা ধাপ পার হতেই দেখি সিঁড়ির চাতালে এক কৃষ্ণকায় নবযৌবন সম্পন্না নগ্নপ্রায় নারী শুয়ে আছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ বলা যায়। অবাক হয়ে দেখি আমাদের বাড়ীরই ঝিয়ের মেয়ে। আমার বয়স তখন ৩০/৩২ হবে, বিয়েও হয়নি। ঐ দৃশ্য দেখে রক্তে আগুন ধরার কথা। কথায় বলে বয়েস কালে পথের কুকুরীটাকেও দেখতে ভাল লাগে। একে আমি যুবক - অবিবাহিত, স্থান নির্জ্জন ঘরের নিভৃত কোণ, সময় রাত্রি, আর পাত্রী উদ্দাম কামনার জ্বলন্ত আগুন, পরিবেশ নগ্ন। এ পরিস্থিতি ভোগের সম্পূর্ণ অনুকূল এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার কিন্তু এ দৃশ্য দেখে প্রচন্ড বিরক্তি এল। কোন বিকার অনুভব তো করলামই না, সাথে সাথে নীচে নেমে এসে মাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। মা এসে ওকে ডেকে নিয়ে নীচে গেল, আর আমিও আমার গুরুদেবের অসীম কৃপায় চরম অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেলাম। দয়াল গুরুদেব দয়া করে কামনা বাসনা না এনে বিনিময়ে আমার তরুণ মনে কাঙ্খিত বিবেকের পরশ দিয়ে অধমকে সেদিনের সঙ্কটময় মূহুর্ত্ত থেকে রক্ষা করে দিলেন। তাই বলছিলাম মোহন্ত গুরুর মহিমা বোঝা ভার। একা একা থাকলে যদিও কখনও কোনরূপ বিকার আসত কিন্তু বাস্তবে কোন কামনা বাসনার বিপাকে ধরা পড়তে গেলেই চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে যেত। অবশ্য

আমার শরীর স্বাস্থ্য এত ভাল থাকার জন্য ঈর্ষার বস্তু বলে অপরের কাছে গণ্য হলেও কারো কারো মনে হয়ত আবার দোলাও দিত নিশ্চয়ই। আর তার প্রমাণ যে একটু আধটু কখনও পাইনি এমনও নয়। কিন্তু হলে কি হবে - আমাকে কোনদিন কোন গ্লানি স্পর্শ করতেই পারেনি। কারণ গুরুদেব তো দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছেন। আমার মধ্যে একটা ধারণাই জন্মেছিল যে আমার ইন্দ্রিয় বোধ বিজিত। অবশ্য এই ধারণাটা পরে আমার ক্ষতি করেছে সে কথা বারান্তরে পাঠক জানতে পারবেন।

☞ মোহন্ত গুরুর পরীক্ষা

দয়াময় গুরুদেবের কত লীলা যে দেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। গুরুদেব মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন, দেখেন যে তাঁর প্রতি শিষ্যের বিশ্বাসের ভিত কতখানি অটুট আছে। তখন তিনি কিন্তু নিজেই শিষ্যের বিশ্বাস তাঁর প্রতি একটু ঢিলে করে দেন। ওঃ! সে কি দুঃসহ অবস্থা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বোঝে না। কি করুণ ! কি দেউলিয়া অবস্থা তখন যে ঘটে তা বলার নয়। অবশ্য কৃপাময় গুরুদেব আবার নিজগুণেই টেনে রাখেন, সব কিছু ক্ষণেকের খেলা খেলে নিজেই আবার সবকিছু সামাল দেন। নচেৎ শিষ্যের অত শক্তি কি করে হবে? তাই বলি কি মোহন্ত গুরুতেই শিষ্যের নিষ্ঠা ভক্তিকে অটুট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে, তবেই চক্রে চক্রে মন বসবে, চক্রে চক্রে স্মরণ হবে, অজপাতে লক্ষ্য পড়বে - শেষে একদিন তিনিই তোমাকে জীবত্ব থেকে শিবত্বে নিয়ে যাবেন, স্নান করাবেন আলোক তীর্থের ঝরণা ধারায়। শিষ্যকে তাই মনের দিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে - দেখতে হবে সে কি চায়? কামনা বাসনার স্পর্শ তাতে যেন না থাকে কারণ বাসনাই সংসার, বাসনাই তো অপমৃত্যুর দরজা, সেই দরজা যেন সদা বন্ধ থাকে। একবার

দয়াময় বাবাকে মাস কাবারে মাইনে পাওয়ার পর খামের ভিতর ভরে কিছু টাকা দিয়েছি। দয়াময় বাবা তো অত্যন্ত রসিক পুরুষ ছিলেন। অমন মধুর অথচ কখনও কখনও প্রয়োজনে বাস্তব নগ্ন রসিকতা জীবনে আর কোথাও দেখলাম না। তিনি খামটা হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে খুলতে উদ্যত হলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছি, "ওটা কি হচ্ছে?" বাবার সঙ্গে আমি ওই রকমই কথাবার্তা বলতাম। বাবা বললেন, "না দেখছি কত আছে?" আমি বললাম, "দেখার কিছু নেই - যা আছে আছে, পরে দেখবেন।" বাবা খামটা বন্ধ করে রাখলেন আর দেখলেন না। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি হাসলেন। অনেককে দেখতাম বাবাকে কোন টাকা কড়ি দেওয়ার সময় খাম খুলে দেখিয়ে দিতেন - বাবা কিছু বলতেন না। আমার বোধে আসত "এ আবার দেখাবার কি আছে? কাউকে কিছু যদি দিই বা দিতে চাই তো অপরে জানবে কেন? আমার এ সব ভাল লাগত না। পরে বুঝেছিলাম সেদিন যা করেছি ঠিক করেছিলাম কেননা এঁরা বিশ্ব সম্রাট, এঁদেরকে আমার মত নগণ্য প্রাণী কি দিতে পারে? বাবা এঁর মধ্য দিয়ে সেদিন আমার মনে "বাবাকে দিলাম" এই বোধে অহংকার এল কিনা তার পরীক্ষা নেওয়ার জনাই খামটা সঙ্গে সঙ্গে খুলতে উদ্যত হয়েছিলেন। কারণ বাবা নিজে একদিন প্রকাশ করেছিলেন যে গুরুর জন্য বা কারও জন্য কখনও কিছু দিলে তোমার ডানহাত দিল তো বাঁ হাত যেন না জানে এমনভাবে দিতে হয়। একান্ত গুরুগত প্রাণ হতে গেলে সঠিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ছাড়া, গুরুতে মন প্রাণ সমর্পণ ছাড়া, নিজের বলতে আমার কিছু নেই এ বোধ ছাড়া, এ দেহ গুরুর দেওয়া, তিনিই আমার মধ্যে বসে ক্রিয়া করছেন, সব কিছু তাঁরই কৃপায় সম্ভব হচ্ছে, এই অনুভূতি ছাড়া এ সব পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। তিনি কৃপা করে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে এ সব অনুভব করিয়ে ছিলেন বলে তাঁর দয়াতে তাঁরই নেওয়া সব পরীক্ষাতে পাশ করতে পেরেছিলাম।

☞ যোগক্ষেমম্‌বহাম্যহম্‌ ও মোহন্ত গুরুদেব

গুরুকৃপা যে কি বস্তু তা যারা অনুভব করেনি তারা এতটুকুও বুঝবে না, বোঝা সম্ভব নয়। আমার দয়াল গুরুদেব আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে তা বুঝিয়েছেন, এমন কি সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি যোগক্ষেম্‌বহাম্যহম্‌ অর্থাৎ যোগ এবং ক্ষেমও বহন করেন, যদি গুরুতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ থাকে। আমি হাওড়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক, শ্যামবাজার শাখায় ও মানিকতলা ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখাতেও কাজ করেছি। হাওড়া ষ্টেট ব্যাঙ্কে খুব কঠিন কাজ ছিল কারণ ওটার সঙ্গে বেশী ট্রেজারীর কাজ থাকত। কাজে কাজেই, অসাবধানতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হোত। আর ওখানে কিভাবে কাজ করেছি অনেকেই হয়ত জানেন। হাজার হাজার টাকা গুণতে হোত আর খুব দ্রুতগতিতে। ওরই মধ্যে হয়ত জাল নোট আছে। হাতে ঠিক মেশিনের মত ধরা পড়ে গেছে। যদি কারও কাছে বেশী চলে গেছে তো ঠিক পরে ফেরৎ চলে এসেছে। ক্যাশ কখনও কম হয়নি অতদিন কাজের মধ্যে। এ রকম ক্যাশের কাজে হয়? এক আধটু ত্রুটি ঘটবেই যতই সাবধান হওয়া যাক কিন্তু হয়নি। এমন অঘটনও ঘটেছে যে চল্লিশ হাজার টাকা ভুলে মেঝেতে ফেলে চলে গেছি। ক্যাশ কুলি আমারই ঠিক ভুল হয়েছে মনে করে ক্যাশিয়ারের কাছে আমার নামে জমা করে দিয়েছে। সে তো টাকাটা নিতেও পারত কিংবা কি করে সে জানল যে আমারই ভুলের টাকা? অবিশ্বাস্য ব্যপার। সবচেয়ে মজার কথা ভুলে ব্যাঙ্কের টাকা পকেটে নিয়ে চলে গেছি তবুও ক্যাশ মিলে গেছে। অসম্ভব ব্যাপার স্যাপার সম্ভব হয়েছে কেবল মাত্র বাবার লীলায়। আর আমি তখন বাবার বাড়ী যাবার জন্য সদা ব্যস্ত - সর্ব্বদাই মনটা পড়ে থাকত বাবার কাছে। তাই বাবা ও আমার সব কাজের ভার নিয়ে নিয়েছিলেন। আমার হয়ে পাছে অফিসে লেট হই, সই করে দিয়েছে কে যেন আমায় সই করার ঘরে। আমি তো জানি আমি করিনি কে করল তাহলে? কে আমার সই অবিকল করতে পারে? বাবা ছাড়া আবার কে?

☞ জ্বলন্ত পাপ পুরুষ ও মোহান্ত গুরু

সমস্ত সোপানের ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম প্রাণারামই শ্রেষ্ঠ - ওর মধ্যে সমস্তই আছে - এটা বাবার শ্রীমুখের কথা। বাস্তবিক তাই ঘটেছিল আমার জীবনে। এমন অঘটন শুনিও নি। দয়াময়ের এমনই লীলা। ক্রিয়া যেন আপনি হোত, আপনি চলত। আমার জীবনেই দেখেছি, যে সোপানের ক্রিয়া করি - কখন জানি না পরের সোপানের ক্রিয়া আপনিই কখন ঢুকেছে, বেশ চলছে। বাবার কাছে কোনদিন কিছু বলিনি। দয়াময় পরের সোপানের ক্রিয়াদান করার পর মনে হয়েছে এ যেন খুব চেনা লাগছে।

একবার ক্রিয়া করতে করতে দেখছি আমার দেহটা পুড়ছে। পট্ পট্ করে শব্দ হচ্ছে - নাকে মাংস পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। না না ভয় টয় কিছু হয়নি। ভয় পাব কেন? দেবতার আসনে গুরু সেবা করছি ভয়ের কোন ব্যাপার নেই। তন্ময়তা ভাঙ্গার পর দেখি আসনেই রয়েছি। তবে দেহমনে একটা অপূর্ব্ব শান্ত শীতলতার আবেশ জড়ানো রয়েছে, মনপ্রাণ এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠেছে। কি মধুর কি বিস্ময়কর অবস্থা? শান্ত, নির্মল, আনন্দ আর আনন্দ। বাবাকে পরে জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলেছিলেন দেহের ভিতরের পাপ পুরুষ জ্বলে গেছে। কোন চিন্তা নেই - ক্রিয়া করে যাও।

☞ যেমন গুরু তার তেমন চ্যালা

এই তৃতীয় ক্রিয়া হোল বাসুদেব মন্ত্রের সাধনা। আর প্রথম ক্রিয়া সব চাইতে শক্তিশালী ক্রিয়া। এই ক্রিয়া করে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তারই পরিচ্ছন্নরূপদান করে উপরের ক্রিয়া। প্রথম ক্রিয়াই

শরীরটাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে সে অনন্তের বোঝা বইতে পারে। পূর্ব্ব সংস্কার তো চাই-ই আর চাই প্রবল পুরুষাকার ও তীব্র উপাসনা। শুধু দৈব বা শুধু পুরুষাকার দিয়ে পরমার্থ লাভ হয় না। চাই উভয়ের সংযোগ। আর শরীরটা তো চাই-ই, এটা একটা বড় ব্যাপার। শক্তি তো খুবই প্রয়োজন। দৈনিক এক আসনে অন্ততঃ ৬ থেকে ৮ ঘন্টা ক্রিয়া করার মত সামর্থ চাই, তবেত অন্তর্জ্জগতের সন্ধান পাবে। না হলে অনিত্য জগতের সুখ নিয়ে থাক্। জ্বলন্ত ক্ষাত্রশক্তির আধার ছাড়া এই তৃতীয় ক্রিয়া হয় না, বাসুদেব মন্ত্র সাধনা করা যায় না।
একবার আমার বগলে ক্যাঁকবিড়ালী না কি বলে, সেই হয়েছে। খুব অসহ্য যন্ত্রণা। রাতে ঘুমাতে পারি না - হাত তো নামাতেই পারি না। সেদিন তাই সম্পূর্ণ ক্রিয়াটা করতে পারি নি। পরদিন বিকালে বাবার বাড়ী গিয়ে সেই কথাটাই বলছিলাম বাবাকে। মনে মনে একটু আশা ছিল যে বাবা নিশ্চয়ই বলবেন, "ঠিক আছে! ঠিক আছে! এই অসুস্থ অবস্থায় কেউ কি ক্রিয়া করতে পারে? যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে।।" ভাবছি নিশ্চয়ই এরূপ সহানুভূতিই পাব। কিন্তু আমার কপালে তো সান্ত্বনা পুরস্কার বলে কিছু ছিল না। পুরস্কার পুরস্কার তার আবার সান্ত্বনা কি? অরে বাবাঃ! বাবা যেন অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে গেলেন। কপট রোষ দেখিয়ে (কপট রোষ বলার কারণ পাঠক মনে রাখবেন যে এঁদের কোন রোষ থাকে না) বললেন, "তোমার লজ্জা করল না? ক্রিয়া কম করেছ আবার বাহাদুরী দেখাচ্ছ?" আমি তো ভয়ে একেবারে সিটিয়ে গেছি। মনে মনে ভাবছি আগে কখনও ক্রিয়া কোনদিন আপনার আদেশ ছাড়া কম করে করিনি। এমন সময় **আবার রক্ষক ভাবে বললেন, "যা হবার হয়েছে আর কখনও ক্রিয়া কম করে করবে না।" তাই সেবার মা যখন বললেন, "বিষ্টু তোরা তো অফিস থেকে খরচ পাস তো আমাকে একবার কাশীধাম দেখিয়ে আন না কেন?" বাবার কাছে অনুমতি চাইলাম। বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না বললেন। "তোমার দাদাকে বল নিয়ে যেতে। যখন**

কাশীর বাবার ধাম দেখতে আমি যাব তখন তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'' আমি নাছোড়বান্দা হয়ে আবার বললাম, ''তখন না হয় আর একবার আপনার সঙ্গে যাব। দয়া করে অনুমতি দিন, মায়ের ইচ্ছাটা পূরণ করি।'' অগত্যা বাবা রাজী হলেন। আমি অফিসে ছুটি নিলাম, টাকা অগ্রিম নিলাম। বাবা তখন বালীতে এসেছেন। ২/১ দিন পরে কোন্নগরে লিলিদের বাড়ী যাবেন। পরের দিন আমাকে বললেন, ''তুমি তাহলে লিলির বাড়ী যেও''। কিন্তু হায় ভগবান। তখন কি জানি বাবার মনে এতোও আছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখি গায়ে জল বসন্ত বের হয়েছে। তাঁরকদার বাড়ীতে গিয়ে ওদের বললাম বাবাকে যেন ওরা আমার এই অবস্থার কথা বলেন কারণ ওঁদেরও লিলিদির বাড়ী যাবার কথা ছিল। বাবা নাকি শুনলাম, আমার অবস্থার কথা শুনে হেসেই খুন। ওঃ! মনে পড়ে যায় লিলিদি ও জামাইবাবুর কথা। কি ভালই না ছিল ওরা, কি মন প্রাণ। ও রকম আজকাল দেখাই যায় না। বাবা তখন তাঁরকদার বাড়ীতেই রয়েছেন। আমি কিন্তু এবার অসুস্থ অবস্থায় ক্রিয়া বন্ধ রাখিনি কারণ আগের বার বাবা বকেছেন। ক্রিয়া সমানে চলছে, এদিকে সারা গায়ে বসন্তর গুটিতে ছেয়ে গেছে - তিলধারণের জায়গা নেই। সারা শরীরে ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা কিন্তু আমার জিদ্ ক্রিয়া কম করবই না। এবার বাবার আসন টলেছে। বাবা ওখান থেকে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, ''বিষ্টুকে ক্রিয়া বন্ধ রাখতে বল, এ অবস্থায় ক্রিয়া চলবে না। আমি পুনরায় নির্দ্দেশ না পাঠানো পর্য্যন্ত ও যেন ক্রিয়া বন্ধ রাখে।'' কে শুনছে কথা - একবার ক্রিয়া কম করার জন্য বকেছ আবার ক্রিয়া বন্ধ রাখি! এদিকে বাবাও প্রত্যহ লোক দিয়ে খবর নিচ্ছেন। লোকজন আসছে ফল হরলিকস্ দিয়ে যাচ্ছে, বলছে, বাবা খেতে বলেছেন। তখন বাজারে হরলিকস্ অমিল আর আমার অত পয়সা কোথায় যে ফল হরলিক্স খাব? ইতিমধ্যে বাবা লিলিদির বাড়ী ঘুরে আবার বালীতে এসেছেন। তাঁরকদার বাড়ীতে আছেন। বাবার কাছে যেতে পারছি না, মনের যে কি অবস্থা কি বলব? এদিকে তিনি যে আবার

আমার জন্যই বালীতে এসেছেন তখনও তা তো বুঝতে পারিনি। একদিন পায়খানায় গেছি শরীর খুব দুর্ব্বল। পায়খানা থেকে বেরিয়েই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। একেবারে মাটিতে পড়ে আছি। বউদি কাছেই ছিলেন কিন্তু একা মেয়েমানুষ আমার অতবড় লাশ তুলতে পারবে কেন? যা হোক করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে কাছেই দেবীধামে বাবা যেখানে আছেন সেখানে গিয়ে কেঁদে বলতেই বাবা একেবারে দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। দেবীধামের দাদারাও এলেন। আহা! তাদের আজ অনেকেই ইহজগতে নেই - তাদের কাছে শুধু ঋণীই রয়ে গেলাম। বাবাকে দেখেই তো আমি কেঁদে ফেললাম, বললাম, "আপনাদের দেখতে ইচ্ছা করেনা বুঝি? দয়াল বাবা হেসে বললেন, "আরে পাগল? আমাকে খবর দিলেই তো আসতাম কিন্তু তাই বলে কি এমন কান্ড বাধাতে হয়? ব্যস! এরপর আর কি কিছু থাকে? আনন্দময়ের আগমনে সব তখন আনন্দময়। বাবার নির্দ্দেশে গুরুভ্রাতারা সকলে কেউ বিছানা ঠিকঠাক করছে, কেউ আদর জানাচ্ছে, সে কি অবস্থা? ঘা গুলো শুকোতে লাগল! কেউ বলল গাওয়া ঘি এর লুচি খেলে তাড়াতাড়ি ঘা শুকোবে। কিন্তু আমার তখন আর্থিক অবস্থা কোথায় যে গাওয়া ঘি এর লুচি খাব। কোথায় পাব? কে দেবে? ওমা! তার পরেই দেখি পর পর খাঁটি গাওয়া ঘি এর শিশি আসতে লাগল আর আমিও তাড়াতাড়ি সেরে উঠলাম। তাই বলছি মোহন্ত গুরুর বিচার চলে না - তাঁর নির্দ্দেশ, আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই আমাদের কাজ, নইলে ক্রিয়া হয় না। তাঁর প্রতি কোন সংশয় সন্দেহ এলে সেখান থেকে বরং সরে পড়া ভাল তবু সংশয় নিয়ে ক্রিয়া করা বিড়ম্বনা মাত্র।। হৃদয়ে গুরুকে বসিয়ে রেখে তাঁর কাছে আবদার কর, তাঁর উপর অভিমান কর, জোর কর - দেখবে তিনি সকল আবদার, অভিমান মেনে নিয়েছেন আর ফসল উঠছে তোমার গোলায়। ভোগ করবে তুমি, কারণ বাপের গোলাও তো তোমার গোলা। গুরুকে জপতে হবে - গুরু হবে জপের ঘুঁটি তবে তো হবে। বাপের কাছে নিজেকে

অর্পণ করে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে দেখনা কি হয় আর কি হয় না? কিন্তু সব কিছু করতে হবে নিষ্কাম ভাবে। গুরুই একমাত্র সার আর সব কিছু অসার মনে করে কোমর বেধে ক্রিয়ায় লেগে থেকে দেখ কেমন লাগে? এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

রাজবাড়ীতে রাজনর্ত্তকী

এই তৃতীয় ক্রিয়ায় প্রতিকূলতার কথা এতো শুনেছিলাম যে মনটা সর্ব্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকত কি করে সমাধা করব? সদাই চিন্তা, কি করে স্থিরত্ব বাড়ানো যায়? আর বাবা যে এই সময়ে কত লীলা দেখিয়েছেন লিখে শেষ করা যাবে না। এক দিন সকালবেলা ৮টা নাগাদ মশারির ভেতর বসে ক্রিয়া করছি। হঠাৎ একজন যুবতী ক্রিয়ান্বিতা যে ঘরে ক্রিয়া করছি সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। অনেক ছাত্র ছাত্রী পড়াবার সুবাদে পরিচিতির গন্ডীটা বেশ বড় ছিল। তখন ছাত্র ছাত্রী না পড়ালেও অনেকেই আমার কাছে আসত। আমার মা, দাদারা তাকে দেখেওছে কিন্তু কিছুই মনে করার নেই, কেউ বাধাও দেয় নি। উদভ্রান্ত অবস্থা। মেয়েটার চোখে মুখে কামনা যেন ঝরে পড়ছে ।তেমনি তার দেহসৌষ্ঠব। বুকের কাপড় খসে পড়ে গেছে। মেয়েটি এসেই একেবারে মশারিটা তুলে আমার কাছে চলে এল। চাপা গলায় বলল, "আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দেব?" আমি অত্যন্ত সহজ ভাবে সব ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। বললাম শুধু,"কেন রে?" ব্যস! মেয়েটা যেমন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আজও আমার কাছে কুহেলিকা মনে হয়, কারণ সেই মেয়েটাকে আমি পরেও দেখেছি কিন্তু কখনও তার মধ্যে সেইভাব থাকতে পারে মনেও হয়নি - দেখিওনি কখনও। কিন্তু আমি যে দেখেছি এবং পরিষ্কার ভাবে তাকেই দেখেছি এ কথা তো একশো ভাগ সত্যি। আজও তাই মনে বিস্ময় জাগে কে এসেছিল? সত্যি সত্যি এই মেয়েটা না তার শরীর ধরে কোন অশরীরিনী?

☞ নিশীথ রাতের সঙ্গিনী

সাধনা করতে গেলে বাধা বিঘ্ন আসবেই। তৃতীয় ক্রিয়ায় যোগ বিঘ্ন প্রচুর ঘটে। শাস্ত্রেও দেখা যায় এ সব আছে। তাছাড়া ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র মুনি ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশীরা কত চেষ্টা করেছে রামায়ণ মহাভারতে তো পড়েছি। এরা সত্যিই আসে সাধকের ধ্যান ভাঙ্গার জন্য। সাধককে গুরুদেব পরীক্ষা করেন নানাভাবে, এতে তো বিস্ময়ের কিছু নেই।

একদিন সুখাসনে বসে ক্রিয়া করছি। দেখি একজন অপূর্ব্ব সুন্দরী তন্বী যুবতী, কুমারী বলেই মনে হয়েছিল, একেবারে নগ্ন অবস্থায় আমর উরুর দুপাশে দুটো পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এমনভাবে আছে যে তাহার অত্যন্ত সুন্দর উন্নত কুচযুগল আমার দেহের সাথে যেন একেবারে সেঁটে ধরেছে। কি অবস্থা পাঠক চিন্তা করুন। আমার কিন্তু কোন বিকার আসেনি। বরং ভেতরে একটা প্রচন্ড বিরক্তি বোধ কাজ করল। শুধু মনে হল বাবা বোধ হয় দেখছেন। ব্যস! মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মিশিয়ে যেতে বাধ্য। কল্পলোকের যাত্রীকে এই সব কল্প লোকবাসিনীরা কাছে এসে দেখা দেয়। এগুলো সাধকের যোগবিঘ্ন ঘটায়, সাধনায় পতন ঘটায়। এ সব পাকা সাধকের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবে বাবার কৃপায় এসবগুলো আমার মনে কোন ছায়াপাত করতে পারেনি।

☞ এ দুনিয়ায় সব সত্যি, সব সত্যি

অন্য আর একদিনের ঘটনায় আসছি। সেদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে মায়ের পাশে শুয়ে আছি। একটু তন্দ্রাভাব এসেছে। হঠাৎ মনে হল আমার গায়ে কাঁথার ভিতরে একটা ষোড়শী মেয়ে

একেবারে গা সেঁটে শুয়ে রয়েছে। শরীরটা আমার তখন একদম শক্ত হয়ে গেছে। শুধু মনে মনে বাবাকে স্মরণ করছি - তন্দ্রা কেটে গেল। কই? কোথাও কেউ নেই। উঠে পড়ে মুখ হাত ধুয়ে বাবার বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলাম। জি.টি.রোডে এসে বালির বাস ষ্টপেজে বাসে উঠেছি। হঠাৎ দেখি একটা সিটে সেই মেয়েটাই দেহধরে দিব্যি বসে রয়েছে। প্রচন্ড বিরক্তি এল মনে মনে আর বাবার উপর রাগও ধরেছে খুব। স্মরণও চলছে মনে মনে। তারপর একটু বাদেই দেখি মেয়েটা নেই। খুব আনন্দ হোল কারণ বাবা বলেছিলেন যে, "যত বাধা আসবে জানবে ক্রিয়া ভালভাবে চলছে।।" এমন ঘটনা জীবনে বহু ঘটেছে। লেখার শেষ হবে না। শুধু জানাতে চাই - এ দুনিয়ায় যা ঘটে সব সত্যি।

☞ অমৃত ভক্ষণ

তৃতীয় ক্রিয়ার সময়ই লড়াইটা জমেছিল। আর বাবার লীলাও জমেছিল এই সময়টায়। বাবাকে কত ভাবে কত নূতন নূতন ভাবে তখন যে পেয়েছি লিখে জানাবার নয়। অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিলখ্ব তাঁদের সবাইকে চিনতেও পারিনি কারণ পূর্ব্বে কখনও তাঁদের আমি দেখিও নি । আমি যেন জিজ্ঞাসা করলাম – আপানাদের সময়ে কেমনভাবে দীক্ষা হোত? উনি দুহাত টেনে চোখের উপর ইঙ্গিতে এই যোগদীক্ষার কথাই জানালেন। সবই কিন্তু ওঁদের ভাষাতে এই ভাষায় নয়। সেই সময়টা একদিন ভোরবেলায় ক্রিয়া করছি - হঠাৎ বোধহল প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু কোথায় খাবার পাব? ঘরে সে সময় কারও আসার কোন সম্ভাবনা নেই। দয়াল বাবার উপরে যত রাগ গিয়ে পড়ল। ভিতরে ভিতরে গজ গজ করছে মনটা আর শরীরটা যেন একেবারে অবশ হয়ে যাচ্ছে। ক্রিয়াও চলছে তখন। প্রথম প্রাণায়াম চলছে। তারপরে উপরের ক্রিয়া করব কিন্তু

করব কি করে? মন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে আর কিছুতেই পারছি না। এমনিভাবে ক্রিয়া করতে করতেই কোনদিন মরে যাব দেখছি। ক্রিয়া কিন্তু চলছে। হঠাৎ মনে হল যেন আমার মুখটা সুস্বাদু সন্দেশে ভরে গেছে। এমন সুস্বাদু সন্দেশ জীবনে কখনও খাইনি। পেটটা যেন ভরে গেল আর দেহ মনে যত ক্লান্তি সব যেন মুছে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। কি আনন্দ! কি আনন্দ! সে আর কি বলব?

☞ আলোকের এই ঝরণা ধারায়

বাবাকে একবার কি মন হল জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বাবা, উপরের ক্রিয়া কি দুবেলা করা যায় না?" বাবা বললেন, "তা যাবে না কেন? তবে তোমার দরকার নেই। আর যদি কর তাহলে দুবেলাতেই সমান ভাবে করতে হবে।" ব্যস! কোন কথা নয়, বাবাকে স্মরণ করে করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু বেশীদিন করতে পারলাম না কারণ রাত্রে এতটুকু ঘুম হোত না। চোখ বুজলেই অনন্ত জ্যোতিতে আলোর ছটায় জ্বল জ্বল করছে। চোখ বুজেও এই অবস্থায় ঘুমাবো কি করে? বাবাকে বলতেই বাবা একটু মুচকি হেসে বললেন, "থাক! এক বেলাই কর না।" সেই থেকে উপরের ক্রিয়া এক বেলাই করি।

☞ নক্ষত্রলোকের ছায়ায়

একদিন ক্রিয়া সমাপ্ত করে নীচে এসে আমার বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছি। ২/৩ মিনিটের মধ্যে মনে হল যেন আমি একটা নক্ষত্র হয়ে উপরে উঠে গেছি আর দেখছি আমার দেহটা নীচে পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। কিছুক্ষণ পরে দেখছি সেই নক্ষত্রটা আবার এসে নীচে ঐ দেহটার মধ্যে প্রবেশ করল আর তখন যেন আবার

এই দেহটা সচল হোল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আসলে বাবাই কথাটা কায়দা করে বার করে নিয়ে বলেছিলেন, "এ যে ষষ্ঠ ক্রিয়ার অবস্থা?" আর কিছু বলেন নি। পরে বুঝেছিলাম ওটা আমার সূক্ষ্ম দেহ। দুধ ভালভাবে মন্থন করলে যেমন মাখন উঠে তেমনি প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণসমুদ্র মন্থন করলে দেহ ও প্রাণ আলাদা হয়ে যায়। নিষ্কাম ভাবে প্রাণায়াম বহুদিন বহু সংখ্যক করতে পারলে তবে এটা হতে পারে। তার উপর আবার উপরের ক্রিয়ায় সঠিকভাবে স্থিতি এলে তখন এই দৃশ্য দেখা যায়, এর ভালভাবে প্রকাশ ঘটে।

লীলাময়ের লীলা প্রসঙ্গ শেষ হয় নি - কোনদিনই কেউ শেষ করতে পারবে না, পারেওনি কোনদিন। এ লেখনী শুধুমাত্র তাঁর কৃপা প্রদর্শনের কাহিনীর অসংখ্য উদাহরণের থেকে বিন্দু বিন্দু করে সাগরের জলের বিরাটত্বের পরিচয়ের চেষ্টা করেছে মাত্র। সাগর না দেখলে তো তার বিশালতা জানা যাবে না। তাই বলছি নিজেরা করে দেখো যত কথা বলেছি সব সত্যি! সব সত্যি! সব সত্যি! সবই হয় জয়গুরু! জয়গুরু! তোমার জয় হোক।

****

নবম অধ্যায়

☞ ফেলে আসা দিনগুলিদিন মোর দিন বদলের পালায়

"কি রে! তুই এখানে আছিস? কত খুঁজছি তোকে কতক্ষণ ধরে সারা বাড়িটায়? এখানে ছাদে আড়ালে দাঁড়িয়ে একা একা কি করছিস? ওমা! কাঁদছিস্? কেন? কেন? কি হয়েছে?" সস্নেহ পিসিমার কণ্ঠে অভয় সূচক সুর বাজে "ভয় কি বাবা? মন কেমন করছে? আমরা তো আছি ভয় কি?"

না! না! ভয় কোথায়? ঈশ্বরবিশ্বাসী অকুতোভয় ওপার বাংলা থেকে সদ্য এখানে আসা সেই দামাল কিশোর নীরবে শুধু অশ্রু বর্ষণ করে চলেছে। পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ভরাট মুখমন্ডলে কপোল বেয়ে নামছে শুধু অঝোরধারায় অশ্রুমুক্তাবিন্দু। মন তার হারিয়ে গেছে ফেলে আসা দিনগুলোর শ্যামলিমা ঘেরা, হিজল তমাল বনে ছাওয়া ছবির লাবণ্য ঘেরা স্নেহের নীড়ে ঘেরা অত্যন্ত চেনা এক গন্ডীর মধ্যে। মনেপড়ে ঐ দুরে আকাশ পাড়ে সেই সে স্নেহময় পিতার স্নেহছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে বিদায় বেলায় অশ্রুভেজা কণ্ঠে পিতার সেই সস্নেহ সাবধান বাণী, "যেয়োনা, তোমার কষ্ট হবে"। মনে পড়ে যায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্নেহময়ী মায়ের মুখখানা যতক্ষণ না একটা দুরন্ত কিশোরের ছোট ছোট পায়ে চলার পথটা দিগন্তে মিশে যায় ততক্ষণ। ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা মমতাময়ীর নানা ভাবের ভাবনায় মেশানো মুখখানা - চলার মাঝে ফিরে ফিরে দেখা, দুর থেকে বহুদূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া করুণাময়ীর করুণাঘন মুখমন্ডলের বিষাদের বলীরেখা।

চমক ভাঙ্গল পিসীমার কন্ঠস্বরে। বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্ফুট ক্ষীণকন্ঠে উচ্চারণের চেষ্টা করে কিশোর। শহর সভ্যতার প্রাথমিক থাবার মর্ম্মান্তিক পরশটুকু, যা ছিল গ্রাম্য জীবনের সহজ সরল দিন কাটানো মানুষগুলোর শিক্ষার কাছে অধর্ম্ম, পাপ, ঘোরতর অন্যায় তাই সে প্রথমেই ঘটতে দেখল তারই জীবনে। অনভ্যস্ত জীবনের প্রথম পরাজয় ঘটেছে। যে কটা টাকা সে যখের ধন বলে নিয়ে এসেছিল তার পকেটে করে - এ পার বাংলার শহুরে মাটিতে পা রাখতে না রাখতে সেই টাকা কটা তার চুরি করেছে পকেটমারে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামতে না নামতে। মাটির মানুষ তাই লজ্জায় ঘৃণায়, নীরব প্রতিবাদে, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে যেন পিসীমাকে লক্ষ্য করে, সভ্যতাকে যেন নীরবে বলছে, "এই কি তোমাদের সভ্য জীবনের ছবি? এই তোমাদের সভ্য জীবনের অহঙ্কার? এই তোমাদের সভ্যতার রীতিনীতি?" পারেনি বলতে। শুধু অস্ফুটে বলেছে "পকেট থেকে সামান্য টাকা ছিল নিয়ে নিয়েছে ।" উত্তরে পিসিমা বল্লেন কিঞ্চিৎ রাগ করে, "সে কি ? কই আমাকে তো আগে বলিস নি? ঠিক আছে তুই কলেজে খোঁজ নে আমি তোর ভর্ত্তির টাকা দেব!" মনে মনে ভাবছি সত্যই কি ঠিক আছে? আমার মন বলছে কিছুই ঠিক নেই। আর ঠিকই যদি থাকে তাহলে সেদিন প্রথম আসার পরই পিসীমা যখন শুনেছিলেন যে এখানে এসেছি এখান থেকে লেখাপড়া করব বলে - তাহলে সেদিন কেন ঐ কথাটা শুনেই পিসীমার মুখখানা অমন বিবর্ণ দেখেছিলাম? কেন অজস্র চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখেছিলাম সেখানে? ভুল দেখেছিলাম কি? মনে হয় না। যাই হোক আর একবার উঁকি দিয়ে আসা যাক্ সেইদিনের সেই পটভূমিতে।

১৯৫১ সালের ২১শে আগষ্ট ওপার বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে বন্ধুর বাবার হাত ধরে প্রথম কলকাতায় এসেছি সেদিন। সেইদিনটা সকালে ফার্ণ রোডে বন্ধুর কাকার বাড়ীতে উঠে, দুপুরে ওখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল না গড়াতেই বের হয়ে পড়লাম পিসীমার বাড়ীর খোঁজে ৪নং হিন্দুস্থান পার্ক বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর পাশেই

বাড়ীটার সন্ধান করতে। বন্ধু আমার ছিল অত্যন্ত চৌকস্ ছেলে, সামান্য খোঁজার পরই পেয়ে গেলাম বাড়ীটা। বাড়ী দেখে আমিত একেবারে অবাক। ওরে বাবাঃ! এতো একেবারে রাজপ্রাসাদ! মনে মনে ভাবছি ডোবার ব্যাঙ সাগরে এসে পড়লাম। পিসীমাও তো আমাকে দেখে একেবারে অবাক। কতদিন পরে দেখছেন - বললেন হাসতে হাসতে, "কত বড় হয়ে গেছিস? খুব ভাল হয়েছে এসেছিস। তা হ্যাঁ রে, কি মনে করে এতদিন বাদে হঠাৎ পিসীমার কথা মনে হোল?"

মাধ্যমিক পাশ করেছি! ভাবলাম এখানে থেকে পড়াশুনাটা চালাব তাই। "ওঃ তাই তো ভাবছি" কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে পিসীমার। অস্ফুটে বললেন, "কিন্তু" মূহুর্ত্তে সঙ্কট কাটিয়ে যেন বলে উঠলেন, "আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো থাক, পরে দেখা যাবে।" মন কিন্তু আমার ভেঙ্গে গেল পিসীমার ঐ কিন্তু কথাটা শুনেই। কেন জানি না বুঝে গেলাম এ বাড়ীর পরিস্থিতি আমার থাকার অনুকুল নয়। আকুল চিন্তা নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দিন কাটতে লাগল। কি করব? কেমন করে কোথায় কি ভাবে, কার কাছে থেকে কোন উপায়ে কলেজে ভর্ত্তি হয়ে লেখা পড়া করব? কি করি? ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে বাবার সাবধান বাণী, "যেয়োনা কষ্ট পাবে" ঠিকই বলেছিলেন বাবা। সন্তানের ভবিষ্যৎ যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে বাবা দেখেছিলেন। তাই সাধ্যাতীত চেষ্টায় গায়ে গতরে খেটে পিসেমশায়ের অন্নের মূল্য দিতে চেয়েছি। কিন্তু তবুও বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে থাকা দূরাত্মীয়ের প্রতি বেশীর ভাগ বাঙালী পরিবারের "বোঝা বওয়ার বিরক্তি সূচক" যে অপ্রসন্নতার মনোভাব দেখা যায় — কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে, "আপদ গেলে বাঁচি" সুলভ আচরণের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তার থেকে আমিও বাদ যাইনি।

খাওয়ার খোঁটা খেলেই মনে পড়ত বাবার কথা। আগেই বলেছি ক্ষিদে যেন আমায় তাড়া করে বেড়াত। দুটো বেশী খেতাম,

চুরি করে খেতাম বলে মা হয়ত খুব চিৎকার, চেঁচামেচি করেছেন। কখনও, ঠাকুমা হয়ত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন সত্যি কথা বলতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম, "আমি কি জানি?" মুখের বুলিই ছিল "আমি কি জানি?" দুধের সর বসিয়েছেন মা, সরটা তুলে মুখেপুরে দুধটা ভাল করে হাতা দিয়ে একটু আবার নেড়ে চেড়ে দিয়ে মানে যাতে আবার সর একটু দাঁড়ায়, বেড়িয়ে গেছি। মা বিকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সরের ঐ অবস্থা দেখে আমাকে ধরে বলেছেন, "এ নিশ্চয়ই তোর কাজ।" সঙ্গে সঙ্গে সেই একই রেকর্ড বেজেছে, "আমি কি জানি?" ভর্ত্তি পেট ভাত খেয়ে উঠে, মা যেই শুতে গেছে অমনি একটা টিনের প্রায় অর্দ্ধেক মুড়ি ঢেলে বোয়েম বা শিশি থেকে অর্দ্ধেক ঘি নিয়ে মুখে দিতে দিতেই নিমেষের মধ্যে সব শেষ করে দিয়েছি। মা ঘুম থেকে উঠে ঐ সমস্ত দেখে আমিই করেছি অনুমান করে চেঁচামেচি করলেই বাবা এসে বলতেন, "কি হয়েছে কি? খেয়েছে তো কি হয়েছে?" বাবাকে কোনদিন আমার খাওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করা ছাড়া অন্যকথা বলতে শুনিনি। তাই আজ বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে দুটো বেশী খাওয়ার খোঁটা শুনলেই বাবার কথা মনে পড়ে যেত। স্নেহশীল পিতার মন দিয়ে হয়ত তিনি ভেবেছিলেন ছেলেটা বেশী খায় - কোন আত্মীয় কি চোখে দেখবে - হয়ত পেট ভরে খেতে পাবে না - এইসব বাপের মনে যা হয়। বাস্তবে তাই কিন্তু ঘটেছিল। এমনও হয়েছে মা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাত্রে সমপরিমাণ ভাত দিয়ে তরকারী বা ডাল দেবার জন্য ঘরে ঢুকতেই বলেছি, "আরো ভাত দাও - মনে ভয়, অনেকগুলি ভাইবোন আমরা, যদি ভাত কম পড়ে, না থাকে তাই আগে ভাগে পুরো ভাতটা চেয়েছি। মা বলেছেন, "তুই খা না, চাইলে আবার দিচ্ছি"। আমি বলেছি, "না তুমি আগে ভাতটা দিয়ে দাও। সেদিনের সেই ভাত চেয়ে না পাবার আশঙ্কা আর আত্মীয়ের বাড়ী চাইলে রাক্ষস উপাধি পাওয়ার স্মৃতির কথা মনে হলে দয়াময় বাবার লীলার কথা মনে হয়ে চোখ ভারী হয়ে উঠে। ভাবি, একদিন চেয়েছি পাইনি, আর আজ তাঁর অফুরন্ত দানে ঘর ভরে আছে। খেতেই পারি

না, খাওয়ার ইচ্ছাই হয় না। এ কি বিচিত্র লীলা। এই লীলা প্রসঙ্গেই বাধ্য হয়ে লেখনী চলে যায় কলেজে ভর্ত্তির ও পড়ার দিনগুলোতে। সেই কথাতেই আসা যাক।

☞ লীলাময়ের লীলায় কলেজে ভর্ত্তির প্রসঙ্গে

পিসিমা না হয় কলেজে ভর্ত্তির জন্য টাকার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু তারপর? ওই তো বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থায় অনিশ্চিত অবস্থা - যে কটা টাকা সঙ্গে এনেছিলাম সেও তো পকেটমারের পকেটে, কে পড়াবে? কোথায় থাকব? টাকা কোথায় পাব? দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছি। কলেজে ভর্ত্তির সময়ও তো প্রায় পার হয়ে গেছে - লেট ফি দিয়েও ভর্ত্তি হওয়া যাবে না শুনছি। কোথাও কোন জায়গায় সিট খালি নেই। কি করব? কাকে বলব? কেউ তো নেই, হা ঈশ্বর! আমার ভবিষ্যৎ কি হবে? দিনরাত এই চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। শুনছি একমাত্র যদি হয় তাহলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সান্ধ্য শাখাতে। রাস্তা ঘাট কিছুই জানি না। কত টাকা লাগবে? এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে কোনরকমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মন নিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা ঐ কলেজে হাজির হলাম। সেইমাত্র অফিস খুলেছে। গিয়ে দাঁড়াতেই হেডক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই?" "আই'কম্ ক্লাশে ভর্ত্তি হতে চাই" - আমি বললাম। তিনি কোন রকম না তাকিয়েই বললেন, "হবে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাছাড়া কোন সিটও খালি নেই।" তখন আমার চোখ মুখের অবস্থা এত করুণ যে রাস্তার লোকেরও মায়া হবে। আর্ত্তস্বরের মত আমার মুখ দিয়ে কথা কটা কে যেন বের করে দিল, "আমার কি তাহলে পড়া হবে না?" বলেই মনে মনে ভাবছি, "হে ভগবান! হে মা কালী! আমার কি উপায় হবে তাহলে? কি করব? কোথায় যাব তাহলে?" ভাবছি কিন্তু আমি যেন আর নড়তে পারছি না।

ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছি। একে আমার হোকো চেহারা, তার উপর ময়লা জামাকাপড়, হেডক্লার্ক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাচ্ছেনই না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু দম নিয়ে দয়াময়কে স্মরণ করে যেন তাঁকেই বলছি এমনভাবে আবার মুখ দিয়ে বেরুল, "আমার কি পড়া হবে না তাহলে?" দয়াময় যেন মুখ তুলে চাইলেন। হেডক্লার্ক এবারে যেন আমার দিকে চেয়ে একবার দেখলেন। কি তার মনে হোল জানি না - খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে ভাবছি, "এই রে বিরক্ত করলাম আবার! দিলে বোধহয় তাড়িয়ে! আর বোধহয় রক্ষা নেই।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ সস্নেহে বলে উঠলেন, "তুমি একটু দাঁড়াও তো ভাই। আমি একবার অধ্যক্ষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে কথা বলে আসছি। দেখি কিছু করা যায় কিনা?" আশার আলো জেগে উঠল মনেতে। ভদ্রলোক একটা ঘরে ঢুকে গেলেন - কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে আমাকে বললেন, "টাকা এনেছ? প্রিন্সিপাল রাজী হয়েছেন — লেট ফি দিয়ে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।" আমি সঙ্গে সঙ্গে "এনেছি স্যার" বলেই পকেট থেকে পিসীমার দেওয়া টাকাগুলো সব বার করে ওঁর হাতে দিতেই — উনি নিজেই সব কাগজ পত্র লিখে টাকাটা গুনতে গিয়ে বললেন, "কত এনেছ দেখি", বলেই হিসাবপত্র করে বললেন, "আরো টাকা চাই।" মুখ তখন আমার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে - "কাছে আর একটাও টাকা নেই আমার", আমি বললাম, উনি আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে বাকী টাকাটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি আজ। তুমি তোমার সময় মত আমাকে শোধ করে দিও, কেমন?" কি আর বলব? উনি তো আমার কাছে তখন সাক্ষাৎ ভগবান! দুই হাত কপালে তুলে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম ওঁকে। ওরফে হেডক্লার্ক শ্রী নিবারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে, করুণার অবতার হয়ে যিনি আমাকে সেই মূহুর্ত্তে নিজের টাকা ও শ্রম দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, চরম সঙ্কট

থেকে মুক্ত করলেন। আমার প্রতি তাঁর হঠাৎ কি ভাবে এত সমবেদনা ও পরোপকারের প্রবল ইচ্ছা জাগল, কে হঠাৎ করে তাঁর মধ্যে দিয়ে আমাকে তাৎক্ষণিক বিপদমুক্ত করার প্রেরণা জোগাল, আমার কাছে আজও এটা পরম বিস্ময়ের। পরে দেখেছিলাম এই নিবারণবাবুই এত নরম মেজাজের লোক মোটেই ছিল না। কিন্তু সেদিনের সেই হঠাৎ পাওয়া সুযোগের মূহুর্ত্তে — কে যেন তাঁর ভিতরে বসে কাজ করল আমার ভর্ত্তির সুযোগ করে দিতে। গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া একে কি বলা যাবে? চরম আনন্দে তাই দয়াময়কে উদ্দেশ্য করে মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিলাম আর একবারও — আবার ভর্ত্তি হওয়ার নিষেধগুলোকে নিবারণ করে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সেইদিনের নিবারণ চক্রবর্ত্তীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় এই মাথাটা আরও একবার নীরবে নত হয়ে পড়েছিল।

☞ ডেরা ডান্ডা উঠল আবার

দিন যায় দিন আসে, সূর্য্য ডোবে আবার সূর্য্য হাসে — আমার জীবনেও কিন্তু এই বঙ্গে পদার্পণ করার পর থেকেই কষ্টের দিন সুরু হয়েছিল, আর প্রতি মূহুর্ত্তেই অনুভব করেছি গুরুদেব যেন সারা জীবন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে প্রতিটি ক্ষণের গ্লানি ও প্রতিটি কষ্টের কালিমা আপনি হাতে করে তুলে নিয়ে আমাকে জয়ী করেছেন— দুঃখ, কষ্ট, বেদনার ডালি সরিয়ে আমাকে রাজপথে উঠতে সাহায্য করেছেন। দীক্ষা পাওয়ার পর একবার বাবাকে বলেছিলাম, "বাবা জন্ম মূহুর্ত্ত থেকে প্রতিটি মূহুর্ত্তে আপনি আমার উপর কড়া নজর রেখেছেন এটা আমি বেশ বুঝতে পারি।" বাবা অত্যন্ত উদাসীনভাবে জবাব দিয়েছিলেন "তা হবে।" হবে নয় হয়েছিল হয়েছে হইয়েছেন তিনি। নইলে সেদিন যখন পিসীমা

আমাকে ডেকে বললেন "আমার শ্বশুর তোর এখানে থাকাটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না - তুই তোর মামার বাড়ীতে থাকার চেষ্টা কর"। তখন বজ্রাহত সেই আমাকে কেমন করে তিনি আবার এক জায়গায় আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা যেন আগে থেকে করেই রেখেছেন। মনে হোল সব ঠিক করাই আছে কেবল কালের অপেক্ষা, শুধু পর্দ্দাটা সরে যাওয়ার। ঠিক পরে পরেই ছবিগুলো সমস্ত সাজানো গোছানো ভাবে চোখে এসে পড়বে, কেউ যেন অলক্ষ্যে বসে আমার জীবন পরিক্রমার পথ আলপনা এঁকে রেখেছে যাতে পথ ভুল না করি। যখনই ভুল করেছি, বাবার বুক থেকে একটু ছাড়া পেয়েছি অমনি বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার মত অন্যের গোয়ালে ঢুকে পড়েছি, গোয়ালের মালিক ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে বা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, অমনি বাবা দুহাত আগলে বাধা দিয়েছেন বা খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের ঘরে পুরে দিয়েছেন। এই খোঁয়াড়, গোয়াল, নিজের ঘর সবই রূপকাকারে বললাম, পাঠক নিজ বোধে বুঝে নেবেন। কিন্তু আমার জীবনে এটা ঘটেছে - বহুবারই ঘটেছে। গুরুকৃপা যেমন পেয়েছিও অনেক, অপচয়ও করেছি অনেক বেহিসাবীভাবে। তবুও তিনি কৃপা বর্ষণে বিরত হননি এই অধম সন্তানের প্রতি। কখনও না - কোনদিনও না।

যাই হোক কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি। শুরু হয়েছে কলেজ জীবন একটা খাতা দিয়ে, কারণ বই তো নেই একটাও, কোথায় পাব? পয়সাই তো নেই বই কেনার। তাই অনেকে কষ্টে চেয়ে চিন্তে ২/১ খানা পুরানো বইও জোগাড় হল আমার মেজ মামার ছেলের কাছ থেকে। যদিও সে আমার থেকে বয়সে বড় অনেক আগে পড়ে গেছে। তাহলেও তখনকার দিনে তো এখনকার মত বই বিক্রী করে পয়সা পাইয়ে দেবার অছিলাতে বা অন্য একাধিক কারণে ঘন ঘন সিলেবাস বদলাতো না। একটা ষ্টান্ডার্ড বই, ভাল লেখকের লেখা বই অনেকদিনই চলত। সুতরাং মেজ মামার ছেলের বইগুলো কাজে দিল - সুরু হোল জীবনের জয়গান। কিন্তু হঠাৎ একদিন পিসীমা

যখন অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য বলে বসলেন তখন সেই জয়গান বেসুরো বাজতে লাগল, দমবন্ধ হয়ে আসার মত হয়ে কানে কর্কশ ধ্বনি ছড়াতে শুরু করল। - আবার শুরু হল ডেরা ডান্ডা গুটানোর পালা।

☞ মামার বাড়ীতে ক্ষণিকের অতিথি

আগেই বলেছি এপার বাংলায় পা দিয়েই আমার কষ্টের দিন শুরু হয়েছিল। তাই আশ্রয়হীন অবস্থায় এসে পিসীমার বাড়ীতে একটু স্থির হয়ে বসার আগেই হঠাৎ দমকা ঝড়ে সে বাসাটাও ভেঙ্গে গেল। কিন্তু পাঠকের স্মরণ থাকার কথা যে আমি একথাও বলেছি আমার চলার পথে গুরুদেব যেন আলপনা চিহ্ন এঁকে রেখেছিলেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই পিসীমার বাড়ীতে থাকার জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন দীনহীন কাঙাল অবস্থায় নিজের থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে এর দোর তার দোরে ভিক্ষা করছি আশ্রয় লাভের ও অন্ন সংস্থানের জন্য, বারে বারে বিমুখ হচ্ছি, দিশাহারা পথিকের মত অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি,- ঠিক সেই সময় আমার ন'মামা দেবতার আশীর্ব্বাদের মত হঠাৎ ছোট মামার লেকের ধারে বাড়ীতে এসে উঠলেন। খুব রাশভারী লোক ন'মামা। ছোট মামাও তখন কলকাতায় নামকরা উকিল, প্রচুর আয় করেন। আমার মেজমামার ছেলেরাও তখন টালিগঞ্জে থাকে, আর সেজমামা তাঁর ছেলেদের কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে পড়াশুনা করাচ্ছেন। প্রচুর আয় করছেন, ময়মনসিংহ জেলা জজ কোর্টের এক নম্বর উকিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! যার এতগুলো আত্মীয় কলকাতার বুকে বাড়ী করে, কেউ ভাড়া বাড়ীতে প্রচুর আয়ে দিন কাটাচ্ছে তারই নিজের রক্তের একজন উচ্চাশা বুকে লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে দুটো ভাতের সংস্থানের জন্য দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাই হোক ন'মামা তো আমাকে দেখে দারুণ খুশী। তাঁদের ছোটবোনের ছেলে আর আমার

মাকে ন'মামা তাঁদের ভাইদের সবচেয়ে ছোট একমাত্র বোন বলে খুব ভালও বাসতেন। আমার কথা শুনে ন'মামা খুব মর্ম্মাহত হলেন। তিনি তখন আমার দাদার কলেজে পড়ার জন্যও আর্থিক সাহায্য করছেন। যদিও দাদা তখন মেজমামার ময়মনসিংহের বাড়ীতে গায়ে গতরে খেটে শ্রমদান করে ওঁর বাড়ীতে দুটো অন্নের সংস্থান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পড়ার খরচ ন'মামা দিতেন। সেই ন'মামা আমার এই দুরবস্থার কথা শুনে বললেন, "আমাদের এত আত্মীয় থাকতে আমাদের অত্যন্ত আদরের একমাত্র ছোট বোনের ছেলের দুটো অন্ন জুটছে না?" তিনি আমাকে তখন মেজমামার ছেলেদের কাছে যেতে বললেন। আমি ন'মামার কথামত গেলামও। কিন্তু তারা বললেন, "থাকতে পার, তবে রেশনের টাকা দিতে হবে।" ন'মামা শুনে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে বললেন, "টাকাই যদি দিবি তাহলে ওদের ওখানে কেন হোটেলেই তো থাকতে পারিস।" যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই চেষ্টায় ছোটমামার বাড়ীতে আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হোল - ছোটমামার বড় ছেলের ঘরে থাকার নির্দ্দেশ হোল, ভাইবোনদের সাথে খুব আলাপও হয়ে গেল। কিন্তু বিধাতা বোধহয় মুচকি হাসি হেসেছিলেন সেদিন সে সময়ে। সেই কথাতেই আসা যাক্।

☞ মারলাম এক আছাড় অন্ন গেল বাছার

কথায় বলে, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। আমার জীবনেও এটা মামার বাড়ী আসার পরই ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বেশ আছি মামার বাড়ীতে, ভাই বোন সবারই খুব আপনার হয়ে গেছি। আর বাড়ীতে থাকতে গেলে একটু কাজ কর্ম্ম করতেই হয় সবাইকে। সেটুকু খুশীমনে করি, খাই, দাই, ভালই আছি। কিন্তু তাই কি হয়? চিরকালের কষ্টের জীবনে সুখ সইবে কেন? সইলও না। বাড়ীতে মামার একটা হিন্দুস্থানী চাকর ছিল। কি কারণে জানিনা হঠাৎ সে ব্যাটার ঠিক ঐ সময়েই চাকরীর জবাব হয়ে গেল। আমি তখন

নিজেই মামীমাকে বললাম, "ও মামীমা! ও যে গেছে যাক্ গে, নূতন লোক রাখার আর কোন দরকার নেই, আমি তো আছি! শুধু শুধু লোকের কি দরকার? এইসব কাজ আমিই পারব। এ তো কিছুই নয়। তাছাড়া পিসীমার বাড়ী এটুকু কাজ করার অভ্যাস আমার আছে। তারপর আমরা গাঁয়ের ছেলে, এ সব কাজ আমাদের গায়েই লাগে না।" মন ভেজানো কথা হলেও মামীমা কিন্তু খুব খুশী হলেন, কারণ মামীমাই তো বাড়ীর সব। মামা ত নিজের কাজ নিয়েই সদাব্যস্ত। ঘরের ব্যাপারে মামীই সর্ব্বেসর্ব্বা, তা সেই মামীকেই জিতে নিলাম। আবার কি? সবাই খুব খুশী। সবাইয়ের ফাই ফরমাস খাটি দুটো ভাতের জন্যে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কিছুতেই আটকায় না আমার। বিকাল হলেই কলেজে যাই। কলেজ যাবার পথে যে কোন ব্যায়ামাগারে ঢুকে একটু স্বাস্থ্যচর্চ্চা সেরে নিই। ভাল স্বাস্থ্য থাকার সুবাদে যে কোন ব্যায়ামাগারেই অবাধ গতি আমার। সকলেই ভালবাসত। অমূল্যদা তো (অমূল্য চক্রবর্ত্তী), যিনি ব্যায়ামাগারের ভারোত্তলনের শিক্ষক ছিলেন, আমার সুঠাম স্বাস্থ্য দেখে, শক্তির পরিমাণ জেনে ভারোত্তোলন চর্চ্চার উপদেশ দিলেন। কিছুদিনের অভ্যাসে কৌশলগুলো বেশ দ্রুত আয়ত্ত্বও করলাম। ভেতরের শত্রুর কামড়ের বিপন্নতার কথা সকলের কাছে বলি। প্রতিকার চাই কিছুই হয় না। নিত্য কোন না কোন দেবালয়ে যাই, কিছুটা সময় কাটাই, প্রার্থনা জানাই রিপুর দংশনের অব্যাহতি পেতে। সবই বিফল হয়। এভাবে কলেজ, বাড়ী, ব্যায়ামাগার, মন রেখে ভাতের জোগাড়, স্বাস্থ্যের জোগাড়, শিক্ষার জোগাড়, এক আগার থেকে আর এক আগার শিক্ষাগার, ব্যায়ামাগার, গৃহ কারাগার মোটামুটি ব্যালান্স রেখে কোন রকমে তখন চলছি। অমূল্যদাও মনে করছে আগামী ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় নেমে তাঁকে পুরস্কার এনে দিচ্ছিই। কিন্তু সবই ঐ পর্য্যন্ত রয়ে গেল। অমূল্যদাকে গুরুদক্ষিণাও দেওয়া হল না। নিজের স্বাস্থ্য চর্চ্চাও ঘুচল, শেষমেষ অন্নের আগার মামাবাড়ীর দরজাটাও চিরদিনের জন্য বন্ধ হল। কেমন করে? ভাগ্যের পরিহাস, সেই কথাই বলছি।

ধূমকেতুর মত মামার বাড়ীতে মামীমার বোনের এক ছেলের উদয় হোল ঐ সময়ে। লম্বা চওড়া চেহারা, সুদর্শন যুবক, আমার চেয়ে বয়সেও বড়। সে এই বাড়ীতে এসেই আমার পিছনে লাগতে লাগল। দিনরাত বিদ্রূপ, ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, কথায় কথায় ভাতের খোঁটা। খালিই বলত, "ওরে পরের বাড়ীতে খেয়ে ওরকম শরীর বাগানো যায়।" মনটা শূন্য হয়ে যেতো — ভাবতাম গরীব বলেই তো বলছে, বলতে সাহস পাচ্ছে। কিন্তু কি করব? উপায় তো নেই। এটাই আমার প্রাপ্য। আড়ালে টিটকারী, চিমটি কাটা, গাঁট্টা মারা, যত রকমের শয়তানী, সব চলত আমার উপর কিন্তু সব কিছু নীরবেই সহ্য করতাম বাধ্য হয়ে— দুটো পেটের ভাতের জন্য। শয়তানটা কারও চোখে না পড়ে এমনভাবে অত্যাচার চালাত, লোক দেখলেই একেবারে বিকারশূন্য ভাব দেখাত যেন পুঁটি মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তাছাড়া তার মনে মনে তো মামীমার জন্য একটা অহংবোধ কাজ করছে। সেও তো বলতে গেলে এ বাড়ীরই অন্য এক ভি.আই.পি, তার বিরুদ্ধে কে যাবে? কার ঘাড়ে দুটো মাথা? মুখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে সবই সহ্য করছিলাম এতদিন। কিন্তু সেদিন আর সহ্য করতে পারিনি। পারিনি নয়, পারা গেল না বলা যায়। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারিতের পুঞ্জীভূত বেদনা সেদিন একসঙ্গে গর্জ্জনের ভিতর দিয়ে সরব প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিল।

মামীমা দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন। আমিও দুটো খোঁটার ভাত খেয়ে একটু বিশ্রামের জন্য মাত্র শুয়েছি, শয়তানটা যেন ঝাপিয়ে পড়ে বিরক্ত করতে সুরু করল। মাত্রাহীন অত্যাচারে জর্জ্জরিত অবস্থায় দীর্ঘদিনের ক্রোধ বদলা নিল। কোন কথা না বলে শয়তানটাকে মারলাম তুলে এক আছাড়। ব্যস্! কাপড়ও খুলে গেল যেন কাছার, অম্নও উঠল এই গরীব বাছার। আর যায় কোথা? চিরাচরিত প্রথায় ধনবানের জয়, গরীবের পরাজয়! শয়তানটা ভাবতেই পারেনি এরকম ঘটবে। আছড়ে পড়েই বিকট চিৎকার করে "ও মাসীগো! মেরে ফেললে গো। বাঁচাও বাঁচাও।" মামীমা সেইমাত্র

কিছুক্ষণ শুয়েছেন, ঐ চীৎকার শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আঁতকে উঠেই আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকেই বোনপোকে ধরাশায়ী দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন, "ওরে বাবারে! একি হলো রে? দুধের ছেলেটাকে মেরে ফেললে রে?" ওদিকে মাসী বোনপো ছুতনাতায় মরাকান্না জুড়েছে। এদিকে আমি ভাবছি "সেকি? এত বুড়ো খোকা আমার থেকে বয়সে কত বড়, সে হল দুধের ছেলে? তাছাড়া মেরে কাকে ফেললাম, শুধু তো মামুলি একটা কুস্তির প্যাঁচ কষেছি, আর তাতেই বাছাধন চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। তখন তো কুস্তি করতাম তাই সে প্যাঁচেই কাত হয়েছে। মেরে ফেল্লামই বা কোথায়, আর মেরেছেই বা কে? ও তো শুধু কায়দার চোটে পড়ে গেছে। যাই হোক, সেই শয়তানের ধরাশায়ী হওয়াই আমাকেও ভাগ্যের কাছে শয্যাশায়ী করে রাজশাহীর পাশে আমার প্রিয় জন্মস্থান ময়মনসিংহে পাঠিয়ে ছাড়ল। কারণ তারপর তিনদিন অন্নজল জোটেনি — দেয়ওনি চাইওনি — ভরসা ছিল শুধু দু'পয়সার গুড় আর রাস্তায় ঘুরে কলের জলে পেট ভরানো। কেননা, কারও কাছে কোনদিন নিজের জন্য হাত পাতিনি, সেদিনও পাততে পারিনি। ভাগ্যিস্ পরীক্ষাটা শেষ হয়েছিল গুরুকৃপায়। কারণ পাঠক সহজেই বুঝছেন যে ঐ ঘটনার পর মামার বাড়ীর বিদায় ঘণ্টা জোরেই বেজেছিল। তাই তো বললাম, "মারলাম একটা আছাড় আর অন্ন গেল এই বাছার।"

তারপর? তারপর আর কি করব? বাধ্য হয়েই দেশের বাড়ী চলে গেলাম আর যাওয়ার পরে পরেই যা আশঙ্কা করছিলাম সেটাই ঠিক ঘটল অর্থাৎ বাবার কাছে ছোট মামা চিঠি পাঠিয়ে লিখলেন, "শ্রীমানকে আর এখানে পাঠাবেন না"। আরে সে তো জানা কথা। এ তো আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া ব্যাপার। মামীমার ক্রোধ মানেই তো সেখানের পাট চুকবেই। মামা কে? মামা তো তখন জো হুকুমের মালিক। সে তো আগে থেকেই জানি কার ইঙ্গিতে কি ব্যাপার ঘটবে বা ঘটতে পারে। এটা যে কখনই মামার অভিমত নয় সেটা আমার থেকে স্পষ্ট কেউ জানেন না। তাই বিমর্ষ হইনি,

কারণ এটা তো হিসাব মেলানো ব্যাপার। কিন্তু তার পরের হিসাব ঈশ্বর কি ভাবে মিলিয়ে রেখেছেন দেখে অবাক হতে হবেই হবে। তাই আবার সেই হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে ফিরতে হল যখন, তখন আবার শুরু হল গুরুদেবের নূতন লীলা, আরম্ভ হল আর একটা অধ্যায়। সেই কথাতেই আসছি কিন্তু আবার বলে রাখি যে গুরুদেব আমার জীবনের চলার পথকে যেন আলপনা এঁকে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন।

পিসীমার শ্বশুরের বাড়ীতে থাকতে দিতে অমত করার জন্য পিসীমার বাড়ী ছেড়ে তো মামার বাড়ী ঠাঁই হোল, সেখানে পাট চুকিয়ে মারীমার ক্রোধের শিকার হয়ে ময়মনসিংহের বাড়ীতে যখন আছি —কি করব, কোথায় থাকব ভাবছি — এমন সময়ে এদিকে পিসীমার বাড়ীতে তখন খেল সুরু হয়ে গেছে।

পিসেমশায়ের তখন একটা ইলেকট্রিক ফ্যানের কারখানা ছিল, বর্ত্তমানে যার নাম হয়েছে "পোলার ফ্যান"। হস্তান্তর ঘটে বর্ত্তমানে কে মালিক জানা নেই। তবে তখন পিসেমশায়ের ঐ রমরমা কারখানা ইতিমধ্যে আর্থিক সঙ্কটে বন্ধ হয়ে গেছে আর পিসেমশায় বহু টাকার দেনায় জড়িয়ে গেছেন। এমন অবস্থা ঘটেছে যে কোনদিক থেকে ঠেকা দেওয়ার কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে ঐ পিসেমশায়ের বাবা গত হয়েছেন। ভাই, ভাগনা আত্মীয় পরিজন যারা ঐ কারখানায় পিসেমশায়ের দৌলতে উঁচু উঁচু পদে কাজ করতো, যেমন এক ভাই ছিল ইঞ্জিনিয়ার, মানে বলতে গেলে যারা পিসেমশায়কে ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছিল, তারা পিসেমশাইকে আর্থিক সাহায্য তো দূরের কথা, এই দুর্দ্দিনে সব ছেড়ে পালিয়ে গেছে। যা হয় আর কি ? সুসময়ের বন্ধুরা অসময়ে কেউ নয় মনে করে সবাই গুডবাই জানিয়েছে। হায় রে পয়সা! হায় রে দুদিনের অহঙ্কার! কত লোকের, কত আত্মীয়ের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে, নিজের পছন্দের লোককে আপন করে চাকরী দিয়ে সাহায্য করে যে একদিন নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিল —

এরা সবাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করবেই — সেই তারাই কিন্তু আজ দুর্দ্দিনে সবাই তাকে পর ভেবে দূর দূর করে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' মনে করে ত্যাগ করে গেছে। পিসেমশাই এর আর্থিক টান এত বেড়েছে যে দুটো বেশী পয়সার জন্য নিজের ঐ প্রাসাদ তুল্য বাড়ী ভাড়া দিয়ে, কম পয়সায় সংসার চালাতে কম টাকায় বাড়ী ভাড়া করে থাকার জন্য উঠে যেতে হয়েছে। অথচ এই পিসেমশায়ের বাড়ী থেকে গ্রাম থেকে আসা এক গরীব উচ্চাকাঙ্খী আত্মীয়কে দুটো ভাতের জন্য অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস? বিধাতার কি নিষ্ঠুর খেলা? ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান? ''চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'' - কথাটার একেবারে নিখুঁত প্রয়োগ জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। 'আজ আমীর, কাল ফকির' উক্তিটির সার্থক রূপ দেখতে পাই। তো ঘুরে ফিরে আবার একদিনের সেই ফকিরটাই চলে এল ঐ ৪নং হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীটাতে। দায়িত্ব পড়ল ভাড়া বাড়ীটার দেখাশুনা করার। তিনতলাটা ফাঁকা ছিল, ঐখানেই ড্যারা গাড়লাম। কারণ পিসেমশায়ের এমন আর্থিক দুরবস্থা যে সংসার চালান দায় ভেবে পিসীমাকে পর্য্যন্ত তাঁকে নিজের বোনের বাড়ী সুদুর বিহার শরীফে রেখে আসতে হয়েছে। আর গুরুদেব এই অধমকে করে দিয়েছেন সেই বাড়ীটারই কেয়ার টেকার। যে বাড়ীটা থেকে চোখের জল ফেলে দুটো ভাতের জন্য তাকে চলে যেতে হয়েছিল। ঈশ্বরের কি বিচিত্র খেলা তাই ভাবি।

বাংলার বাইরে বেশী যাইনি আমি কোনদিন — একবার শুধু পুরী গিয়েছিলাম, আর এখানে থাকতে থাকতেই রাজগীরটা দেখা হয়ে গেল। তাড়িয়ে দেওয়া পিসীমার ঐ প্রাসাদোপম বাড়ীটার আমিই এখন বলতে গেলে সর্ব্বেসর্ব্বা। দিব্যি খাই দাই থাকি, কালীঘাটে যাই মাঝে মাঝে মাকে দর্শন করতে, নানা সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করি, সঙ্গ করার চেষ্টা করি। আর এই সময়ে আমার সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ছিল পরিতোষ মানে পরিতোষ সেনগুপ্ত, আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বলাও

যায়। আমি যেন ওদের পরিবারেই একজন হয়ে গিয়েছিলাম। ওর বাবা, মা, কাকা, কাকীমা ও তাদের ছেলেমেয়েরা মিলে ওদের বিরাট পরিবার। বাবা, কাকা, দাদারা সবাই তখন ওরা কিলবার্ণ কোম্পানীতে চাকুরী করে। দারুণ ভালবাসত ওরা আমাকে, আর এই ভালবাসা না পেলে আমার চাকুরী করাই কঠিন হোত। কঠিন কেন, চাকুরীটা বোধহয় জুটত কিনা সন্দেহ। এ সবই আমার গুরুকৃপা। চাকুরীর কথায় পরে আসছি। কিন্তু গুরুকৃপার কথা স্মরণে এল, তাই বলছি, পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন তো, আমি এখন কোথা থেকে কেমন ভাবে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সাজানো পথে চলছি কিনা? যেন আগে ভাগে আমার চলার পথ নির্দ্দিষ্ট করে রাখা ছিল কিনা? আমার এখন "নেপোয় মারে দই" এর অবস্থা কিনা? তাই তো আবার বলছি "জন্ম লগ্ন থেকেই গুরুর দৃষ্টি আমাকে ঘিরে রেখেছিল।"

☞ গুরুকৃপায় চাকুরী প্রাপ্তি

এই পিসীমার বাড়ীতে থাকার সময়ই অর্থাৎ কেয়ার টেকারের দায়িত্বে থাকাকালীনই অভাবনীয় ভাবে গুরুদেব আমার চাকরীটা যেন হাতে করে তুলে দিলেন বলা যায়। পিসীমার ঐ বাড়ীটাতে তখন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। ওঁর নাম মিঃ সদাশিবন, ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকুরী করতেন। আর ঐ ব্যাঙ্কেরই একজন চাকুরে মিঃ সদাশিবনের গেষ্ট হয়ে কিছুদিন এসে ছিলেন। তাঁর নাম এ.বি.এন মুনি। ঐ ব্যাঙ্কের একজন বড় অফিসার হয়ে এসেছেন তখন মিঃ দেশাই বলে এক ভদ্রলোক। আর মিঃ সদাশিবম ও মিঃ মুনি খুব ফাঁপড়ে পড়ে গেছেন, কারণ ওঁরা ঐ অফিসারের থাকার জন্য একটা উপযুক্ত বাড়ী তখন কোনরকমেই কোথাও জোগাড় করতে পারছেন না, খুব মুশকিলে পড়ে গেছেন। ওঁরা একদিন হঠাৎ কোন কিছু না করতে পেরে আমাকে বললেন যে, "তুমি যদি কিছু দিনের জন্য তোমার ঐ তিনতলার ঘরগুলো ভাড়া

দাও তাহলে খুব উপকার হয়।'' ঠাকুরের কি খেলা দেখুন! যে একদিন ওই ঘরগুলোতে নিজে বাস করার অধিকার অর্জ্জন করতে পারেনি, আজ তাকে লোকে জিজ্ঞাসা করছে যে সেই ঘরগুলো সে ভাড়া দেবে কিনা? কেননা ঠাকুরই তো তাকে আজ বাস্তবে সেই পদে আসীন করে দিয়েছেন। যাই হোক, ওদের বল্লাম, ''দ্যাখ ভাই, আমি তোমাদের ঘরগুলো ভাড়া দিতেও পারব না, আর ভাড়ার টাকাও নিতে পারব না কারণ ঘরের মালিক তো আমি নই, আর তাঁরা এখানেও থাকেন না যে কথা বলে দেব। তবে তোমাদের অন্য উপায় না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা ঐ ঘরগুলো সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে যাতে পার সেটুকু ব্যবস্থা করতে পারি।'' অন্য কোন উপায় না থাকায় অগত্যা রাজী হয়ে গেলেন তাঁরা এবং ঐ ঘরগুলোতে বসবাস আরম্ভ করলেন। ওঁরা অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন, অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। মাসখানেক ওঁরা অর্থাৎ মিঃ দেশাই ওই ঘরগুলোতে বাস করে অন্যত্র চলে গেলেন। এদিকে মিঃ মুনি একদিন আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ''ব্যাঙ্কে চাকরী করবে?'' আমি বললাম ''সেই আশাতেই তো আমি রাত্রে কলেজে পড়ছি।'' কারণ আমার তখন, ''ন্যাড়া, ভাত খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি'' এমন অবস্থা। মিঃ মুনি বললেন ''ঠিক আছে মিঃ দেশাইকে বলে তোমার একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখছি।'' তখন সেই সময়ে এখানকার কাজ তাঁদের মিটে গিয়েছিল, তাঁরা হায়দ্রাবাদ চলে গেলেন। আর আমাকে বলে গেলেন ''তুমি চিন্তা করো না, আমরা গিয়ে তোমার জন্য ওখান থেকে সব ব্যবস্থা করে তোমাকে চিঠি দিয়ে জানাব।'' ইতিমধ্যে পিসীমারা বিহার থেকে চলে এসেছেন। আর আমিও তখন আর কি করব। কাজে কাজেই কিছুদিনের জন্য আবার দেশের বাড়ীতে পূর্ব্ববাংলায় ফিরে গেলাম। তখন ওটার নাম ছিল অবশ্য পূর্ব্ব পাকিস্তান। ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা - আমিত তখন মামীমার তাড়া খেয়ে বাড়ীতে ছিলাম, পিসেমহাশয়ের দুরবস্থার কথা জানিই না। লীলাময় আমাকে এখানে কান্ড ঘটিয়ে নিয়ে এলেন সেই পিসীমার বাড়ীতে, কোথা থেকে মিঃ দেশাইকে কিছুদিনের জন্য নিয়ে

এলেন সেই বাড়ীতেই গেষ্ট করে আবার ঠিক কাজটুকু সারা হলে, পিসীমাও তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলেন আর আমিও দেশে ফেরৎ গেলাম। কাজের কাজ কিন্তু ঠাকুর ইতিমধ্যেই সেরে রেখে দিলেন। বুঝলাম এই জন্য যে, দেশে গিয়েই মিঃ মুনির চিঠি পেলাম "হাওড়া বালীগঞ্জের ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাতে দেখা করো, সেখানে চিঠি যা দেবার দেওয়া হয়েছে।" বাড়ী থেকে ফিরলাম, গেলাম বালীগঞ্জ ব্রাঞ্চে - ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। জাতে বাঙালী ভদ্রলোক তো, সোজা বলে দিলেন এখানে কোন পদ খালি নেই। কি করব? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওখান থেকে গেলাম হাওড়া ব্যাঙ্কের শাখাতে। ম্যানেজার ভদ্রলোক ছিলেন পাঞ্জাবী। ইনি কিন্তু বাঙালী নয়। তাই একটু আশার আলো দেখালেন, বললেন "এখানে হলেও হতে পারে, তবে টাকা পয়সার ব্যাপার তো, ,বিভিন্ন মিলে গিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে আসতে হবে - খুব বিপজ্জনক ও দায়িত্বশীল কাজ। কিন্তু ব্যাঙ্ক তোমার কোন দায়িত্ব বা ঝুঁকির জন্য দায়ী থাকবে না। ভদ্রলোক ইংরাজীতে কথা বলছিলেন আর আমিও যথাসাধ্য বুঝে কষ্ট করে কোনরকমে জবাব দিলাম। বললাম, "ছেলে বড় হলে বাবা মাই কোন দায়িত্ব নেয় না - ব্যাঙ্ক তো নেবেই না - এ তো জানা কথা। কিন্তু চাকুরীটা আমার চাই-ই।" তখন তিনি বললেন (খুব সংক্ষেপে বলছি) একহাজার টাকা জমা রাখতে হবে তোমাকে। আমি বললাম, "কোথায় পাব?" তখন উনি আবার বললেন, "ঠিক আছে! তুমি পাঁচশত টাকা জোগাড় করে এসে দেখা কর।" আমি তখন বললাম, "কোথায় পাব অত টাকা আমার কোন উপায়ই নেই।" ভদ্রলোক যেন একটু থমকে গেলেন। কি ভাবলেন কি জানি! শেষে বললেন "দেখ কমপক্ষে তিনশ টাকা তোমায় জমা রাখতেই হবে, চেষ্টা করে দেখ না, তারপর এসো, দেখা যাবে।" কি সর্ব্বনাশ, শেষে তীরে এসে তরী ডুবে যাবে? কিন্তু কোথায় পাব অত টাকা! আমায় সাহায্য করার মত কেউই নেই। কত চেষ্টা করলাম, কত ভাবলাম কার কাছে পেতে পারি। কিছুই হল না, কেউ দিল না। শেষে যখন ভেবেই নিয়েছি চাকরীটা হাতছাড়া হোল তখন আবার

একবার লীলাময়ের লীলা দেখলাম। পরিতোষের দাদা একদিন আমাকে বললেন, "তোমার জমার জন্য তিনশত টাকা আমি দেব - যাও কোন চিন্তা করো না, তবে টাকাটা ভাই আমাকে ফেরৎ দিতে হবে।" আনন্দে চোখে জল এসে গেছে, ভাবছি, এত বড় লোক আত্মীয় থাকতে কেউ আমাকে সামান্য তিনশত টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারল না অথচ যে আমার জাগতিক সম্পর্কের কেউ নয়, যার কাছে কোন কিছু প্রত্যাশাই আমি করতে পারি না - সে অযাচিত ভাবে নিজেই এগিয়ে এল আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে? কাকে তাহলে আত্মীয় বলব? পরিতোষের দাদা না আমার আত্মীয়রা? এখানেও ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা? অবশ্য পরিতোষরা ছিল কোলকাতার ঐ এলাকায় পুরানো বাসিন্দা। এখন তারা কোথায় আছে কে জানে? যেখানেই থাক, ভগবান তাদের মঙ্গল করুন। যাই হোক, পরিতোষের দাদাকে কথা দিলাম টাকাটা প্রত্যেক মাসে মাহিনা থেকে ফেরৎ দেব এবং সেই অনুসারে তিনশ টাকা ধার করে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম আর দৈনিক চার টাকা রোজে ব্যাঙ্কে আমার চাকুরী জীবনও অস্থায়ীভাবে সেই থেকে সুরু হল। অবশ্য মায়ের চুরি বিক্রি করে দাদা দেশ থেকে টাকা পরের মাসেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর পরিতোষের দাদার ঋণও পরের মাসেই শোধ করে দিয়েছিলাম। ছুটির দিনে কাজও নেই, তখন আমার মাহিনাও ছিল না - এই হোল জীবনে চাকুরী পাওয়ার ইতিহাস। পরের বছর মিঃ মুনি যাওয়ার সময় বলেছিলেন, "চিন্তা করো না এবার এসে তোমাকে উচ্চপদে চাকরীর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।" আমি বলেছিলাম, "আর বেশী কিছু চাই না - এতেই আমার চলে যাবে।" গুরুদেবের কৃপায় চলেও গেছে। সারাজীবন আমি সেই ক্যাশেই কাজ করে এসেছি ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৭ পর্য্যন্ত। তারপর চাকরীর মেয়াদকাল পূর্ণ হবার আগেই ১৯৮৭ সালে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে নিয়েছি। কারণ চাকুরী করা আর সেই সময় আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না।

শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

☞ কষ্টকর দিনগুলির ইতিবৃত্ত

দেশ থেকে ফেরার পর থেকেই ব্যবহারিক জীবনে কষ্টকর যে অধ্যায় আমার জীবনে সুরু হয়েছে কোথায় যে তার শেষ হবে তা একমাত্র গুরুদেবই জানেন। চাকুরী জীবনে সামান্য টাকা সম্বল করে জীবনের সুরু, তারপর পিসীমার বাড়ী ছেড়ে চলে এসে বালীতে ভাড়া বাড়ীতে নিজের রোজগারের টাকায় থাকতে আরম্ভ করলাম। ইতিমধ্যে দাদা এখানে এসেছেন, ছাত্র পড়িয়ে সামান্য সামান্য কিছু পেতেন - এই দিয়েই কোনরকমে চলত। ইতিমধ্যে বালিগঞ্জে নাইট কলেজে বি.কম ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি। সকাল ৯টায় বাড়ী থেকে বেরুই হাওড়া ময়দানে ব্যাঙ্কে চাকুরী করে বিকালে কলেজ করি, বাড়ী ফিরি রাত ১১টায় / সাড়ে ১১টায়। এই সময় ছোটবোনের কঠিন অসুখ হোল, গুরুকৃপায় আরোগ্যলাভ ঘটল। এর মধ্যে গুরুদেব আমাকে কত হাত দিয়ে যে কৃপা করেছেন কি বলব? ডাক্তার, কবিরাজ, প্রতিবেশী, বন্ধু, সহকর্মী সকলের কাছে ঋণী হয়ে আছি। গুরুদেব শোধ দেবেন এই বিশ্বাস। পাঠক বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা কিন্তু সত্য বলছি, আমি বলতাম, "যারা আমার জন্য করেছে, আমার এই দুটো হাত দিয়ে তাদের জন্য আমি কি করতে পারি? গুরুদেব সহস্র হাতে তাদের জন্য করবেন। সব তাঁর চরণে জমা হয়ে আছে।" কতই তো দেখলাম! কি অবিশ্বাস্য কষ্টকর জীবন যে কাটাতে হয়েছে আমাকে ! কি অসম্ভব পরিশ্রমই না করেছি! শরীরটা ভাল থাকার জন্য তখন বুঝিনি। রোগ ব্যাধি আমাকে কোনদিনই কাবু করতে পারত না, পারেও নি। এই দেহে কতই না অত্যাচার করেছি - কতই না অনাচার করেছি - এই দেহটার কত গর্ব্বই না ছিল অথচ আজ সেই শরীরটাই ব্যাধিতে জর্জ্জরিত। অবশ্য এই দেহটার জন্য শ্রীগুরুর সেবাকরাও সম্ভব হয়েছে - সুযোগ পেয়েছি তাঁর কত অভূত পূর্ব্ব লীলা দেখার, ধন্য হয়েছি তাঁর সঙ্গলাভ করে, কৃতার্থ হয়েছি এই চোখে ও ভিতরের চোখে (গুরুপ্রদত্ত চোখে) তাঁর অবিশ্বাস্য যোগবিভূতির সাক্ষী হতে পেরে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যে কি আছে তার জন্য শঙ্কা বোধ

হচ্ছে। কারণ চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।

বালীর বাড়ীতে আসার পর বোনের বিয়ে হল। সেও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম করুণা। বহু হাতের মাধ্যমে তাঁর দয়াতেই সাহায্য এল - সমস্ত মিটেও গেল। আমাদের ভরসা তো তিনি। কারণ আমার তখন সে অবস্থা কোথায়? এরপর বালীতে আমার এক বন্ধুর বোনের সাথে দাদার বিবাহ হল। আমি ঘটক, বিবাহ উৎসবের সম্পন্ন করার নায়কও আমি। বিবাহের কথাবার্ত্তা একেবারে পাকা করে দাদাকে বললাম অমুক দিন তোমাকে বিবাহ করতে হবে। দাদা ছোটবেলা থেকেই আমাকে খুব ভালবাসেন — বিশ্বাস করেন, আমার কাজের উপর নির্ভর করেন, কোনদিনই আমার কথার প্রতিবাদ করেননি, এখনও করেন না - আজ পর্য্যন্ত এমনটিই হয়ে আসছে। আমিও দাদাকে যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করি। বৌদি আসার পর আমার কাজ অনেক কমে গেল। হাত পুড়িয়ে খেতাম, বৌদি এসে রান্না ঘরের ভার নিলেন। আজও সেই রান্নাঘর আগলাচ্ছেন। আড্ডা দিতে ওস্তাদ ছিলাম। পাড়াতেও লিডার ছিলাম, রোগীর জন্য রাত জেগে সেবা করা, মরা বওয়া, পাড়ার স্বাস্থ্য রক্ষা, বিনি পয়সায় ছাত্রছাত্রী পড়ানো ইত্যাদি সেবামূলক কাজ, পাড়ার পূজো, উচিত কাজে এগিয়ে যাওয়া এই সব নানাকাজে প্রেরণার উৎসও ছিলাম, কাজও করতাম কিন্তু সব কিছু করছি অথচ ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ করছি। ভেতরে যেন একটা চাপা কান্না অনুভব করতাম। মনটা কি যেন চাইছে কি একটা যেন খুঁজছে পাচ্ছে না। দারুণ অতৃপ্তিবোধ কাজ করছে - শান্তি পাচ্ছি না। সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে ঘুরছি, দক্ষিণেশ্বর তো নিয়মিত যেতাম, এ ছাড়া তাবিজ কবচ, মাদুলি, কিছুতেই মন শান্ত হোল না। আবার ব্যায়াম আরম্ভ করলাম। কত কিছুর মধ্যে নিজেকে ডোবাতে চাইছি - দেশের বাড়ীতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পূর্বে হত — কালীপূজো, লক্ষ্মীপূজো ,সরস্বতীপূজো সব সুরু করলাম। পন্ডিত, জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, সাধু সন্ন্যাসী - নাঃ কোনটাতেই অশান্ত মনকে ঠান্ডা করতে পারলাম না। অতৃপ্তি ভিতরে ভিতরে বোধ হতেই লাগল। তাছাড়া অনেকেই বলল যে দীক্ষা না নিলে,

গুরু করণ না করলে এ জ্বালা জুড়াবে না। একমাত্র রাস্তা দীক্ষা গ্রহণ। কিন্তু দীক্ষা বললেই তো হবে না, গুরু পাব কোথায়? অনেক খোঁজা খুঁজি করলাম, দেখলামও, কিন্তু কাউকেই তো পছন্দ হল না। দাদার শ্বশুড়বাড়ীর গুরুদেবের শরণাপন্ন হলাম। ওঁর কাছে মাঝে মাঝেই আগে থাকতেই যেতাম, তিনিও আমাকে খুব ভালবাসতেন, পছন্দ করতেন ও ওঁর বাড়ীতে নানা পূজাপার্ব্বণে আমাকে চিঠি দিয়ে ডাকতেনও। ওঁকে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করায় উনি আমাকে কোন কথা দিলেন না তবে দীপান্বিতা কালীপূজার পর দেখা যাবে বললেন। ইতিমধ্যে অভাবনীয় ভাবে আমার প্রিয়তম গুরুবাবা স্বপ্নে দেখা দিয়ে দীক্ষাগ্রহণের কথা জানালেন। সে ইতিহাস বারান্তরে লেখা হবে।

আবার ক্রিয়ার কথাতে ফিরে আসা যাক। যখন আমি তৃতীয় ক্রিয়া করি তখন দুই বেলাতে তদারকি না থাকলে এটা সম্ভব হোত না কখনই। তদারকি অর্থে বাবার দৈনন্দিন জীবনে তদারকির কথা বলতে চেয়েছি — বলতে চেয়েছি, তাঁর সখ্যভাবে সব কিছু জেনে নিয়ে সাহায্যদানের কথা। তা সে যত না-বলার মত কথা হোক না কেন — ঠিক বার করে নেবেনই। আবার যত কিছু অসুবিধা হোক সন্তানের, দূর করে দেবেনই। বলতে চাইছি তার শিক্ষক ভাবের কথা, বলতে চাইছি তাঁর পিতৃমাতৃ স্নেহচ্ছায়ার কথা। কি ভাবে তিনি পালন করেছেন আমাকে, তা বলা খুবই কঠিন। নিত্যসঙ্গী করে বাজারে নিয়ে গেছেন যেন তাঁর এ বন্ধুটিকে ছাড়া বাজার হবে না। এইভাবে ঠোঙ্গা করে মুড়ি কিনেছেন। মুড়িকে বাবা বলতেন হুরুম। নিজে মুখে দিচ্ছেন আর আমাকেও খেতে বলছেন। একছড়া কলা কিনে নিয়ে দুহাত ভর্ত্তি বাজার দিয়ে বলছেন টকাটক খাও। বন্ধুকে যেন মজা করছেন। আবার ক্রিয়ার এতটুকু কমতি দেখলে রুক্ষভাবে শিক্ষকসুলভ মনোভাবে শাসনও করছেন। গুরুর কাছ থেকে এমন সাহায্য না পেলে কি আর আমার ক্রিয়ার সোপানের উন্নতি হোত। কখনও মনে হয় না। আবার কি আশ্চর্যভাবের খেলা দেখিয়েছেন — পাঠক স্মরণ করুন সিনেমা দেখার সময়। নব দম্পতির বধুকে

দেখিয়ে আলিঙ্গন করে "ওগো চন্দ্রবদনী ...." ইত্যাদি বলে তৃতীয় ক্রিয়ার দেহ ও প্রাণ আলাদা হলে যে অবস্থা আসে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ওই সিনেমা হলে বসে বসেই। আবার ইংরেজী ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়ে কামনা বাসনা ত্যাগের নিঃশব্দ শিক্ষা দিচ্ছেন বহিরঙ্গ সাধনার মাধ্যমে, কখনও বা আশ্চর্য্য যোগবিভূতি প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর যোগের প্রতি প্রয়োজনীয় আকর্ষণ এনে যোগের মহান রূপ প্রকাশের প্রয়োজন ঘটাচ্ছেন, কখনও বা পরীক্ষক সেজে ক্রিয়ার বিবিধ অনুভূতির স্পর্শ ছুঁইয়ে শিষ্যের মনের নিষ্কলুষতার তার সংযমের , তার উদাসীন ভাবের পরিমাপ করছেন, কখনও বা আবার দায়িত্বশীল অভিভাবকের পদে আসীন হয়ে কখন কটায় ক্রিয়ায় বসেছি, কটায় ক্রিয়া শেষ করেছি কতগুলো প্রাণায়াম করছি ইত্যাদি খবর প্রত্যহ নিচ্ছেন। দুদিন-একদিন নয়, দিনের পর দিন। এমন পরমানন্দ মাধবকে রক্ত মাংসের শরীরে ধরতে পারার সৌভাগ্য কজনের হয় ? এখন আফশোষ হয়। কত অবজ্ঞাই না করেছি, কত অবহেলা, অনাদর, কত কটু কথা অম্লান বদনে হজম করে কত সহজভাবে, কত সরল ভাবেই না এই শক্তিধর পুরুষ ধরা দিয়েছিলেন আমাদের কাছে। সন্তানের কত অমার্জ্জনীয় অপরাধ তিনি কত তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। দুরূহ তৃতীয় ক্রিয়া জলের মত সহজ হয়ে গিয়েছিল নিত্য, তাঁরই নিত্য দেহের পরশ পেয়ে। বাবার শ্রীমুখে শুনেছি ঐ সমস্ত কঠিন ক্রিয়া, অথচ তা তখন কত সহজ ছিল। আজ সেই সমস্ত ক্রিয়াই দুরূহ বলে মনে হয় তাঁর ঐ স্থূল দেহের অভাবে। বাড়ীতে পুষ্টিকর খাবারের অভাব জেনে বাবা ও দয়াময়ী মা ঠাকরুণ কত পুষ্টিকর খাবার খাইয়েছেন এই বেইমানটাকে। আমার দয়াল বাবা যেমন আমাকে নিবিড় সঙ্গদান করে কৃতার্থ করেছেন, মনেহয় বাবা নিজেও বলাগড়ের গুরুদাদুর অত সঙ্গ লাভ করেননি। তাই মনে হয় শাস্ত্র পাঠ, গীতাপাঠ ও সব কিছু নয় - গুরু সঙ্গই গুরু শক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাতেই গুরুদেবের শক্তি সঞ্চারিত হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাবা যেন জোর করে ধরে কাছে রেখে নানা ছল ছুতোয় পরীক্ষাগুলো পাশ করিয়েছেন, ইনজেকশন

দিয়ে ঔষধ ঢোকানোর মত করে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন। তা নাহলে সঠিক সময়ে সোপান অতিক্রম করা, সংখ্যা পূরণ করা অবিশ্বাস্য। শুধু কি তাই, যখন যে ক্রিয়ার যে যে অবস্থা পাওয়ার কথা, সেই সেই অবস্থা তার আগেই আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আজও এই বৃদ্ধ বয়সে ৫/৬ ঘন্টা ধরে ক্রিয়ার আসনে বসতে পারছি, এটাও তাঁরই কাজ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

☞ সেদিন আর এদিনের অবস্থা

বর্ত্তমানকালে ক্রিয়া করার সেই মানসিকতাই দেখা যাচ্ছে না ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আমাদের কালে কয়েকজনের মধ্যে ক্রিয়ায় প্রচুর উৎসাহ দেখেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য, বর্ত্তমানকালে কি ছেলে, কি মেয়ে প্রত্যেকেই যেন একটা সমস্যা নিয়েই আসছে। তাই দেখা যাচ্ছে কোনরকমেই কোন উৎসাহ নেই। যতই গীতাপাঠ কর শাস্ত্রপাঠ কর না কেন মনে যদি বন্ধন মুক্তির ঐকান্তিক প্রয়াস না থাকে তাহলে যত ক্রিয়াই কর না কেন অবস্থা প্রাপ্তি ঘটবে না। ক্রিয়া করলেই তো হবে না - চাই অভিমান শূন্যতা - চাই ভক্তি, শ্রদ্ধা, গুরুতে অবিচল বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, আত্মসংযম — তবে হবে। ক্রিয়াটা যে কি তাই কেউ বর্ত্তমানে বুঝতে চাইছে না। গুরুতে তো শ্রদ্ধা ভক্তি নেই বললেই চলে, আছে শুধু ভক্তির ভঙ্গি। হে গুরুদেব! তুমি এই দুর্য্যোগে পথ দেখাও, নচেৎ ক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখাই দায় হবে। যদি আগ্রহ বর্ত্তমান ক্রিয়ান্বিতদের না বাড়ে তবে কি হবে? বড়ই আতঙ্কের ব্যাপার বলে বোধ হচ্ছে। কারণ ধর্ম্মহীনতা মানে পাশব বৃত্তির অভ্যুত্থান, বাহ্য স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে মেতে থাকার প্রবণতা। এক আসনে ৫/৬ ঘন্টা ক্রিয়া করার মত ক্ষাত্র শক্তির - সাধক সাধিকার অভাব ঘটেছে। হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য। তৃতীয় ক্রিয়া বাসুদেব মন্ত্রের সাধনা। এতে কৃতকার্য্য হতে পারলে জানা যাবে যে আমাদের এই স্থূল দৃষ্টি ও অপরাজ্ঞানের বাইরে আছে অসীমতার প্রকাশ। বিজ্ঞান পদে অবস্থান করে দেহ ও প্রাণকে আলাদা করে

নিজের স্বরূপ দেখার প্রাথমিক অবস্থা। জানিনা আমার বলাটা ঠিক ঠিক হল কিনা। গুরুদেবই জানেন, তবে এটুকু বলতে পারি যে ঐ ক্রিয়াতেই আমার আমিকে দেখার রাস্তা খুলতে থাকে। তবে গুরুকৃপা অবশ্যই দরকার, তবেই হতে পারে। নিষ্কাম ভাবে খেটে যেতে হবে। কামনা বাসনা দ্বারা বৈধী সাধনা হয় না। পরাজ্ঞানের সাধনা হয় না আর পরাজ্ঞান ছাড়া আত্মার প্রকাশ ঘটে না। অবশ্য এখানেই সুরু — শেষ যে কোথায় বলতে পারব না। কারণ আজও তার হদিশ পাইনি, এটুকু শুধু বলতে পারি।

☞ তৃতীয় ক্রিয়ায় স্থিতি ও সোপানের ব্যাখ্যা

এই তৃতীয় ক্রিয়া সর্ব্বব্যাপক বাসুদেব মন্ত্রের ক্রিয়া। সংশয় নাশের সাধনা। যেমন রাজবাড়ীর প্রধান তোরণ, কি তার জৌলুষ, কি তার রূপ, কি বিচিত্র বাহার, যে একবার দেখেছে সে কোনকালেই ভুলতে পারবে না। এই বাসুদেব মন্ত্রের সাধনার দ্বারা বহু জন্মজন্মান্তর এই দেহেতেই ঘটে যায়, পরিশেষে নিজেকে ও বিশ্বের সমস্ত কিছুকে বাসুদেবময় বলে মনে হয়। **অজপা নিয়ে মানুষ জন্মায়, অজপাই আয়ু, অজপার পুঁজি ফুরোলেই জীবের মৃত্যু হয়। তাকে স্মরণ করা ভাল, স্থিরত্বে সাহায্য করে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী হতে হলে সেই অজপার মুখ ঘুরিয়ে গুরু উপদেশ অনুসারে নিষ্ঠাভরে বহু প্রাণায়াম দ্বারা চঞ্চল বায়ু স্থির হয়ে জ্ঞান জন্মায়, সেই জ্ঞানে তখন জীব জন্মমৃত্যুর হাত থেকে চিরমুক্ত হয়।**

☞ সাধনার পথ কিন্তু অতিশয় দুর্গম

নানা বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে, সুখ দুঃখকে অবহেলায় সহ্য করে, সহনশীলতার মূর্ত্ত প্রতীক হয়ে, গুরুতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদন করে স্থির বায়ুতে পৌঁছে তবে এর প্রকাশ ঘটে। এই ক্রিয়ায় ধ্যেয় বস্তুর প্রকাশ করে চৈতন্যময় গুরু ভিতর থেকে দেখিয়ে দেন

কি ভাবে তাঁর ধ্যান করতে হবে তাঁকে আরাধনা করতে হবে। তাই তৃতীয় ক্রিয়ায় কষ্টও যেমন আনন্দও অপরিসীম। কারণ জীব ধ্যেয় বস্তুর আস্বাদন পেলে আর তার কি বাকি রইল? কারণ চতুর্থ ক্রিয়া ধ্যানের ক্রিয়া, স্থিরত্ব বাড়ানোর ক্রিয়া। স্থিরত্বের মধ্যে ডুবে যাও, প্রাণসাগরের গভীর অতল দেশে থেকে আরও গভীরে, সেখান থেকে আরও গভীরে ডুবে যেতে যেতে জ্যোতির সাগরে অবগাহন করে অতলে তলিয়ে যাও, দেখতে পাবে পরা শান্তি, এই দেহেতেই ঘটে যাবে জন্ম জন্মান্তর। নেশায় ডুবে বুঁদ হয়ে তাঁরই চরণতলে পড়ে থেকে কখন কোথায় কি হচ্ছে - কি হচ্ছে না এ সব তোমার হিসাব রাখতে আর ভাল লাগবে না। তোমার জীবত্ব থেকে শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটবে। আর সেই অবস্থা কিছুতেই কোন প্রকারেই প্রকাশ করা যায় না।

এই তৃতীয় ক্রিয়া করতে গিয়ে দুরন্ত বাধা আসে। কেউ সারাজীবনই এই ক্রিয়া করে গাঁট পার হতে পারে না। এখানেই প্রারব্ধের কথা চলে আসে, স্বীকার করতে হয় প্রারব্ধকে। তবে এর ঔষধও আছে - যেমন গুরুর সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেই এর গাঁট পার হওয়া যায়। আর স্থিতি ৩/৪ মিনিট যে দরকার সেটা বোধ করি এইজন্যই যে, দেহবন্ধন বা কর্ম্মবন্ধন যাই হোক, জন্ম জন্মান্তরের যে ময়লা আবর্জ্জনা, সংস্কার, শত সহস্র বৎসর রাস্তা বন্ধ করে আছে — তাকে ভেদ করে, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তবে তো তাঁর প্রকাশ হবে, তাই বোধহয় ঐ সময়টুকু দরকার হয়। অবশ্য পরে যখন স্বপ্রকাশ ঘটে তার কথা স্বতন্ত্র। এই সমস্ত কথা কিন্তু প্রত্যক্ষ বোধের কথা বলছি আর শাস্ত্রকারগণ যে ভাবে সাধনার ত্রাসের কথা বলেছেন, আমার ভিতরের জ্ঞানের সঙ্গে তা একমত, তবে সকল সময় হয় না। আমি মনে করি ঈশ্বর যে ভিন্নভিন্ন আধার সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি আধারের সংস্কারও ভিন্ন ভিন্ন, যেমন কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ইত্যাদি। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ইহা তর্ক থেকে জন্ম নেয়, বোধ থেকে নয়। কেননা কেউ বা সিদ্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে

আবার কেউ বা সাধনা করে সিদ্ধ হয়। তেমনি সাধনার যে ক্রম আছে এটা সব আধারে সমান নাও হতে পারে। আধার ভেদে ভিন্ন হবে। কেননা দেখা যায় যে কারও কারও সাধনার প্রারম্ভেই নানা তত্ত্বের প্রকাশ ঘটছে, পরে ক্রম অনুসারে সাধনা করছে। আবার কেউ বা ক্রম অনুযায়ী সাধনা করে তবে তত্ত্বের প্রকাশ ঘটছে। কাউকে দেখা যায় প্রত্যক্ষ সেবা করে অনেক বেশী - সাধনা করে কম, তাতেই তার অগ্রগতি ঘটছে, আবার কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে সাধনা বেশী করে করছে, সেবার সুযোগ নেই তাতেই তার অগ্রগতি ঘটছে। এ সবই সাধকের আধার ভেদে প্রকাশের তারতম্য ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি। গুরুদেব যেন ক্ষমা করেন, কোন অহং বোধে বলছি না। গুরুদেব যেমন শ্রীমুখে প্রকাশ করেছিলেন তেমনি ভাবে বলছি, গুরুদেবের নামে সতর্ক হয়েই বলছি, তিনি আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন বলেই হয়ত বা হবে, তিনি শ্রীমুখে বলে গেছেন, "ষষ্ঠ ক্রিয়ায় যা যা হবার কথা আমার মধ্যে সেগুলো নাকি তৃতীয় ক্রিয়া করার সময়ই সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল।" এ সবই তাঁর অসীম করুণায় সম্ভব হয়েছিল। তবে এটুকু বলতে পারি যে ষষ্ঠ ক্রিয়ার আগে তৃতীয় ক্রিয়ায় প্রকাশ তেমন বেশী কিছু ছিল না। তবে বেশ কিছু মহাপুরুষের দর্শনলাভ ঘটেছিল।

☞ গুরুদেবের গুপ্তভাবে পরীক্ষা

তবে গুরুদেবের পরীক্ষাও কিন্তু চরমভাবেই দিতে হবে। তিনি পরীক্ষা করে বাজিয়ে নেবেনই। তবে তাঁকে ধরে থাকলে পরীক্ষায় তিনিই পাশ করিয়ে দেবেন। ক্রিয়া করে আশা মিটত না। ৮ ঘন্টা তো আছেই, রবিবার বা ছুটির দিনগুলোতে ১০/১২/১৬ ঘন্টা ক্রিয়া করেও মনে হোত আরও কিছু করতে পারলে ভাল হোত। কি পাব, কি পেলাম মনেও আসত না। ক্রিয়ার আনন্দে ক্রিয়া করে যেতাম - কোনদিন অবস্থার কথা কাউকেই জানাইনি, আজ জানাচ্ছি।

তখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বিরক্তি আসত। এমনকি বাবা জিজ্ঞাসা করলেও রেখে ঢেকে বলতাম, মনে হোত বাবা তো সবই জানেন - বা কখনও মনে হয়েছে বললে যদি ঐ অবস্থাটা আর না পাই, যদি বেশী করে বলে ফেলি সে তো মহা অন্যায়। যা থাকে ভেতরে থাক্ যা হয় ভেতরে ভেতরে রাখি, মুখে কখনই বলিনি বা বলার চেষ্টা করিনি। তাই দয়াল গুরুতো অন্তর্য্যামী, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তিনি কিন্তু তোমার ভাবের পরীক্ষা নেবেনই নেবেন। সেই প্রসঙ্গেই একদিনের কথা বলছি —

একবার বাবার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাজার যাচ্ছি। সেই সময় ঐ পাড়ারই একজন ভদ্রলোক বাবাকে তো চিনতই আমাকেও চিনত, কারণ ব্যাঙ্কে কাজ করার সুবাদে অনেক লোকের সঙ্গেই চেনা পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আর ব্যাঙ্কটা বাবার বাড়ী থেকে বেশী দূরেও নয় সুতরাং না চেনার কোন ব্যাপারই নয়। এই সময় ঐ ভদ্রলোক আমাদের দুজনের কাছে এগিয়ে এসে বাবাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "এই ছেলেটি আপনার কে হয়?" বাবা একটু মুচকে হেঁসে ভদ্রলোককে বললেন "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না?" ঐ ভদ্রলোক তখন আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন, "কি মশায়! উনি আপনার কে হন?" খুব গম্ভীর ভাবে হঠাৎ বলে উঠলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানিনা মুখ দিয়ে আপনিই জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেল, "কে যে হন না, তাই তো ভাবছি।" ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে একবার বাবার মুখের দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। বাবা খুব হাসতে লাগলেন। জানিনা কি করে, কেমনভাবে ঐ প্রাণঢালা প্রকৃত সত্য কথাটা সেদিন বলতে পেরেছিলাম। মনে হয় আমি বলিনি - কে যেন অন্তরের ভাবকে জোর করে প্রকাশ করিয়ে নিয়েছিল !

হে অনাদি অতীত, তুমি জেগে ওঠ, মূর্ত্ত হয়ে ওঠ আর আমার

হাতের কলমে প্রাণ সঞ্চার করে তুমি প্রকাশিত হও। সকলকে তোমার কথা অর্থাৎ আমার প্রাণপ্রিয় গুরুর কথা, আমার সখার কথা, আমার জন্ম জন্মান্তরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ধাত্রীর কথা, আমার একাধারে পিতা একাধারে মাতার কথা, রক্ষকের কথা, মোক্ষদায়কের কথা সবাইকে তুমি জানাতে দাও। আমার তো শাস্ত্রের জ্ঞান নেই যে তা থেকে তোমাকে প্রকাশ করি তাই মিনতি করছি, তোমার দেওয়া সমস্ত দান, যা দিয়েছ, জানিয়েছ, বুঝিয়েছ, শিখিয়েছ, তা আজ আমার লেখনীর মধ্য দিয়ে তোমারই দয়ায় প্রকাশিত হয়ে তোমারই স্মৃতিচর্চ্চারূপে তোমার অনন্তের ভান্ডারে জমা হয়ে থাক, তোমার জয় হোক।

দশম অধ্যায়

☞ সাগর থেকে মহাসাগরে

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, বয়ে চলে আপন ছন্দে, মিশে যায় অপার আনন্দে অনন্তের বন্দনায়, রেখে যায় শুধু স্মৃতিভার, রইল যারা তাদের জন্যে রোমন্থনের সুযোগ। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মূহুর্ত্ত যারা কাটিয়েছে সেই সে সোনাঝরা দিনগুলোতে কখনও বা পৌষের মেলাতে, কখনও বা ফাল্গুনের বেলাতে, কখনও আবার শ্রাবনের ধারাতে আনন্দধারায় অবগাহন করে। প্রতিটি মন তাই পড়ন্ত বেলায় সারা দিনের সুখ দুঃখের ছায়াকে ফিরে ফিরে দেখে। দেখতে চায় যে দিনটা চলে গেল তার স্মৃতিকে। প্রতিটি জীবনও তাই জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা দিনগুলোর সাল তারিখের হিসাব নিকাশ করতে বারে বারে ফিরে ফিরে চায় তার পায়ে পায়ে চলে আসা দীর্ঘজীবনের পথটাকে আর একবার দেখতে। কেন জানিনা এটাই বোধহয় জীবনের ধর্ম্ম, এটাই

বোধহয় জীবনবোধের রেওয়াজ। সেই রেওয়াজী পথে চলতে গিয়ে আমিও তাই বারে বারে হারিয়ে যাই। আমার সেই মধুময় দিনগুলোর ছোট ছোট মধুমাখা স্মৃতিতে যা সারা জীবনে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারকে চিরদিনের দেনাপাওনার হিসাবকে শুধু উজ্জ্বল নয় প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে। আর সেই কথাটা স্মরণে এলে মনে হয় সেদিনের সেই ছোট্ট ডোবাটা আজ সাগরে পড়েছে, তারপর সাগর থেকে মহাসাগরে বিলীন হয়েছে। কিন্তু ডোবা কি ভুলতে পেরেছে কে তাকে অবিরাম আকর্ষণে সাগর থেকে মহাসাগরে উত্তরণ ঘটাল? পারে কি ভুলতে সে সেদিনের দুহাত বাড়িয়ে থাকা আমার চিরদিনের শান্তিধামের আদরিণী জননীর স্বর্গীয় সুরের সেই মধুর কন্ঠের ডাক, "বিষ্টু ! বাবা কিছু শিমূলতুলো আনতে হবে।" পারে কি ভুলতে সেই ডোবাটা সেদিনের কত রঙ্গ তামাসা করে দয়াময়ী জননীর কাছে বসে বসে আকন্ঠ খাওয়ার পরও ছল ছুতো করে মিষ্টি আদায় করার মধুমাখা স্মৃতিটা । পারবে কি ভুলে যেতে আনন্দধামের পরমানন্দ মাধবের লীলাসঙ্গমের মধুর মধুর লীলাগুলোর ঐশ্বর্য্যকে, যা তাকে দেহে মনে পরিপুষ্ট করে আজ রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে ঐশ্বর্য্যমন্ডিত করে রেখেছে? না পারেনি, পারা যায় না কখনও। আর তাই এই কাহিনীর অবতারণা, তারই স্মৃতি স্মরণ করে।

মা বলেছেন শিমূল তুলো আনতে হবে। বোধহয় এক কিলো মত আনতে হবে। এক কিলো তুলো মানে বিরাট একটা পোঁটলা হয়েছে। বাসে নিতে চাইল না। রিক্সা অনেক পয়সা চাইল, কোথায় পাব? তখন তো পয়সার স্বচ্ছলতা নেই। কি করব? দুপুর রোদে ঐ বিরাট পোঁটলা মাথায় নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। রাস্তাও কম নয়, - কমসেকম্ দু মাইল তো বটেই। হেঁটে হেঁটে ঐ পোঁটলা মাথায় নিয়ে দয়াময়ীর কাছে পৌঁছাবই । মা নিশ্চয়ই বোধহয় মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন - বলে উঠলেন, "দেখেছ! যে ছেলে মায়ের কথা শোনে মা তাকেই কাজের কথা বলেন।" কথা কটা বলেই মুখ টিপে একটু হাসলেন মা করুণাময়ী। চমকে উঠলাম

মায়ের কথাগুলো শুনে, একি শুনলাম? এ যে হুবহু আমার গর্ভধারিণীর মায়ের কাছে - ছোটবেলায় মায়ের কাজ করে দেওয়ার জন্য শুনেছি। এ কি করে হবে? কিন্তু হল তো? পরে ভাবলাম গর্ভধারিণীর সঙ্গে জগজ্জননী তো একাকার হতেই পারে। তাঁর মধ্যেও তো জগৎ-জননীরই লীলা চলছে। ডোবা এসে নদীতে, নদী সাগরে, সাগর মহাসাগরে হারাবেই তো, এটাই তো নিয়ম। আবার মহাসাগরের জল, বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হয়ে ডোবায় আসবে এটাই তো চলার পথ, এটাই তো ঈশ্বরীয় লীলা।

আজ তাই দেখি যে ঈশ্বর তার কত না অতুল ঐশ্বর্য্যের ভান্ডার এই দেহে রেখেছেন যা ভাবলে অবাক হতে হয়। কিন্তু আমার প্রকাশের কোন উপায় নেই। যদি কেউ চায়, অবশ্যই কায়মনোবাক্যে, তবে ক্রিয়া করে এই দেহেই দেখতে পাবে যে আমি কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ কথাগুলো বলছি কিনা। এ সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য, এতে তোমার অহংকার হবার মত কিছু নেই। প্রতিটি দেহই তাঁরই দেহ, যে কোন দেহেই তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর প্রকাশ ঘটতে পারে, এতে কোনরকম সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। আসল ঐশ্বর্য্য হোল তো জ্ঞান আর সেই জ্ঞানের প্রকাশ ঘটলেই সমস্ত বাসনার মোচন হবে। তখন ঐ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভান্ডার হাতে পেয়েও যারা পারে, তাদের কাছে ভিখিরী হয়ে থাকাও মহাআনন্দের বিষয় হয়। তখন ব্যবহারিক জগতের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, দুঃখ-কষ্ট , শরীরের রোগ ভোগ যাই ঘটুক, তারা ভ্রূক্ষেপও করেনা, দেহটায় আমি বোধই থাকে না - দেহটা তখন পরমানন্দ মাধবের, তাই তারা দেহের মালিক পরমানন্দ মাধবকে নিয়েই সদাব্যস্ত থাকেন, অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও দীন থেকে দীনতর ব্যক্তির মত দিন যাপন করেন, পাছে কেউ জানতে পারে, বুঝতে পারে। ঐ ভাবে থেকে সূক্ষ্মভাবে তাঁরা সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য তথা জগতের কল্যাণে নীরবে, নিভৃতে কাজ করে চলেন। তাঁরা কোষবদ্ধ তরবারী নিয়ে থাকেন কিন্তু কখনও তরবারীর আস্ফালন করেন না, সেটি কোষবদ্ধই

থাকে। তাঁদের দ্বারা কোন ভয়ের কারণ এ জন্য কখনও ঘটে না। আর এ সমস্তই তাঁরা লাভ করেন গুরূপদেশ মত নিষ্কাম ভাবে সাধনার ফলে। এঁদের শরণাগত হয়ে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়, তবু কখনও কোন কারণেই এদের সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, উচিতও নয়, করলে ঐ ডোবাতেই পচে মরতে হবে। আমার নিজের জীবন দিয়ে এ কথা স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি, বই পড়ে নয়। আর তাই যেটুকু 'প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি জোর গলায় বলছি যে আগে যেমন জীবনটা শুধু দুঃখের আগার মনে হোত, তাঁকে জানার পর সে বোধ থাকে না। কারণ জীবনে প্রকৃত আনন্দ যে আছে, সত্যই আছে, যা ছিল কথার কথা মাত্র তা আর বোধহয় না। তখন যেমন সদাই মনে হোত এ ভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। সেই নিরর্থক চিন্তা যুক্ত জীবনটা তখন সদর্থক হয়ে ওঠে । এখন মনে হয় যতদিন বাঁচি ততই লাভ, কারণ ততদিন তো এই চোখে গুরুপ্রদত্ত চোখে পরমানন্দের লীলামাধুরী পান করতে পারব, তাঁর সেবা তো করতে পারব তাঁর গরবে গরবিণী তো সাজতে পারব, তাঁর নিত্যানিত্য লীলাসঙ্গী তো হতে পারব। বাইরের জগতে কোন সুখ তো নেই, যা আছে তাকে সুখ না বলে ইন্দ্রিয়ের বিকার বলাই ভাল কারণ তাতে কোন নির্ম্মল আনন্দ নেই। **সেই আনন্দ অর্থাৎ আত্মানন্দ আছে প্রাণে, শ্বাসেই প্রাণের সেবা করলে প্রাণে জাগা সচ্চিদানন্দের আনন্দ তো অনুভব করতে পারব।** তাই তৃতীয় ক্রিয়া করে ধ্যেয় বস্তুর প্রকৃত সন্ধান পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হওয়ার পর দয়াময় যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তোমাকে পরের সোপানের ক্রিয়াটা দিতে হবে। তারপর দেখা যাক বাবারা কি করেন? মনটা যেন ডোবা থেকে সাগরে পড়ার আশায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য অনেকেই তখন বলল, "তোর আবার প্রোমোশন হবে"। মন তখন কেন জানি না হারিয়ে গিয়েছিল আনন্দধামের অচিনপুরের কোন এক অজ্ঞাতস্থানে। শুধু মনে জেগেছিল কে যেন বলছে ডেকে, যেতে হবে অনেকদুরে, ডোবা থেকে সাগরে, সাগর থেকে মহাসাগরে, দুর থেকে বহু দূরে, আকাশ থেকে মহাকাশ, মহাকাশ থেকে পরাকাশের সীমানায়।

তবে হ্যাঁ! লাভ একটা হয়েছিল এই তৃতীয় ক্রিয়ায়। বেশ একটা উত্তেজক ভাব, আজ কি হয় কি হয় ভাব। কখনও শত্রুপক্ষ একটু একটু করে এগিয়ে আসে আবার পেছু হটে। আবার এগোয় আবার পেছোয়, শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য তারা কুঁপোকাত হবেই জানতাম, তাই "চালাও পানসি" বলে লড়াইও হয়েছে জবরদস্ত। তবে সব কথা আজ তো আর মনে নেই। বাবা তখন বলেছিলেন, "বিষ্টু! কবে কোন সোপানের ক্রিয়া পাচ্ছ এবং কবে সমাধা করছো সব লিখে রেখো।" যোগীদের কথা হাজার বছর পরেও ফলতে বাধ্য। কিছু কিছু হয়ত লিখেছিলাম, কোথায় আছে মনেও পড়ে না। আর তাছাড়া এ সমস্ত কথা যে আমায় কখনো লিখতে হবে বা কারো এগুলো জানার আগ্রহ আসবে কে জানত? তবে একটা কথা আজও মনে আছে যে বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন যে "তোমার মধ্যে সব কটা ক্রিয়াই আছে। ক্রমশঃ বুঝতে পারবে।" তাই আমিও তখন দেখতাম যে কোন একটা ক্রিয়া সমাপ্ত হবার পরই তার কিছুদিনের মধ্যেই পরের ক্রিয়াটা যেন ঐ আগের ক্রিয়ার আবেশের মধ্যেই আপনা আপনিই এসে যেত, করেও ফেলতাম। বাবাকে অবশ্য বলতাম না। কিন্তু বাবা পরের ক্রিয়া দান করার সময় মনে হোত যে এমনভাবে কখন যেন মাঝে মাঝে ক্রিয়াটা করেছি বোধহচ্ছে। অবশ্য ক্রিয়ার কথা বা অনুভূতির কথা তো বটেই কাউকে কখনও বলিনি, বলতামও না। অন্যে দর্শনের গাল ভরা কথা বলতো চুপচাপ শুনতাম, দর্শনের জন্য কোনদিন লালায়িতও ছিলাম না। কেবল মনে হোত ক্রিয়ার কথা বললে ক্রিয়া যদি ঠিক না হয় আজ বা আজ যদি কোন অনুভূতি না আসে। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলেও রেখে ঢেকে একটু আধটু বলতাম। অবশ্য বাবা জোর করেই যেন বের করে নিতেন সব। ক্রিয়ান্বিত ক্রিয়ান্বিতাদের সকলের সাথেই আমার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, কিন্তু আলোচনার বিষয় বস্তুই ছিল ক্রিয়া। কয়েকজনার সাথে ভাবের গভীরতাও ছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হোল আমাদের রেখা সরকার মানে আমার রেখাবাবু। সে যেন আমাদের সংসারের একজন। নিজের দাদাদের সাথে তার অত ভাব নেই। আমিই যেন তার মায়ের পেটের

ভাইয়ের চাইতেও বেশী। আজও সে আমার প্রতিদিনের খাওয়ার জোগাড় যন্তর করে রেখে তবে বাড়ী যাবে, তাতে যত রাতই হোক। ঝড়, তুফান, দুর্য্যোগ কোন কিছুই তাকে আটকাতে পারে না। আজ প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর সে একইভাবে চলেছে কিন্তু নীরব, নির্ব্বিকার কর্ম্মী। এই রেখা সরকার ছাড়াও আমার পরিচিতের গন্ডী এতই বিশাল যে তাদের সবার নাম করতে গেলে একটা বিশাল তালিকা তৈরী হবে, তাই অসম্ভব। আমার মনে হয়েছে অধ্যাত্ম অতি সুখকর জীবন। কিন্তু চোরা পথে যদি কামনা বাসনা ঢুকে পড়ে তাহলে সেই জীবন হয় কন্টকাকীর্ণ ও বিষময়। আমি দেখেছি আমাদের মধ্যে অনেক গুরু ভ্রাতা ভগিনীরা কামনার বশবর্ত্তী হয়ে বিবাহ করেছে, চাকুরীর জন্য ব্যাকুল হয়ে চাকরী পেয়েছে, এমন কি অতি সামান্য বস্তুলাভের আশা করেছে, চেয়েছে, পেয়েছেও। কেউ কেউ আবার খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে পেয়ে ত্যাগ করেছে বা আরও পাবার আশায় পাওয়া বস্তুকে অবহেলা করে বহু দুঃখ ভোগ করছে, -এ তো আমার নিজের চোখে দেখা জিনিষ। কেউ হয়ত বলবেন আমার বিবাহের কথা। আমার বিবাহ করার ঘটনা তো আমার মায়ের আবদার ও আমার গুরুবাবার আদেশ পালনের ঘটনা, ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেবে। আর সেইজন্য আমার বিবাহ কোন দুঃখের কারণ হয়নি, কারণ কর্ত্তা তো সাজিনি, তাই গুরুদেবই রক্ষা করেছেন। আর বিবাহ কথাটার যৌগিক অর্থ কজনাই বা জানে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ"— অর্থাৎ বিবাহ করার প্রয়োজন তবে সে অর্থ তো জাগতিক জীবের, বদ্ধ দশায় জীবের যে অর্থ করা স্বাভাবিক তাই। **বাস্তবে বিবাহ শব্দটার প্রকৃত অর্থ হোল, বি - অর্থে বিগত, আর বাহ শব্দটি বহ শব্দের প্রয়োগ - যার অর্থ বহন করা অর্থাৎ জীব যখন সাধনার মার্গে বহন ক্রিয়ার উর্দ্ধে উঠে অর্থাৎ শ্বাসের জয় হয়ে জিতশ্বাস অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই হোল সঠিক বিবাহ। আর এই বিবাহের ফলে তখন জ্ঞানরূপী পুত্রের জন্ম হয়, যেটা অতি দুর্লভ ঘটনা।** নিরক্ষরের সংস্কৃত অর্থ করার মত "পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত"মানে পশুরাজ সিংহ মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়েছে বলার মত। সাধারণে বিবাহ কথাটাকে যে ভাবে অর্থ করে সাধকের তা মনে করলে তো সাধনা হবে না।

☞ হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের কথা

তৃতীয় ক্রিয়াকে বলা হয় হৃদগ্রন্থি ভেদের ক্রিয়া। তাই এই সুযোগে হৃদয়ের ব্যাখ্যাটাও সেরে ফেলা যাক্। যতটুকু বোধকরি তাই বলছি, বাবা যেন ক্ষমা করেন। মানুষের একটা স্থূল হৃদয় ও একটা সূক্ষ্মহৃদয় আছে। স্থূল হৃদয়ে জাগতিক ব্যাপার, ভাব ভঙ্গি অনুভূত হয় আর সূক্ষ্ম হৃদয়ে ঈশ্বরীয় অনুভূতি জাগে। যা কিছু সাধন ভজন, ঈশ্বর অনুভূতি, ঈশ্বরীয় বোধ চেতনা সমস্ত কিছু সূক্ষ্ম হৃদয়ের ব্যাপার, একেই বলে আদিত্য হৃদয়, আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য অর্থাৎ প্রাণসূর্য্য অর্থাৎ প্রাণময় হৃদয়, যাকে আবার কূটস্থ বলা হয়। দুই ভ্রূর মাঝখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থানে কেবলমাত্র শুদ্ধ মনেরই প্রবেশাধিকার থাকে। মন যতক্ষণ সেই স্থানে থাকে সে সতী হয়ে থাকে এবং স্বামী সহবাস করে জ্ঞানরূপী পুত্র লাভ করে এবং তারপরে আবার ঈশ্বরীয় লীলায় সে গৃহত্যাগ করে অর্থাৎ জগৎস্বামীকে ভুলে গিয়ে নানা কামনা বাসনায় জড়িয়ে কালচক্রের আবর্ত্তনে কলঙ্কিনী হয়ে কুলটা রূপে কুলটা হয়, অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করে এবং মায়ায় জড়িয়ে বহু বাসনার জন্ম দেয়। এইভাবে আবার কালপূর্ণ হলে প্রকৃত স্বামী সৎগুরুরূপে দেখা দেয়, তাকে আবার ময়লা মাটি ধুইয়ে দিয়ে সতী হবার উপায় বা রাস্তার ঠিকানা জানিয়ে দেন এবং বাস্তবে জগৎস্বামীর রূপ বা তাঁহার পদ দর্শন করিয়ে দেন। যদি তখন অন্য কামনা বাসনা ত্যাগ করে স্বগৃহে বা স্বামীর ঘরে ফেরার জন্য সে নিরন্তর চেষ্টা (সাধনা) করে, সর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করে শুধু স্বামীলাভের, স্বামীসঙ্গের সংকল্প করে পবিত্রভাবে অর্থাৎ পবিত্রমনে, তখনই স্বামী এসে দর্শন দেন। এই তো সাধন রহস্য। যা মুহুর্ত্তে ব্যাখ্যা হয়ে গেল। আবার ঘর থেকে বার হওয়া অর্থাৎ স্বস্থান চ্যুত হওয়া আরও সহজ ব্যাপার, মুহুর্ত্তেই বার হওয়া যায়। কিন্তু স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। ফেরার রাস্তা যে কত কঠিন, বাধা ও প্রলোভন ফেরার গতিকে যে কত মন্থর করে, বলে শেষ করা যায় না। আসার

রাস্তা খুব সহজ, খুব মসৃণ, কিন্তু ফেরবার রাস্তা বড়ই কঠিন, বড়ই দুর্গম। কাম ক্রোধ ইত্যাদি দস্যুর দল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছিনতাই করার জন্য নানা ছলনায় ভুলিয়ে রাস্তা ভুল করিয়ে কব্জা করে সব কিছু কেড়ে নেবার জন্য ওৎ পেতে আছে, অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু ওরই মধ্য দিয়ে একমাত্র গুরুস্মরণ অস্ত্র হাতে সাধককে চলতে হবে। তবে শেষকালে স্বামীসঙ্গ ফিরে পাবে, পাবে জ্ঞানরূপ পুত্রকে। তাই আসা যত সোজা, ফেরা ততই কষ্টের, ততই সাধনার পথ। যেখানে ইন্দ্রিয় ও রিপুজয়ী হয়ে তবে স্থির বায়ুতে আদিত্য হৃদয়ে স্থান পাওয়া যাবে নবদুর্ব্বাদলশ্যামের পদপ্রান্তে চির আশ্রয়। হৃদয় গ্রন্থি ভেদ মানে তাই হৃদপিন্ড ভেদ নয়। হৃদপিন্ড যে দেহটাকে সচল রেখেছে আর সেই দেহে যে সমস্ত আসুরিক বৃত্তি আছে তাদের পরাজিত করে, শ্বাসজয়ী হয়ে দয়িতের সাক্ষাৎলাভ অর্থাৎ স্থিতিলাভ করা অর্থাৎ কালজয়ী হওয়া। এই পথে লোভ নামক শত্রুটি বড়ই ভয়ানক। নানা মায়াজাল বিস্তার করে নানাভাবে নানারূপে সাধক সাধিকার পথ আটকে দাঁড়ায়। কিন্তু সাধকরূপী তুমি তো ওদের জান, ওদের মতলব বোঝ ,তুমি কিন্তু দাঁড়াবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে গুরুপ্রদত্ত ওঁকার মন্ত্র স্মরণ করতে করতে কায়মনোবাক্যে গুরুস্মরণ করে তুমি তোমার পথ ধরে এগিয়ে চল। দেখবে দয়াল গুরু নিজে এসে ঠিক তোমার হাত ধরবেন। আবার যদি একটুও পিছিয়ে পড়ে যাও বা পিছল পথে চলো, তিনিই স্মরণমাত্রেই তোমাকে আবার ঠিক তোমার চলার রাজপথে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দেবেন, কোন চিন্তার কারণই রাখবেন না। দেহ মনে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার করে তিনিই তোমাকে নববলে বলীয়ান করে তুলবেন। অতএব মাভৈঃ, শুধু তোমার কাজ তুমি করে চল, সেখানে যেন তোমার এতটুকু শৈথিল্য বা উদাসীনতা না থাকে।

এর পরেই আসে লোভেরই দোসর মোহশত্রুর কথা। এক একটা দিন যায় ভেতরে ও বাইরে দেখি আর আমি অন্ততঃ আমাকেই দায়ী করি। ভাবি এগুলো কারও দোষ নয় আমারই অপকর্ম্ম অথবা বেহিসেবী কাজের ফল অথবা সুকর্ম্মের ফল। অন্যান্য

সাধারণে যাদের সেই চোখ নেই, তারা কিন্তু তাদের মোহবশতঃ কাজকে না চিনতে পেরে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এগুলোকে অন্যের সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করবে এবং মোহের ঘোরে অর্থাৎ স্বমোহের বশে বশীভূত হয়ে নিজের দিকে দোষীর আঙ্গুল না তুলে অপরের প্রতি দোষীর অঙ্গুলি হেলন করবে। এটাই তো পরিণতি, এটাই তো মোহ ঘটাবে। তাই চেয়ে চেয়ে শুধু দেখি আর ভাবি, ভাবি আর দেখি সাধনার ক্ষেত্রে সাধককেই কিভবে মোহগ্রস্ত করে, জাগতিক জীব তো কোন ছাড় !

বর্ত্তমানে আমারই যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে এ আমারই ক্ষণিক মোহের বা মোহের বশে ক্ষণিকের হঠকারিতার ফল, যা আমার সাধনার প্রচন্ড ক্ষতি করেছেও। মোহ অতি বিষম বস্তু। সাধককে খুব সাবধানে পথ চলতে হবে নইলে সামান্য মোহ, মমতা সাধকের চলার পথকে খুবই সঙ্কটময় ও জটিলতর করে তুলবে, যা অতিক্রম করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র দয়াল গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া সেই বাধা অতিক্রম করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আজ তাই নিজের কথাই ভেবে দেখতে গিয়ে দেখি যে "কি চেয়েছিলাম আর সামান্য মোহের ক্ষণিকের চমকের হঠকারিতায় আমাকে কি সঙ্কটের মধ্যেই না ফেলে দিয়েছে! অপরের সামান্য দাবী, একটু আবদার যেটা সামান্য বলে মনে হয়েছিল, তা যে এত ভয়ানক হয়ে উঠবে তা তখন তো একবারও মনেই হয়নি। কিন্তু ছাড়ব বললেই কি মোহ আমাকে ছাড়বে? ছাড়ছে কি? ছাড়ছে না। নিজের জীবনের গল্পটাই তাই বলি এ মোহটার ব্যাপারে।

ইদানীং খবরের কাগজে কে নাকি আমার নামে বিজ্ঞাপন দিয়েছে এইভাবে যে, আমি নাকি অনেক ছেলে বা মেয়েদের বিয়ের যোগাযোগ করে দিই বা আর্জ্জি করে থাকি । সুতরাং আমার সাথে যোগাযোগ করলে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক পুত্র কন্যার পিতামাতারা উপকৃত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি .....। বোঝ ঠেলা এবার, কি চাইলাম

আর কি পেলাম বিনিময়ে।

আমি কিন্তু ভালভাবেই জানি যে এই ব্যাপারটার বিন্দু বিসর্গও তো জানি না, তবু এটাকে আমার কর্ম্মফল হিসেবেই মেনে নিয়েছি। কারণ আমি তো বাস্তবে আমাদের এই সম্প্রদায়ের দুঃস্থ, গরীব, অপারগ বাবা মায়ের অনুরোধে, বিনা স্বার্থে, বিনা চিন্তায় উপকার হবে বলে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে সক্রিয় সাহায্য করেছি। এটা তো সূর্য্যের মত সত্যি । সুতরাং উপকার হলেও, স্বার্থ না থাকলেও, অপরে এটাকে ব্যঙ্গ করে বিজ্ঞাপন দিতেই পারে, দিয়েও দিয়েছে, হয়ত বা হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে কেউ দিয়েছে, হয়ত বা যারা বেশী উপকার পেয়েছে তারাই দিয়েছে বা হয়ত যারা আরও বেশী কিছু আমার কাছে আশা করেছিল, পায়নি, আশাহত হয়ে তারাই কেউ দিয়েছে। এভাবে মোহবশতঃ কারও বা উপকার, কারও বা একটু আবদার মেটাতে গিয়ে আমার সাধনার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তো আমিই সৃষ্টি করেছি এটা তো ঠিক। "দোষ কারো নয় গো মা " তাই দোষ কাউকে দিই না, দিইওনি কখনো, এখন দয়াল গুরুবাবার চরণ একমাত্র ভরসা। তিনি তাঁর সন্তানকে দয়া না করলে আমার আর কোন উপায় নেই। তিনিই তো আমার জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, সব কিছু। আমি তাঁকে না বুঝতে পারি, না জানতে পারি, কিন্তু তিনি তো আমাকে জানেন ষোল আনার উপর আঠার আনা। তিনিই পারেন আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করতে, তিনিই পারেন রাজপথে দাঁড় করাতে, তিনিই পারেন বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুরই মানে বুঝিয়ে দিতে। এ জীবন বিতৃষ্ণায় ভরে গেলে তিনিই পারেন জ্ঞানের আলোয় এনে আবার বেঁচে থাকার ইচ্ছা জোগাতে। জীবনও তিনি, মরণও তিনি। তিনিই বন্ধু, তিনিই সখা, তিনিই প্রাণ, প্রাণেরও প্রাণ, প্রাণের আরাম প্রাণায়াম। তাই মন যমুনায় না ভেসে, প্রাণ যমুনাতে, প্রাণ যমুনা থেকে প্রাণসাগরে ভেসে চলেছি, মহাআনন্দে, মহাসুখে, মহাশান্তিতে, আর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হচ্ছে তাঁরই জয়গান, তাঁর স্তোত্র, তাঁরই দেওয়া মন্ত্র "চরাচরং" ব্যাপ্তির মহিমা প্রকাশ করে, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।।"

তৃতীয় ক্রিয়াতেই আমার পূর্ণ আকাশের প্রকাশ হয়েছিল। একথা শুনে বাবা খুব আনন্দও প্রকাশ করেছিলেন। আগেই বলেছি, আমি ক্রিয়া করে খুব আনন্দ পাই, ক্রিয়ার আনন্দেই ক্রিয়া করতাম, দর্শন হবে কি হবে না - কেমন হবে এ সব কথা আমার মনেই আসত না। বাবা আমার নিকট চির অমর। বাবাই জানেন আমার পরে কি হবে? তবে তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা এই যে আমার এই বোধ যেন চির জাগরূক থাকে। আমার চির কালের বোধ এবং এখনও তাই-ই ভাবি যে, বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই তবে বেশী নয়। বই পড়ে যার কথা আংশিক জানা যায় ক্রিয়া করে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ বোধহয় । তখন আপনা আপনি সব সংশয় নাশ হয়, বই পড়ে কিন্তু সত্যিকারের সংশয় নাশ হয় না। **প্রথম ক্রিয়াই আমার কাছে চির বিস্ময়। আজও ঠিক করে নিরূপণ করতে পারি না, কি করে প্রথম ক্রিয়াই ভাল করে করা যায়। কারণ ক্রিয়া যাঁর তিনিই ভেতরে থেকে ক্রিয়া করেন। তোমার দরকার শুধু তাঁকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করা আর প্রতিনিয়ত তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ। ব্যস্ তাতেই বাজী মাৎ।**

☞ ধ্যেয় বস্তুর সান্নিধ্যলাভ

তৃতীয় ক্রিয়ার সংখ্যা পূরণের পর পরের ক্রিয়াটা অর্থাৎ চতুর্থ সোপানের ক্রিয়া কখন কোথায় পেয়েছিলাম অর্থাৎ বাবার বাড়ী না অন্য কোথাও আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে বাবার কথা সত্য হতে দেখে অর্থাৎ আমার মধ্যে বাবা যে বলেছিলেন সব কটা ক্রিয়া আছে সে কথা স্মরণ করে আনন্দ হোল। তৃতীয় ক্রিয়াতে বাসুদেবের সর্ব্বব্যাপক রূপের প্রকাশ হয়েছে এইবার। তোমাকে সেই রূপ ধ্যান করতে হবে। স্থিরত্ব বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রাণ সাগরের অতলে তোমায় ডুবতে হবে, দেখবে জ্যোতির সমুদ্র, সেই জ্যোতির মধ্যে ডুব দিয়ে গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে গেলে দেখবে তোমার জন্য বিরাজ করছে

অপার শান্তি, যাকে বলে "পরাশান্তি"। তোমার জন্মান্তর ঘটবে, জীবন মৃত্যুর পারে গিয়ে নিজেকে মৃত্যুঞ্জয়ী ঘোষণা করতে পারবে। দীঘি থেকে মহাসমুদ্রে উত্তরণ ঘটবে তোমার। তাই এই আত্মানন্দ লাভের চাবিকাঠি ক্রিয়াকে স্রেফ ক্রিয়াকে যে ভালবাসতে পারবে। ক্রিয়াও তখন তার কাছে সম্পূর্ণ নগ্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে। সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে দেখা দেবে। তাতে না আছে কাম, না আছে কামনা। আছে শুধু গুপ্তধন ও সীমাহীন আনন্দ। যে আনন্দ, অনাবিল, অনাস্বাদিত, অপার্থিব ব্যাপার, আনন্দ আর আনন্দ, যেন এক আনন্দমেলা।

☞ পঞ্চম ক্রিয়া প্রাপ্তি ও গুরুবাবার পরীক্ষা

আমি যখন প্রথম দিন ক্রিয়া পাই তখন যারা পঞ্চম ক্রিয়া করত, দয়াময় বাবা কৃপা করে যেদিন আমাকে পঞ্চম ক্রিয়া দান করলেন সেদিন তাঁরা ষষ্ঠ ক্রিয়া পেল। নিজের জীবন দিয়ে বুঝলাম ক্রিয়ার উন্নতি করতে হলে চাই নানাদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের আঘাত, অপমান, লাঞ্ছনা নানা প্রকারের নির্য্যাতন। তবেই আসবে ক্রিয়ার জন্য ব্যাকুলতা। একমাত্র ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুতে আসক্তি থাকলে ক্রিয়া হয় না, হবে না কিছুতেই, স্থিরত্বলাভ ঘটবে না। কারণ ক্রিয়া কোন সতীনের জ্বালা সহ্য করে না। লোভের ওপর বৈরিতা আনতে হবে , আনতে হবে অনাসক্তি। তোমার যত কিছু থাকুক না কেন, সব কিছুর ওপরে। প্রথম ক্রিয়া পাবার পর থেকে কি ভাবে দিন কেটেছে তাই ভাবি। ছিলাম ভোজন বিলাসী হয়ে গেলাম ভোজন বিরাগী। দেহ যেমন বিশাল ছিল, খাদ্যেও আসক্তি ছিল সুপ্রচুর। সমস্ত আজ স্বপ্ন মনে হয়। আস্তে আস্তে কেমন ভাবে সব পরিত্যক্ত হতে লাগল। আত্মীয় পরিজন, স্বজন বান্ধব সকলের প্রতি বিরাগ আসতে লাগল। সবাইকে কেমন যেন এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দিল। সকলের প্রতি বিরক্তি ভাব দেখা দিল। পাছে বাবার বাড়ী যেতে দেরী হয়, পাছে ক্রিয়ার ক্ষতি হয় এই শুধু মনে

হতে লাগল। বাবা আমাকে কোথাও যেতেও দিতেন না। ক্রিয়া জ্ঞান, ক্রিয়া ধ্যান, ক্রিয়াই ছিল আমার বাবা, মা, আমার প্রভু, আমার জপের মালা। যাতে অজপা অযথা ব্যয় না হয় সেদিকেই লক্ষ্য ছিল, সেদিকের তদারকিতে হুঁশিয়ার থাকতাম। এ সমস্ত একান্তই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই এখনও সেই অভ্যাসের দাস হয়েই আছি — কোথাও কারো নিকটে যেতে ভাল লাগে না, কি খেতে ভাল লাগে তাও বুঝিনা — বেশী খাওয়া তো ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধু খাওয়া ভাল কিন্তু বেশী খাওয়া ক্ষতিকর। ক্রিয়ার জন্য জীবনে কোন আপস করতে নারাজ ছিলাম। একটাই শুধু পরাজয়ের গ্লানি এখনও, প্রতিনিয়তই আমাকে কুড়ে কুড়ে খায় যখন আমি একা শক্ত মোহজালে, জড়িয়ে বহু সময় নষ্ট করে ফেলেছি। তবে এজন্য দোষ কাউকে দিই না এ আমার নিজের গাফিলতির জন্যই হয়েছে। এ আমার স্বখাত সলিল। তখন মনে হয় আমারই শক্তি কারো মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাকে হতবল করে দিয়েছিল। এ আমার সাধক জীবনের তিক্ততম অধ্যায়ের অহরহ নিপীড়ন, এ আমার পবিত্র জীবনের ক্ষণিকের ধূমকেতু, এ আমার দয়াময়ের দেওয়া জীবনে লীলাময়ের কোন এক অজানা লীলা। জীবনে চলার পথে ছোট্ট একটা হোঁচট যা স্থায়ী নয় কিন্তু অবশ্যম্ভাবী, যা দহন করে না তাপ দেয়, যা বড় প্রয়োজনের সময়ে বড় রকমের ক্ষতি ঘটায়। এ সমস্তই গুরুদেবের খেলা। তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আরও কত কি লীলা তাঁর বাকী, তিনিই শুধু জানেন। তাই সদাই অজপার কাছে প্রার্থনা করি যে তুমি এ দেহ দেউলের গৃহে থাকতে থাকতে সমস্ত কাজ তোমার গুটিয়ে ফেল । কে জানে কখন তোমার চলে যাবার সময়ের শেষ মুহুর্ত্ত ঘনিয়ে আসবে কে বলতে পারে? ঈশ্বরকে ভালবাসলে নানা বাধা তো আসবেই। সাধককে তা অতিক্রম করতেই হবে। কোন পাওনা দেনা তো তিনি বাকী রাখেন না । তিনি যেমন বড় দাতা তেমনি আবার কর্ত্তা হিসাবে হিসাব না করে তিনি এক চুলও চলেন না। ভরসা শুধু এই যে সকলের জীবনে উত্থান পতন যেমন আছে তেমনি তাঁর কৃপা হলে তিনি এক মুহূর্ত্তেই জীবনের ক্ষয় ক্ষতি

নিমেষে শোধ করে দিতে পারেন। শুধু পারেন না, দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেবেনও। শুধু যদি অকপট হওয়া যায়। দয়াময় বাবা প্রায়ই আমাকে বলতেন, "তুমি এখন খরচ করে যাও আমি একেবারে তোমাকে সব পুষিয়ে দেব, কোন চিন্তা করো না"। এই ক্ষতি পূরণের প্রসঙ্গে আগে নিজের কথা বলে বাবার পরীক্ষার কথা বলব, না বাবার রগড়ের কথা বলব।

টাকা পয়সার লোভ আমার কোনদিনই ছিল না, তবে অপচয় ভালবাসিনা। চিরকাল ঠকেছি, জেনেশুনে ঠকেছি, না জেনেও ঠকেছি, ঠকতে ভাল লাগে, ভাবতে গিয়েও ঠকেছি, চিরকাল ঠকেছি, ঠকছি। তবে কখনও কারও ক্ষতির পরিকল্পনা কখনও ছিল না। কখনও অপারগ হয়ে বাধ্য হয়েছি কোন কাজ করতে, হয়ত অপরে ঠকেছে। পরে সেই কাজের কথা যখন মনে হয়েছে খুব কষ্ট হয়েছে, অনুতাপে পুড়েছি, এভাবে ঠকেছি। কখনও বা জান কবুল করে কারও কোন বিশেষ উপকার করার পর কর্ম্মযোগের বন্ধনে উল্টোফল ফলেছে, তারা দোষ দিয়েছে ঠকেছি, আবার কখনও বা বেহিসেবী এমন হয়ে গেছে নিছক মজা করার জন্য বা কৌতুহল বশতঃ, সেখানেও ঠকেছি। ঠকতে কার ভাল লাগে? আমারও লাগে না, তাই ক্ষতিপূরণের চেষ্টাও করেছি। তবে সব ক্ষতি তো পূরণ হয় না তখন আর কি করা যাবে? তেমন নিজের কর্ম্মফলে যে নিয়তির করাল গ্রাসে পড়েছে, কাল যাকে তাঁরই নির্বুদ্ধিতায় গ্রাস করছে তখন কিছু ক্ষতি তো তার হয়ই, সেখানে বাবার কাছে প্রার্থনা জানান ছাড়া তো কিছু করার থাকে না। তাই বলছি লোভ আমাকে কাবু করতে পারেনি ঠিকই, তবে মোহ সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। এই সব ভিতরের শত্রুর কাছ থেকে অনেক অনেক সচেতন থেকে এদের ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাধনার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এরা পিছু ছাড়ে না। সাবধানের যেমন মার নেই, তেমনি মারেরও কোন সাবধান নেই। অতি সাবধানীর ঘরেও চুরি হয়, অতি সাবধানীরও রোগ হয়, ভোগে, মরেও। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা অনুমান করতে পারি। গুরুদেব কিন্তু বড়ই দয়াল, তাঁর

ক্ষমা সীমাহীন, তিনি সবেতেই আছেন, সবাই তাঁর মধ্যে না থাকতে পারে কিন্তু তিনি কোন কিছু ছাড়া নন। তাই গুরুকে ভজনা করলেই সবাইকার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, সকলের আনুকুল্য লাভ করা যায়। ওপরে ওপরে অনেক প্রতিকূলতা থাকলেও ভেতরের আনুকূল্য পাওয়া যায়।

আগেই বলছিলাম না গুরুর ক্ষমা সীমাহীন। শুধু ক্ষমা নয় গুরুর স্নেহও অপরিসীম, কৃপার মাত্রাও মাত্রাহীন। কি করেন, আর কি না করেন তাঁরা সন্তানের মঙ্গলের জন্য, বলে শেষ করা যায় না।

সেইবার ১৯৫০ সালে দামোদর নদীর বন্যা হয়েছে। বর্দ্ধমান, হুগলী জেলা একেবারে ভেসে গেছে। কালনা থানার অন্তর্গত আনুখাল গ্রামেও বানের প্রকোপ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দেখা দিয়েছে। কখন কি ভাবে ঘর বাড়ী ভাসবে কোন ঠিক নেই। বানের জলের উচ্চতা ক্রমাগত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, কমার কোন লক্ষণ নেই। ঐ গ্রামে আমাদের সম্প্রদায়ের বহু ক্রিয়ান্বিতের বসবাস। দুর্য্যোগের ঐ ঘন ঘটার দিনে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে কে কোথায় যাবে এই চিন্তাতে সকলেই আকুল কণ্ঠে দিনরাত প্রার্থনা জানাচ্ছে, ঠাকুর রক্ষা কর। আর জল বাড়লেই জমি জায়গা তো গেছেই , ভদ্রাসনটুকু যদি বানের জলে ভেসে যায় তাহলে আর বেঁচে থেকে কি লাভ? কোথায় কোন তেপান্তরে হয়ত চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে। জল যত বাড়ে, বাড়ে তত আকুতি, জোরালো হয় ঠাকুরকে আত্মনিবেদনের মাত্রাবোধ। ঐ গ্রামে গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী ছিলেন খুব রসিক লোক, বাবার খুব কাছের লোক, গরীব ভদ্র নিষ্ঠাবান ক্রিয়ান্বিত। গরীব হলেও গোবরাদার কোন মনের সঙ্কীর্ণতা ছিল না, সদা হাস্যময়, খোলামেলা প্রাণের উচ্চকিত হাসির শব্দে মাতোয়ারা করা মজলিসি মানুষ। বলতে গেলে তার ঐ ভিটেটুকু সম্বল। সারাদিন রাত গোবরদা বাবাকে প্রার্থনা জানাচ্ছে সকলের সঙ্গে মনে মনে, ঠাকুর যেন বসত বাড়ীটুকুকে তথা গ্রামটাকে বানের জলে ডুবে যাবার হাত থেকে কৃপা করে রক্ষা করেন। ভক্তের কাছে

কাঙাল ভগবানই সম্বল। প্রাণের ডাক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাল। রাত দুপুরে গোবরদা স্বপ্ন দেখছেন বাবা যেন মালকোঁচা মেরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাঠের মধ্যে তীব্র বেগে ধেয়ে আসা সুগভীর বানের জলের স্রোতের ওপর দাঁড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে জলের গতিকে আটকে রাখছেন, আর খুব পরিশ্রান্তস্বরে বলছেন, "ওরে গোবরা ওঠ! ওঠ! শীঘ্র একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। সারাদিন ধরে তোদের গ্রামটাকে জলের স্রোত থেকে আটকে রেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি।" "বাবা - বাবা" শব্দে অস্ফুট চীৎকার করে ধড়মড়িয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ভক্ত দেখে সকাল হয়ে এসেছে কিন্তু বাবা কোথায়? সদ্যঘুম ভাঙ্গা জনিত বিভ্রান্তি ঘোচবার পর তার বোধে এল, স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু এ কি তার ভ্রান্তি কিন্তু সে যে বাস্তবে দেখছে বাবা তাদের গ্রামকে জলে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে কি প্রচন্ড লড়াই করছেন, কি কষ্ট তাঁর ভক্তের জীবন, ভক্তের ভদ্রাসন বাঁচাবার জন্য। বেলা হল, গ্রামে জনশ্রুতি শোনা গেল, বানের জল কমছে, আর ভয় নেই। ঠাকুর দয়া করে তাদের এ যাত্রা রক্ষা করলেন। রক্ষা করলেন ধন, মান, জীবন সহ চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ভদ্রাসনটুকু। আর এদিকে তখন নীরবে গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর কপোল বেয়ে নামছে অশ্রুমুক্তাবিন্দু। মনে মনে কৃতজ্ঞতা আপ্লুত স্বরে সে তখন ঠাকুরকে বলছে, "হে ঠাকুর তোমার দয়ার সীমা নেই, মাত্রা নেই। অকৃতজ্ঞ অধম আমরা তোমায় চিনতে পারি কৈ?

☞ বাবার রগড় সব পুষিয়ে দেব

সত্য সত্যই এঁরা যদি দয়া করে চেনা না দেন তাহলে এঁদের চেনা বড় দুষ্কর। কখন কোথায় কি জন্য একটা কথা বললেন, কিভাবে বললেন, কেন বললেন, কি তাঁর মানে দাঁড়াবে এ সব ভাবতে যাওয়া মিথ্যে, অকারণ - তার চেয়ে আদেশ পালনই ভাল। এমনই একটা ঘটনার কথা মনে এল তাই বলি ঃ-

সেবার বাবা গেছেন ক্ষিতীশদার বাড়ী। যথারীতি বাবার সঙ্গে আমিও গেছি। সেখানে পৌঁছেই বাবা হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, "ও বিষ্টু! তোমার কাছে গোটা বারো টাকা হবে? দাও তো। আমি তোমাকে পরে দিচ্ছি।" আমি বললাম, "না বাবা! আমার কাছে তো এখন অত টাকা নেই আজ।" বাবা বললেন, "ওঃ! আচ্ছা থাক তাহলে। একটু দরকার ছিল, কি আর করা যাবে তোমার কাছে নেই যখন।" মজার ব্যাপার হল যে সেখানে তখন আরও অনেক গুরুভাই ভগ্নী সবাই রয়েছেন, কিন্তু বাবা তাদের কারও কাছে চাইলেন না এমনকি আমার কাছে অত টাকা নেই শুনেও আর কারো কাছে চাইলেন না, কিছুই বললেন না। এদিকে হয়েছে কি, কিছুক্ষণ বাদে আমার হঠাৎ মনে পড়েছে যে একজন আমার কাছে দুই খন্ড গীতার দাম পাবে বলে, সেই টাকাটা তো সেদিন আমি নিয়ে এসেছি আর সেটা জামার ভেতরের পকেটে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ গিয়ে বাবাকে বললাম, "বাবা, আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল ঠিক মনে ছিল না টাকাটা আমার কাছে হবে, আছে আমার কাছে।" বাবা তখন হাসতে হাসতে বললেন, "ওঃ! তুমি বোধহয় ভেবেছিলে যে টাকাটা তোমায় আর ফেরৎ দেব না, তাই না?" আমি বললাম,"আমি যে সেটা ভাবতে পারি না তা আপনি ভাল ভাবেই জানেন।" বাবা হেঁসে বললেন "আরে না না। সেভাবে নয়, আমি এমনই বললাম তোমাকে।" ব্যাপারটা যে কি হল সকলেই নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। কারণ বাবা সেই যে একদিন বলেছিলেন, "তুমি এখন খরচ করে যাও। আমি তোমাকে একদিন সব পুষিয়ে দেব"। এরকম রগড় অথচ কি গভীর ভাবের কথা বলে বাবা মাঝে মাঝে মজা করতেন।

তাই এখন মনে হয় বাবা শুধু পুষিয়ে দেননি ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। এত বড় দাতা পৃথিবীতে কে আছে আমার? গুরুর দেওয়ার কি শেষ আছে? শিষ্যের নেবার ভান্ডারের প্রয়োজন। গুরু তো দেবার জন্য দুহাত তুলে বসে আছেন কিন্তু নেবার মত শিষ্য কোথায়? সেই আধার, সেই ক্ষাত্রতেজ, সেই উদ্দীপনা এককথায় সেই নেবার মত নীরব নিশ্চল কাতর প্রার্থনা কোথায়? আমাদের

আছে শুধু জাগতিক ব্যাপারের কামনা, প্রার্থনা। বস্তু জগতের দেহসুখ, অর্থসুখ, ভোগসুখের প্রার্থনা, আত্মীয় পরিজন, ছেলে মেয়ের জাগতিক সুখের প্রার্থনা, অনিত্য বস্তুর প্রার্থনা, যা আজ আছে কাল থাকবে না, যা আগমপায়ী তাকে পাবার প্রার্থনা, দুধ আর তামাক একসঙ্গে ভোগের প্রার্থনা। এই সবের জন্য আমরা সদাই প্রার্থনা জানাই। ঈশ্বরলাভের জন্য, মৃত্যুর হাত এড়িয়ে নিত্য সুখ ভোগের জন্য, দুঃখ সুখের পাট চুকিয়ে কান্না হাসির হাট পেরিয়ে যাবার জন্য গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি কি আমরা? করি না। তাই আমাদের ঝুলিতে উঁকি মারলে দেখা যাবে শুধু দু'দশ পয়সার মালে ভর্ত্তি, ষোল আনা মূল্যের কোন জিনিষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা বলতেন, "চেয়ো না, চাইতে হয় না, না চাইলে সব পাবে"। এর অর্থ করলে বোধহয় এ মানেই দাঁড়ায় যে যেহেতু আমরা সঠিক জিনিষ চাইতে পারিনা, চাইতে জানিনা তাই ভুল করে পাছে ভুল জিনিষ চেয়ে বসে ক্ষতি করি নিজেদের। তাই দয়া করে আমাদের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য চাইতে মানা। অথবা এর মানে এও হয় যে এমন জিনিষ চেয়ে বসলাম যে সে জিনিষ আমার পাওয়ার অধিকার বা ব্যবহারের জ্ঞান নেই। যেমন একটা ছোট ছেলে যদি হঠাৎ তার বাবার কাছে রিভলভার দেবার আবদার করে, বাবা কি তাকে সেটা দেবেন বা দিতে পারবেন? ছেলের কষ্ট হবে কিন্তু বাবা কেন দিলেন না, সে জ্ঞান তো ছোট ছেলেটির নেই। তাই তার বাবার উপর দুঃখ হবে, অভিমান হবে। তার চেয়ে না চাইতে পাওয়াই ভাল। আবার এটাও হয় যে বাবা হয়ত ছোট্ট ছেলেটিকে মেলায় নিয়ে গেছেন ছেলে বায়না করছে এটা নোব, ওটা নোব, নানা রকমের দু আনা চার আনার জিনিষ। কিন্তু স্নেহময় পিতার মনে আছে যে সন্তানকে তিনি একটা দামী জিনিষ কিনে দেবেন। ছেলের ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে উপযুক্ত বিচারের অভাবে সে তুচ্ছ চার আনার জিনিষ নিয়ে খুশী হল ঠিকই কিন্তু সস্তার মাল ২/৪ দিনেই ভেঙ্গে গিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেল যখন, তখন ছেলেরও দুঃখ হোল আর দামী জিনিষটা না কিনে দিতে পারার জন্য বাবার মনেও অতৃপ্তির দুঃখবোধ থাকল। তাই হয়ত বাবা বলতেন — চাইতে নেই 'কারণ ঠিক ঠিক কি জিনিষ চাইলে

আমাদের আখেরে মঙ্গল হবে তা আমরা জানি না, কিন্তু পিতা তাঁর জ্ঞানে সন্তানের কখন কোন জিনিষ মঙ্গল ঘটাবে, ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে সক্ষম হবে, তৃপ্তি পাবে সবই জানেন। তাই সদা লক্ষ্যকারী ঈশ্বররূপী গুরুদেবও আমাদের কোন কোন জিনিষের কখন প্রয়োজন, বুঝে আগে ভাগেই আমাদের ইচ্ছাপূরণে সদাই ব্যস্ত থাকেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন "যোগক্ষেমম্বহাম্যহম্।" তবে কর্ত্তা সাজলে হবে না - তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনিই ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষটি ঠিক ঠিক ভাবে সন্তানের কাছে পৌঁছে দেবেন। নতুবা বিচার করলেই ঠকতে হবে। এটাত ঠিক।

কান্না হাসির ঢেউ দোলানো জাগতিক এই জীবনটা কিন্তু বাবার বাড়ীতে যতদিন মোহান্ত গুরুর সান্নিধ্যে ছিল, আজ কিছুটা বিপর্য্যস্ত। সাময়িকভাবে হলেও তখন সে জীবনটা ছিল যেন খাপ খোলা তলোয়ার। কোন ময়লা নেই, কোন দাগ নেই, সদা উজ্জ্বল, সদা উচ্ছল, সদাই আনন্দময়। বাবার বাড়ীটা ছিল আমাদের কাছে একটা আনন্দধাম। আর সেই আনন্দধামে বসে আনন্দময়ী মা ও আনন্দময় বাবা দুহাতে বিলিয়ে দিতেন শুধু আনন্দ আর আনন্দ। বাবার সান্নিধ্যে এসে প্রাণে যেন আনন্দের জোয়ার বইত। কত রকমের রঙ্গ, কত ভাবের গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত, কত মজার অথচ কত গভীর সাধনার প্রকাশের ব্যঞ্জনা যে সেখানে নিত্য বাবা দেখিয়েছেন বলে শেষ করা যাবে না। কত আপাত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কত বড় মহাযোগী। সামান্য একটা ফতুয়া গায়ে শীর্ণ দেহ ধরে বাইরের লোকচক্ষে বসে আছেন। সাধারণ লোক দেখলে ভাববে "ইনিই গুরুদেব?" কারণ গুরুদেব অর্থে আমাদের চোখে যে ছবি সচরাচর ভাসে তা হল বেশ সৌম্যদর্শন চেহারা, গেরুয়া বা ঐ রকমে বিচিত্র বসন, রুদ্রাক্ষ মালা, তাবিজ কবচ পরা, জটাধারী বা লম্বা লম্বা চুলের মালিকানা যুক্ত কেউ দেখলেই বাবা বলে প্রথমেই লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হবে। কিন্তু এই মহাত্মারা নিজেদের এত প্রচ্ছন্ন রাখতে ভালবাসেন বা থাকেনও যে কার সাধ্য চিনবে, ধরা না দিলে ধরবে, দেখা না দিলে দেখবে, এমন কি জাগতিক মুখটাও বোধহয় দেখা যায়

না ইচ্ছা না হলে। বাবাকে দেখতাম, বিছানায় শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে, মুখে একটা বই দুহাতে তুলে মুখটাকে আড়াল করে বইটা যেন পড়ছেন এমন ভাব। নুতন কেউ হয়ত হাজির হয়েছে ঐ ভাবেই প্রশ্ন করেছেন "কি চাই? কিছু জানতে এসেছ"? "না বাবা দেখছি।" বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করতে করতে সে হয়ত বলেছে, "বাবা আপনাকে দেখতে এলাম।" বাবা কোন কথা বল্লেন না। এদিকে এক মজার ব্যাপার মহাযোগী ঘটিয়েছেন। লোকটি নত হয়ে প্রণাম করার সময় বাবা কখন নিজের হাঁটু দুটি মুড়ে দিয়ে নিম্নাঙ্গের কাপড় সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে ঐ ব্যক্তি প্রণাম সেরে দাঁড়িয়েই বাবার জাগতিক শরীর ও মুখমন্ডল দর্শনের সুযোগ না পেয়ে "নাঙ্গা বাবা" দর্শন করেই চলে গেল। বাবা, লোকটি চলে যাবার পর খিল খিল করে হেসে শিশুর মত বলে উঠলেন, "শালা দেখতে এসেছে, দেখবি তো দেখ, পালিয়ে গেলি কেন? দেখ কি দেখবি" সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে, বাবা কিন্তু কথা কটা বলেই আবার নির্ব্বিকারভাবে সেই পূর্ব্বের মত চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাইরের জগতে আমরা এই মজা উপভোগ করলেও এর একটা ব্যাখ্যাও তো আছে। কারণ বোধহয় এরা কার্য্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া কিছু করেন না বা বলেন না। কিন্তু এদের কাজের ব্যাখ্যা তো দেওয়া যাবে না, সে স্পর্দ্ধাও নেই। তবে আমাদের মনে তো কত কথাই আসে, তাই এর অর্থ এই হতে পারে যে নিছক রসসৃষ্টি করার জন্যই হয়ত দয়াময় বাবা, রসময় বাবা এই রসের অবতারণা করলেন বা হয়ত কার্য্যকারণ সম্পর্কে এমন হতে পারে যে ঐ লোকটির ভাগ্যে হয়ত ক্রিয়াপ্রাপ্তি বা মহাপুরুষের মায়িক দেহ দর্শনের সুযোগ নেই, তাই এই ত্রিকালজ্ঞ যোগী তাঁর লীলা দেখিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে তার মনে বিরক্তি উৎপাদন করে এখানে আর পুনর্বার না আসার মনোভাব জাগিয়ে তাকে যোগ দীক্ষায় বিঘ্ন ঘটিয়ে সরিয়ে দিয়ে, গুপ্তভাবে সত্যটাকে জানিয়ে দিলেন। কারণ ঐরূপ গুরুদেবের নাঙ্গা মূর্ত্তি দর্শন করে অহংসর্ব্বস্ব আমাদের মনে বিরক্তি আসা খুব স্বাভাবিক বা আরও গূঢ়ভাবে ভাবলে এমনও তো হতে পারে যে

অন্ড মানে বীজভান্ডার বা সৃষ্টির উৎস স্থল যদি হয়, তবে কৃপা করে তাকে ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির মূলীভূত কারণকে তার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। সবই হতে পারে, সব সত্যি, সবই হয়। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। যে যেভাবে নেবে, সে সেভাবেই পাবে। তবে একটা কথা অবশ্য ঠিক যে বাবার ঐ কাজের মধ্যেই ঐ লোকটির মঙ্গল নিহিত ছিল। কারণ এরা কখনও মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করেন না, করতে পারেন না। এদের দয়া সীমাহীন, নিঃসীম।

আনুখালে বাবা গেছেন, আমরাও গেছি। বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে আছি। সুধীরদা আছে আমাদের সঙ্গে। সুধীরদা মানে সুধীর গিরি। বাবার কাজে একপায়ে খাড়া, তালেবর সেজে অপরের কাজ কাড়া। সুধীরদাও আমাদের সঙ্গে আনুখালে গেছে। সেদিন সুধীরদার শরীর খারাপ। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে "বাবা আজ কি খাব?" বাবা মুচকি হেসে বলেছেন, "সাবুটাবু খেও,"। ব্যস! আর যায় কোথা। আমরাও মজা করব ঠিক করলাম। সুধীরদাকে আমি আগে খুব একদিন জোর ধমক দিয়েছি সুধীরদার একটু মাতব্বরী মনোভাবের জন্য, বড্ড অপরের জন্য নির্দিষ্ট কাজ নিজে থেকে কেড়ে নিয়ে করতে যেত বলে। আমার সঙ্গে লাগতে আসত, পারত না। হেরে গিয়ে গজ গজ করতো। মানে আমি তো রেখে ঢেকে বলতাম না। একদিন মা আমাকে গম ভাঙ্গিয়ে আনতে বলেছেন। মাকে বলেছি কাছাকাছি গমকল সব বন্ধ। সুধীরদা বলে উঠল, "না মা, বামুনগাছিতে গমকল খোলা আছে, - বিষ্টু মিথ্যে কথা বলছে"! কিছু না বলে দূরের গমকলে হাজির হয়েছি গম ভাঙ্গাতে। কোথাও কিছু নেই, সুধীরদাও হাজির হয়ে ওস্তাদী করে আমার কাজটা কেড়ে নিয়ে করতে চাওয়ায় দিয়েছি জোর ধমক, বলেছি— "দেখেছিস্ চেহারাটা, দুহাত দিয়ে গলা টিপে একেবারে মেরে ফেলব, আমার সাথে টক্কর মারতে আসিস না।" তারপরেই সুধীরদার চোঁচা দৌড় আর গজগজানি। সেই থেকে আর আসত না, ভয় পেত, মানে সেদিন তো রেগে গেছি এমন যে তুই ই বলেছি, তুমি টুমি নয়। যাই হোক সেই সুধীরদাকে কায়দা করে আমরা সাবু বলে ভাতের ফেন এমনভাবে সরবরাহ

করেছি জানতেও পারেনি, বুঝতেও পারেনি । সাবু মনে করে দিব্যি খেয়ে টেয়ে সুস্থ মনে রাত কাটিয়েছে। পরদিন সকালে সকলের সামনে বাবা সুধীরদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুধীর কাল রাত্রে তাহলে কি খেলে?" অন্তর্যামীর কাছে তো কোন জিনিষ অজানা নেই, সবই জানেন। সুধীরদা রাতের ঐ ভান্ডারা ভোজ না খাওয়ার দুঃখ চেপে বেশ বিষণ্ণ চিত্তে গুরুবাক্য পালনের তৃপ্তিতে জবাব দিচ্ছে, "কেন বাবা? আপনি বললেন সাবু খেতে তাই সাবু খেয়েই আছি।" বাবা হাসতে হাসতে বললেন, "সাবু খাইছ? ছাই খাইছস্ ,তুই ফ্যান খাইছস্ কাল।" সুধীরদা কটমট্ করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, যেন জ্যান্ত খেলে বাঁচে। আর আমরা? আমাদের বাঁধনহারা হো হো হাসির শব্দে সুধীরদার গজগজানি তখন কোথায় তলিয়ে গেছে। কি করব? সুধীরদাকে জব্দ করার ইচ্ছাটা মাথায় জেগেছিল। হয়ত ইচ্ছাময় গুরুদেব প্রয়োজনবোধে জাগিয়েছিলেন। হয়ত বা ঐ দিন ঐ সময়ে সুধীরদার ঐ অবস্থায় ঐ খাদ্যটাই মঙ্গল করেছিল, কে বলতে পারে?

ঐ সুধীরদাকেই একদিন আমাদের বুজির বাবা মানে চক্রবর্ত্তীদা গুরুবাক্য পালনে তৎপর হয়ে মুখে প্রস্রাব করে দিল। এই সব মজার মজার কত রঙ্গ কত রসের খেলা রসময় গুরুর কাছে ঘটতে দেখেছি। তাঁর করুণায় কখনও স্বয়ং অংশ নিয়েছি, কখনও বা দলবদ্ধভাবে বাবা ঘটিয়েছেন, যার ভেতরে তাঁর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নিশ্চয়ই কিছু ছিল, আর অবশ্যই ছিল কোন সম্ভাবিত মঙ্গলের ইঙ্গিত, নচেৎ তিনি কখনও ঐ সব ব্যাপার ঘটাতেন না বা ঘটতে দিতেন না। কারণ প্রয়োজনে, সন্তানের বিশেষ প্রয়োজনে, তার হিতার্থে পিতাকে অনেক সময় সন্তানকে নিজ হাতে ভয়ঙ্কর বিষতুল্য ঔষধও তো প্রয়োগ করতে হয়। আর ঐ বিষই তখন অমৃতের কাজ করে সন্তানের জীবনদাতার ভূমিকা পালন করে, এমনতো যখন তখন দেখা যায়। কাজে কাজেই বাবা হয়ে সন্তানকে প্রস্রাব সেবন করানোর মধ্যে যে অবশ্যই মঙ্গল ছিল সে কথা তো সহজেই বোঝা যায়।

☞ যা বলছি তাই করো

এইসব সিদ্ধমুক্ত যোগীঋষিদের কাজ কারবার দেখে অপার বিস্ময়ে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং নীরব দর্শক হয়ে থাকাই ভাল। আর তা না হলে কিছু তো বোঝা যাবে না, ভাবাও যাবে না। উপায়ই বা কি?

একজন ভক্ত এসেছে একদিন, ক্রিয়া নেওয়ার আদেশ হয়েছে। যথানিয়মে বাবা যেমন সময় হলে বলতেন, "অমুক, ওকে দীক্ষাটা দিয়ে দাও বা ক্রিয়াটা দিয়ে দাও। সেদিন মনে হয় শুকদেবদাকে বাবা ঐ লোকটিকে ক্রিয়া দেবার আদেশ দান করলেন দয়া করে। এদিকে লোকটি তো মনে মনে বাবাকে গুরুরূপে বরণ করে এসেছে দীক্ষা পাবে বলে। তাই আদেশপ্রাপ্ত শুকদেবদা যেই ঐ লোকটিকে ক্রিয়া দেওয়ার ঘরে যাবার জন্য ডেকেছে, অমনি লোকটি সবিনয়ে বাবার কাছে বলছে, "বাবা, দয়া করে আপনি নিজে দিলে ভাল হয়।" বাবা তো সোজা হয়ে বসে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ধমকের সুরে বলে উঠলেন, "যা বলছি তাই করো।" লোকটি বিষণ্ণ চিত্তে কি করবে, ভাবী গুরুদেব বলছেন, কোনক্রমে ক্রিয়ার ঘরে ঢুকল। ক্রিয়া প্রাপ্তির পর কিন্তু সে খুশীতে ডগমগ হয়ে বাবাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। যখন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কি দেখলে?" আবেগে আপ্লুতস্বরে, কৃতার্থের ভঙ্গিতে লোকটি বলছে, "আজ্ঞে বাবা কি বলব? আপনিই দয়া করে ক্রিয়া দিলেন।" বাবার মুখে মুচকি হাসি, যেন তৃপ্তিতে ভরপুর। গুরু শিষ্য উভয়েরই উৎফুল্ল হৃদয়। এ সব খেলার রহস্য কি বুঝব আমরা? যে বুঝবে সে মরবে, সে মজবেও, মজে তবে বুঝতে পারবে, এইটুকুই বোধহয় এ রহস্যের মর্ম্মার্থ।

যোগীবর শ্রীশ্রী শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যোগীরাজ শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী
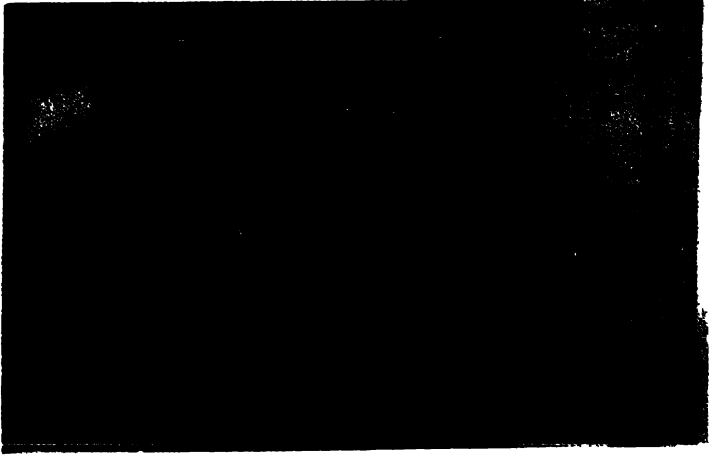
যোগীশ্বর শ্রী শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

বেলাশেষের নিবেদন

এভাবেই আনন্দের অনাবিল স্রোতে ভাসতে ভাসতে কেটে গেছে দয়াময় বাবার বাড়ীর মধুময় দিনগুলো। সেই দিনগুলো শুধু আনন্দের হলেও, সেই সব প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো চিরকাঙ্খিত হলেও সেদিনের সেই প্রতিক্ষণের ছোট্ট মনটার মধ্যে ফিরে ফিরে পেতে চাইলেও তো পাব না সেই দিনগুলোকে। তাই না পাওয়ার ব্যথা, হারানোর ব্যথা, ব্যথার ব্যথীকে হারানোর ব্যথা, জন্ম জন্মান্তরের জনককে ইহজন্মে আর না পাওয়ার সুযোগের ব্যথা, হৃদয়নিধিকে হৃদপদ্ম ছাড়া অন্য কোথাও না দেখার ব্যথা, তাই চকিতেও যদি অতীতকে স্মরণ করতে যাই অমনি দেখি প্রতিটি মূহুর্ত্ত লীলাময় গুরুর লীলায় পরিপূর্ণ। যা দুঃখের তাও তাঁর লীলা, যা সুখের তাতেও তাঁর লীলা, আবার আমার এই অনিত্য দেহের মধ্যে থেকে কত না লীলা তিনি করে চলেছেন। জীবন কাহারো সমান নাহি যায়, আমারও যায় নি। তাই বলি, হে ঠাকুর তোমার মায়ার সংসারে থাকাটা যে কত কষ্টের তা তুমি ভাল করেই জান। কিন্তু বুঝতে দাও না। কারণ বুঝতে দিলেই আর কষ্ট থাকে না, তাই মায়া দিয়েই অষ্টপ্রহর বেঁধে রেখেছ। এ জগতে এসে কতই না দেখলাম, কিন্তু বুঝলাম না কিছুই। কারণ জ্ঞানের আলোতে একবার বুঝলেও পরক্ষণেই অজ্ঞান আমার জ্ঞানকে আবার আচ্ছন্ন করে। নিজ বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে কখনও ভুল হয়নি, দুর্গম হলেও কখনও রুদ্ধ হয়নি চলার পথ, কারণ সর্ব্বদা তোমার স্মরণে কাজ করতাম। স্পষ্ট মনে হোত, আমার সব কাজে তোমার সম্মতি আছে, তা সে সুকর্ম্মই হোক বা দুষ্কর্ম্মই হোক, ভেতরে তোমার সান্ত্বনা অনুভব করতাম। বেশ মনে পড়ে আমার নির্জ্জন পথেও তুমিই ছিলে পথের সাথী, দিতে অভয়, দিতে বরাভয়। ব্যর্থকাম হলেও তুমিই ভেতর থেকে বুঝিয়ে দিতে, দিতে উৎসাহ, জোগাতে প্রেরণা। তাই তো কেউ কখনও আমাকে বিষণ্ণ দেখেনি, কাঁদতে দেখেনি, ভেঙ্গে পড়তে দেখেনি কখনও। তাই তো আজও বলি যে খাওয়ার জন্য ছাড়া কখনও কাঁদিনি। কিন্তু আজ আমার এ কি দুর্দ্দশা প্রভু? আজ সর্ব্বব্যাপারে

পরনির্ভরশীলতা যেন আমার সঙ্গী হয়ে আছে। সর্ব্বদাই চাপা কান্না অন্তরকে মথিত করছে। তবে কি ভুলের মাশুল দিচ্ছি? কেন তুমি আমার হাত ধরে তুললে না? তোমাকে ছেড়ে মায়ার উপর নির্ভর করেছি তাই? যে জীবনভোর তোমার উপর সদা ভর দিয়ে চলেছে, তুমি ছাড়া তার এ জীবন কতটা দুর্ব্বিসহ হয়েছে তুমি তো বোঝ। দয়াল গুরু তুমি, করুণাসিন্ধু তুমি, পতিতপাবন নাম যে তোমার। কৃপা করে একবার এই জীবন সন্ধ্যায় আমাকে হাত ধরে এক টানে তোমার চরণপ্রান্তে নিয়ে যাও প্রভু, যাতে এই মায়াময় মোহনরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি। এই দুরন্ত সংকটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার কর প্রভু ! আমি জানি এ সবই তোমার খেলা, তোমার লীলা। কিন্তু এও জানি তুমি কখনও আমাকে পর করে দিতে পার না।

☞ গুরুকীর্ত্তন

চৈত্যময় গুরু চরম ক্ষতির মধ্য দিয়েও পরমার্থ সাধন করাতে পারেন। গুরু যে পরাশিব। পঞ্চ মুখে সর্ব্বদা হরিনাম করেন জীবের কল্যাণের জন্য। কেউ একথা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, অতীতের এমন সব ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা দেহ ভোগের মধ্য দিয়েই দেহবন্ধনের মুক্তি ঘটিয়েছেন। **আদিকাল হতে আজ পর্য্যন্ত জীবের মুক্ত হবার কিন্তু এটাই নিয়ম, আর তা হল গুরুতে সর্ব্বস্ব অর্পণ, গুরুতে নির্ভরতা।** জীবের হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদা বাস করে জীবের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের খবর রাখেন। তিনি নিজে নিষ্কাম থেকে জীবের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করে দেন। তিনি যেহেতু নিজে নিষ্কাম তাই তাঁর উপর নির্ভরতাই জীবের মুক্তির কারণ ঘটায়। তিনি জ্বলন্ত আগুন, তাই তাঁর উপর নির্ভরতায় মনের সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দেয়, ছাই করে দেয় দেহমনের মালিন্য। সুদুর ও অদূর অতীতে তাই দেখা যায় কত পতিত ও পতিতা মহাপুরুষের চরণাশ্রিত হয়ে, তাঁদের একান্ত শরণাগত হয়ে, নির্ভর করে মুক্তিলাভ করেছেন। **প্রারব্ধ বলে, যে যেমন দেহ ধারণ করেছে তাকে সেইরূপ কর্ম্ম**

করতে হবে। কিন্তু কর্ম্মটাই সর্ব্বদা আসল নয়, আসল হল ভাব। তিনি ভাবাশ্রয়ী তাই ভাবটাই গ্রহণ করবেন। যেমন মুচি হয়েও শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। দেহটা তার মুচির ঠিকই, কিন্তু অন্তর যদি গুরুময় (হরিময়) হয় তবে গুরুতেই তার গতি হয়। শুধু মনটা তাঁর চরণে নিবেদিত হতে হবে, বাহ্যভাবে যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

গুরুদেবের উপর বিশ্বাস রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু রাখতেই হবে, না রাখতে পারলে সমূহ বিপদ। আমরা সাধারণ জীব, বদ্ধ জীব, নিজেদের বড়ই অসহায় মনে হয়। সামান্যতম বিপদেও বিচলিত হয়ে পড়ি, কারণ শ্বাসের স্থিরতা নেই। তাই গুরুর উপর বা গুরু বাক্যের উপরও স্থিরতা বা বিশ্বাস (বি অর্থাৎ বিশেষ অর্থাৎ নাই শ্বাস) নেই। গুরুকৃপায় মুক্তি কিন্তু কঠিন নয়।

কৃপা মানে - করে পাওয়া। আমরা "গুরুকৃপা" কথাটা খুবই বলি কিন্তু এই করা কথাটার অর্থ বুঝি না। তাঁর উপর নির্ভর করা, তাঁর বাক্য পালন করা, তাঁর কাজ করা, সবই করা, সবচেয়ে প্রয়োজন তাঁর উপর নির্ভরতা অটুট রাখা। একান্তভাবে গুরু তো পরম কারুণিক, করুণার আধার। কি ভাবে কার প্রতি কখন, কেমন ভাবে তিনি কৃপা করবেন বলা মুশকিল। তবে এটা খুব সত্য যে তাঁর উপর নির্ভরতা, তাঁর মত উদার, তাঁর মত পক্ষপাত শূন্য যতদিন না হওয়া যায় ততদিন কিছুতেই চিরন্তন সুখ শান্তি লাভ করা যায় না। তিনি আমাদের সবকিছু দিয়েছেন কিন্তু চান না কিছুই। আদর অনাদর কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। আমরা কি পেয়েছি তার হিসাব রাখিনা, রাখতে চাই না। অপরে কি পেল, আর আমি কি পাইনি তারই হিসাব রাখতে সদাব্যস্ত। আর এর জন্যই তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করি, এত অকৃতজ্ঞ এত অধম

আমরা। গুরু সর্ব্বত্র সমানভাবে আছেন, সকলকে তিনি সমান চোখে দেখেন, আমরা অজ্ঞানতা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে থেকে তাঁকে অবিবেচক বলে ধিক্কার দিই। কিন্তু তিনি এত দয়াল যে আমার শত অভিমানেও বিচলত হন না। বরং অকৃপণভাবে আমাকে তবুও শুধু দিয়েই চলেন। কেমন ভাবে আমাকে সুস্থ সবল রাখা যায়, কেমনভাবে উন্নতি ঘটান যায়, আমার, কিভাবে কোন পথে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলতা আসে সেই তদারকিতে তিনি সদাই ব্যস্ত থাকেন। এতই তাঁর করুণা, তিনি এত অকৃপণ দানসাগর।

☞ প্রার্থনা

হে ঠাকুর, হে অন্তর্য্যামী, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় বিকালের দিগন্ত দেখা দিয়েছে। হে পরম দয়াল গুরু, সারাজীবন তোমার লীলাতে, তোমার খেলাতে মগ্ন থেকে সময়ে অসময়ে বিচারে, অবিচারে, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে, জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার অকৃপণ দানে তোমারই দেওয়া অতুল বৈভবে মত্ত হয়ে তোমার দানকে, তোমার সদা উন্মুখ দৃষ্টিকে, সম্যক মর্য্যাদা দান হয়ত করতে পারিনি-কিন্তু তুমি তো ক্ষমার আধার, আমার সব অক্ষমতা, আমার সব অপরাধ, আমার শতেক অজ্ঞানতা, তুমি ক্ষমা করো ঠাকুর। তুমি হাত বাড়িয়ে সারা জীবনের ন্যায় আজও কৃপা করে আমার হাত ধরো, ধরে রাখো আমাকে তোমার হৃদয়ের মাঝখানে। আর যদি তুমি দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে বিকশিত না কর, শত ঝঞ্ঝার কুহেলিকা অবহেলায় দূরে সরিয়ে, শত বাধার ঘনঘটার মেঘ নিমেষে নাশ করে, শত মায়ামোহের জাল অবহেলায় ছিন্ন করে, আজ যদি তুমি আমার সম্মুখে প্রকাশিত না হও তবে তো জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা আমার বিফল হয়ে যাবে। হে কৃপাময়! তুমি তো জান কিসের জন্য সব কিছু আমি ত্যাগ করেছিলাম। তুমি তো বোঝ তোমার জন্য কতটুকু অনিত্য সুখ আকাঙ্খা করেছি। ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, সংসার তোমার কাছে

কখনও তো চাইনি মালিক। চেয়েছিলাম শুধু তোমার মালিকানায় মালী হয়ে থেকে তোমার সেবা করতে, চেয়েছিলাম শুধু তোমার রূপে রূপসী সেজে থাকতে, তোমার গরবে গরবিনী হয়ে থাকতে, তোমার বিশাল রাজত্বের এককোণে নিতান্ত দীনহীন হয়ে অবজ্ঞা অবহেলা আর অপমান সয়ে, চোখের জল আড়ালে মুছে তোমারই জন্য চোখের জলে ভাসতে চেয়েছিলাম। শুধু তোমাকে শুধু তোমাকে। তুমি তা জান, তুমি তা বোঝ, কারণ সর্ব্বজ্ঞ তুমি। তবে কেন আমাকে অন্যরূপে দেখা দিতে চাও? ঐরূপ তো চাইনি। ঐরূপ তো তোমার ভ্রান্তির রূপ - এরূপ তোমার সংবরণ কর। এরূপ তোমার মায়ার, তোমার ছলনার - এরূপ তোমার সংবরণ কর ঠাকুর, তোমার শান্তরূপ, তোমার স্নিগ্ধরূপ, তোমার ভুবনভোলানো রূপ সাধক দেখতে চায়।। দেখতে চায় তোমার বিদ্যারূপ, তোমার মাতৃরূপ, তোমার জ্ঞানময় রূপ, যার উজ্জ্বল প্রভা তোমার সন্তানের মুখে পড়ে উজ্জ্বল আলোর ছটা বিকিরণে আমার আমিকে - চিরদিনের হারিয়ে যাওয়া আমিকে - যুগ যুগান্তরের অজ্ঞানের অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যাওয়া যোগী বাঞ্ছিত নিজ স্বরূপকে সে চিনতে পারে। বড় বুভুক্ষিত আমি, বড়ই কাঙাল আমি, বড় বিপন্ন আমি-একমাত্র তুমিই পার আমাকে এ গোলকধাঁধার পথে না ফেলে রেখে তোমার অভয়পদ কমলের আশ্রয়ে আসীন করতে - একমাত্র তুমিই দিতে পার পরামুক্তি, পরাশান্তি, পরাবৈরাগ্য, পরাচৈতন্য। সব নিয়ে একমাত্র সব দিতে পার তুমি, সর্ব্বহারা করে সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে পৌঁছে দিতে পার তুমি, সবহারানোর দেশে পৌঁছে দিয়ে - সব পেয়েছি বলাতে পার তুমি, সব চক্ষু বন্ধ করে দিয়ে সব কিছুর সৌন্দর্য্য দর্শন করাতে পার তুমি। তাই করো ঠাকুর, তাই করো। ধন, মান, জীবন, যৌবন, কামনা, বাসনা, সুখ, সম্পদ, ঘাত, প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, আসক্তি, নিরাসক্তি, জ্ঞান, অজ্ঞান, সব কিছু আজ নীরবে নিভৃতে চোখের জলে ভিজিয়ে তোমাকে দিতে চাই-বিনিময়ে চাই শুধু তোমাকে, শুধু তোমাকে। বল, তুমি আমার হবে? আমারই শুধু হয়ে থাকবে? থাকবে তুমি আমার হৃদয়ের নিভৃত গোপন কোণে।

সঙ্গোপনে তুমি আর আমি-আমি আর তুমি। চিরদিনের চিরকালের অনন্ত সৌরভে, দুয়ে মিলে এক হয়ে পরম গৌরবে? তোমার জয় হোক ঠাকুর, এই প্রার্থনা জানাই।।

****

একাদশ অধ্যায়

সাধক জীবনের বহু প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে সাধককে চলার মত পথ স্থির করে কায়মনোবাক্যে গুরুস্মরণ করে একদৃষ্টিতে চোখের জলে ভেজা পথকে চোখের আলোতেই দেখে দেখে পথ চলতে হবে। চোখে জল আনবে শুধু তাঁকে না পাবার দুঃখ, চোখে আলো জ্বালাবে ঘাত প্রতিঘাতের তীব্র দহন। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য, প্রতিকূলতাই সাধনার অনুকূল অবস্থা বলে ধরে নিতে হবে। কারণ প্রতিকূল অবস্থা যাঁর সৃষ্টি, অনুকূল অবস্থাও তাঁরই তো সৃষ্টি। আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুদল তাদের আক্রমণকে প্রথমে বুঝতেই দেয় না, এত সুচতুর আক্রমণকারী এরা, অথচ যখন বোঝা যায়, তখন দেখা যায়, এরা ভালভাবে আমাকে কব্জা করেছে, বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের সঙ্গই তখন মধুর লাগে, তাদের সহবাসের অনুকূলে যুক্তিও মনে উদয় করিয়ে দেয়। কিন্তু কখনও কখনও এক আধবার আবার মনে এ কথাটাও উদয় হবে যে বোধহয় ভুল হচ্ছে কিন্তু পরক্ষণেই বিপরীত চিন্তা এসে মনকে এদের সঙ্গ ত্যাগ করার বাসনা স্তিমিত করে দেবে। এই অবস্থায় দয়াময় গুরুদেব যদি এদের মোহকারী গন্ডী থেকে তাঁর অহৈতুকী কৃপায় বার করে না দেন তাহলে সাধকের অপমৃত্যু অনিবার্য্য। গুরুর দয়া ছাড়া সাধনা অসম্ভব। যদিও এটা ঠিক যে আসক্তি বা বাসনা একেবারে ত্যাগ করতে পারি না তবুও এটার বদলে যদি অবজ্ঞা, অবহেলা ও লাঞ্ছনা

দৈনন্দিন প্রাপ্তি ঘটে সেটাই মঙ্গল। তিনি দেখেন যে আমার হৃদয় কতটা তৈরী বা পোক্ত হয়েছে। যদি বাহ্য প্রাপ্তির জন্য এতটুকুও আসক্তি থাকে, অন্য কিছু চাহিদা থাকে, তো তিনি তোমার কাছে আসবেন না কখনও। হৃদয়ে শুধু তাঁরই আসন পাতা থাকবে, অন্যের ছায়ামন্ত্র থাকলেও তাঁকে পাবে না, পাওয়া যাবে না।

☞ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

এই দেহটার মধ্যেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বাস। ধর্ম্মের ও অধর্মের উভয়েরই প্রকাশ এই দেহেতেই ঘটে, যখন যার প্রভাব বৃদ্ধি হয়। আবার এই দেহ রথের সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই পরিচালক, ধর্ম্মও যার, অধর্ম্মও তার, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দেবতা, অসুর এরা সবাই ছিল। দেবতা ও অসুরদের পিতা একজন, মাতা দুজন। তেমনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্রষ্টা একজন এবং উভয়েই এই দেহেতেই বাস করে। সৃষ্টির কর্তা কর্ম্মের ফল অনুযায়ী যাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন ঠিক সেই অনুসারে এরা শক্তি প্রদর্শন করে। ভালভাবে বিচার করলে দেখা যাবে জগতে ধার্ম্মিক বলে যাদের খুবই পরিচিতি রয়েছে তাদের মধ্যেও অধর্ম্মের প্রকাশ ঘটেছে-যেমন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ নিজে, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, ব্যাসদেব ইত্যাদি। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। আবার মজার ব্যাপার হল যে অসুর হয়ে যারা জন্মেছে তাদের মধ্যেও ধর্ম্মের প্রকাশ ঘটেছে। দানব সম্রাট বলি যদি ঠিক সময়ে সাহায্য না করতো তাহলে দেবতাদের অমৃতলাভ ঘটতো না। অথচ দেবতারা এই সময়ে অসুরদের প্রতারণা করল। আরও আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি এই প্রতারণার পরামর্শ দাতা কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ ও সহকারিণী হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। **কাজেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য এ সব বিচার না করে আমাদের আত্মার সেবা অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম করাই উচিত, আর সেটাই হোল ঠিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।** সেই আত্মা কিন্তু পাপ

পুণ্যের উর্দ্ধে অর্থাৎ লিপ্ত নয়। ধর্ম্ম ছাড়া অধর্ম্ম টিকতে পারে না, যেমন-আকাশে সূর্য্য চিরবর্ত্তমান, মেঘ সাময়িক সূর্য্যকে আড়াল করে বটে, টেকে না। সূর্য্য কিন্তু মেঘকে আড়াল করে না কারণ সে জানে ওর স্থায়িত্ব সাময়িক। ধর্ম্ম আছে বলেই তেমনি অধর্ম্ম দাঁড়ায়, কালক্রমে তার অবসান হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না। কারণ ধর্ম্মের লীলা প্রকট করার জন্য তাকে আবার প্রকাশিত হতে হয়। তাই এই স্থূলদেহ যতদিন থাকবে সেখানে উভয়েই অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম থাকবেই। তবে অন্তিমে ধর্ম্মের প্রভাব বাড়বেই, কারণ সে চিরন্তন। অতএব এই স্থূলদেহে স্থিরত্বও থাকবে, চঞ্চলতাও থাকবে, আর এই দেহে মহাস্থিরতার স্থিতিকাল যদি বেশী হয় একসঙ্গে ও একবারে তাহলে দেহ থাকবে না, আর দেহ না থাকা মানেই ঈশ্বরের লীলা প্রকাশিত হবে না। মোটর গাড়ী যেমন না চালালে অচল হয় তেমনি পরমহংস অবস্থায় থেকেও কখনও সখনও প্রাণের চঞ্চলতার প্রকাশ ঘটাতে হয়, ঘটেও, নচেৎ দেহটা থাকবে না । প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নানা কাজ করিয়ে তবে দেহস্থ আত্মা মুক্তি পাবে। আর সেই জন্য এই দেহটার মধ্যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খেলাও চলে আর এটার নামই কুরুক্ষেত্রের কুরু পান্ডবের যুদ্ধ। যখন এই দেহেতে ধর্ম্মের প্রভাব বেশী থাকে তখন দেহের ভেতরে ও বাইরে থাকে নীরবতা, আর যখনই দেহের মধ্যে কামনা বাসনা প্রকাশ ঘটবে তখনই দেহের ভেতরে বাইরে ক্রোধ, অস্থিরতা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে, ধর্ম্মকে অধর্ম্মের মেঘে ঢেকে দেবে। শ্বাসের গতি বাড়বে, দেহমন অশান্ত হবে, স্বস্তি থাকবে না, নিজেকে ও অপর দশজনকে বিচলিত করবে। কিন্তু·ধার্ম্মিক নিজে শান্ত থাকে; নিজেও বিচলিত হয় না, অপরকেও করে না, অন্তরে শান্তি বিরাজ করে, অধার্ম্মিকের চক্ষুশূল হবে। এই দেহে অবিরত এই রকম ঈশ্বরীয় লীলা চলছে, শেষে অন্তিমে ধর্ম্মের জয় হয়, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দেহ খাঁচাটায় ঢুকে ঈশ্বরও বন্দী হয়ে যান মায়াজালে, হন পরাধীন। কেননা, যে প্রারব্ধবশে এই দেহটা তৈরী, জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভোগ তাঁকে করতেই হবে, এমন কি যদি কেহ অষ্টপাশমুক্ত

হন তবু ঘটস্থ হয়ে সেই ফলভোগ করতে হবে। তবে হ্যাঁ যারা এই প্রাণবায়ুর প্রবাহকে স্থির করে জিতশ্বাস হতে পারেন, তাদের তখন দেহাত্মবোধ থাকে না বলে স্বাধীন হতে পারেন এবং তাঁরাই তখন একমাত্র যা খুশী তাই করতে পারেন। তবে সচরাচর তাঁরা কখনই প্রকৃতির কাজে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে বাধা দিতে পারেন না। কারণ তাঁরা তখন দেহের নিয়ম কানুনের উৰ্দ্ধে এবং তাঁরা পাপপুণ্যের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে কাজ করেন না। যে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হয়েছে, প্রারব্ধ ফল তাকেও কিন্তু ভোগ করতে হবে। এই দেহের মধ্যেই সব স্তরে স্তরে সাজানো আছে কেবল কালপূর্ণতার অপেক্ষা করছে। এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সেই চিরন্তন প্রশ্ন, যে তাহলে কি প্রারব্ধের হাত থেকে রেহাই নেই? ভাগ্যই কি তাহলে শেষ কথা? নিয়তিই কি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান? না - না তা নয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, "একমাত্র সেইজন পারে রোধিবারে নিয়তি শাসন, যেজন নারায়ণে কর্ম্মফল করে সমর্পণ।" অর্থাৎ যতক্ষণ মনপ্রাণ শ্রীগুরুর চরণে অর্পিত হয় ততক্ষণ প্রারব্ধ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু দেহধারী জীব তো তা পারে না - দেহ খাঁচায় নামতেই হবে এবং নির্লিপ্ত ভাবে হলেও প্রারব্ধ ভোগ করে খণ্ডন করতে হবে।

বিশ্বামিত্র বনের ভেতর আত্মগোপন করে তপস্যা করতে গিয়েও মেনকার ফাঁদে পড়লেন। পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দুর্ব্বাসার মত মহাতপস্বীরাও কোন না কোনভাবে নানা ঘটনায় লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ধর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেই ঐ রকমের তপস্বীরাও প্রবৃত্তির চোরা গোপ্তা আক্রমণে কাহিল হয়ে গেলেন-কিন্তু তাতে সাধককে হতবল হলে চলবে না। তাকে মনে রাখতে হবে যে সাধনার ফল কখনও নষ্ট হয় না, কিছুতেই নয়, সে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান, সাময়িক হয়ত রোগ ভোগ ইত্যাদি নানা রকমের বিঘ্নতে শরীর দুর্ব্বল হতে পারে। অতএব সাধক তুমি ছোট বড় যে

স্তরেই থাক না কেন, কোন অবস্থাতেই হতাশার কোন কারণ নেই। মনে রাখবে তুমি দিব্য শক্তিতে বিশেষ ভাবে বলীয়ান, তুমি চলেছ এই আমি থেকে সেই আমির সন্ধানে, সত্যের সাথে মিশতে। সাধককে তাই দাঁতে দাঁত চেপে এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হবে। দেহের মধ্যে থাকার জন্য দেহের ধর্ম্ম মানতেই হবে। যেমন অবধ্য শ্রীকৃষ্ণ দেহধারণ করে ধর্ম্মের জয় এনে দিয়ে আশ্রিতদের রক্ষা করে নিজে শেষে একলব্যের বংশধর জরা ব্যাধের হাতে নিহত হলেন। অতএব ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের এক দেহেই পরিণতি বিচার করলে মানতেই হবে যে ধর্ম্মক্ষেত্র আর কুরুক্ষেত্রের স্থান আলাদা নয়। দেহটাই ধর্ম্মক্ষেত্রও বটে, আবার কুরুক্ষেত্রও বটে - ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। একই ক্ষেত্রে দিব্যজ্ঞান আর অন্ধত্ব। ঈশ্বরের এ এক বিচিত্র খেলা। যত বড় শক্তিধর সাধক সাধিকা হোক না কেন প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা তাদের নিত্য সাথী। অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় হাওয়াই বইবে। আমরা নানা দেবদেবীর পূজা করি। অন্যান্য সম্প্রদায় অনেক রকমের উপাস্য দেবদেবীর সাধনা করে। কেননা আমরা ভাবি তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিমান বা বলবান, তারা প্রসন্ন হলে সুখে থাকব, কোন বাধা বিঘ্ন আসবে না বা কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। আর আমাদের ভেতরে বসে সেই চতুর চূড়ামনি মজা দেখে ভাবেন যা করছিস আপন মনে, আপন ভাবে, কর না কেন; শেষে কিন্তু আমার কাছে আসতেই হবে, কারণ, যাকে ইচ্ছা যে ভাবেই ভাব, কর, সব আমারই রূপ, আমারই ভিন্ন ভিন্ন ছায়া। কোন রকমে বুঝতেই দেয় না বা হয়ত কোন কোন ভাগ্যবানকে অতি কষ্টে তবে বুঝায় যে, সে আমাদেরই স্ব স্ব দেহের হৃদয় গহ্বরে সদা সর্ব্বদা বাস করছে-তাহাকে বোঝা বড় কঠিন, অনেক কষ্টে কোন কোন নিষ্ঠাবান সাধক/সাধিকা বা কোন ভক্ত তাঁকে যদি বুঝতে পারে তখন সে বাঁধা পড়ে। যতদিন না কামনা বাসনা দেহ ছাড়ে ততদিন সে বুঝতে দেবে না, জ্ঞান আসবে না, কুরুক্ষেত্রের ছায়াও দূর হবে না, তা যতই

দেবদেবী বা ভূত প্রেতের সাধনা করি না কেন। এই দেহেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী দিয়ে প্রাণবায়ু অবিরত যাতায়াত করছে। যতদিন প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলা ছেড়ে সুষুম্নাতে না যাবে বা ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় না যাবে ততদিন জীবকে মায়ার অধীনেই বাস করতে হবে। ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই জড়সমাধি বা চেতনসমাধির অবস্থা। চৈতন্য সমাধিতে থেকে চলাফেরা, কথাবলা, কাজকর্ম্ম করা সব হতে পারে, তবে নিষ্কাম ভাবে। আর জড় সমাধিতে ইন্দ্রিয়াদির কোন কাজ থাকে না। প্রাণবায়ু যখন উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে, নিষ্কাম ভাবে চলছে চৈতন্য সমাধিতেও ঠিক সেইভাবে প্রাণের কাজ চলে নিষ্কাম ভাবে। যখন জীব মুক্ত অবস্থায় থাকে - জীবের সমস্ত দুঃখের তখন অবসান হয়। কিন্তু ইড়া পিঙ্গলায় গতি থাকলে সম্ভব নয়। আর অসংখ্য প্রাণায়াম অন্তমুখীণভাবে হলে তবে এটা সম্ভব হয়। শান্তির আশায় জীব অনন্তপথ অতিক্রম করে, কিন্তু জানে না, কিভাবে এই শান্তি সহজে মেলে। তাই নানা কামনা বাসনার জালে পড়ে শেষে হতাশ হয়, ঈশ্বরের কথা ভুলে যায়। তারপর একদিন ভোগ শেষে কাল পূর্ণ হলে সদগুরু দেখা দেন। তখন প্রকৃত পথ জানতে পারে, চলে প্রকৃত সংগ্রাম। অনেক চেষ্টার পর আসে দ্বৈতসত্ত্বা বোধ, তারপর এক হওয়ার লড়াই। এই দেহেতেই সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব অবিরত চলছে-এরই নাম হল দেবাসুর সংগ্রাম। অতএব বিচার করলে দেখা গেল এই দেহেতেই আমিই কর্ত্তা, আমিই শাসক, আমিই রাজা, আমিই প্রজা, আমিই সৃষ্টি করি, আমিই নাশ করি-আমিই ধর্ম্ম বা আত্মা, আবার আমিই পূর্ণ। এই ছোট আমিটা (অহং) বড় আমিতে মিশে গেলেই ল্যাঠা চুকে গেল অর্থাৎ আমি মুক্ত, আর ছোট আমিতে ফিরে এলে আবার বদ্ধ। আমিই জীব আবার আমিই শিব। এই লীলাই ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চলছে নিশিদিন নিরন্তর, নিরবধি।

☞ নারায়ণ ও নিয়তি

কালের চক্র চষে বেড়াচ্ছে নিশিদিন এই উভয় ক্ষেত্রকে, কখনও থামে না-কাউকে সে মানে না, কারো কথামত চলেও না। তাকে মেনে চলতে হয় সকলকেই। তার রথচক্রে নিষ্পেষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে সম্রাট এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত, এই কালচক্রই হল নিয়তি। একমাত্র নিয়তিতেই যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সে এই নিয়তির শাসনে বাঁধা নেই অর্থাৎ নারায়ণকে যে নিজেকে সমর্পণ করে সেই নিয়তির শাসন এড়াতে পারে। কারণ নিয়তি আর নারায়ণ একই। আমরা কালের অধীন হয়ে বাস করছি তাই কাল যা প্রসব করবে তা ভোগ করতেই হবে। আর এই কালের চলার পথ দুই নাসিকায় দুই ভ্রূর মাঝে এতে দৃষ্টি রেখে গুরু নির্দ্দেশিত পথে চলে, একে যদি পরিচালনা করা যায়, তবেই কালক্রমে অর্থাৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে কালের পথে চলে একে নিরন্তর সেবার দ্বারা এই কালকে প্রসন্ন করে মহাকালের পথে পৌঁছানো যায়। কিন্তু গুরুকৃপার প্রয়োজন হবে, হবে তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর এই অহৈতুকী কৃপা যে কখন পাওয়া যাবে তার কোন ঠিক ঠাওর নেই কারণ মহাকাল তো খেয়ালী কিনা তাই সেখানে পৌঁছাতে দেওয়া না দেওয়া তাঁর খেয়াল। তবে একবার পৌঁছাতে পারলে তখন সেই কালচক্রের রশি তোমার হাতে চলে আসবে, তখন তুমি সুখ দুঃখের অতীত হবে অর্থাৎ তোমার জিতশ্বাস অবস্থা প্রাপ্তি ঘটবে। এই অবস্থা প্রাপ্তির কথাই গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শুনিয়েছেন। এই অবস্থা পাওয়া যায় গুরু প্রদত্ত অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা অর্থাৎ কালকে জয় করতে হলে সেই কালেরই শরণাপন্ন হয়ে নিরন্তর তাঁকে সেবা করার দ্বারা, কিন্তু নিষ্কামভাবে। এই কালস্রোতে আছে নারদমুনির বাস। তিনি কিন্তু অতিশয় রসিক ও দ্বন্দ্ব প্রিয়। ইনিই সাধনকালে নানা রকমের বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে মজা দেখেন। ইনিই মহাকালের ভক্ত। তাই মহাকালব্যাপী প্রাণকে স্মরণ করে যদি পথ চলা যায় তবে হয়ত এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই কালস্রোতের উপর কারো কোন হাত নেই —

থাকলেও তাঁরা করেন না, কারণ করলে বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। তাই দেখা যায় যে মহাপুরুষ বা দেবতারা যে অভিশাপ প্রদান করতেন বা বরদান করতেন সেগুলোর মধ্যে সাধারণ জীব রহস্য অনুভব করতে না পারলেও সাধকের বোঝা উচিত যে এগুলো ভারী মজার ব্যাপার। কারণ কালজয়ী মহাপুরুষ বা দেবতারা কালকে জয় করে। কালের খবর তো তাঁরা জানেনই। কখন কোন সময়ে প্রারব্ধ বশে কি ঘটেছিল, ঘটছে বা ঘটবে ত্রিকালজ্ঞ হিসাবে তাঁরা তা প্রত্যক্ষ জানেন, দেখেন তাই এই কালের স্রোত কার জীবনে কখন কি ফলাফল বহন করবে বা কি ঘটাতে চলেছে ভবিষ্যতে সব তাঁদের নখদর্পণে থাকার জন্য, তাঁরা তো সতে থাকেন - তাই সেখানে থেকে পরিষ্কার ভাবে জীবকে সেই সত্যটা শুধু প্রকাশ করে দেন। আর সাধারণ জীব তো অজ্ঞান কালের অধীন, তাই তারাও বিবশ হয়ে বাধ্য হয়ে, ঐ শক্তিশালী মহাপুরুষদের সামনে এমন কাজ করতে বাধ্য হয় বা এমন জিনিষ চাইতে বাধ্য হয় যা ভবিষ্যতে সেই ফল অর্থাৎ বরদানের ফল বা অভিসম্পাতের ফলরূপে ঠিক ঐ মহাত্মাদের মুখ দিয়ে ঠিক সময়েই বের হবে। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে এ অন্ধ জীবন যে অপ্রাপ্ত বস্তু চায় না তা নয়। কিন্তু মহাত্মাদের কথার জালে আটকে পড়ে, অজ্ঞানে থেকে, বিবশ অবস্থায় এমনভাবে কথা বলে যাতে অপ্রাপ্ত বস্তু সে পেল না কিন্তু মায়াজালে বদ্ধ হয়ে সে পাকচক্রে মহাত্মার উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাস্তুটিই শেষে চাইতে বাধ্য হল। সে তো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না তাই ভাবল, যাই হোক, যা চাইলাম তাই তো পেলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি সে মহাত্মার কথার জালে ভ্রমান্ধ হল, যেটা শুধু মহাত্মাই বুঝলেন এবং তাঁর জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। যা ঘটাবার ইচ্ছা ছিল প্রকারান্তরে তাই ঘটিয়ে ছাড়লেন। এই ব্যাপার। অতএব কালজয়ী পুরুষ ছাড়া এ রহস্যভেদ করা অসম্ভব। এই কালকেই আমরা ঘন্টা, দিন, মাস, বৎসর হিসাবে এমন কি শতাব্দী হিসাবে জড়জগতে ভাগ করেছি শুধু মাত্র ভ্রমান্ধ জীবের নিজেদের সুবিধার জন্য, নচেৎ কাল অবিভাজ্য। এ সমস্ত মানুষের সৃষ্টি, মানুষের নিয়ম। এই কালই ধর্ম্ম, কালই মৃত্যু, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই মহামায়া যা কিছু

নামে ডাক না কেন ব্যাপারটা সেই একই। মানুষের যে এই দেহ, এটাই তাই ধর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র বটে। কারণ এই দেহে যেমন নানা জ্বালা, যন্ত্রণা ভোগ করছি, রোগ অশান্তিতে জ্বলছি, প্রবৃত্তির তাড়নাতে বিবশ হয়ে যাচ্ছি এ সবই ঠিক, কিন্তু এই দেহটা আবার যদি না থাকত তাহলে ঈশ্বরের লীলা অনুভব করতে পারতাম না। যেমন পর্দ্দা যদি না থাকে তাহলে রূপোলী পর্দ্দার যত ভাল ছবিই তোলা থাক, দেখা যাবে না। পর্দ্দার দরকার। সেইরকম দেহটার প্রয়োজন আছে - দেহের খাঁচায় বদ্ধ না থেকে সাধনা দ্বারা যে ইন্দ্রিয়াতীত সুখ, বোধাতীত অবস্থা এই সমস্ত নানা বৈচিত্র্যময় ঈশ্বরীয় লীলা দেখা যেত না। তাই দেবতারাও দেহধারী হয়ে সাধনা করতে ভালবাসেন। এই ঈশ্বরীয় লীলা দর্শন করে সেই লীলামৃত পান করার জন্য কত যোগী, ঋষি, মুনি যুগ যুগ ধরে কঠোর তপস্যা করছেন। কেউ বা গৃহত্যাগ করে কত কঠোর কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তরণের পথে উত্তীর্ণ হচ্ছেন, কত বিভিন্ন আদর্শে ব্রতী থেকে কায়মনোবাক্যে এই রসমাধুরী পান করার জন্য জন্ম জন্মান্তর সাধনা করছেন। সবাই দেহধারী হয়ে করছেন তাই এই দেহটাই সাধনার পীঠস্থান - সাধনার গবেষণাগার। এই দেহটাকে দেখা মাত্রই গবেষণাগারের অধ্যক্ষের মত গবেষণাগারের প্রাপ্তব্য ফললাভের মত, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির রূপ, কার্য্যকারিতা, স্থায়িত্ব ইত্যাদির ব্যাপারে অভিজ্ঞ গবেষকের মত মহাপুরুষরাও তাঁদের জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত সর্ব্বজ্ঞতা দিয়ে যেমনভাবে মূহুর্ত্তের মধ্যে সব খবরাখবর জানতে পারেন, কেমনভাবে কাল এই দেহটাকে নিয়ে খেলা করছে ভবিষ্যতে করবে সেই অমোঘ ভবিষ্যৎ কালের সব কথা কি করে বলে দিতে পারেন, অবলীলাক্রমে কেমন করে জাগতিক ধ্যান ধারণাকে নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে সত্যের সন্ধান দিতে পারেন যা অব্যর্থ, যা চিরসত্য, যা ঘটবেই, যা চিরন্তন সেই অভিমত কত সহজে মহাপুরুষেরা ব্যক্ত করতে পারেন সেই ঘটনার সাক্ষী থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা কথা যেটা আমার দয়াল গুরুদেব একে নিয়েই লীলা দেখিয়েছিলেন তার কথা না লিখে পারছি না।

☞ গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা

সেই সময়ে আমার শরীরটা পূর্ব্বে যা ছিল, তার তখন অর্দ্ধেক হয়ে গেছে বলা যায়। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন সবাই একবাক্যে এই কথাগুলো প্রায়ই মনে করায় যে আমি নাকি দিন দিন একেবারে খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি। সময়টা যতদূর মনে আছে, মনে হয় তখন তৃতীয় সোপানের ক্রিয়া চলছে। আগে আগে দিলীপদাকে যে প্রথম প্রথম বলতাম বাবা আমায় ভালবাসেন না, দেখতে পারেন না, সেই বাবা তখন এমন কাছে টানতে সুরু করেছেন যে তখন চোখে সরষের ফুল দেখার অবস্থা। তখন ভাবছি আমার শরীরটা টিকে থাকুক বাবা বোধহয় চান না। এমন মনের অবস্থা আর খাটুনির কথা তো আগেই বলেছি। সেই অবস্থাতে তখন দুবেলায় আমাকে পাক্কা ছয় ঘন্টা ক্রিয়া করতে হচ্ছে , মনে হচ্ছে শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে একেবারে। কিছু প্রধান ক্রিয়ান্বিত দাদারা উপদেশ দিচ্ছেন "বাবার কাছে কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম কর - এভাবে শরীর ভেঙ্গে গেলে ক্রিয়া করবে কি করে?" শরীর শুকিয়ে গেলেও শরীরে কিন্তু কোন দুর্ব্বলতা অনুভব করছি না। সমবয়সী গুরুভাইরা বলছে তুই একটু বাবাকে বল এভাবে তোর শরীর থাকবে না আর শরীর না থাকলে ক্রিয়া করবি কি করে? এই ভাবে ঘরে বাইরে সকলে মিলে মনটাকে ব্যথার ব্যথী সেজে অনবরত দুর্ব্বল করে দিতে লাগল। নিজে যদি কখনও নাও বলতাম ঐ সমস্ত আপাত আত্মীয়ের আউরানীতে মনটা খুব দুর্ব্বল হতে লাগল। বাবাকে ভয় পেয়ে কিছু বলিনি কিন্তু ঐ সমস্ত প্ররোচনার হাত এড়াতে না পেরে একদিন বিকালে বাবার বাড়ী, অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি সেদিন। রোজই যেতাম কিন্তু সেদিন বাবাকে একেবারে একা পেয়ে গেলাম। যেতেই বাবা বললেন "নেও সুরু কর।" অর্থাৎ বাবার শ্রীচরণে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আমি সেদিন কেন জানি না একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছি তখন, জানি না হয়ত তাঁরই খেলা হবে আর সেদিন অফিসেও অনেকে বলল, "তোমার কি হয়েছে বলতো? তুমি কত হাসি খুসি ছিলে, কত স্ফূর্ত্তিবাজ ছিলে, কেমন সুন্দর সকলের সঙ্গে মজা

করতে, আপনার ভেবে কত রঙ তামাসা করতে , তুমি এত চুপচাপ হয়ে গেছ যে ভাবতেই পারছি না আমরা''। সত্যি তাই অবস্থা চলছে তখন কোথাও তো যেতামই না, আগে থেকেই বাবা কোথাও যেতেও দিতেন না আমাকে, এমনকি কারও বাড়ীতে কোন বিয়ে সাদী হলেও যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম — কিছুই ভাল লাগত না শুধু বাবার সঙ্গ ছাড়া আর কোনও কারও সঙ্গ তখন ভাল লাগেনা। এইভাবের ভাবান্তর দেখে সকলেরও ভাবান্তর ঘটে গেছে তখন আমার সম্পর্কে, সবাই খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তাই সেদিন বাবাকে একা পেয়ে উসখুস করছি বাবাকে কি করে বলিঋ করতে করতে শুধু মুখ দিয়ে কোনরকমে 'বা' শব্দটা মাত্র বেরিয়েছে। বাবা শুয়ে শুয়ে তখন বই পড়ছিলেন। বাবা খুব নাটক টাটক পড়তে ভালবাসতেন। ঐ শব্দটা মাত্র শুনেই বাবা বই থেকে মুখটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু বলবে না কি ?" আমি তখন জড়তার সঙ্গে আমতা আমতা করে কোনরকমে বললাম, "সকলে ইয়ে মানে সকলে বলছে-" বাবা শুধু নির্ব্বিকার ভাবে বললেন, "কি বলছে ?" বাবা জিজ্ঞাসা করতেই খুব সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম, "ইয়ে মানে বলছে আমার শরীরটা নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে!" বাবা এবার নির্ব্বিকার না হয়ে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, "কি বলছে ?" ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে কি রকম একটা ভাবে একটু জোরে বলে ফেলেছি, "মানে ওরা সব বলছে আমার শরীরটা নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে।" বাবা এবার রগড় করে বললেন, "কই ? কোথায় ? দেখি দেখি ?" বলেই আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, "কই ? ভালই তো আছ!" বলেই অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে সেই আগের মত সটান বই মুখে শুয়ে পড়লেন।

হায় ভগবান, একি ব্যাপার, বাবা আমার শরীর ভাল বলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন ? কোথায় ভাবলাম একটু সহানুভূতির সঙ্গে বলবেন, "হ্যাঁ গো! তোমার শরীর একটু খারাপই চলছে, ঠিক বলেছ'! হয়ত বা আরও একটু অন্তরঙ্গভাবে স্নেহের সুরে বলবেন, "তুমি এখন এই কর, কি তাই কর!" কোথায় ?

উপদেশের ছিটে ফোঁটা তো নেই-ই! উপরন্তু তাচ্ছিল্য, অবহেলা আর উদাসীনভাব আর তার সঙ্গে সর্ব্বজ্ঞতার প্রত্যয় নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে একেবারে শুয়ে পড়লেন। কেন পড়বেন না? তিনি তো অজ্ঞ নন, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ। তিনি তো আপাত আত্মীয়ের মত আপাত দৃষ্টিতে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন প্রপাত সম্বন্ধ নিয়ে, দৃপ্ত দৃষ্টিতে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের কোষে কোষে বিচরণশীল সেই জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখা আমার সেই শরীরটাকে তাই ভালই তো দেখছি বলে অপরের মন্তব্যকে নস্যাৎ করতে দৃকপাত করেন নি।

একটু স্থির ভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়। শুধু বোঝা যায় ,কেন ভালভাবেই বোঝা যায় যে সব দেহই তো তাঁর কাছে শ্রীদেহ। তিনিই তো সব শরীরেই বাস করছেন তাই ঘরের কথা জানতে তাঁর তো বিলম্ব হওয়ার কথা নয় - অসত্য ভাষণের স্থানও নেই।

এই দেহটা তো আমি নই বা মানুষ নয়। দেহের ভিতরে মানুষটার বাস। **বলা যায় দেহটা একটা সং আর ভিতরটা হল সার, দেহটা একটা খোলস, দেহের ভিতরের মানুষটা সার, দেহটায় রঙ লাগানো থাকে, সারে কোন রঙ লাগে না। দেহটা বৃদ্ধি হচ্ছে, সচল হচ্ছে, জাগ্রত আছে সেই সারের জন্য, নইলে সব কুপোকাৎ। সেই সারবস্তু আমাদের দুই নাসিকা বেয়ে সর্ব্বদা চলাচল করছে। চঞ্চল হয়ে অবিরত নাচতে নাচতে সপ্তম ভূমিতে স্থির ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাচ্ছে আবার চঞ্চল হয়ে মনকে সর্ব্বদা আন্দোলিত করছে। সত্যকে মিথ্যা দেখছি, হাসছি, কাঁদছি, প্রলাপ বকছি - কি বিচিত্র অবস্থা? তাই সেই আমিতে থেকে সার বস্তুকে লক্ষ্য করলে তখন সবই জ্ঞানময় হয়ে দেখা যায় সর্ব্বজ্ঞ হয়ে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায়, সব পেয়ে সব হারানো যায়, আবার সব হারিয়ে সব পাওয়া যায়। বাজিমাৎ হলে কি আর খিস্তি খেউরী, ভুল কিস্তি ঠিক কিস্তি এ সবের প্রশ্ন ওঠে? ওঠে না। তাই বাবার সেই অমোঘ বাক্যতেই কিস্তিমাত হয়েছিল। শরীরও ভাঙ্গেনি, দুর্ব্বলও হয়নি, কিছুই হয়নি - তবে একটা জিনিষ অবশ্যই হয়েছিল। শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে মাথাটা আরও নত হয়েছিল, একথা ঠিক।**

নারীর কথা

কোন কাব্যগাথা লিখতে বসিনি যে প্রেমোচ্ছ্বাসে মত্ত হয়ে দয়িতার মানভঞ্জনের জন্য লিখে ফেলব "দেহি পদবল্লব মুদারম্"। কোন কবির ভাষায় বলতে পারব না "নহ মাতা, নহ কন্যা" এই সমস্ত সাজানো কথা। বরং বলতে পারব সরল, সোজা, স্পষ্ট করে প্রত্যেক সাধকের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে রমনী অসাধারণ মোহ, মায়াশক্তির অধিকারিণী; বিধি, হরি, শম্ভুকে তারা এক মূহুর্ত্তে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারে। তারা যেমন মমতাময়ী, করুণাময়ী তেমনি নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্করী, নির্ম্মম হতে পারে। তাই নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অরূপ রতন খুঁজতে যাবে এমন জনের প্রতি রূপসীর রূপসাগরে হারিয়ে যাবার চোরাবালির রাস্তায় না চলে কেমনভাবে অরূপের রূপের প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে এই রূপময় রূপকুম্ভরূপী দেহ খাঁচা থেকে বেরিয়ে অনন্ত আকাশে অপরূপ ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই এই লেখনী ধরা। তাই বলছি পুরাণে আমরা দেখেছি যে দুর্দ্দমনীয় দানবকে পর্য্যন্ত এই নারী ছাড়া কেউ ধরাশায়ী করতে পারেনি। সামান্য নারীর রূপের মোহে বদ্ধ হয়ে কত দেশ ধ্বংস হয়েছে, নারীর জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এমনকি সামান্য নারীর জন্য রাজ্যপাট, *সিংহসন ত্যাগ বিরল ঘটনা নয়। সেখানে একজন মানুষ যে সেই* রূপসীর রূপে আকৃষ্ট হবে এ কোন ছাড়? কিন্তু সাধক জীবন তো সাধারণ জীবন নয়। অসাধারণত্বে ভরপুর। তাই পথের বাধা কি করে, কেমন করে, দূরে সরিয়ে কখনও ছলে, কখনও বলে, কখনও কৌশলে, কি করে নিজের চরম অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে তাদের তৃপ্ত করে মোহ দূর করা যায়, কি ভাবে কোন ছলনা আশ্রয় করে

ছলাকলাময়ীর ছলনার, অবসান ঘটাতে পারা যায় এই লেখনী সেই সন্ধান দানের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ।

চেষ্টাকরেও এই রমণীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না এত দুর্ব্বার আকর্ষণ এদের। একমাত্র সতত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ও গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া সাধকের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এই নারী যতই ভক্তিমতী হোন না কেন, সেই নারীর প্রভাবেই যে কোন মূহুর্ত্তে বুদ্ধিনাশ হতে পারে, আর একবার বুদ্ধিনাশ ঘটলে দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ। এরা বল বীর্য্য হরণ করার অদ্বিতীয় শক্তি, যে কোন সময়ে অঘটন ঘটাতে অতিশয় পটু। যে চোখে তুমি এক মূহুর্ত্তে মায়া, মমতা, লাস্য দেখবে, পরমূহুর্ত্তে সেই চোখেই দেখবে, সেসমস্ত মুহুর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলছে। তাই তখন তোমার কি মনে হবে? মনে হবে হায় হায় এই কি সেই নারী যে অসীম মমতার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আগে আমার তাপিত দেহ শীতল করেছিল! একি সেই একই নারী যে ক্ষণকাল পূর্ব্বে মায়াচ্ছন্ন চোখে আমাকে বড় আপন করে দেখে আমাকে বশীভূত করে ফেলেছিল, এই কি সেই মমতাময়ী নারী যে মোহজাল বদ্ধ করে কি মধুরভাবে আমার হয়েছিল? আমার সমস্ত কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, অহংকার , পুরুষাকার ক্ষণকাল পূর্ব্বে এরই কাছে জমা দিয়ে দীনহীন হয়ে গেছি? হয়ে গেছি বিবর্ণ দেহ, বিবর্ণ দৃষ্টি এরই জন্য, এই নারীর জন্য! সে ঈশ্বরভাবই হোক বা আসুরিকভাবেই হোক নারীর মধ্যে শক্তি কিন্তু প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি বা প্রাণকৃষ্ণ। তাই নারী বহুরূপী, কখনও বঁধু, কখনও মাতা, কখনও কন্যা, কখনও প্রেয়সী, কখনও শ্রেয়সী, কখনও শ্যামা, কখনও বামা, কখনও ব্রহ্মময়ী। নারীর মোহকারী শক্তিকে কেউ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। এদের জন্য পুরুষ শক্তি পায়, প্রেরণা পায়, অসম্ভবকে সম্ভব করতে আগুয়ান হয়, আদরণীয় বরণীয় হয়। আবার এই নারীর জন্য প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে দেশ

জাতি ধ্বংস হয়, মোহান্ধ মানুষের বিকৃত জীবন ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, বহন করে ধিক্কার, নিন্দা, অপমানকর ঘৃণিত চিহ্ন। বিধাতার বড়ই বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী জাতি। কথাতে বলে "বৃদ্ধের থাকে না দিগ্বিদিক, কামিনী কাঞ্চন এত সাংঘাতিক।" মহাপুরুষেরা বলে গেছেন, "নারী নরকের দ্বার।" কথাগুলো একেবারে মিথ্যা নয়, যার জীবনে এই নারীর জন্য বিপর্য্যয় ঘটে গেছে সেই একমাত্র পারে অমন কথা বলতে। বাকী লোকেরা অর্থাৎ ভুক্তভোগী ছাড়া অমন সুন্দর কথা বের হয়ে আসে কি করে? এ কথা অবশ্য সত্য যে সাধনা জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল, প্রতি পদে মায়া, মোহ, ভ্রম যেন ওৎ পেতে আছে। সাধকের সামান্য বিচারের ভুলে তার জীবনে অনর্থ নেমে আসতে পারে। সেই জন্য বার বার বলা হয় সাধু সাবধান নচেৎ ক্ষতি অনিবার্য্য। সাধককে তাই সুচতুর ভাবে যোগ যুক্ত হওয়ার কথা শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে শুনিয়েছেন।

সাধককে সাধনা করতে হলে রমণীর কাছ থেকে তাই শত হস্ত দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়, নচেৎ সাধনার ক্ষতি অনিবার্য্য, এড়াবার কোন উপায় নেই। আমার বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে রমণী শুধু ক্ষতিকারক। উদ্দেশ্য হল অমৃত যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন অমৃতের অপপ্রয়োগ গরলের কাজ করে শেষে প্রাণঘাতী হয়। তাই পুরুষের জীবনে নারীর যেমন প্রয়োজন আছে, আবার নারী ক্ষতিকারকও হতে পারে। নারী যেমন সাধককে মোক্ষের পথ দেখাতে পারে তেমনি তাকে নরকের পথে অতি সহজে নিক্ষেপ করতেও পারে যদি সাধক সতর্ক না থাকে। তেমনি ভাবে এই কথাটা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমার জীবনে এই অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি। গুরুদেবের অসীম করুণায় আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বলছি, শুধু তাঁর অহৈতুকী কৃপায় বেঁচে গেছি নচেৎ বাঁচার কোন রাস্তা ছিল না। এ বিপদ যে কখন কোন দিক থেকে সাধককে ছোবল মারবে বা

মারতে পারে তা একমাত্র গুরুদেবই জানেন। এত মনোহারিণী শক্তি এদের, যে মুহুর্ত্তের ভুলে সাধককে নরকে পাঠিয়ে ছাড়বে। আর সে ক্ষেত্রে সাধক যদি অত্যন্ত সতর্কভাবে নিরন্তর গুরুস্মরণ না করে, তা হলে পতনের বেগ কেউ ঠেকাতে পারবে না। একমাত্র গুরুদেবই পরিত্রাতা আর পরিত্রাণ না পাওয়া মানেই সাধনার অপমৃত্যু। জীবন হবে একটা ছেঁড়া কাগজ। ছোট বেলা থেকে বাবা মা'র শিক্ষায়, বংশ ধারা, কৃষ্টিতে মেয়েদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিলই না বলা যায়। এমনকি ভাইবোনদের ব্যাপারেও মেলা মেশাতে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকত। বড় হয়ে এই জীবনে সেই অভ্যাসের ফলে, সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, অফিস কাছারীতে, সমাজে সেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। এই বঙ্গে আসার পরও মেয়েদের সান্নিধ্যলাভ ঘটলেও দূরত্ব বজায় রাখার অভ্যাসই ছিল। সর্ব্বদাই সচেতন থাকার চেষ্টা করেই গেছি। বিবাহের পরে শালি, শালাজ তো দূরের কথা নিজের স্ত্রীর সাথে সারা জীবন কটা কথা বলেছি হাতে গুণে বলা যাবে। অভ্যাসের কোনরকম তারতম্য ঘটেনি, একটা আড়ষ্টতা থাকত,.একটু দূরত্ববোধ অনুভব করতাম। লোকের বিশ্বাস হবে কিনা জানিনা একমাত্র গুরুদেবই জানেন। তবে মিথ্যা কথা বলিনি এটা ঠিকই - নিজের স্ত্রীর চিন্তা দূরে সরিয়ে দয়াময় গুরুদেব অনুক্ষণ ক্রিয়ায় কি করে উন্নতি হবে, কি করে স্থিরত্ব বাড়ান যাবে, কোন কৌশলে আজ ক্রিয়াটা করব - এই সব চিন্তার প্রকোপ মনের মধ্যে দিনরাত জাগ্রত রেখেছিলেন - জাগ্রত রেখেছিলেন আমার মত পাষন্ডের বোধকে তাঁর চিন্তা করতে, তাঁর কথা স্মরণ মনন করতে, তাঁর দেওয়া অমূল্য রত্নের উৎস খোঁজার প্রচেষ্টাতে। সারা জীবন তাই গুরুদেবই জানেন কখনও কাউকে দোষ দিইনি, আজও দিই না। আজও মনে করি আমার সব দোষ, সব সফলতা কি বিফলতা বা আমার সমস্ত চেতনাই বা কি, অজ্ঞানতাই বা কি, সব আমার, আমার কর্ম্মফলের, আমারই তৈরী কর্ম্মের পরিণতি।

মেয়েদের মধ্যে কতকগুলো সংস্কার আছে - যেগুলোর তারতম্য ঘটলে তাদের আদর্শ জীবনেও যেমন অসুবিধা হয়, পরিবেশেরও তারতম্য ঘটে। অবশ্যই এ দোষগুলো নারী, পুরুষ উভয়েরই মধ্যে আছে। কিছু কিছু তো আছেই সকলের মধ্যে। কিন্তু মেয়েরা যেহেতু সংসারের ধারয়িত্রী এবং সংসারের পালয়ত্রীও বটে, তাই তাদের পক্ষে যে কোন দোষের আধিক্য ঘটলে বা দৃষ্ট হলে সংসারের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় বা সংসারের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে মারাত্মক ফল প্রদান করে। সেই দোষগুলো কিন্তু খুবই সাধারণভাবে সকল মেয়ের, সকল পুরুষের মধ্যেই আছে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুলো বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। কেননা তারা মায়ের জাতি, তারা সংসারের ধারয়িত্রী, পালয়ত্রী কিনা, তাই তাদের পক্ষে এ দোষ সামান্য হলেও বিষময় ফল প্রদান করবে। সেগুলো হোল কথায় কথায় অভিমান, বৃথা জেদ, ঈর্ষা, সীমিত বুদ্ধি, হীনমন্যতা, অসংস্কৃত দাবী ও অন্যায় অধিকার বোধের মাত্রাজ্ঞানহীনতা, মোহিনী মায়ার অপপ্রয়োগ ও লোলুপতা। এই সমস্ত দোষগুলো নারী পুরুষের উভয়েরই থাকা স্বাভাবিক। তবু আবার বলছি যে নারীর ক্ষেত্রে, তাঁদের ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর ও মনের কর্ম্ম বিভাগের বিচারে, তাদের জন্মগত দেহমনের সীমার নিরিখে, এ কথা অতীব সত্য যে ঐ দোষগুলো সুসংহত ও উপযুক্ত ভাবে যদি দেখা না দেয় তবে সে নিজেও কষ্টকর জীবন যাপন করবে - অতৃপ্তি ও দুঃখ নিয়ে থাকবে আর পরিবেশগত ভাবে যে বেষ্টনীতে সে বাস করবে তাদের জীবনেও শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়ে অশান্তিতে ভরে দেবে। তাই দেবীত্বে বা মাতৃত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে ঐ সমস্ত দোষগুলোকে স্মরণে রেখে বা বর্জ্জন করে বা তার উর্দ্ধে উঠে তাদের চলতে হবে। কি আশ্রম জীবন কি সংসার জীবনে কেউ যদি আদর্শ নারীর স্থান পেতে চায় তাহলে তাকে এ গুলোকে বর্জ্জন করতেই হবে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ দমন, ত্যাগ, নিরাসক্তি যেমন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রথম অর্জ্জনের বস্তু, সংসারজীবনেও মেয়েদের কাছে এগুলো সংসারে ঢুকতে হলে প্রাথমিক পাঠ।

অনেক সময় মেয়েদের অত্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ যে রোগে ভুগতে দেখা যায় তা হল অভিমান। একে জাগতিক জীবনে কোমল মনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে মনে করা হয়, কিন্তু বাস্তবে অভিমান প্রচন্ড ক্ষতিকারক। কারণ অভিমান হল অহংকারের সরস প্রকাশ। সুপ্ত অহংবোধ গুপ্তভাবে কাজ করে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতাকে জাগ্রত করে অন্যের ঈর্ষ্যায়। অন্যকে হীনভাবে দেখতে সাহায্য করে, নিজেকে প্রচ্ছন্নভাবে ভাবতে, নিজেকে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে মদত দেয়। শেষে প্রবল আকার ধারণ করে শান্তি, শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হোল বৃথা জেদ ও একগুঁয়েমিতা। এই দোষটিকে আমরা অনেক সময় নৈতিক দৃঢ়তা বলে ভুল বুঝি। এরা যে কখনই এক নয়, আত্মসমীক্ষা করলে তবে স্থির ভাবে বোঝা যায়। তখন সংশোধন করা যায়, আর এটি সংশোধনের জন্য নিজ প্রচেষ্টার প্রয়োজন, অপরে এ দোষ খন্ডাতে পারে না বা সামান্যই পারে। কারণ যে এ দোষে দোষী হয় তার জ্ঞানদৃষ্টি বা ন্যায় অন্যায় বোধ করার মানসিক দৃষ্টি তখন অহংবোধে এতই সমাচ্ছন্ন থাকে যে তার ঐরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেই তার উত্তর দিতে পারে না।

মেয়েদের মন হবে কোমলতা ও মাতৃভাবে পরিপূর্ণ। সেটার প্রকাশ ঘটবে অপরের প্রতি দয়া, মায়া, সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে। মাতৃত্বের ও নারীত্বের প্রথম পাঠ অপরের প্রতি আর কিছু না থাক, কোমল স্বভাব ও সহানুভূতির মধ্যে দিয়ে। এই কোমলতার অর্থ কিন্তু এই নয় যে নৈতিক দৃঢ়তার বিসর্জ্জন। নৈতিক দৃঢ়তা হোল আদর্শ জীবন গঠনের নীতিতে দৃঢ় থাকা, আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুর প্রতি বা ইষ্টের প্রতি ন্যায়, বিচার ও নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, অবিচল থাকা মহৎকাজে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ

ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকৃত শিক্ষা পারিবারিকই হোক বা সামাজিকই হোক, তারই অভাবে ন্যায় অন্যায়, ঠিক বেঠিক হিসাবের ভুলে, এককথায় অশিক্ষার দ্বারা, অবিবেকী মনের পরিচালনাতে, অহংবোধের ঠুনকো গরিমার দীপ্তিতে নিজের কাজকে রাঙিয়ে যা করছি, যা বলছি আমার জীবনের নীতি অনুযায়ী করছি ভেবে সঠিক পথ নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে ভুল পথে চলে, সংসার, পরিবেশ তথা নিজ জীবনকেও অশান্তিতে ভরে তুলছে। কারণ কোমলতা ও নৈতিক দৃঢ়তা তো এক নয় আবার বৃথা জিদ ও নৈতিক দৃঢ়তাও এক নয়। তাই বিচার করার, চিন্তা করার, স্থির মনে কাজ করার, ধীরভাবে সংসারে চলার, অপরের মতামতের আদর্শের মূল্য দেওয়ার, বিশেষভাবে নারীর ক্ষেত্রে এই জগতে বিশেষ প্রয়োজন।

পরের স্থান হোল ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য বোধ। এই দোষটি জাগতিক ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হোলে যে গুণের বা যে মহৎ কাজের আবির্ভাব ঘটাতে পারত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অপপ্রয়োগই ঘটে। তাই শাস্ত্রকারগণ ঈর্ষাকে চতুরভাবে বর্জ্জন করতে বলেছেন। কারণ চতুর কথাটা আমরা বুঝি না। যেমন **অপরের দোষ দেখা মানেই আমি সেই অবস্থায় নিজে পৌঁছে তবে দেখছি তাই সে দোষটি আমার মধ্যে দেখা দেয়।** সেইরূপ আমরা জাগতিক জীবনে অপরের গুণাগুণ দেখতে অভ্যস্ত নই। তার কোন গুণ নেই আমার গুণই বেশী না হলেও আছে – বলতে অভ্যস্ত। তাই সেই গুণটির চিন্তা মনের কোণেও উঁকি না মারার জন্য গুণের অনুপ্রবেশ তো ঘটে না, তাই সুচতুর হওয়া প্রয়োজন-নচেৎ অত শত না ভেবে সমূলে নাশ করাই ভাল, তাই এই বিধান। ঈর্ষা, জ্বালার সৃষ্টি করে নিজের মধ্যে, নিজেকে বিকৃত করে, অপরের মত না হতে পেরে ঈর্ষা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। ঈর্ষা অন্ধকারের গন্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করে। সীমিত

বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র হৃদয়ের গন্ডী তৈরী করে, মনটাকে আকাশের সীমানা থেকে নামিয়ে এনে ডোবায় বন্দী করে রাখে। নারী হল প্রকৃতি। উদারতা, বিশালতা, আকাশব্যাপ্তি হবে তার মনের স্বাভাবিক প্রকাশ, স্বাভাবিক ব্যঞ্জনার মহিমা। তার কি সংসার, কি সমাজ, কি জাগতিক পরিবেশ উদার মনের পরশ পেয়ে, কোমলতার আবেষ্টনীর মধ্যে, স্নেহছায়ার গভীরে অনাগত সৃষ্টির আনন্দের ছোঁয়াতে ঈশ্বরীয় লীলার খেলায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে ধীরে ধীরে অঙ্কুর থেকে মহীরূহে পরিণত। তার পালয়ত্রীর রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে অনাগত সৃষ্টি হবে মহান থেকে মহীয়ান। তার চেতন মন থাকবে ঈশ্বর সমর্পিত। অবচেতন মনে আনন্দের ঘনঘটা নিয়ে থাকবে সৃষ্টি সুখের উল্লাস। আর তার অচেতন মনটা নিস্পৃহ থাকবে। মন থাকবে যত কিছু জাগতিক বৈষম্য ঘটানো, অশান্তির কারণ ঘটানো দোষের সমারোহ। এই হল আমার বিচারে আদর্শ নারীর রূপ।

☞ নারী প্রকৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা

সৃষ্টির পর প্রাণ থেকেই যখন প্রাণীর সৃষ্টি হোল, তখন প্রাণী ছিল এক, কেবল পুরুষমাত্র। সেই পুরুষের সংকল্প থেকে দুই হোল, পরে বহু। এই দুই অর্থাৎ পুরুষ থেকে নারী সৃষ্টি হল, তাই দেখা যায় একের অপরের প্রতি আকর্ষণ অতি চিরন্তন। প্রাণ তো একটাই দেহটাই ভিন্ন ভিন্ন - আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতিগত আকর্ষণ হল চিরন্তন অর্থাৎ সোজা কথায় সৃষ্টির প্রথম থেকেই নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তনভাবে কাজ করছে। সাগরে যেমন ঢেউ ওঠে মাঝে, কিন্তু সে আঘাত লাগে তীরে এসে। তেমনি হৃদয় সমুদ্রে যে তরঙ্গ ওঠে তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটে দেহের বহিরাঙ্গনে। ঈশ্বরীয় সৃষ্টিই হল ঐ প্রকৃতির। নারীর হৃদয়েও তেমনি তরঙ্গ ওঠে

কিন্তু সেই তরঙ্গ ওঠে নীরবে নিভৃতে সাধারণতঃ বাহিরে তার উচ্ছ্বাস দেখা যায় না বা প্রকাশ ঘটে না একমাত্র বারাঙ্গনা ছাড়া। তাদের কথা স্বতন্ত্র, পেশার দিক থেকে তারা এই আলোচনা বহিঃভূতই থাক। কিন্তু পুরুষ হোল নটরাজ, তার হৃদয়ে যে তরঙ্গ অনুভব করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মূহুর্ত্তের মধ্যে তার দেহের আঙিনায়, সে প্রকাশ উদ্দাম, উচ্ছ্বল, দ্রুতবেগে ধাবমান যেন অগ্নি তরঙ্গ, পুরুষরূপী সে, তরঙ্গকে চাপতে পারে না - চাপতে জানেও না - এই হোল শারীরতত্ত্বীয় ঈশ্বরলীলা এবং এই লীলা ঈশ্বর খেলে চলেছেন অনন্তকাল ধরে, খেলা চলছে, চলবে। ততদিনই চলবে, যতদিন ঈশ্বরের সৃষ্টি থাকবে আর থাকবে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা নারী ও পুরুষ বা তাদের দেহ। কালের পরিবর্ত্তনে রূপ পাল্টাতে পারে কিন্তু পুরুষ ও নারীর প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। নারী তার পুরুষের প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ শক্তিকে ধরে আছে, এটা ঈশ্বরের চিরন্তনী শক্তি আবার পুরুষ নারীর এ আকর্ষণ শক্তিতে বিবশ হয়ে আকর্ষিত হবে সেটাও ঈশ্বরের চিরন্তন বিধান - আর এই শক্তি কাজ করেছে শুধু ঈশ্বরের সৃজনশীলতার দিকে তাকিয়ে। এই শক্তি শুধু মনুষ্য নয় মনুষ্যেতর প্রাণী যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ সবার মধ্যে দিয়ে কাজ করছে। মানুষ বলে তার কিছু আলাদা নয়। তাই শাস্ত্রে পুরাণে দেখা গেছে কত মহা মহা মুনি ঋষি, শক্তিধর পুরুষ, বামাকন্ঠের শুধু ধ্বনিতেই বিবশ হয়ে গেছে, সৃষ্টির উল্লাসে মগ্ন হয়ে মত্ত হয়ে গেছে, কোন কলঙ্ক বা অপবাদের চিন্তা তখন মনে নেই। নারীর ভেতরে সেই একই আকর্ষণ অনুভূত অবশ্যই হয় কিন্তু নীরবে। বরং নারীর সেই আকর্ষণকে ধরে রাখার, বেঁধে রাখার শক্তি অসাধারণ। যে অবস্থাতে পড়ে একজন পুরুষ বিবশ হয় এবং তার কাজের মধ্যে বিবশতা প্রকাশ পায় ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে পড়ে একজন নারী মনের প্রবলতম বিক্ষেপকেও অনন্যার মত শক্তি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে। প্রকাশ হতে দেয় না যদিও তার অন্তর ভিতরে ভিতরে কামনার ঝড়ে বিপর্যস্ত। সেখানে তখন চলছে কি প্রচন্ড ঝড় তুফানের খেলা। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর জাত নারী সে প্রচন্ড মানসিক ঝড় তুফানকে নীরবে নিভৃতে তার ঈশ্বরদত্ত ধারণা শক্তির দ্বারা

অবহেলায় ধারণ করে থাকে। এতটুকু প্রকাশ হতে দেয় না। সেজন্যই কথায় বলে "মেয়ে জাতের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না"- শারীর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এ কথাটা অতীব সত্য। বলা যায় চিরসত্য কথা। দৈহিক প্রবল উত্তেজনাতে যেখানে একজন পুরুষ বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে, নারী কিন্তু সেই একই উত্তেজনার মুখে অত্যন্ত সাধারণভাবে সেই বস্তুকে হজম করে ফেলে। নারী যেখানে নিজেকে গোপন পথে চলে ভিতরের অবস্থাকে সামাল দিতে পারে, পুরুষ সেখানে বিপর্য্যস্ত হয়, বহু কষ্টে সামাল দেয় বরং বলাই ভাল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে হার মানে। এখানেই জয় সূচিত হয় - এখানেই নারী হয় অসাধারণ, হয় অনন্যা। নারী ও পুরুষের দেহতন্ত্রীতে আবেগের গমানাগমনেরও সময়ের পার্থক্য দেখা যায়। নারীর দেহতন্ত্রীতে আবেগ তরঙ্গায়িত হয় ধীরে, স্থায়িত্ব হয় বেশী কিন্তু পুরুষের ঠিক উল্টো ফল লাভ হয় অর্থাৎ আবেগের গতিও যেমন দ্রুত, স্থায়িত্বও তেমনিভাবে কম। ঝড় যেন আসে আকাশব্যেপে। সব কিছু দলিত মথিত করে ক্ষণেকের স্থায়িত্বে দানবীয় শক্তির পরিচয় দিয়ে দুর্ব্বার গতিতে প্রস্থান করে, থামতে চায় না। কোন বাধা মানে না, কোন কিছুর ধার ধারে না, এমন ভাব। যেন এক বিশাল টর্নাডো মূহুর্ত্তের স্থায়িত্বে সৃষ্টির ধ্বংসকারী রূপ নিয়ে এসে ধরিত্রীকে দলিত মথিত করে গেল। আর নারীরূপা ধরিত্রী সেই উন্মত্ত ঝড়ের শত শত দামালপনা নীরবে সহ্য করে বক্ষে উদ্যত লাঞ্ছনার চিহ্ন ধারণ করে পড়ে রইল ক্ষত বিক্ষত হয়ে। এমন কি অত্যাচারী যে, সে অত্যাচারীর প্রতি একটু সমবেদনাও হয়ত না জানিয়েই উধাও হয়। আর ধরিত্রী অত্যাচারিতার নির্ম্মম দামালপনার শেষে আবার তার বসন ভূষণ সামলে নূতনভাবে, আবার নবসাজে সজ্জিত হয়, যেন আবার নিপীড়নের অপেক্ষা করে। কারণ এই প্রতীক্ষায় থাকাই যেন সুখ। প্রতীক্ষাই তো শেষে তার চিরবাঞ্ছিত নিপীড়নে তৃষ্ণা মেটায়। এইটাই হোল ঈশ্বরের সৃষ্টি- সুখের উল্লাস।

ঈশ্বরের সৃষ্টি বিন্যাস তাই অতি সুন্দর, মনোমুগ্ধকর। নারীকে প্রকৃতির দিক থেকে চারভাগে যেমন ভাগ করেছেন, পুরুষকেও ঠিক সেই সৃষ্টির বিচারে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। নারীর প্রকৃতি হল শঙ্খিনী, পদ্মিনী, চিত্রানী, হস্তিনী নামে বিভক্ত আর পুরুষ প্রকৃতি

হোল শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এই চারভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগে অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনের প্রভেদও শ্রীভগবান প্রদত্ত। এ সমস্ত কামশাস্ত্রের কথা, তবে কথা প্রসঙ্গে সামান্য আভাষ প্রয়োজনে দেওয়া হল। শ্রেণীগত মিল নারী পুরুষের না হলে স্থূলজগতে দাম্পত্য শান্তি মেলে না দেহ মনের বিচারে। শ্রেণীগত এই অঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী ভগবান কতকগুলি কামাঙ্গও দেহে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি সহায়তার উদ্দেশ্যে নিয়ে যেগুলির দর্শনে, স্পর্শনে এমন কি নাম শ্রবণেও দেহে কামনার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই বোধ নারীর মধ্যেও জাগে তবে পুরুষের চেয়ে আনুপাতিক হারে কম, তবে একথা ঠিক যে নারী যদি একবার কামাসক্ত হয় তবে তার উন্মাদনার গভীরতা ও স্থায়িত্ব অনেক বেশী হয় এবং নারী যদি তার কাম্যবস্তু না পায় তবে সাংঘাতিক প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে ওঠে। সেই ভয়ঙ্করী রূপ তখন পুরুষকে অতি সহজে কাবু করে ফেলে। পুরুষের মধ্যে যা ঘটে বাহ্যিকভাবে সে তা প্রকাশ করে কিন্তু নারী অন্তরে লালন পালন করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং সুযোগ বুঝে তা প্রয়োগ করে। অল্প কথায় এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায় না - অনেক ভাবনা চিন্তা করে লেখনীতে প্রকাশ করা উচিত। **তবে একটা কথা চিরসত্য যে এই দেহেতেই পুরুষ ও নারী উভয়েরই বাসস্থান। সেই পুরুষ ও সেই নারীর মিলনে জীব শিবত্ব পায়, জ্ঞানরূপ পুত্রলাভ করে আর স্থূলদেহের মিলনে স্থূলসন্তান লাভ করে।** দেহের ভিতরে প্রকৃতি চঞ্চলা হলে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি অমিল হলে মানুষের চিত্তে বিকার আসে। সে তখন জাগতিক সুখের সন্ধানে পাগল হয়। জৈবিক ভাবে বা স্থূলভাবের জগতে যেমন পুরুষ বা নারী তার মনের মানুষকে কাছে পেতে চায়, এই আধ্যাত্মিক জগতেও দেখা যায় যত বড় স্থির বুদ্ধির মানুষ বা মানবীই হোক না কেন, কোন না কোন সময়ে স্থূল মিলনের জন্য তারও কাতরতা আসে - আসে ব্যাকুলতা কিন্তু স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে নিমেষে সামলে নেয় - বিকারগ্রস্ত হয় না। কিন্তু একজন মনের মানুষকে সে তখনও খোঁজে, খোঁজে কোন প্রাণের দরদীকে, যে তাকে দরদ দিয়ে তার ব্যথা বেদনা বুঝবে, বুঝবে তার হৃদয়ের বোবা কান্না

- নিজেকে ধূপের মত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে যে তাকে শান্তি দেবে, সান্ত্বনা দেবে, দেবে পরিতৃপ্তির আস্বাদ। এমন ত্যাগের সন্ধান পাওয়া কিন্তু বড়ই কঠিন - পাওয়া হয়ত যায় কিন্তু পরিবর্ত্তে সেই রকম দরদী চাই। তাই এমন কাউকেও হয়ত দেখা যায় যে তার মনের মানুষকে না পেয়ে নীরবে নিভৃতে সে আপনমনে গেয়ে ওঠে "জীবনপুরের পথিক রে ভাই, কোন দেশেতে সাকিন নাই কোথাও আমার মনের মানুষ পাইলাম না।" এই সমস্ত ঘটনা থেকে একটা কথা বার বার ভেসে ওঠে আর তাহল সাধককে এই দুর্দ্দমনীয় কামরিপুকে জয় করতে হবে। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দেব ও অসুর উভয়ই বাস করে কিন্তু দেহরথের সারথি কৃষ্ণ। এই দেহে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই আবার বসবাস করে - সাধকের কাছে "দেহি পদপল্লব মুদারম্" ভাবটি তাই উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। একদিকে দেহের জ্বালা অন্যদিকে মনের জ্বালা - সব জ্বালা সহ্য করে নিজেকে তাই জ্বালাতে হবে, ধূপের মত উৎসর্গ করতে হবে, নিজেকে সেই শ্রীগুরুর শ্রীচরণে যিনিই একমাত্র পারেন তাঁর অহৈতুকী কৃপা দিয়ে সন্তানকে আপন বক্ষে টেনে নিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই জীবন তরণীকে নিশ্চিন্তে পরপারে পৌঁছে দিতে। দেনও তাই, নইলে এত সাধন-সাধনা করলেন কি করে? এত মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব এল কেমন করে। তাঁরা তো এমনি ভাবেই জয়ী হয়েছেন । তাঁরাও তো এই যন্ত্রণাসাগরের যন্ত্রণা পার হয়েছেন। তাঁরাও তো এমনি করেই ভবব্যাধির হাতকে ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। তাই **সাধক শেষে জয়ী হবেই - চাই নিরলস প্রচেষ্টা ও গুরুকৃপা এবং একান্তভাবে আন্তরিকতা**। দেহরথে শ্রীকৃষ্ণ সহায় হয়ে সঠিকপথে রথচালনা করে নারীই হোক আর নরক হোক, কামনাই হোক আর ছলনাই হোক - যেই আসুক সবকিছুই ঐ রথের চাকায় নিষ্পেষিত হবে। রসময় সারথি তোমার আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমাকে রসোত্তীর্ণ পথে উত্তরণ ঘটাবেনই। তোমার কাজ শুধু মনে মনে প্রার্থনা করা "চরণ ধরিতে দিও গো আমায়, নিওনা, নিওনা সরায়ে।" ব্যস ! বাজীমাৎ।

☞ যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যের কথা

এই প্রসঙ্গে পুরাণে উল্লেখ আছে এমন একটা গল্পের বা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। মনে হয় গল্পটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না তাই উল্লেখ করছি। একদিন ব্যাসদেব ও তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা হচ্ছে। ব্যাসদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁরই একটা লেখা শোনাচ্ছেন, যেখানে তিনি লিখেছেন যে ''নারীর মোহকারী শক্তি মহাজ্ঞানীরও বুদ্ধি বল হরণ করে নিতে সক্ষম।'' হঠাৎ এই লেখা শুনে মাথা চুলকে গুরুদেবকে বললেন ''গুরুদেব, আপনার এই উক্তিটুকু মানতে পারছি না ক্ষমা করবেন, এই অংশটা আপনি কেটে বাদ দিয়ে দিন।'' ব্যাসদেব একটু ভেবে বললেন, ''ঠিক আছে ! এখন ওটা যেমন আছে থাক - প্রয়োজনে সময়ান্তরে বাদ দেওয়া যাবে।'' এই ঘটনার কিছুদিন বাদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য একদিন শিষ্য বাড়ী হতে ফিরছেন। পথে সন্ধ্যা নেমেছে আর রাতটাও খুব ঘন অন্ধকার ও দুর্য্যোগপূর্ণ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন একে অচেনা পথ, তায় রাত্রিকাল, পথ চিনে চলা খুবই দুষ্কর, তার উপরে দুর্য্যোগ। সবচেয়ে কষ্টকর রাস্তাটি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কি করি, কি করি অবস্থায় চিন্তিত যাজ্ঞবল্ক্য হঠাৎ দূরে একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়ে অতি উৎসাহে মনুষ্যের আবাসস্থল ভেবে তার দিকে দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়ে দেখলেন একটা ছোট্ট কুটির। মানুষের আবাস নিশ্চয় ভেবে যাজ্ঞবল্ক্য কুটীরের দ্বারে আঘাত করলেন। দরজা খুলে গেল। যাজ্ঞবল্ক্য দেখলেন কুটীরের দ্বারে একজন পূর্ণ যৌবনা তপস্বিনী কিন্তু বিধবা দাঁড়িয়ে আছেন। যাজ্ঞবল্ক্য রমণীর কাছে সবিনয়ে রাত্রিটুকুর মত আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু রমণী মধুর কণ্ঠে স্থান দিতে অপারগতা জানিয়ে বললেন, ''এখানে তিনি একাই থাকেন - কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই, এমন অবস্থায় আপনার ন্যায় পুরুষের স্থান দেওয়া উচিত নয় - বিশেষে তাঁর মত অপরিচিত পুরুষের স্থান এখানে কেমন করে সম্ভব'' ? যাজ্ঞবল্ক্য তবুও তাঁর একান্ত অসহায়তার কথা বল্লেন। তদুপরি আরো বল্লেন ''আমি একজন ঋষি আমার

কাছ থেকে আপনার কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই - দয়া করে আপনার কুটীরের সামনে ঐ জায়গাটুকুতে থাকার অনুমতি দিন।'' ঋষির এই কাতরতায় রমণীর মন অবশেষে গলল - রাজী হল স্থান দিতে। **রমণী এমন একটা জাত যে এরা ভোজনে দ্বিগুণ, বচনে চতুর্গুণ, কামনায় আটগুণ শক্তি ধারণ করে।** যাই হোক রমণী রাজী হয়ে দ্বার বন্ধ করে দিলেন আর যাজ্ঞবল্ক্য সেই কুটীরের সামনে ঘুমাতে গেলেন। কিন্তু ঘুম আসে কৈ? আসে কামনা আর ভাসে ঐ রমণীর রমণীয় মুখচ্ছবি। রাত বাড়ে, বাড়ে কামনার বেগ যত রাত্রি গভীর হয়, গভীর ভাবে চেপে বসে কামনার দাউ দাউ আগুন। শেষে তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে শেষে কুটীরের চালে উঠে চাল ফুটো করে কুটীরের মধ্যে রমনীর পাশে মেঝেতে লাফ দিয়ে পড়লেন এবং কামান্ধ অবস্থায় ঐ যুবতী বিধবা নারীকে একেবারে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পর মুহূর্ত্তেই দেখলেন যাকে তিনি আলিঙ্গন করে আছেন তিনি আর কেউ নয় তাঁর গুরু স্বয়ং ব্যাসদেব। ব্যাসদেব তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, ''কি হে এখনও কি লাইনগুলো কেটে বাদ দেবে, না লেখাটা ঠিকই আছে?'' যাজ্ঞবল্ক্য অতি বিনীতস্বরে মাথা হেঁট করে কোনরকমে জবাব দিলেন ''আপনিই সত্য।''

তাই বলছি নারী, নরক, কাম, কামিনী, দেহ, বিদেহ এ সব সাধকের কাছে কোন বাধা হয়ে সাধনার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, যদি গুরু স্বয়ং এসে হাত ধরে তাকে তার সাধনার পথে চলতে সাহায্য করেন। সব বাধা বিঘ্ন, সব প্রত্যয় নিমেষে ব্যয়ের ঘরে চলে যাবে, সব বাধা, সব আঁধি দূর হয়ে সাধকের চলার পথ কুসুমাকীর্ণ হয়ে উঠবে আর সেই পথের শেষে সাধক আমার আমিকে খুঁজে পেয়ে বিজয়ের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে গুরুদেবকে হৃদয়ে স্মরণ করে কৃতাঞ্জলিপুটে শুধু প্রণাম জানাবে আর বলবে ''নমঃ প্রভু ! তোমার জয় হোক - জয় হোক তোমার।''

☞ আমার জীবনে নারী ও নারীর মূল্য

আমার জীবনে নারীর কথা বলতে গেলে, প্রথমেই সবিনয়ে স্মরণ করতে বলব যে, আমার নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর নামটা, যেটা আমি বাস্তব উপলব্ধি থেকে দিয়েছিলাম সেটাই স্মরণ করতে, আর সেটাতেই তো আমার নারী সম্পর্কে জীবন দর্শনের ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠবে পাঠকের কাছে। আমি সত্য পথের পথিক হবার চেষ্টা করেছি, জীবন যাপনও — আমার দয়াময় গুরুর কৃপায় — সেই পথে, আজও চলেছি শত শত ঝড়, ঝঞ্ঝা, লাঞ্ছনা অশনিপাতের মধ্যে থেকে — তবু কিন্তু জীবন আমার কাছে ত্যক্তনীয় পরিচ্ছদ নয় - দেহটা, সেটা অবশ্যই বটে। তাই শাস্ত্রের কথা মনে করে চলেছি জ্ঞান হবার পর থেকেই। গুরুকৃপায় শিশুকালে পিতামাতা পরিবার পরিজন, শিক্ষালয় সমাজবোধেও সেই একই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তা জানি না, তবে সেই পরিমন্ডলেই বড় হয়েছিলাম। কামনা জেগেছে, শরীর বিবশ হয়েছে, হয়েছে উদ্দীপনায় উত্তেজনায় উদভ্রান্ত, কিন্তু যেই এই দেহটা, এই শরীরটা, এই দেহের ভেতরের মনটা বাস্তব-সম্মুখীন হয়েছে, হয়েছে ক্রিয়ামুখী, হয়েছে প্রতি পক্ষের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থা, কোন সে অঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তিবলে, কোন সে জাগরূক চেতনায় চোয়াল দুটো শক্ত হয়েছে, অন্তরের অন্তঃস্থলের উৎসমুখে এসে দাঁড়িয়েছে বিরক্তি, ঘৃণা, সংহত শক্তির বোধ। দেহের জ্বালা মেটেনি-মিটেছে আত্মরক্ষার আত্মতুষ্টি, মিলেছে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার, গুটিয়ে নেওয়ার, বিরত থাকার আত্মবোধ, সংযমীর আত্ম সচেতনতা । নারী তাই সেই ছোট বেলা থেকেই শুধু ভোগ্যা বলে বোধে আসেনি। মনে হয়নি কোন বিশেষ বিশেষণে

প্রকৃতিরূপাকে বেঁধে রাখতে। বরং হৃদয়ের পরিমিতিবোধে সেই নারীদেহের মধ্যে যে বাস করছে তাকে ধরার আকাঙ্খা উন্মত্ত করেছে। নারীদেহ তাই আমার কাছে শুধু মোহিনী, কামিনী প্রণয়িনী না হয়ে, হয়েছে জননী, দেবীরূপিনী, মোক্ষদায়িনী, লীলাসঙ্গিনী। ছলনা না হয়ে, হয়েছে শুধুই ললনা, লাবণ্যরূপে না এসে এসেছে কন্যারূপে, ভোগ্যা না হয়ে মোক্ষপথের সহযাত্রীর রূপ নিয়ে। শাস্ত্রে বলেছে, "ত্যক্তেন ভুঞ্জিয়াৎ" - ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, বড় শক্ত কথা মনে হবে যদি হৃদয় দিয়ে না ভাবা যায়। আবার খুব সুন্দর মনে হয় যদি অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করা যায়। আর শাস্ত্র মানে যদি শাসনের কথা মনে আসে তবে নিজেকে শাসন করলে, সংযমী হলে, শান্ত হলে তবে শাস্ত্রের অর্থবোধ হবে। আবার শান্ত হতে হলে শ্বাসকে ধরতে হবে যা দুই নাসিকায় যাতায়াত করছে। তাই শান্ত হয়ে মানে করলে দেখা যাবে শাস্ত্রই ঠিক। নইলে মনে হবে ত্যাগই যদি করবো তবে ভোগ করবো কি করে - এ তো দুটো বিপরীত কথা হয়ে গেল। না তা কখনও নয়।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রই এই ত্যাগের মন্ত্র-

> "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যদ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।"

কি সুন্দর কথা। ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে কক্ষপুটে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। আবার তিনি নিজে জগতের সব কিছুতে মিশে রয়েছেন। অতএব আমি আমার নিজ জ্ঞান ত্যাগ করে, লোভকে বর্জ্জন করে যদি জগৎকে ভোগ করি তাহলেই তো নিষ্কাম ভোগ হল। অপরের বস্তুতে লোভ না করে, নিজের যা কিছু আছে, আমি আমার বোধ ত্যাগ করে, নিজের টুকুতে যদি সন্তুষ্ট থাক, অপরের

ধনে যদি লোভ দৃষ্টি না দাও, যদি আমার মনে না কর, যদি ঈশ্বরের মনে কর, সব কিছুর মালিক তো ঈশ্বর এই যদি বোধে আন, যদি ভাব এ ধন তো ঈশ্বরের ধন, আমার তো নয়, তাই **সেই ধন ঈশ্বর নিবেদনের মাধ্যমে যদি ভোগ কর, ভোগের প্রসাদ গ্রহণ কর, তাহলেই তো ঋষি প্রদর্শিত পথে চলা হল ঠিক রাস্তা ধরা হল, হল ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ।** একবারে সব কিছু ত্যাগ করতে তো বলা হয়নি। বলছে ভোগ কর কিন্তু ত্যাগের বাদী সুর নিয়ে ভোগ কর, কিন্তু অপহরণ করো না। ভোগ কর কিন্তু অর্থগৃধ্নু হয়ো না, নিজের টুকু নিয়ে তুষ্ট থাক কিন্তু অপরের ধন অপহরণের চেষ্টা বা ইচ্ছা ত্যাগ করো। এইটুকু শুধু করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ সোজা কথায় নিজের টুকু যা আছে, ভগবান তোমাকে যা দিয়েছেন, যেটুকু দিয়েছেন, ঠিক প্রয়োজন বুঝে দিয়েছেন, প্রয়োজনে আবার দেবেন এইটুকু মনে এনে অপরের ধন গ্রহণের, অপহরণের, অর্জ্জনের ইচ্ছা ত্যাগ কর। **অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ কর তাহলেই শান্তি পাবে।** হানাহানি, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, যুদ্ধ, মারামারি সবের মূলেই তো পরস্ব অপহরণের ইচ্ছাই মূল। রাম ও রাবণের যুদ্ধের মূলে যে নারী হরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূলেও সেই পরের সম্পত্তিতে আগ্রাসন, সেই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাই মূলীভূত কারণ। একজন সুন্দরী যুবতী লোভ সৃষ্টি করে বাসনা আনছে, ভোগের স্পৃহা প্রবলতর হচ্ছে - তার রূপ, দেহ, যৌবন তো ঈশ্বরের সৃষ্টি, যেটা একান্তই তার নিজের, তুমি তাকে নিজ সুখে লাগাতে গেলেই তো গোলমাল হবে, বেসামাল হবে, তার চেয়ে তাকে, তার দেহ সৌন্দর্য্যকে তার অন্তরের সৌন্দর্য্যকে ভালবেসে তাকে নিয়ে তাকে যে সৃষ্টি করেছে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সাধনার পথে দুজনে যদি হাত ধরে চলতে পার, যদি তাকে তুমি নিজে ভোগ না করে ঈশ্বরের ভোগে নিবেদন করতে

পার- যদি তাকে তোমার ঈশ্বর চিন্তার, ঈশ্বর আরাধনার পথের উৎস মুখে প্রেরণাদাত্রী তৈরী করতে পার, যদি সে তোমাকে দিন রাত ধর্ম্ম চিন্তায়, ধর্ম্ম পথে যাবার জন্য, ঈশ্বর আরাধনায় বাধা বিপত্তি ঠেলে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিজে নীরবে সহ্য করে, কোন দাবী দাওয়া না রেখে নিভৃতে চোখের জল ফেলে, নিজ কামনা বাসনার টুঁটি টিপে জাগতিক সব বাধা তুচ্ছ করে, শত অত্যাচার, তিরস্কার সহ্য করে তোমার চলার পথ কুসুমাকীর্ণ করে নিরন্তর তোমার চলার অন্ধকারময় পথে উজ্জ্বল মঙ্গলদীপের আলো জ্বেলে পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তোমার চলার পথকে আরও সহজ সুন্দর করে তোমার একমনে এগিয়ে যাবার জন্য সাহায্যকারিণী হয় - এক কথায় তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা যদি হয় তোমার মঙ্গল, তোমার অগ্রগতি, তাহলেও কি তুমি বলবে যে তাকে তোমার ভোগ করা হল না? দেহভোগ তো তুচ্ছ নিমিত্তের সুখের ব্যাপার। সে কিন্তু শুধু তোমারই হয়ে, তোমারই অনন্ত সুখদাত্রী হয়ে, তোমার চিরকালের সুখের জন্য সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে রয়েছে-তবু কি তুমি বলবে যে তাকে তোমার ভোগ করা হল না? দেহসুখের ক্ষুদ্র গন্ডী পার করে দিয়ে নীরবে, নিঃশব্দে নিঃসীম ঈশ্বর চিন্তায় নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে তোমাকে যোগ-ঋষি বাঞ্ছিত, চিরদিনের সুখের বিশাল ধনভান্ডারের সুপ্ত গোপন পথে পৌঁছে দিল, তাতেও তোমার মন না উঠে তবে রোগশোক, জরাব্যাধির মন্দির, আজ মাকাল ফল তো কালই কঙ্কালরূপী এই দেহ নরকটার দিকে তাকিয়ে চিরসুন্দরকে ভুলে বলতে পারবে, "সুন্দরী তুমি আমার কামিনী, তুমি আমার প্রেয়সী? না বলবে, না না হে নারী, তুমি কামিনী নও তুমি ভুবনমোহিনী মোক্ষদায়িনী, তুমি কখনই প্রেয়সী নও — তুমি শ্রেয়সী, তুমি ভোগ্যা নও — তুমি সুযোগ্যা সহচরী, তুমি বন্যা নও — তুমি অনন্যা। তখনই তোমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে

আপনিই উৎসারিত হবে হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত মন্ত্র, ত্যাগের ভিতর ভোগের সেই অমোঘ বাণী, যার দ্বারা যুগপৎ অভ্যুদয় ও শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ সাধ্যের মহামিলনের মহামন্ত্র, ভোগ ও ত্যাগের মহাসমন্বয়ের চিরসত্যের কথা।

"যতোঽভুর্ভ্যুদয়ান শ্রেয়োসলাভঃ সধর্ম্মঃ"

হে ঠাকুর তোমার জয় হোক।।

****

দ্বাদশ অধ্যায়

☞ মোহময়ী মায়া ও সাধক - দুঃস্বপ্ন পর্ব্ব

এই শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণুতে ঈশ্বরের শক্তি নিহিত আছে তাই ভগবানকে খোঁজা মানেই নিজের মধ্যে নিজেকে খোঁজা। এই আমিটা কে? কার বর্ত্তমানে এই দেহটা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে আর কার অবর্ত্তমানে দেহটা অচল হবে? তাহলে আমরা যে আমার আমার করে মরি, ছোটবেলা থেকে মরণের আগে পর্য্যন্ত একইভাবে একই অভ্যাসে চলি, সেই দেহটা তো তাহলে মিথ্যা আমি, নষ্ট আমি, কষ্টের আমি, মায়ার আমি যাকে পরিচালনা করেন; আমার আমি সত্য আমি- যাকে খোঁজার পথে প্রতিপদে ছড়িয়ে আছে অজস্র বাধা বন্ধনের ছাঁদ। আছে মায়ার ফাঁদ, আছে মোহের অজস্র বিবশ করা আস্বাদ, যার বিষময় স্বাদ সাধকের জীবনে দুরন্ত বিপর্য্যয়ের ঝঞ্ঝা এনে সাধককে স্বর্গ থেকে মূহূর্ত্তে ধূলায় মিলিয়ে দিতে পারে, দিতে পারে ঈশ্বরময় জীবনে ক্ষণিকের হলেও ঘনঘটার তুফান তুলতে,

পারে সাধনার উচ্চতম সোপান থেকে নরক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করতে। নিজেকে জানার পথে সাধকের এই যন্ত্রণা ভোগ, এই উত্থান পতন এত ঘটে, এত বেশী ঘটে যে স্থির বুদ্ধি হয় সাময়িকভাবে অস্থির, ব্যাকুলতার বদল ঘটে চঞ্চলতায়, মনোযোগে আনে আষাঢ়ের দুর্য্যোগ, একান্তভাবে নিজঘরে পরবাসী করে, ভ্রান্তির পথে ঘুরিয়ে এই ভাবনাই এনে দেয় যে ঈশ্বর আমার কাছে বহুদূরে - নাগালের বাইরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই মোহময় ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুর গোপন নাশকতায় ধর্ম্মসুখে আসক্ত মন তখন ইন্দ্রিয়সুখে সুখী, ইন্দ্রিয় পরশে কাতর হয়ে ঈশ্বরের মূল্যায়নেই ভুল করে। করতেই পারে না, করতে চায় না পাছে মোহের বাসনাটা ছুটে যায় — পাছে মোহরূপী শত্রুর নাশ হয়। এটা অবশ্য নিশ্চিত যে ইন্দ্রিয় সুখের প্রয়োজন অতি সামান্য কিন্তু তার সঙ্গে এও সত্যি যে সুখের বোধ অতি প্রবল তাই মোহকারী আকাঙ্খাও প্রবল শক্তি, অতি প্রখর ভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যকারী শক্তি, আর মায়া মোহের ফাঁদে একবার পড়লে তা থেকে বার হওয়া, তা থেকে দূরে আসা, তার সুকঠিন বেড়াজাল ডিঙানো সাধকের কাছে কত কষ্টের, কত লাঞ্ছনার, কত বঞ্চনার। কত অসত্য অপবাদ, কত অপরাধের মিথ্যা অপরাধীর মত দিন যাপন করে বরবাদী জীবনে যে আবার সত্যের সিংহনাদ ঘোষণা করতে হয়, একমাত্র ভুক্তভোগী সাধকই তা জানে, তা মানে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। সুরু হয় প্রচন্ড সাধনা, রোমে রোমে জাগে হারিয়ে ফেলা ঈশ্বরের প্রতি মূহুর্ত্তের অনুভাবনা, নিভু নিভু মনটাতে বাড়ে ঈশ্বর চেতনা, আসে শান্তি, ঘোচে ভ্রান্তি, মুছে ফেলে হৃদয়ের যত ক্লান্তি। সাধক আবার উদ্দাম গতিতে প্রিয় মিলনের পথে এগিয়ে চলে, ঝেড়ে ফেলে ক্ষণিকের দেখা পাওয়া আগমপায়ী বিভ্রান্তিগুলোকে। শুধু সে এগিয়েই চলে না। কোণ্ সে অদৃশ্য ইঙ্গিতের স্পর্শে জেগে উঠে লেখনীতে বাঙ্ময় করে রাখে রুদ্ধকারার দিনগুলোর কথা, এই পথে চলা কোন অমলিন পথিকের সাবধান বাণীর কথা স্মরণে রেখে - সত্যের পথে চলা কোন অজানা পথিকের সাধনের উদ্দেশ্যে, যা তাকে অবিরত স্মরণ করাবে পূর্ব্বসূরীর যন্ত্রণা, যা তাকে জোগাবে

প্রেরণা, যা তার কানে কানে সুর শোনাবে কর্ম্মফলের বাজনার, যা তাকে অদৃশ্য ভাবে বলে চলবে এ পথে এসো না এ পথে চলো না এ পথে শয়তানের হানা এ পথে চলতে মানা।।

সেই সময়টা, সেই দিনগুলোর সুরুটা বোধহয় যতদূর মনে পড়ে ১৯৮২ সালে গুরুবাবার দেহরক্ষার পর। তাঁরই দয়ায় আসনপ্রাপ্তির কিছু পর থেকেই সুরু হয়েছিল দয়াল বাবার নতুন খেলা, নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে। এ খেলা সাধনার পথে কিছু নতুন নয়। কিন্তু যিনি খেলান, যে খেলে তারাই জানে অন্য লোকে নাহি বোঝে এ খেলার মানে।

আমরা অনেক সময়ই কথায় কথায় গুরু কৃপার কথা বলি, কিন্তু বাস্তবে বুঝি না জানিও না গুরু কি বস্তু। ধরা যাক আমরা কোন একজন ব্যক্তির কাছে দীক্ষা পেলাম। গুরু করণ হল, তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করলাম বা ভক্তির ভড়ং দেখালাম। আধার অনুযায়ী আমরা যে যা চাই বা পারি সবই করলাম কিন্তু সত্যি করে তাতে করে কি গুরুকৃপা পাওয়া যাবে? গুরু তো উপলব্ধির বস্তু - গুরু এমন এক অমূল্য বস্তু যাঁকে অন্তর দৃষ্টিতে তবে বোধে আনতে হয়। যার সেই অন্তর দৃষ্টি নেই সে কখনও সেই অমূল্য রত্নকে বোধে আনতেই পারে না। কখনও পারে না তাঁর মহিমার উপলব্ধি করতে। এ এত সোজা জিনিষ নাকি যে হাটে বাজারে চাইলেই পাওয়া যাবে বা চাইলেই মিলবে? গুরুকে উপলব্ধি করা মানে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। গুরু তো দেহধারী ঈশ্বর বলা যায়। সেই গুরুর কৃপা লাভ করা তো ঈশ্বর কৃপারই সামিল। তাই মুখেই আমরা গুরুকৃপা লাভ করি আর বাস্তব, গুরু কৃপা লাভ, বলে হয় না, করে লাভ হয় আর সেটাই হোল প্রকৃত গুরুকৃপা। গুরু হাটে বাজারে আলোচনার বিষয় বস্তুও তো কখনই নয়, যা আমরা সকলেই প্রায়ই করে থাকি। গুরু কেমন জান? একটা কবিতা দিয়ে বলা যায়। "ঐ যে লুকিয়ে চলে বিশ্বময়ী চর্ম্ম ঢাকা গায়, ঘোমটা দেওয়া বৌটি যেন আড় নয়নে

চায়।'' এই রকম আর কি? ঘোমটা বা ঘুঙ্গট থাকলে সেই বৌটিকে তো সবাই চিনবে না। কে তাহলে তাকে চিনতে পারবে? কার কাছে সে ধরা পড়বে চেনা পড়বে? চেনা পড়বে বা ধরা পড়বে একমাত্র তার কাছে যার সঙ্গে তার পূর্ব্ব পরিচিতি আছে - কারণ সেই একমাত্র জানে বৌটির আদব কায়দা, চাল, চলন সব কিছু জানে, জানে তার ঠমক, গমক, ছন্দময় গতির ব্যঞ্জনা, ঘোমটার ফাঁকে চাহনির অর্থবহ ইঙ্গিত। তাই ঐ বৌটির তখন ঘোমটাই থাক বা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাক সে কিন্তু মনের মানুষ নিমেষ দৃষ্টিপাত মাত্রেই তখন সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে আর অপরে পারবে শুধু অনুমান করতে আর তা করতে গেলেই ভুল হওয়াটা হবে স্বাভাবিক। যেমন কোন ভক্ত হয়ত গুরু দেবকে বলছে ''বাবা আপনি তো সবই জানেন।'' হ্যাঁ জানেন। খুব সত্যি কথা যে মোহন্ত গুরু সবই জানেন, কারণ অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি তাঁর আছে - তিনি সদা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু যে, মুখে বলছে সে কোন সত্যের ভিত্তিতে কথাটা বলছে? তার কাছে সত্য হচ্ছে গুরু জানেন, কিন্তু ভিত্তিটা কি? কোন ভিত্তিতে সে সর্ব্বজ্ঞের সামনে সর্ব্বজ্ঞতার কথা তুলছে? জ্ঞানে না অজ্ঞানে থেকে? মুখে বলছে না বোধে বলছে? তত্ত্বজ্ঞ হয়ে বলছে বা মুখস্থ বলছে? তুমি গুরুকে কতটা জেনে এ কথা বলছ? কিছুই না জেনে বলছ তো? তাই তোমার কথাটা ঐ বউটিকে না চিনে বলার মত সব অনুমান সাপেক্ষ বলা হচ্ছে বা কোন লোকের মুখে গুরুর কথা, তাঁর সর্ব্বজ্ঞতার কথা শুনে বলা হচ্ছে। তাই তোমার জানা ঠিক নয়। যে তত্ত্বজ্ঞ হয়ে বলে সে কখনও মুখে প্রকাশ করে না। যে মুখে বলে, সে গুরুর সামনে বলে এক, পিছন ফিরলেই করে বা ভাবে আর এক, আর আড়ালে গেলে বা গোপনে ভাবে বা করে অন্য কিছু — এ সব অজ্ঞানতার ফল, এ সব মূর্খামি, এ শুধুই ভন্ডামি ও মর্কট ভক্তির পরিচায়ক। তাই কথাতেই বলে ''গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।'' নিজেকে মেরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করলে তবে গুরুকে চেনার

সম্ভাবনা দেখা যায় মাত্র। নিশ্চিত নয় তবুও তখনও বাকী থাকে সম্পূর্ণতার। নিরন্তর নিষ্কামভাবে স্মরণ মনন করতে করতে চোখের জলে বুক ভাসালে তবে গুরুর প্রসন্নতা মেলে। এমন চেনা কোথায় আছে? কজন আছে দুনিয়াতে?

আমার বেশ মনে আছে "গুরুবাবাকে কথা প্রসঙ্গে একদিন কোন অসতর্ক মূহুর্ত্তে বলে ফেলেছিলাম এই কথাটাই," বাবা আজ ১৫/১৬ বছর আপনার সঙ্গ করলাম কিন্তু আপনার একটা লোমকূপের খবরও জানতে পারলাম না।" ১৫/১৬ বছর বাবার সঙ্গে থাকা মানে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে বাবার দয়ায় তখন সপ্তম ক্রিয়া করছি বলা যায়, কত ভালবাসা পেয়েছি বাবার, কত পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে দয়াল বাবা উপযুক্ত করে নেবার চেষ্টা করেছেন, কত বিচিত্র অনুভূতিতে কৃপা করে তিনি আমার অন্তর ও বাহিরের ঝুলি ভরে দিয়ে রেখেছেন সেই সময়ে, কত অজানা জ্ঞান সম্ভারে আমার দেহ, মন, প্রাণ শীতল করে দিয়েছেন সেই সময়, যা প্রকাশ করা আজও সম্ভব নয় আমার কাছে। তবুও আমার ঐ সামান্য মনে করা কথাকটা শুনে বাবা যেন কি ভীষণ রকম পালটে গেলেন। তাঁর সেই সময়ের চেহারা মনে হলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে হয়। হঠাৎ যেন বাহ্যিক রূপের পরিবর্ত্তন ঘটল, খুব গম্ভীর অথচ তিরস্কার সূচক দৃপ্ত ভঙ্গিমায় শাসনের সুরে বলে উঠলেন "আমাকে চেনার, চেষ্টা করো না, যা বলেছি, যা দিয়েছি তাই করো। সে বড় বিষয় ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই"। কথা কটা শেষ করেই বাবা দ্রুত আবার তাঁর পূর্ব্বের বাহ্যিক অবয়বের আস্তরণে যেন ফিরে এলেন। ভাবলাম, যেন বোধে এল, ঠিকই তো বাবা তো ঠিকই বলেছেন। গুরু তো আত্মা, ঈশ্বর, তিনি তো নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু ঘট ঘটমে বিরাজে রাম — পরমাত্মা তো নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে আমাকে কর্ত্তা সাজিয়ে সব কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। তাই আমিও বলি ভাইরে! "গুরু ভজ, গুরু জপ, গুরু কর সার, তাতেই হবে জপসিদ্ধ তাতেই হবে

পার। সমস্ত কিছুই গুরুময়, সমস্ত দেহই গুরুর দেহ। গুরু ছাড়া অন্য কিছু নেই জগতে। সমগ্র দুনিয়াটাই বুঝি শ্রীগুরুর দেহ, নিজের দেহটাও শ্রীগুরুরই দেহ। আমরা যা কিছু খাই, যা কিছু করি, চলি, ফিরি, কথা বলি, সবই গুরু শক্তিতে করি - তবে এটা প্রত্যক্ষ বোধে আসা চাই - মুখে বললে হবে না। আর এইটাই অর্থাৎ এই বোধ হওয়াটাই হল প্রকৃত জ্ঞান বা পরাজ্ঞান আর যা কিছু জ্ঞান সবই অপরা জ্ঞান। আর জ্ঞান হলেই পাবে শান্তি, হবে শান্ত, সবশেষে পাবে মুক্তি, হবে মুক্ত।

আমরা এই শ্রীদেহ লাভ করেছি ঠিকই কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আমরা দুঃখকে অতিক্রম করতে পারছি না এটা আমাদের চরম শাস্তি। যতকাল এই দেহেতে শ্রীগুরুকে চিনতে না পারা যায়, জানতে বা বুঝতে না পারা যাবে ততদিন দুঃখের অবসান হবে না, চিরন্তন শান্তির আশাও নেই। সাধনার ক্ষেত্রে সাধকের উচিত তাই প্রাণপথে দেহস্থিত গুরুর কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করা যাতে দেহজ্ঞানের অবসান হয়ে আত্মজ্ঞান ফুটে ওঠে। আমার ভিতরের জ্ঞান — সূর্য্যের উপর হতে মেঘের আবরণ কেটে গিয়ে যাতে চিরন্তন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। যাতে আমাকে আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাই আমার মিথ্যা আমিটার। এই দেহ আমিটার আবরণ খসে না পড়লে আমার আমিকে দেখতে পাব না চিনতে পারব না আর গুরুকে চিনতে না পারলে আমি যে আত্মা তা জানতেও পারব না। দুঃখেরও অবসান হবে না। সাধক তাই চোখের জলে প্রার্থনা জানায় —

"তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে?"

সাধক কি দিয়ে চরণ ধোবে? চোখের জলে? চোখের জল

কখন আসে? আসে প্রিয়কে কাছে না পাওয়ার দুঃখে বা পেয়ে হারানোর ব্যথাতে। আর যে না পেয়েছে তার চেয়ে পেয়ে যে হারাচ্ছে, হারাতে চলেছে, বা হারিয়েছে তার ব্যথা, তার মর্ম্মবেদনা অন্তহীন, নিঃসীম। যো নেহি খায়া উহ ভি পস্তায় গা মগর যো খায়া হ্যায় উহ্ জ্যায়দা পস্তায়েগা। চোখের জল ফেলা ছাড়া সাধনার বোধহয় ভোগান্তির শেষ হয় না, শেষ হয় না কর্ম্ম বন্ধনের, ক্ষয় হয় না কর্ম্মফল, বা কর্ম্ম ফলের প্রাপ্ত ভোগ। সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাই কাঁদতেই হয় নিরন্তর — এ কান্নার শেষ নেই দয়িতের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত। এ কান্না, অন্য কিছুর জন্য নয় - নিজেকে হারিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কান্না, অহংবোধে মত্ত হয়ে, বিবশ হয়ে, ক্ষণিকের ভুলে, রিপুর ফাঁদ থেকে উদ্ধারের জন্য এই কান্না - নিজের চিরসাথীকে মোহবশে দূরে সরিয়ে, ফিরে পাওয়ার জন্য নিজের কাছেই নিজের আত্মসমপর্ণের মিনতির কান্না, এ কান্না হতাশার, এ কান্না প্রিয়মিলনের। সাধক তাই অতীতের ভুল স্মরণ করে, স্বীকার করে, চোখের জলে তার পরম প্রিয়কে কিভাবে ফিরে পেল তার ইতিহাস চোখের জলে লিখে রাখে, লিখে রাখে প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস, ভবিষ্যৎকে সাবধান করার জন্য। সেই প্রত্যক্ষ ইতিহাস সাধকের নিজের কথায় বলা হচ্ছে। "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো" - হে ঠাকুর তুমি কৃপা করে আমার হাতে কলম দিয়েছ, সত্য পথের পথিক আমি — আমার হাতে কলম দিয়েছ — সত্য পথের পথিক আমি তোমার হাতে গড়া সন্তান, তাই তোমার আদেশে তোমার ইচ্ছায় সত্যের প্রকাশ হোক এই শুধু প্রার্থনা। জীবনের হিসাবের খাতা খুলে যখন বসি তখন দেখি বলার মত অনেক কিছুই আছে। কিন্তু হে ঈশ্বর, অপ্রিয় কথা সত্য হলেও বলব না তুমি জান। তাই ধৈর্য্য ধরে দুঃস্বপনের দিনগুলি কি ভাবে কেটেছে একমাত্র তুমিই তার সাক্ষী বলে সেদিনের কথাগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

☞ আগুন জ্বলার পূর্ব্ব ইতিহাস

মানুষের সাথে মেশার স্বাভাবিক প্রবণতা আমার গোড়া থেকেই ছিল আর সেটাই ছিল আমার জীবনের খোরাক। মানুষের সঙ্গ বড় ভাল লাগে চিরকালই। গুরুবাবার দেহত্যাগের পর অনেকেই ক্রিয়া পায়। তার মধ্যে মেয়েরাও থাকে এমন কি অনেক কুমারী মেয়েও আছে । পিতা পুত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে তাদের সাথে একটা আনন্দঘন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় মেলা মেশাতে কখনও কোন অসুবিধা কোনদিনই হয় না, হয়ওনি আজ পর্য্যন্ত। আর তাতে আমার স্ত্রীও মেয়েদের সঙ্গলাভে মাতৃস্থানীয়ার আনন্দে মশগুল থাকত। বছর খানেক এমনিভাবে কাটার পর একটি মেয়ে ধরা যাক্ মেনকা ক্রিয়া পেল যেদিন, সেদিনই তার মধ্যে বিশেষভাব লক্ষ্য করা গেল। মেয়েটি কোন ব্রাহ্মণ কন্যা নয়। কিন্তু তাহার বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যে যে অসাধারণত্ব ছিল, তারই জোরে সে আমার মনে বিশেষ স্থান করে নিল আর আমিও সেইক্ষণে স্থান পেলাম মোহরাক্ষসীর কবলে, ঐখানেই হোল গোলমাল — যা আমার দীর্ঘ সাধন জীবনে কোনদিন স্থান পায়নি এমনকি নিজের অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রেও নয়। হঠাৎ মনে উদয় হোল আমার এমন এক জন নির্ভরতার লোক দরকার যার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে প্রাণের সেবা করব ও বাবা যাদের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে গেছেন সেই পরম প্রিয় ক্রিয়ান্বিতা ও ক্রিয়ান্বিতদের সঙ্গে বাকী জীবনটা সহজে, সরলে, কাটাব। হে দয়াল গুরুদেব, তুমি সাক্ষী, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি দেখছ কোন মিথ্যা লিখছি না।

☞ মহামায়ার ফাঁদে

সুরুতে প্রথম দিকে ঐ কন্যাটির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ দেখেছিলাম এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মহামায়ার খেলা সুরু হয়ে কবে যে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বুঝতেই পারিনি। কারণ আমার মনের অবস্থা তখন অতি উচ্চে — মনের এমন অবস্থা যে বোধহচ্ছে আমি ষড় রিপু জয়ী, কাম, ক্রোধ ইত্যাদির উর্দ্ধে-এমন কি আমার স্ত্রী আমার সম্পর্কে একই কথা বলে চলেছে। তাছাড়া শুধু স্ত্রী কেন সকলেরই তখন আমার সম্পর্কে একই অভিমত। ভুলের বোঝা চেপে বসল আরও। মহামায়ার মায়া আমাকে যে ফাঁদে ফেলে জড়িয়ে নিয়েছে বুঝতেই দেয়নি। সবশেষে ভুলের বোঝা চরম বৃদ্ধি পেল কিভাবে সে কথাই বলছি। মেয়েটি মাঝে মাঝে দেশের বাড়ী যায় কিন্তু থাকতে না পেরে চলে আসে। ইতিমধ্যে কন্যাটি আমার স্ত্রীর ও আমার হিতৈষীদের মন জয় করে নিয়েছে নিজ ক্ষমতায়, নিজ দক্ষতা গুণে। তাছাড়া গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত মহামায়ার খেলায় চোরাপথে কানে আসতে সুরু করেছে বিভিন্ন দিক থেকে মেয়েটির গুণপনার ও অসাধারণত্বের নানা কথা। ইতিমধ্যে কন্যার মা, কাকীমা আমার বাড়ীতে এসে বলছে যে বাড়ী গিয়ে মেয়েটি নাকি থাকতেই চায় না - থাকতে পারে না, খুব মন খারাপ করে থাকে, মাঝরাত্রে উঠে বিছানায় বসে এ বাড়ীর কথা মনে এনে শুধু কাঁদে। মনের মধ্যে নাড়া জাগল - নাড়া জাগল আমাদের দুজনের মধ্যেই অর্থাৎ মোক্ষদা ও আমার মনে। ওর মা কাকীমাকে বললাম ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে, কন্যার স্নেহে লালন পালনের ইচ্ছা নিয়ে। সুরু হল জীবনের নতুন আর এক অধ্যায়। এখানে আসার পর থেকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতিতে কখন সে যে মোহ মায়ার মোক্ষমজালে আবদ্ধ করে চূড়ান্ত ভাবে কন্যার স্থান দখল করেছে, মাঝে মাঝে

পিতৃ মাতৃ মনের স্নেহের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক হয়ে আমরা ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তখন আমাদের উভয়েরই মন স্নেহ নিগড়ে বাঁধা পড়ে গেছে। টাকা কড়ির হিসাব, সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন, অনুক্ষণের দর্শনে ছিল তার দখলে ষোলআনা। দাবী আদায়ের ভঙ্গিমায় তার রূপান্তর ঘটতে সুরু করে কখন কোন দুর্ব্বল মূহুর্ত্তে তা যে নিশ্চিত পাওয়ার জিদে পরিণত হয়েছে, স্নেহের অনুশাসন মানতে মানতে কখন যে শাসনের কারাগারে অবরুদ্ধ হয়ে গেছি, ভেবেছি মরুক গে আমাদেরই যদি একটা মেয়ে থাকত এই মায়াশক্তির বোধে রুদ্ধ হয়ে সংসারে যে কারাগারে আমরা রয়েছি পিতৃমাতৃত্বের মোহময় রসায়ন কখন যে তার কামনা বাসনা, অন্যায় জিদ ও অন্যায় আচরণের লৌহ কটাহে হলাহল তৈরী হয়ে সেই হলাহল উভয়েই পান করে যে মোহমত্ত হয়ে গেছি এমন কি তার নিজস্ব আত্মীয় পরিজনেরও কাছে আমরা উভয়েই ঐ কন্যার দৌলতে যে চরম জীবদ্দশা বদ্ধ জীব হয়ে গেছি — বুঝিনি — বুঝতে পারিনি। হে দয়াল ঠাকুর! ভ্রমরূপেও তোমার কি অস্বাভাবিক প্রকাশ, হে মা মহামায়া বিধি হরি শম্ভুও তোমাকে যে প্রণাম করে আজ অন্তর দিয়ে তার কারণ অনুধাবন করছি। চাকুরী পেল, অবশ্যই আমার তদ্বির ছিল। করবে না বলল। ভাবলাম, যাক্ গে ঠিকই আছে। আমাদের মেয়েকে কি চাকরী করতে দিতাম? ওতো মেয়ের মতো সেবা যত্ন করছে আমাদের, নিজের বাপ মা ঘর সংসার ছেড়ে গুরুকে গুরুমাকে বাবা মা জ্ঞানে রয়েছে, আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে! হে ঈশ্বর! হে ঠাকুর! তোমার ইচ্ছায় কিনা হয়! তাই ভাবি এখন ,শিশুকাল থেকে যে মায়ার প্রভাব এড়িয়ে, বাবা, মা, ভাই বোন, স্ত্রী প্রিয়জনকে ভুলে তোমার সেবায় দীর্ঘজীবন আত্মনিয়োগ করল নিজের রক্তের সম্বন্ধের জাগতিক বন্ধন যাকে ঘরে ধরে রাখতে পারল না মূহুর্ত্তের ভুলে, তোমার কোন এক অদৃশ্য খেলার

মায়ার ফাঁদে নিমেষে তার বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়ে, মোহাচ্ছন্ন করে কি সুচতুরভাবেই না জীবন নাটকের সুবর্ণময় অধ্যায়টা - চরম প্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটা সাধকের জীবনের বহু কষ্টের পর গুরুকৃপাধন্য মাহেন্দ্রক্ষণটা জানিনা কেন কিসের জন্য তোমার মনের কোন গোপন অভিপ্রায় সাধনের জন্য ধোঁয়াসার অন্ধকারে আবৃত করে দিলে? কেন? কেন? কেন ঠাকুর? জানি সবই আমার কর্ম্মফল সবই আমার দ্বারা সৃষ্ট স্বখাত সলিল। কিন্তু এও জানি তুমি মঙ্গলময়, কখনও কারও অমঙ্গল সৃষ্টি করনা, করতে পারনা, কারণ তাহলে তোমাকে কেউ করুণাময় বলে ডাকত না - ডাকত না পরমানন্দ মাধব বলে। আমরা তো মোহান্ধ জীব, সাজানো পিতা মাতা — তুমিই সাজিয়েছ, তোমার ইচ্ছায় হয়েছে সব। কিন্তু তোমার মধ্যে তো ইচ্ছা নেই - আছে শুধু অনিচ্ছার ইচ্ছা, আছে মঙ্গলরূপের জোয়ার, আছে প্রকৃত সৃষ্টি সুখের উল্লাস। তাই তো তুমি জগতের পিতা মাতা একসঙ্গে হয়ে রয়েছ - সেটুকুই ভরসা। কিন্তু মনটা তো মানে না - তোমার লীলা বোঝে না তোমার খেলা জানে না, তাই চিরবিরহীর সুর নিয়ে আবার কাঁদে, বলে, এমন তো ছিলাম না; বুক চিতিয়ে চলতাম সত্যটুকুই খুঁজতাম - মায়া মোহ ছুড়ে ফেলে তোমারই তো সেবা করতাম, তাহলে? এমন দুঃস্বপ্ন কেন দেখলাম, তোমার প্রতি কোন দুর্ব্বলক্ষণে কি দূরত্বের সেতুবন্ধন ঘটেছিল? তাই তোমার অভিমান, তাই তোমার বিরহ, তাই তোমার অপ্রকাশে মোহজালের প্রাদুর্ভাব? তাই কি হৃদপদ্মে বজ্রকীটের দংশন? তাই কি তোমার দেওয়া দেহদেউলে আগমপায়ীর আগমন?

সাধক তাই কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে নীরব নিশীথে লিখে চলেছে প্রাণের ঠাকুরের বিরহ ব্যথার ইতিবৃত্ত-লিখে চলেছে জীবনের প্রত্যক্ষ বোধের সারণী সংক্ষেপ। কেমন করে মায়ামুক্ত

পুরুষকেও মায়ারাক্ষসী তার করালগ্রাসে করায়ত্ত করে, কেমন করে মায়ার আবরণে ঢেকে ঐ মায়ামুক্ত পুরুষকে সংসার মায়ায় আকৃষ্ট করে সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে, কেমন করে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার অমরবাণী "মম মায়া দুরত্যয়া" সাধকের প্রত্যক্ষ বোধে বর্ণে বর্ণে ফুটে উঠে তার সাধনার ক্ষণিক বিরতি ঘটিয়ে সেই সাধনাকে তীব্র থেকে তীব্রতর ভাবে জ্বলে উঠতে সাহায্য করে, কেমন করে সাধনার সুউচ্চ শিখরে উঠেও মহামায়ার মায়াকে তুচ্ছ না ভেবে তাঁরই দেওয়া মহামন্ত্র অনুক্ষণ স্মরণ করে মা হারে না পুত্র হারের যুদ্ধে তাঁরই হাতে তাঁরই দেওয়া বিজয়মাল্য যুদ্ধশেষে কেমনভাবে সগৌরবে কণ্ঠে ধারণ করতে হয়, কেমন করে জীবত্ব থেকে শিবত্বে উপনীত হতে হয় এই স্মৃতিচিহ্ন লেখার সেটাই মূল উপজীব্য, এই লেখনী ধরাবার সেটাই বোধহয় গুরুদেবের উদ্দেশ্য!

☞ সাধকের মহৎ স্বীকারোক্তি

কিন্তু তবুও আবার বলছি আমার এই বন্ধন দশার জন্য দায়ী নয় কেউ-দায়ী আমি নিজে-নিজের জালে নিজে জড়িয়ে গেছি। যা পেয়েছি তা অনেক, যা হারিয়েছি তারই জন্য শুধু বেদনা। যা কুড়িয়েছি তা যদি কাঁচ হয় - হয় যদি গরলকুম্ভ, তা শুধু আমার হয়ে আমারই থাক, আমি তা পান করতে রাজী চিরদিন, চিরকাল। আমার কাছে যদি কেউ কিছু পেয়ে থাকে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই সে প্রাপ্তি তার কাছে অমৃতময় হোক। কারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নেই, নেই কোন অভিযোগ। আমি চাই শুধু তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতে নিরন্তর, নিশিদিন। যদি কেউ এই মর্ম্মছেঁড়া কাহিনীতে ব্যথা পায়, ঈশ্বর করুণায় মুক্তিলাভ করুক, যদি কেউ কখনও সত্য

প্রচারের আলোকে দেখা এই কাহিনীতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, কামনা করি তার ক্ষোভ নিরসনের জ্ঞানালোক দেখা দিক। এই লেখার প্রতি ছত্রে, প্রতি আখরে, যদি কেউ লেখনীর মিথ্যারূপের প্রতিপন্নতায় প্রতিবাদী হয়ে এগিয়ে আসে - বিনীত আমন্ত্রণ রইল তাদের প্রকৃত অর্থ জেনে আগুয়ান হতে। যদি কেউ পাপ বা পুণ্যবোধের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এ লেখার ভ্রান্তি নিরসনে বিরত থাকে, তাদের আমি দিব্বি করে বলছি, আমার কাছে নেই কোন পাপ পুণ্যের মিথ্যাবোধের জ্ঞান, আমি সত্যপথের পথিক, সত্যের পূজারী, গুরুদেবের অসীম করুণায় সতী না হলেও অসতী কভু নই। আমন্ত্রণ জানাই এই ভ্রান্তি নিরসন করে কৃতার্থ করুন। আর কি করতে পারি আমি? কি বলতে পারি আর? তাই শুধু চোখের জলে ভিজে গুরুচরণে প্রণত হয়ে লিখে যাই আত্মবিস্মরণের সেই দুঃসহ দিনগুলোর কথা — যা ছিল আমার কাছে দুঃস্বপ্নের দিন, প্রিয় বিরহের দিন, নিজেকে হারিয়ে ফেলার তাপদগ্ধ বিবর্ণ বিশীর্ণ অন্তহীন দিন!

☞ সাধকের আর্ত্তি

হে দীন দয়াল ঠাকুর, হে দয়াল গুরুদেব, মহামায়ার ভ্রান্তিরূপে পড়ে এখন আমি যেন কারে পড়ে ভাঁড়ে ঘোল খাচ্ছি। হে দয়াল, হে পতিতপাবন, বিপদতারণ, উদ্ধারক গুরু, তোমার বিশেষ কৃপা ছাড়া আমার উদ্ধারের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে তুমি বিশেষভাবে দয়া কর ঠাকুর। তোমার জন্য আমার মধ্যে সেই পূর্ব্বের ব্যাকুলতা ফিরিয়ে আন। তোমার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ যে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তুমি যদি দয়া না কর, তবে ত কোন উপায় দেখি না। আমি তো অন্ধ আতুর, আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল। তুমিই তো আমার জন্মদাতা, গতিদাতা, বিধাতা, মুক্তির পথও তুমিই দেখিয়েছ নিজে ডেকে দীক্ষা দিয়ে। আমার ঘরে যে দৈত্য

দানব বাসা বেঁধেছে - তারাও তো তোমারই বলে বলীয়ান। তাদের ছলনায় ভুল করে ফেলেছি, মহা বিপদে পড়ে দুই চক্ষে অন্ধকার দেখছি সর্ব্বদা এদের হুমকিতে, এদের হুকুমে চলতে হচ্ছে কারণ এদের প্রলোভনে পড়ে আবার আমার মধ্যে মৃতপ্রায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য সকলেই প্রভুত্ব বিস্তার করতে সুরু করেছে, এদের সাথে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি - "এবার বাঁচাও মোরে"। তোমারই দয়ায় তোমার কাছে যা যা পেয়েছিলাম, সমস্তই আজ খোয়া গিয়েছে। আবার মজার কথা এই যে সেগুলো সব তোমার কাছে জমা পড়েছে। আমি না হয় মোহান্ধ হয়ে পথ ভুল করেছিলাম, তাই সমস্ত মূল্যবান সম্পদ খুইয়ে তো জরিমানা দিয়েছি। কিন্তু তুমি তো আমার চিরসাথী, আদি, অন্তে, মধ্যে তো তুমিই আমার একমাত্র দরদী বন্ধু হয়ে থাকবে। তাই আজ যখন আর আমার কেউ নেই, যখন আমি নিরুপায়, তখন তুমিই এসে হয় আমাকে এ দেহভার থেকে মুক্ত কর, নচেৎ বাঁচার মত বাঁচাও।

☞ মন্দির, মসজিদ, সব একাকার

হে অনন্তরূপিনী জননী, জনকল্যাণদায়িনী মা, তুই কি মন্দিরেই শুধু আছিস, মসজিদে তুই কি নেই, এই দেহে তোর কি বাস নেই? তুই তো শিখিয়েছিস্ মন্দির মসজিদ সব এক। দেহই মন্দির দেহটাই মসজিদ। মন্দির মসজিদে কোন তত্ত্ব নেই, আছে দেহে তাই তত্ত্বকে খুঁজতে হলে দেহেই খুঁজতে হবে, তবে তত্ত্বগতভাবে তোকে জানা যাবে।

☞ মায়ামুক্ত ও জ্ঞানী, অবতার পুরুষ

মায়ামুক্ত অর্থে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত, মায়ামুক্তকেও প্রয়োজনে মায়াবদ্ধ হতে হয়। জ্ঞানী ও অবতার এক নয়। সাধনার দ্বারা জ্ঞানী

হওয়া যায়। অবতারেরও প্রকাশ হয়। তবে জ্ঞানী অনেক হতে পারেন। অবতারের প্রকাশ অতি প্রয়োজনে ঘটে। সাধারণ ভাবে বহুযুগ অতীত হলে অবতারের প্রকাশ ঘটে। তাঁদের সাধারণ মানুষের মত রক্ত মাংসের দেহ থাকে বটে তবু সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাঁদের উপর মনুষ্য বুদ্ধি আরোপ করা উচিত নয়। এটা একটা বিরাট ভুল। তাঁদের দেহ চিন্ময় দেহ, জ্ঞানময় দেহ, মানুষ তাঁদের চিনতে পারে না। হয়ত লোকমুখে শুনে তাঁদের সাময়িক ভক্তি করে কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে তাঁদের প্রদর্শিত পথে নিষ্কাম সাধনার প্রয়োজন। কামনাবাসনা সাধনা করতে দেয় না, সাধককে একেবারে দেউলিয়া করে দেয়, একেবারে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে উত্থান শক্তি দুর্ব্বল করে দেয়। তাঁদের পুরানো জায়গায় ফিরে আসা কঠিন হয়ে উঠে। তবে দয়াল গুরু অবস্থা বুঝে যে উঠতে চায় তাঁর প্রতি করুণা করে থাকেন। কিন্তু তিনি কৃপা না করলে কোন উপায় নেই।

মায়াযুক্ত পুরুষ প্রয়োজনে মায়াবদ্ধ হয়ে লিখে চলেছেন নিজ জীবন যুদ্ধ পরিক্রমের ইতিহাস। এমনই এক পাতা থেকে নেওয়া নীচের অংশ।

গত ২৪ ঘন্টায় যা ঘটে গেল তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রতি মুহুর্ত্তে আমাকে শাসনে রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। সে সমস্ত কাজগুলো বিবশ ভাবে করিয়ে নেবেন সেই গুলোই ঘটছে, বাকী সমস্ত কাজ আভাসে কেটে যাচ্ছে। সকালে ঘুম ভাঙ্গল। রাত থাকতেই-তারপর যন্ত্র চালিতের মত সংসারের সব কাজ করে চলেছি কিন্তু কোন কাজেই আনন্দ অনুভব করি না, কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি অনিবার্য্যভাবে সব কিছু করিয়ে নিচ্ছে। কেমনভাবে করাচ্ছে জানি না বুঝি না, কিন্তু এটা বুঝি যে ঘাড় ধরে করাচ্ছে। সর্ব্বদাই মন চাইছে ক্রিয়াতে ডুবে থাকতে কিন্তু জাগতিক কাজ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় এক তিনিই নানা মুখে কত কটু, অম্ল, মধুর মধুর কথা বলে, কখনও বা যন্ত্রণা কখনও বা একটু মিষ্টতা

বিতরণ করে চলেছেন, সব বুঝেও কিছু করার কোন উপায় নেই, সমস্তই যেন এক মহাকালের ইঙ্গিতে এক অমোঘ শক্তির পরিচালনায় চলছে। এতেই মনে বিচার আসছে যে যতক্ষণ দেহ খাঁচাটায় আবদ্ধ আছি ততক্ষণ কোন স্বাধীনতা আমার নেই। যেমন বলাবেন, আমাকে বলতে হবেই, যেমন শুনাবেন আমাকে শুনতে হবেই। ঘুম ভাঙ্গার পর আমার প্রথম কাজই ছিল তোমার সেবা। একটা ছেলে ছিল সেও বাড়ী চলে গিয়ে আমাকেই আজ দৈনন্দিন কাজে কর্ম্মক্ষয়ের জন্য রেখে দিয়েছে। কি করব? সবই তোমার খেলা! সবই আমার কর্ম্মফল। আমায় এই অবস্থায় কেন ফেলেছ দয়াময়! আমি তো স্ত্রী, পুত্র, সংসার কিছু চাইনা, কিছুই চাইনি, চেয়েছিলাম শুধু তোমাকে, শুধু তোমাকে। তাই বিনিময়ে আমাকে এ কি জ্বালায় ফেললে? কি সাংঘাতিক মনোকষ্টে রেখে দিয়েছ আমাকে? শুধু একটা ছোট্ট ভুলের জন্য তোমার হাতে তৈরী সন্তানকে এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ দেওয়া তোমার কি উচিত? আমাকে তুমি দয়া করে এ বিচিত্র লীলার হাত থকে রক্ষা কর ঠাকুর, রক্ষা করো আমাকে। তোমার বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পারছি না, সম্ভব নয় সহ্য করা এই তীব্র মনের দহন।।

এইভাবে সাধক চায় মায়া মোহের কবল থকে মুক্তি। কখনও বা আর্ত্তনাদে মনের আকাশ বিদীর্ণ করে দেখা দেয় ক্ষোভ, কখনও বা যন্ত্রণা কাতর মনে প্রার্থনার কাতরতায় আবেদনে নিবেদনে পরম প্রিয় আত্মা সমীপে জানায় দগ্ধ মনের অভিমান। সেই মনের একটা চিত্রের প্রতিফলন।

যখন যা কিছু ঘটছে, মনে হচ্ছে, দেহের মধ্যে যত কিছু কর্ম্ম সংস্কার জমা হয়ে আছে, তার চুলচেরা হিসেব নিকেশ শেষ করে যেতে হবে, এতটুকু এদিক ওদিক হবার কোন উপায় নেই। জানি, বুঝি সবই আমারই কৃতকর্ম্মের ফল, তাই দোষ কাউকে দিই না, সব আমার দোষ, সব অপরাধ আমার। কেবলমাত্র গুরুদেবের উপর

কখনও সখনও ভয়ানক অভিমান আসছে, বলতে ইচ্ছা করছে, হে দয়াল ঠাকুর, আমি তো দোষ স্বীকার করেই বলছি যে আমি না হয় অজ্ঞান, আতুর, জঘন্য মনের অধিকারী সবই ঠিক, কিন্তু তুমি তো জান, আমি তোমার অধীন আছি তোমারই দাসত্ব নিয়ে রয়েছি - তোমারই সেবাকর্ম্মে মন প্রাণ সব ঢেলে তোমার ভরসায় জীবন কাটাচ্ছি - তোমার স্মরণে সব কাজে রত হই! তোমারই চরণ স্মরণ করে সব কাজে অগ্রসর হই, তোমার চরণেই তো কামনা বাসনা ঢেলে দিই, আমার সকল কর্ম্মের সাথী তো তুমি, কোন কাজই তোমার অগোচরে নেই — এ কথা ভাবতেই পারিনি - পারিনা। তাহলে তুমি কেন আমাকে মোহের অধীন করে মোহমদে মত্ত হতে দিলে? কেন তুমি আমার ভুল করার আগে বিবেকের প্রান্তে নিষেধের আলো জ্বালালে না? কেন হাত চেপে ধরে আমাকে সেই কাজে নিবৃত্ত করলে না? কেন জানালে না আমাকে এই পথে যেতে মানা? কেন তোমার অতীন্দ্রিয় বাণী শুনিয়ে আমার মোহ নিদ্রার দ্বারে আঘাত করে নিষ্ঠুর ভাবে হলেও আমারই কল্যাণে আমার ঘুম ভাঙ্গালে না? কেন দৈববাণী হয়ে আমার মনে তোমার মধুর কণ্ঠে বলে দিলে না "ওরে অবোধ সন্তান, এ পথে শয়তানের হানা, এ পথে পা বাড়াস না?"

এই তোমার সন্তানের প্রতি স্নেহ? এই তোমার পিতৃত্বের দয়ার পরিচয়। এই তোমার একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই তোমার করুণার পরিচয়? জানি সবই আমারই কর্ম্মফল, সবই আমার দোষ। কিন্তু তুমি তো কর্ম্মনিয়ন্তার আসনে বসে আছ। এমন কর্ম্ম আমাকে দিয়ে কেন করালে যার পরিণাম এত ভীষণ, এত কষ্টের, এত নরক যন্ত্রণার? কেন করালে এমন কাজ যা আমার তোমার প্রতি অগ্রসর হওয়ার গতিকে শ্লথ করে দেয়? কেন জড়ালে আমাকে সেই ভীষণ কাজে যেখানে তোমার কাজে বিঘ্ন আনে? যে সন্তান তোমার কাজে কোন বাধা বিঘ্ন মানেনি, সব বাধাকে যে অবহেলায় তুচ্ছ করে শুধু তোমার কাজে নির্ভীক পদক্ষেপে চিরদিন আগুয়ান হয়েছে, হতে চেয়েছে, আজ তাকে এমন অবস্থায় কেন ফেলেছ দয়াময় যাতে সে

এত দুর্ব্বল হয়েছে যে কোন বাধাই অতিক্রম করতে সে যেন আর পারছে না? কেন তার শক্তি হরণ করেছ? কেন সে আজ নিজের কর্ম্মের মধ্যে চিরদিনের পূত পবিত্র মনোভাবের বদলে বদগন্ধ অনুভব করছে? কেন তার দুচোখে আজ অন্ধকার? তোমাকে ডাকছি, সাড়াও দিচ্ছ ঠিকই কিন্তু সেভাবে পাচ্ছি না কেন - যেমনভাবে পূর্ব্বে দিয়েছ। যেমনভাবে আগে তুমি উজ্জ্বল হাসিতে ভুবন ভোলানো রূপে সামনে দাঁড়িয়ে দশদিক আলোয় উজ্জ্বল করতে সেভাবে আস না কেন মনের মাঝারে? কেন তোমার চুপি চুপি অভিসার? কেন তোমার এই আপাত পদসঞ্চার? কেন তোমার আমার উপর এই অবিচার?

হ্যাঁ, অবিচারই বলছি, কেননা আমার তো তোমার মত জাগ্রত বিচার বোধ নেই, নেই কোনই আত্মবোধ, আছে শুধুই প্রাপ্তিবোধ। কিন্তু সে প্রাপ্তি তো জাগতিক কিছু নয়। সে তো তোমাকে প্রাপ্তি, তোমার পরশের প্রাপ্তি, তোমার করুণার প্রাপ্তি বোধ। সেটা ঠিকমত না পাওয়ার অশান্তি প্রাপ্তির বোধ, জ্বালার বোধ, বোধ শুধু যন্ত্রণার - বোধ শুধু দহনের, বোধ শুধু বিরহের।

মনে হচ্ছে তোমারও বোধহয় অভিমান হয়েছে। কেননা দেখছি যে তুমি যেমন মহান, সুন্দর তোমার রূপ, যেমন স্নেহ শীতল ছায়া দান করে এসেছ এতকাল, এখন দেখছি আবার তেমনি নানা কাজে জড়িয়ে রেখে তোমার রূপকে যেন কুটিল, ভয়ঙ্কর, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর করে দেখাচ্ছ; এত ডেকে ডেকেও তোমার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু হে দয়াল, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো অঘটন ঘটন পটিয়সী, তোমার মর্জি বোঝা ভার। এতকাল কেমন সুন্দরভাবে এই তরীটা ভাসিয়ে নিয়ে এলে, কতভাবে কত ছলে আগের সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে কাছে টেনে নিতে, কত শত কৌশল করে সব বাধা সব বিঘ্ন দূর করে দিতে, আজ যেন সেরকম আর করছ না। যেমন ডাকলেই সাড়া দাও না, দাও তোমার ইচ্ছামত, সব প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছ দেখছি কিন্তু কেমন যেন হৃদয়হীন ভাব, বড়

দেরী করে চেতনার মধ্যে আস, এ কি বিচিত্র খেলা তোমার? একি যন্ত্রণা আমার? একি বিচিত্র প্রকাশ তোমার, আর একি মরুময় অবস্থা আমার? এ প্রতিকূলতা সহ্য হয় না! কোথায় এর শেষ শুধু তুমিই জান। শুধু তুমিই জান দয়াময়।

যতদিন যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে কোন না কোন কাজে কালস্রোতের টানে বিবশ হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ছি কিন্তু সেই কাজের প্রতিক্রিয়া সুরু হলেই মনে হচ্ছে ঐ কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত হয়নি - এই চেতনা কিন্তু আগে আসছে না - কি অকরুণ তুমি। মহামায়াকে দিয়ে সন্তানকে সেই কাজটা করিয়ে নিয়ে সেই বিবশ মনটাকে স্ববশে পাঠিয়ে পরে অনুভূতি জাগাচ্ছ যেন লোভ আনিয়ে কোন বস্তুকে লালসায় লিপ্ত করে তুমিই খাওয়ালে আবার হজমের ভার না নিয়ে তাকে কষ্ট দিলে। কর্ম্মটা করাতে সময় নিলে না, প্রতিক্রিয়া জানাতে চতুর্গুণ সময় চাইছ। কি বিচিত্র খেলা তোমার। এ খেলা খেলতে তুমিই জান, তা তুমিই খেল - আমাকে কেন খেলার সঙ্গী করছ ঠাকুর। এমন কাজে লিপ্ত করছ যে লোকে দেখে মনে করবে এ তো সাধারণ জীবের কাজ। কোন জ্ঞানী এ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞান হরণ করে জ্ঞানীকে দিয়ে তুমিই করালে আর শাস্তির সময়ে দেখছি ঐ কাজ সাধারণ লোকে করে শাস্তি মুকুব হোল আর জ্ঞানীর হল মহাশাস্তি ঐ একই কাজের জন্যে। এই রকমই সাধনের পথে ঘটাচ্ছ। এ কি আশ্চর্য্য খেলা খেলছ তুমি? আরও মজার ব্যাপার দেখছি যে জ্ঞানীর মধ্যে যদি আবার এতটুকু অহংবোধ প্রকাশ পাচ্ছে তুমি অমনি জ্ঞানীর শাস্তির পরিমাণ, মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ। সাধারণ ব্যক্তি তোমার ক্ষমা পাচ্ছে, জ্ঞানীর কোন ক্ষমা নেই বরং তীব্র শাস্তি ভোগ জুটছে তার কপালে। তাহলে তুমিই বল এ খেলা কে খেলবে? একমাত্র তুমি খেলবে আর যে তোমার যোগ্য সে খেলবে? আমি তো যোগ্য নই তবে আমাকে এ খেলাতে মাতালে কেন? অহংকার নির্ম্মূল করার জন্য করালে? একই দেহে দেব ভাব ও অসুর ভাবের লীলা প্রকাশের জন্য করালে? তবে কি এটাই দেখাতে চাইছ যে ক্রিয়া

করলে যেমন অপূর্ব্ব আনন্দ আছে সামান্য অহংবোধ এলে কর্ম্মফলের শাস্তিও তেমনি আছে! আর সেই অমোঘ কর্ম্মফলের শাস্তি কঠিন, কঠিনতর এমন কি কঠিনতমও হতে পারে আর তোমার পরশ তখন শিথিল হবেই হবে।

এই যদি তোমার বিধান হয়, তবে হে বিধি! হে ভাগ্যবিধাতা তোমার কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে এই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর খেলা শেষ করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। এ খেলা আমার জন্য নয়, এ খেলা তার জন্য যে তোমাকে চিনতে পারে, এ খেলা তার জন্য যে অহংত্যাগ করে শুধু তোমার হতে পারে, এ খেলা শুধু তারই সাজে যে তোমার মহৎ কাজের সঙ্গী হয়ে বিরাজ করবে তোমার রাতুল চরণের মাঝে। আমাকে তুমি কৃপা করে এ খেলা থেকে দূরে সরাও ঠাকুর — এই প্রার্থনা।।

কি ভাবে জীবন যাপন করেছি সাধনার সময়ে বাবার কাছে সেই মধুময় দিনগুলোতে, আর আজ কি ভাবে রেখেছ আমায় বল। তুমি তো সর্ব্বকালের সাক্ষী - বল এটা কি সাধককে মানায় না সাধনা করা যায় এভাবে? কত নিস্পৃহ ছিলাম, কত নিশ্চিন্ত ছিলাম পরিবারের মধ্যে। কোন দায় দায়িত্ব বেঁধে রাখতে পারেনি। রাত ২টায় উঠে ক্রিয়ায় বসেছি, সকাল ৮টায় উঠে স্নান খাওয়া সেরে অফিস গেছি, বাবার কাছে গেছি, ফিরে এসেছি, ক্রিয়া করেছি আশা মিটিয়ে - দায়িত্ব থাকলেও চাপ আসেনি - যেটুকু পেরেছি করেছি - পরিবারের পরিজনরা অসন্তোষ প্রকাশ করেনি বরং সাহায্য করেছে সাধনাকে ভালবাসতে সাহায্য চেয়েছি, পেয়েছি অফুরন্তভাবে, আর আজ তুমি ছাড়া সবাই নীরব। তাই আজও তো রাত ২টায় উঠে মন্দিরের বাড়ীর চাবি খুলেছি ৪৫মিনিট ধরে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করে আসনে বসেছি - আসন থেকে উঠে বারোয়ারী কাজ ফুল তোলা, মেসিনে জলতোলা, মন্দির পরিষ্কার সব সেরে স্নান সেরে, পূজা, ভোগ নিবেদন সেরে জল খেতে ১২টা বেজেছে তারপর মন্দির থেকে ভোগ আনা, চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া, কাগজপড়া তারপর অবেলায়

২টা কিংবা ৩টার সময় কোনক্রমে দুটি খাওয়া - এটা কি সাধক জীবন? এই কাজগুলো কি সাধনার অঙ্গ? না ক্রিয়া করার পথে ব্যঙ্গ? ছিঃ ছিঃ! গুরুদেব! এ কি করলাম আমি? কেন এমন হল? শুধু একটু স্নেহ, মমতার জন্য এত চরম শাস্তি দিলে? তোমাকে ছেড়ে যে কাজই করি যত ঠাকুর দেবতার জন্যই করি, মন যে শান্ত হয় না প্রভু, মন শুধু ফিরতে চায় সেই আসনে যেখানে বসলেই তোমাকে পাওয়া যায়, তোমার পরশ অনুভব করা যায়। হে ঠাকুর, তুমি বলেছ যে সাধককে সহনশীলতা, ধৈর্য্য অবলম্বন করে শত জয় পরাজয়, লাঞ্ছনা গঞ্জনার পথ পার হতে হয়, যত প্রতিকূলতাই আসুক, যত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাক, গুরুর উপর আস্থা রাখলে আত্মনারায়ণের প্রতি একান্ত শরণাগত হলে তিনি সাধককে উদ্ধার করবেনই, শুধু কালসাপেক্ষ। তাই একান্ত শরণাগত হয়ে তোমার কাছে জানতে চাইছি — হে দয়াল গুরুদেব, কতকাল আর এ ভাবে আমাকে চালাবে। যে ক্রিয়া ছাড়া কিছু জানতে চায়নি, কিছু বুঝতে চায়নি, তাকে নিয়ে জীবনের পড়ন্ত বেলায় এ কোন লীলা তুমি খেলে চলেছ দয়াময়। আমার যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে - ঠিকমত তোমাকে স্মরণ করতে অবসর না পাওয়ার জন্য, তোমাকে ছেড়ে থাকতে হচ্ছে বলে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা এই হৃদয়ের পরতে পরতে জমা হচ্ছে — তুমি তো অন্তর্য্যামী, তুমি তো তা বোঝ! তবে কেন আমাকে এই শেকলে বেঁধে তোমার কাজ ছাড়া অন্য কাজে লিপ্ত করে কাছ ছাড়া করে রেখেছ? সদা সর্ব্বদা চারিদিকে কে যেন আমার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, উঃ! কি কদর্য্য সে দৃষ্টি! যেন গিলে খেতে চায়, যেন আমাকে মায়াবদ্ধ করে বন্দী করতে চায়। একমাত্র তুমি যদি আমাকে তোমার বাহু বেষ্টনীর মধ্যে ধরে রেখে শাসন করো তবে হয়ত সাধনা টিকে থাকবে নচেৎ অসম্ভব। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তুমি বড় নিষ্ঠুর, বড় অকরুণ তাই একদিন আমিও ওদেরই দলে ছিলাম বলে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুর দল ছদ্মবেশে, বন্ধুবেশে, হিতাকাঙ্খী হয়ে যখন আমার মনের ঘরে ডাকাতি করতে আসছে, তোমার শরণাগত হয়ে নিরন্তর তোমাকে ডাকছি কিন্তু কেন জানিনা পূর্ব্বের মত সাড়া দিচ্ছ না।

ওগো দয়াল ঠাকুর, বন্ধ কর এত অত্যাচার, ছিন্ন করে দাও এ বন্ধন, রুদ্ধ কর এদের আক্রমণ, স্তব্ধ কর অত্যাচারীর দৌরাত্ম্য, প্রতিষ্ঠা কর তোমার গুরু মাহাত্ম্য, প্রকাশিত হোক, উদ্ভাসিত হোক, নিয়মিত হোক, আমার জীবনে শুদ্ধ সত্ত্ব অধ্যাত্ম।

☞ কান্না

সাধনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হোল জপ! জপ ঠিকভাবে না হলে মন্ত্র চৈতন্য হবে না, হবে না জাগরণ। বর্ত্তমান দুনিয়ার যা পরিবেশ ও দূষণ এত বেশী আর তার সঙ্গে রামের দোসর সুগ্রীবের মত অসতের সংখ্যা এত বেড়েছে যে পরিমিত জপ হওয়া অসম্ভব। আর জপ যদি পরিমিত না হয় তাহলে রোগও সারে না। ঠিক ঠিক ভাবে জপ করা বলতে আন্তরিকতার সঙ্গে চক্রে চক্রে সময় অনুযায়ী মন্ত্র স্মরণের কথা বলা হচ্ছে যা সাধারণভাবে হয় না বা ভুল হয় বা আংশিক হয় মনের চঞ্চলতার জন্য। টিভি দেখা, বাজে আলোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা সবের বেলায় সময় আছে, উৎসাহ আছে, মন আছে, আছে মৌন সম্মতি, নেই শুধু জপের আগ্রহ। জপ করতে বসলেই যত আলস্য যত ঘুম, যত ক্লান্তি, যত কুচিন্তা, যত অক্ষমতা। এই সমস্ত অনর্থের মূলে আছে কামনা। এই কামনা থাকতে সাধনায় মন বসে না, তাই বিধি পূর্ব্ব মন্ত্র স্মরণ হয়না, চাঞ্চল্য এসে মনের স্থিরতা নষ্ট করে, মন একমুখী না থেকে বহুমুখী হতে চায়, তাই মন্ত্র জাগরণ হয় না। আর মন্ত্র স্মরণ ঠিকমত না হলে স্থিরতা আসে না তাঁকে জাগানো যায় না, হয়না ইষ্ট দর্শন।

এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করে সাধকের। মহা অভিশাপরূপে শেষে দেখা দিয়ে জীবনটাকে ছেঁড়া কাগজ করে তোলে, সাধকের পতন ঘটে। এই কামনাই ছদ্মবেশে মোহজাল সৃষ্টি করে ছোট্ট একটা ছিদ্ররূপে মনে প্রবেশ করে সাধককে গ্রাস করে, শেষ সম্বল হয় চোখের জল। সেই জলে তুফান

তুলে গুরু স্মরণে গুরুদেব দেখা দেন, অভয় আশ্বাসবাণী দিয়ে শেষে নিজের কোলে তুলে নেন। এই মোহ অতীব ছলনারূপে বিনয় অভিনয় সৃষ্টি করে সাধকের মনে স্থান করে নেয়। শেষ তো দূরের কথা অদূর ভবিষ্যতের পরিণতির কথাও সাধক ভাবতেই পারে না - ভিখারী রূপে প্রথমে এসে রাজা হতে চায়, সেবক হয়ে দেখা দিয়ে সেবা পেতে চায়, জননী সেজে এসে রাক্ষসীরূপ ধরে, সাধকের সম্বল হয় কান্না, চোখের জল। এই রাক্ষসী সাধকের সর্ব্বস্ব হরণ করে ভিখারীতে পরিণত করে - নিজের রসনা ও বাসনা পুরোদমে মিটিয়ে নিয়ে সাধককে উচ্ছিষ্টতে নিয়ে আসে।. তখনও সম্বল হয় চোখের জল। আজ আমি নিজ অন্তর দিয়ে তাই বলি সাধু সাবধান, নচেৎ প্রথমে সফল সাধনা সুরু হলেও পরে বিফল আর শেষ সম্বল চোখের জল। সকলকে ডেকে আজ তাই বলতে ইচ্ছা হয় —

"পরিস না কো মায়ার কাজল
হাতে হাতে পাবি ফল
ওরে শেষ সম্বল চোখের জল।"

বাবাগো! আজও কি ঠিক কথা বলে ফেলার জন্য নিজদোষ স্বীকারের পুরস্কার দেবেনা ! হে মা চৈতন্যময়ী, তুমি আমার চেতনাকে সদা সর্ব্বদা চৈতন্যময় করে না রাখলে আমার এই জাগা ঘরে চোর তো ঢুকবেই। আমার অভিজ্ঞতা বলছে যত অশুভ বা অসৎ কর্ম্ম জীবনে ঘটেছে, সব ঘটেছে তখনই যখনই আমার চেতনাকে কোন শক্তি যেন অচৈতন্য করে রেখেছে সেই সময়ে, আবার কাজ শেষ হলে চেতনা ফিরিয়ে দিয়ে সেই অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগও করিয়ে নিয়েছে। যে সময় অশুভ কর্ম্মের ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে বাধ্য তা যেন বুঝেও বুঝতে না দিয়ে শাস্ত্রবাক্য ও গুরূপদেশ ভুলিয়ে দুর্ম্মতিকে আমার মনে প্রবেশ করিয়ে স্বচ্ছন্দে তার কার্যসাধন পথ যেন এঁকে দিয়েছে মনের কোণে; এতে যে মহাক্ষতি হতে পারে মনকে বিবশ করে সে চিন্তা আসতেও দেয়নি। ঠিক যেমন ঘটে

গিয়েছিল পান্ডবদের পাশা খেলার সময়, অভিমন্যু বধের সময়। ঠিক ঐ সময়ে পান্ডবদের অনুক্ষণের সাথী শ্রীকৃষ্ণ হাজির রইলেন না, ফল যা হবার তাই-ই হল, সেই ফল কিন্তু ভোগ করল পান্ডবেরা। সাধকের তাই চেতন শক্তি এতটাই সজাগ থাকা দরকার যেন কোনক্রমে কষ্টার্জ্জিত সাধনার ধন, চোর এসে চুপি চুপি চুরি করে সরে না পড়ে। চুরি হলে সাধকের শেষ সম্বল চোখের জল। সেই জল ঝরে, গুরুকৃপা পেয়ে, মাথা তুলে আবার দাঁড়াতে অনেক সময় ব্যয় হয় অনর্থক। সাধক শেষে জয়ী হবে ঠিকই, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বাণী তার সহায় হয়ে রয়েছে "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" - আমার ভক্ত প্রকৃষ্টরূপে নষ্ট হয় না। ঠিকই তো যা চুরি যায় সেটা তার সাধনার সময়, নচেৎ সাধনার পরমার্থ কে চুরি করবে? কার সাধ্য? সে তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রক্ষিত, তবে এই চুরি আনে বিষাদ, চুরি আনে সাময়িক দুঃখ, অবসাদ, হতাশা - বাস্তবে কিন্তু লাভ হয় সাধকের কেননা সে তার সম্পদকে পুনঃ সঞ্চয়ের জন্য আরো ব্যগ্র হয় সাধনায়, নিবিষ্ট হয় ইষ্টে, আরও রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হয় রুদ্রের সন্ধানে। তোমার কাছে তাই প্রার্থনা জানাচ্ছি হে দয়াল গুরুদেব, তুমি আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও - যাতে আমার জাগা ঘরে চুরি না হয়। তুমি যদি দয়া করে আমার মনের ঘরে পাহারা দাও তাহলে আর রিপুরা এসে চুরি করতে পারবে না, তারা আমাকে মনোকষ্টও দিতে পারবে না। আমার তো আর ভুল হবে না কারণ তুমি যে রয়েছ মনের মাঝেতে, আলোর ঝরণা ছড়ায়ে মনের যতেক শতেক ময়লা, তোমার অমল, কমল করের পরশে, দিয়েছ দূরেতে সরায়ে, আমাকে তুমি তোমার ঐ ভৃগু পদ চিহ্ন লাঞ্ছিত বক্ষে কত না যতনে, কত সঙ্গোপনে আবেগে রেখেছ জড়ায়ে।।

জড়িয়ে রাখ বাবা, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে রাখ। কৃপা করে আমাকে তোমার ঐ চিরশীতল বক্ষে জড়িয়ে রেখ চিরকাল, চিরদিন। কারণ আমার ভীষণ ভয় করছে যে — জুয়া খেলায় হেরে গেছি, হেরে গেছি জীবন জুয়ার চালে। সেই খেলার সময় তোমার প্রচ্ছন্ন

নিষেধ শুনিনি, অপরাধ করেছি, তাই হেরেও গেছি। পরমায়ু যে এদিকে শেষ হয়ে আসছে, তলানিতে ঠেকেছে, কিন্তু তুমি তো পরম দয়াল, দয়ার সাগর, দয়ার ঠাকুর, এখন তুমি না দেখলে কে দেখবে, কে বাঁচাবে আমাকে ? তুমি ছাড়া আমার তো কেউ কখনও ছিল না, আজও নেই; তাই তোমাকেই তো আসতে হবে সন্তানকে উদ্ধার করতে। আর যদি উপায় না কর তো বুঝব তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকেছি - জগতে কেউ আর তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করবে না কখনও। তোমার উপর সত্যিই আমার অভিমান, আমার মধ্যে অহং এসে আমার স্থির বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আমাকে দিয়ে অপরিণামদর্শিতার কান্ড ঘটাল ? কেন সে সময়ে কঠোর হতে পারলাম না ? কেন মোহজালে বদ্ধ হয়ে পড়লাম তুমি হাজির থাকতে ? কেন আমি কপট মায়া কান্নাকে অবহেলা করতে পারলাম না ? কেন বিকৃতরূপকে বিবশ হয়ে প্রকৃতরূপে দেখলাম ? কেন আজ বিকৃত করে সত্যকে দেখানো হচ্ছে - আমি কিছুই বলতে চাইনা, বলতে যেন না হয়, কিন্তু হে দয়াল গুরু, তুমি সাক্ষী আছ আমার সমস্ত কর্ম্মের। আর কেউ না জানুক তুমি তো জান সত্য কি —বাবা, বড় ভয় করছে যে, মনে হচ্ছে কূট কৌশলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ছি। তুমি তো জান আমি এত জঘন্য মনের অধিকারী নই, এমন স্বার্থপর নই, এত কাঁচা মনের মালিক নই; তুমি তো আমাকে হাতে করে মনের মতন করে বড়ই নিখুঁত ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলে। তুমি তো জান আমার ত্রুটি কোথায় ? তাহলে বল এই খেলার উপযুক্ত কপটতা আমার ছিল কিনা ? এই খেলা একটা বৃহত্তর স্বার্থকে ধ্বংস করে ফেলার চক্রান্ত কিনা ? আর আমাকে তুমি নিমিত্তমাত্র সাক্ষী করে কষ্ট দিচ্ছ, তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আমার কাছে, আর ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম সেই ধর্মরক্ষার ভার তোমার। তাহলে বল আমার ভুল, আমার দোষ, যা কিছু থাক আমার মধ্যে সেই ভুল সেই দোষ আমার উদারতার অপর নাম কিনা ? হে ধর্ম্ম, তুমিই বল যে আমাকে যদি সঠিক মূহুর্ত্তে কঠোর করে ধরে রাখতে, যা তোমার উচিত ছিল সন্তানের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, তাহলে আজ তো আমাকে সবাইকে ত্যাগ করে এমন করে মায়া মুকুরে মুখ দেখতে হোত না। এমন করে নিজ ঘরে

পরবাসী সেজে থাকতে হোত না! এমন করে মোহের ঘরে মায়াজালে বদ্ধ হয়ে নকল দাঁতের দেঁতো হাঁসির ফাঁসির ফান্দায় পড়তে হতো না, পড়তে হোত না তোমার অধম সন্তানকে ভালো থেকে ভাল লাগার বদলে অসুর ভাবের ভালবাসার ফাঁদে?

সাধক তাই আবার প্রার্থনা জানায় মায়ের কাছে। ব্রহ্মময়ী মা আমার তুই, ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, মহৎ, ক্ষুদ্র ফাঁদ, সেই ফাঁদে বন্দী করে ষড় যন্ত্রের শিকার করে কলুর বলদের মত সংসার ঘানিতে পাক খাওয়াচ্ছিস কেন, কেন আজ জগৎস্বামীর কাছে আসামী না হয়েও মানুষের তৈরী সংসার কারাগারে পুরে জরিমানা সমেত কারাদন্ড ভোগ করাচ্ছিস তুই, সে ত শুধু আমাকে শোধন করবার জন্য - তাই তো আজ তোর ভুবন মোহিনী রূপ আমাকে দেখালি। ধন্য করলি, আজকের দিনটায় আমার অনেক জ্বালার নিরাময় ঘটালি। কিন্তু মা, আমাকে অযথা ঘানিতে কেন পাক দিচ্ছিস? কষ্ট হয়না তোর সন্তানের দুঃখে? কারণ তেল যা বেরুচ্ছে ঘানিও খেতে পায় না, বলদও পায় না, নেপোয় মারছে দৈ। আমি পাচ্ছি কৈ? তাই বলছি আর আমাকে কত ঘোরাবি, আর কত জরিমানা দিতে হবে? মাগো, আজ যে আমাকে অনেকের অনেক মন্তব্য, অনেক ছলাকলা সহ্য করতে হচ্ছে মা! কত মন ভোলানো কথা, কত মিথ্যা জেনেও-সত্য বলে, ব্যথা পেয়ে-ব্যথা ভুলে পরিস্থিতির সামাল দিতে হচ্ছে। আসুরিক শক্তি কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আজ অপরাধী হয়েও প্রতিবাদী নেই বলে আমাকে আসামী করে জগৎস্বামীর দন্ড থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে? সকলে ভুলে গেলেও তোর তো প্রকৃত আসামী চিনতে ভুল হবার কথা নয়। তাহলে কি আমাকে পরীক্ষা করছিস পরিশুদ্ধ করতে? নইলে কাল রাত্রে অমন কেন ঘটালি? জপের সময় আনন্দময়ী সেজে এসে ধরা দিতে দিতে প্রতিকূল হাওয়া বইয়ে হাওয়ায় ভাসলি, আর আমাকে চোখের জলে ভাসালি? সব কিছু লন্ড ভন্ড করে দিলি? সব পাওয়ার দেশে পৌঁছে দিতে দিতে সব কিছু কেড়ে নিলি? মা হয়ে ছেলের কাছে ধরা দিতে

দিতে হঠাৎ কেন ফুস করে পালিয়ে গেলি? কেন তবে এসেছিলি? কেন ক্ষণিকের জন্য ভালবেসেছিলি? আর ভালই যদি বেসেছিলি, দয়াই যদি করেছিলি, পাওয়ার আশাই যখন আমার মনে জাগিয়েছিলি, ছোট্ট এই মনটার গন্ডীই যদি ভেঙ্গেছিলি, তবে আমার ভালে আটকে না থেকে আবার আমাকে ফেলে দিয়ে সংসার ফাটকে পাঠিয়ে দিলি কেন? বল মা কেন? কেন?

আমি তো তোর অসহায় সন্তান। তোকে পাবার ইচ্ছা হয় প্রচুর কিন্তু অসুরের দলও যে অতিশয় চতুর, তারা যে মা তোকে দেবার মত আমার সম্বল বলতে আর কিছু রাখেনি। আছে শুধু চোখের জল, তাই সেটাই দিয়ে যাচ্ছি তোকে দিনরাত। তুই শুধু একটু কৃপা করে, আমার প্রতি মমতাময়ী মায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ভুবন মোহিনী রূপে এসে সামনে দাঁড়িয়ে, হাত ধরে বক্ষে টেনে নিয়ে ফিরিয়ে দে মা আমার বরাত, অন্ধকার অমানিশার অবসান ঘটিয়ে এনে দে মা সাধকের কাছে নূতন দিনের নূতন প্রভাত, বন্ধ কর বঞ্চনার করাঘাত, অসুরেরা ভয়ে হোক কুঁপোকাত।।

☞ ফেলে আসা দিনগুলি মোর

তোমার কথা লিখব বললেই কি লেখা যাবে? যাবে না বাবা! কাগজ, কলম, কালি সমস্তই তো আছে, কিন্তু জোগান কই? অতএব কি করব? খানিক কাঁদি তাহলে? তাহলে তোমার দয়া ঠিক পাব! তুমি তো বাবা। ছেলে কাঁদলে আসবে না - তা কি হয় নাকি? এত নিষ্ঠুর তুমি হতেই পার না, আসনে বসলেও ধরা দেবে না? অসম্ভব! তাহলে তোমার কথার খেলাপ হবে না? কি বলছ হবে না? কেন? মনটা দিতে হবে? কিন্তু মনটা যে আমার বড় জ্বালাচ্ছে বাবা! মনটা যে আমার খুব কাঁচা। এখনও ফুলেও বসছে, বিষ্ঠায়ও বসছে, তোমাকে চাইছে আবার সংসারকে ধরছে। অনেক দিনের পুরানো বন্ধুদের নিয়ে ঘর সংসার পেতেছে, কিছুতেই বিদায় দিতে

চাইছে না! দয়া কর বাবা! দয়া কর আমায়। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ এই কথাটা লিখে প্রকাশ করতে চাই আর সেটাও তো হবে তোমার মহিমা প্রকাশ - এতো শুধু আত্মকথা নয় আমার কথা তো লিখতে চাইনা, লিখিওনি কখনও, লেখা তো দূরের কথা কাউকে বলিনিও কখনও - এমন কি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও না। একটা দিন, শুধু একটা দিনের কথা তোমাকে বলেছিলাম যে এই কথাটা মোক্ষদাকে না বললে আমার জাগতিক জীবনে কৃতজ্ঞতার অভাব ঘটবে। সে কথায় পরে আসছি। আজ যখন তোমার কথা লেখার জন্য তুমিই আমায় উদ্বুদ্ধ করেছ, প্রেরণা দিয়েছ তখন এত বাধা দাও কেন? এটা তো এই দেহের জীবন সায়াহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তাই স্মরণকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত, যতদূর মনে পড়ে, এই পরিধির মধ্যে সুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম কমবেশী উভয়ই আছে। কিন্তু দেখছি, কেন জানিনা, সুকর্ম্মের ফল যেন অনুকুল হয়না কিন্তু দুষ্কর্ম্মের ফল প্রতিটি মূহুর্ত্তে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। একসময় মনে হোত প্রতিকূলতাই অনুকূল সাধনার ক্ষেত্র গড়ে তোলে। আজ বুঝছি এই পরিস্থিতিতে এই চিন্তা কত কঠিন তাই আবার বলছি ঠাকুর, রক্ষা কর, রক্ষা কর আমায়, তুমি ছাড়া আমার তো কেউ নেই। তাছাড়া তোমার মত আমাকে কে ভালবাসে? আমি ভাল না বাসলেও তুমি আমাকে ভাল না বেসে থাকতে পার না, কারণ শিশুকাল থেকে তাই দেখছি, জ্ঞান হবার পর থেকে তাই দেখছি, গুরুপ্রাপ্তির পর থেকে তাই দেখছি বাবা! আমার। তোমাকে তো প্রকাশ্যেই সর্ব্বজন সমক্ষে বলেছি "বাবা", আপনি আমায় শিশুকাল থেকে লক্ষ্যের মধ্যে রেখে দিয়েছেন" তবে আজ কেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হবে? কেন আমার মনের আকাশ ভ্রম কুয়াসায় ঢেকে থাকবে? আলো দিয়ে, জ্যোৎস্না দিয়ে, দীপ্তি দিয়ে মোহ মায়ার অন্ধকার ঘুচিয়ে জীবন নাটকের অন্তিমে নেমে নিজ লীলায় নাটকের সমাপ্তি ঘোষণা কর, হে অনন্তলীলাময় ঠাকুর। মিথ্যে মায়া মোহ আমার তো কখনও ছিল না, ছিল না সংসার, আত্মীয়, স্বজন বান্ধবের কোন মায়ার ডোরের বাঁধন, ছিল না কোন প্রেম, প্রীতি ভালবাসার জাগতিক শৃঙ্খল, মনপ্রাণ তো তোমার চরণে আজন্ম নিবেদিত ছিল, আজও আছে, তবে কেন এই যন্ত্রণা?

তুমি হৃদয় আসন টুকুও পরিস্কার করে বসবে না? সেটুকুও আমায় দিয়ে করাবে? তাও ত করতে চাইছি, কিন্তু বাধা দিচ্ছ কেন? তোমার সন্তানকে, তোমার হাতে গড়া পুতুলকে এমনভাবে কেন দূরে ঠেলে দিচ্ছ? এ বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য হয় না, সহ্য করতে পারি না তোমার বিরহ, তীব্র দহনে দগ্ধ করছে তোমার আড়াল। তাই কাঁদছি, তাই মিনতি করছি, তাই প্রণতি জানাচ্ছি। তাই তো কখনও কাঁদাচ্ছ, কখনও হাঁসাচ্ছ, কখনও দূরে, কখনও কাছে, কখনও কখনও গোপনে, কখনও চকিতে, কখনও স্থিতিতে মনের মাঝে বিরাজ করে, উপস্থিতির ছোঁয়ায় আরও জ্বালা ধরিয়ে, ব্যথার বোঝা বাড়িয়ে তুলে, হৃদযমুনায় তুফান তুলে কেন তোমার নিজ সন্তানকে ভুলে দূরে সরে রয়েছ? কেন? কেন? কেন?

নিশীথ রাতেই হোক, প্রখর সূর্য্যালোকেই হোক, প্রত্যুষের স্নিগ্ধতাতেই হোক, সায়াহ্নের মায়াবী আঁধারেই হোক এই হৃদয় গোঙরানো আকুতি, এই বঞ্চিতের কান্না, নিপীড়নের অভিমান কখনও মুক্তাবিন্দু হয়ে নীরবে ঝরে পড়ে সাধকের কপোল বেয়ে কখনও বা পাগল করা বাঁধন হারা যন্ত্রণায় বিদ্ধ মন নিয়ে প্রার্থনা করে সে প্রাণের আকুতি নিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে নীরবে নিভৃতে সঙ্গোপনে বলে, "আর পারছি না ঠাকুর কোনমতেই তোমাকে ছেড়ে থাকতে," কখনও বা আবেশে আবেগে, আনন্দে, নানা ছন্দে বন্দনায় মেতে উঠে জানায় "ত্বমেব মাতাচ, পিতা ত্বমেব," কখনও বা বীর্য্যবান সাধকের পুরুষাকার নিয়ে সরোষে, অভিমানে, গর্জ্জনে, হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সাধক প্রশ্ন তোলে প্রাণের ঠাকুরের কাছে, "বল ঠাকুর কি আমার অপরাধ, কি দোষ করেছি আমি, জানিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও, দাও শাস্তি, দাও লাঞ্ছনা, দাও নিপীড়ন, কর যত পার তিরস্কার, যত পার ভর্ৎসনা, কিন্তু কভু আমাকে ছেড়ে দূরে থেকোনা। পারব না - পারব না ছেড়ে থাকতে, পারব না বিরহ সহ্য করতে, পারব না তোমার ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছেদের দুঃখে নিমজ্জিত হতে, পারব না তোমার এক মুহুর্ত্তের জন্যেও আড়ালে থাকার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে। পারা সম্ভব নয়-কারণ আমার সর্ব্বাঙ্গ যে

তুমি, শুধু তুমি, শুধুই তুমি-তাইতো শুধু তোমার জন্য কাঁদছি।

এ কান্না, এ অভিমান, এ বিরহ যন্ত্রনা, এ তাপ, এ দহন, দয়িতার চিরদিনের সাথী। এ কান্না চিরন্তন - এ কান্না যুগান্তরের, এ কান্না ভালবাসার, এ কান্না কাঙালের, এ কান্না বোবা কান্না, এ কান্নার ঢেউ প্রেমসাগরের, এ কান্নার বেগ ভক্ত হৃদয়ের অকুল পাথারের, এ কান্নার জল পড়ে না মুক্তো ঝরে, এ কান্নায় দয়িতার টনক নড়ে, এ কান্না তাই কজন কাঁদে? শুধু সেই, যে পড়ে তারই প্রেমের ফাঁদে।

"এ কান্না ঈশ্বরীয় লীলা
এ কান্না প্রেমের খেলা"-

এ কান্না কেঁদেছিল বৃন্দাবনের রাধা, এ কান্না গোপিনীদের সাধা। মধু বৃন্দাবনের নীলযমুনার নীলসায়রের অতলে এ কান্নার খোঁজ পাওয়া যায়, নিঝুমরাতের তমালবনের অদূরে গাছগাছালির ফিসফিসানিতে এ কান্নার চাপা স্বরের সুর শোনা যায়, এ কান্নার রেশ দেখা যায় বৃন্দাবনের পথে-প্রান্তরের গৈরিক ধূলিকণায়, এ কান্নার অনুভূতি পাওয়া যায় সাধকের হৃদি বৃন্দাবনের মন যমুনার তীরে তীরে।

সাধকও তাই কাঁদে — কাঁদে তার দয়িতের জন্য, কাঁদে সর্ব্বস্ব ছেড়ে সর্ব্বস্বকে ধরার জন্য। আর লিখে চলে তার জীবনের দিনলিপি, হৃদয় নেঙরানো কথা দিয়ে রচনা করে কখনও কখনও সাত্ত্বিক পথে সত্ত্বের মধ্যে বাস করেও ক্ষণিকের ত্রুটি বিচ্যুতির ইতিহাস, দেহ দেউলে বাস করে দেহধারীর ভুলের মাসুলের মধ্যে দিয়ে অনন্য জয় পরাজয়ের কাব্য কথা - যা চিরদিন বাঙ্ময় হয়ে বিরাজ করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, অখন্ড মন্ডলাকার সাধনার অখন্ড দলিল হয়ে, প্রেমের পূজারী তার অন্তর্দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলবে, "তোমার প্রেমে এত বাধা, তোমার প্রেমে এত উন্মাদনা, যা হরণ করল মহাপ্রভুর চেতনা?" মহাপ্রভুও নাকি এমনি করেই কেঁদেছিলেন একদিন।

মহাসমুদ্রের নীল জলে নব নীরদ জলধর শ্যামমূর্ত্তির রঙের রঙীন মনে অবহেলায় মহাপ্রভু ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার বুকে, চিরসাধনের রাজ্যে প্রবেশ করে মৃত্যুহীন জীবন লাভের প্রত্যাশায় মৃত্যুঞ্জয়ের মোক্ষরাজ্যে।

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের স্মৃতি জাগতিক ইতিহাস লেখে আত্মাহুতি — সাধকের চোখে হয়ে রইল চির বিরহীর মিলনগীতি, দয়ির-দয়িতার মিলন স্মৃতি।

এই মিলন স্মৃতি, তাই আজও জড়িয়ে আছে তমসার কূলে কূলে, পথে - প্রান্তরে, বনে, উপবনে, দুর্গম গিরি কন্দরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যেখানে শবরী রয়েছে চিরপ্রতিক্ষার দিনগুণে চিরদয়িত রামচন্দ্রের আগমনের মুহুর্ত্তের অপেক্ষায়, অধীর আগ্রহ নিয়ে। দিন গেছে, মাস গেছে, গেছে বৎসর কত না দুঃখের কত না কান্নার কত না বেদনার মিলেছে অবসর, তবু হয়নি তবু আসেনি, তবু দেখা মেলেনি প্রভুর। অবশেষে দিনের পর এসেছে রাত, প্রভু একদিন দেখা দিয়েছেন হঠাৎ, হয়েছে তার প্রতিক্ষার অবসান, ঢেলে দিয়েছে মন প্রাণ প্রভুর চরণে, হাতে নিয়েছেন শ্রীফল, প্রভুর জন্য প্রতীক্ষার ফল দানের আনন্দে, নিবেদনে নিবেদনে আপ্লুত নয়নে, শ্রীফল প্রদানে কৃতকৃতার্থ সাধিকা দয়িতের করুণায় শ্রীদেহলাভে ধন্য হয়ে প্রবেশ করেছে শ্রীধামে। জন্ম জন্মান্তরের সাধনার হয়েছে অবসান। দয়িত দয়িতার মিলনে তমসার তীরে হয়েছে পুণ্যধাম। ভবিষৎ প্রজন্ম গেয়েছে গাইছে, গাইবে তাঁর জয়গান, চিরকাল চিরদিন।

সীতা জনক নন্দিনী, পূর্ণ ব্রহ্মাবতার দেহধারী রামচন্দ্রের ঘরণী রাক্ষস দেহধারী লঙ্কেশ্বর রাবণের অপহৃতা কামিণী, দাক্ষিনাত্যেরও বহুদূরে অশোকবনে বন্দিনী থেকে এমনই ভাবে কেঁদেছিল, আঁখিপাখী বিদ্ধ করা দয়িত শ্রীরামচন্দ্রের বিরহানলে দগ্ধ হয়ে। কঁদতে তো

হবেই, কান্নাই তো মিলনের যোগসূত্র। তাই উৎপীড়িতা সীতার, অত্যাচারিতা সীতার চোখের জল ইতিহাস হয়ে আছে। একদিন আর্য্য অনার্য্য যুদ্ধের হয়েছে সমাপন, কবির কাব্যে গাঁথা হয়েছে রামায়ণ, নির্বংশ হয়েছে রাবণ।

এই কান্নার কোন শেষ নেই, বিরাম নেই। যুগে যুগে তাই সাধক কেঁদেছে তার ইষ্টের বিরহে, দয়িত দয়িতার বিরহে। কেউ হারিয়ে কেঁদেছে, কেউ পাওয়ার আনন্দে কেঁদেছে, কেউ পেয়ে হারিনোর বিরহ জ্বালায় অস্থির হয়ে কেঁদেছে, কেউ বা কেঁদে কেঁদে অপরকে কান্নার সুযোগ দিয়ে গেছে।

জাগতিক ভাবে বোধ হয় এমনই কান্না নিজে কেঁদে আমাকেও কান্নার সুযৌগ দিয়েছিল মোক্ষদা। ঘরণী হয়েও ঘর না পাওয়ার জ্বালায় কেঁদেছে, নিজে মা না হলেও হাজারো সন্তানের মা হওয়ার আনন্দে কেঁদেছে, বরণীয়া হয়ে উপেক্ষণীয়া হয়ে কেঁদেছে, সবই কিন্তু গোপনে, অতি সঙ্গোপনে। আবার সর্পকে রজ্জু ভেবে ভুলের মাশুল দিতে কেঁদেছে সেই সাপেরই ছোবল খেয়ে। মানুষটা আজ নেই, চলে গেছে বহুদূরে, রেখে গেছে তার বিষণ্ণ দিনের স্মৃতি, তার চোখের জলের ইতিষাস, অনেকের চোখে জল ঝরাবার মন্ত্ররূপে।

এমন কান্না বোধহয় লৌকিক চক্ষে আমিও একদিন কেঁদেছি। জাগ্রতে নয় অনুভবে, বিরহে নয় কৃতজ্ঞতার মোড়কে, প্রেমের জোয়ারে ভেসে নয়, বিবেকের কশাঘার সহ্য করতে না পেরে। মনটা যেন বার বার স্বীকার করতে চায়, হ্যাঁ কেঁদেছিলাম নিশ্চয় কেঁদেছিলাম, নইলে যে গুরুবাবাকে ভয়ে কথা বলতে পাড়তাম না, তাঁর মুখের উপর সেদিন কি করে অমন করে বলেছিলাম, "হ্যাঁ বলব, অন্ততঃ একজনকে বলব" - সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে বোবা কান্নার গল্পটা বলছি —

☞ সপ্তম ক্রিয়া প্রাপ্তির আখ্যান

সেদিন সকাল থেকেই হরতাল। এমনভাবে সারাদিন চলছে যে লোকজন রাস্তায় প্রায় নেই বলাযায়, ট্রাম, বাস, ট্রেন সব যানবাহন চলাচল বন্ধ, শুনশান অবস্থা। স্তব্ধ প্রকৃতি, স্তব্ধ চারিধার। মনে জাগে শুধু গুরুদেবের অদৃশ্য আহ্বানের অলৌকিক পরশ, বিহ্বলতায় ভরে ওঠে মন — কখন কেমন করে দিবসেও প্রায় অন্ধকার সেই দুর্যোগময় দিনে আমার দেহটার স্থূল উপস্থিতি ঘটেছে গুরুদেবের গৃহে হাওড়ার বাড়ীতে - কিন্তু শূন্যতা সেখানেও, নেই কোন একজন ভক্তের উপস্থিতি, শুধুমাত্র গুরুদেব ও বুজি ও সন্দীপ ছাড়া। চমকে উঠেছে বাবার সেবক অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে বুজি, ঐ ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের মধ্যে বাড়ী থেকে বার হতে মানা পরিস্থিতিতে আমাকে সশরীরে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অক্ষত শরীরে — স্বাভাবিক ভাবে কিশোর মনে বিস্ময়ের ছোঁয়ায় প্রশ্ন এসেছে এ কেমন করে সম্ভব - এই দুর্য্যোগে কুকুর শেয়াল ও যেখানে গর্ত্ত থেকে বাঁচার জন্য বের হতে পারে না বলা যায়, কেউই বাইরে বেরোয় না, সেখানে একজন দেহধারী মানুষ বালি থেকে কোথায় হাওড়ার এই টিকিয়াপাড়ার বাড়ীতে কিভাবে হাজির হল? বিশেষে যেখানে কোন যানবাহনের চলাচল নেই? চোখ বড় বড় করে আমার আপাদমস্তক ভালভাবে দেখে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আর না থাকতে পারে জিজ্ঞাসা করে বসেছে, "এ কি কাকা? কি করে এলে? কখন এলে?" প্রশ্নটা করেও যেন আরও কিছু বলতে চাইছে, পারল না, এমন একটা ভাব। বুঝলাম কিশোর আমার উপস্থিতিতে কোন অলৌকিকত্বের স্পর্শ পেয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সবসে আচ্ছা নীরব থাকা - বাবার নির্দ্দেশও তাই, বলেছিলেন, "সব কিছু দেখবে, জানবে, চুপ করে থাকবে। মৃদু হেসে কোন কিছু না

বলে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছি। বাবা বুজিকে গঙ্গাজল আনতে বলেছেন, ঘর বন্ধ করে বাইরে থাকতে নির্দ্দেশ দিলেন দেখলাম। তারপর বাবা কৃপা করে কাছে বসিয়ে সেইদিন সেইক্ষণে আমাকে সপ্তম সোপানের ক্রিয়া দান করলেন এবং কখনও যা বলেন না - বললেন, কাউকে বলো না।''।

আর মজাটা হোল সেখানেই। কোনদিন আমিও যা বলিনা, করিনা, সেদিন তাই করে বসলাম। বাবাকে বললাম, ''একজনকে শুধু বলব বাবা।'' বাবা বললেন, ''কাকে?'' আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম, ''আপনার বৌমাকে''। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন ''কেন কি করেছে সে?'' উত্তর দিয়েছিলাম, ''সে আমার জীবনে ক্রিয়ার উন্নতির জন্য সব কিছু স্বার্থত্যাগ করেছে, সে না থাকলে আমার ক্রিয়াই হোত না, ক্রিয়া করতেই পারতাম না আমি''।

বাবা মৃদু হেসে বলেছিলেন, ''ওঃ! তাই নাকি? তাই নাকি? বাবারা তার মঙ্গল করুন, বাবারা তার মঙ্গল করুন।''

সেদিন বুঝিনি কিছু, ভাবিওনি কিছু যে কেন ঐ কথা বাবা বললেন, কেন আমিও বাবার মুখের উপর এমনভাবে সাহস করে স্ত্রীর গুণপনার কথা বলতে পেরেছিলাম। আজ বুঝছি কেন পেরেছিলাম ও ভাবে বলতে। কেনই বা বাবা আমাকে, নূতন ক্রিয়ান্বিতকে যেমন ক্রিয়ার কথা বলতে নিষেধ করা হয় সেভাবে সপ্তম সোপানের ক্রিয়া পাওয়ার সময়েও ঐ নিষেধ বাণী স্মরণ করিয়েছিলেন। প্রত্যেক ব্যাপারেরই কার্য্য কারণ একটা সম্পর্ক বোধহয় আছে।

নইলে যে মানুষটার উপস্থিতিই সেখানে নেই, যার কথা ক্রিয়াদানের মধ্যে আসতেই পারে না, বাবা হঠাৎ, বোধহয় আশীর্ব্বাদ করার ইচ্ছা করেই একটা কথা বলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন, যার ফলে আমারও মুখে ঐ প্রশংসা সূচক, বলা ভাল, মনেতে লুকিয়ে রাখা কৃতজ্ঞতার কথাগুলো বেরিয়ে এলো, মানে বাবাই দয়া করে বার করে নিলেন। নচেৎ মুখ ফুটে কোন দিন সে তো কিছু চায়নি আমাদের কাছে, বাবার কাছে তো দূরের কথা, আমার কাছেই চায়নি কিছু, কখনও, কোনদিন, অথচ সে না চেয়েই সব কিছু পেয়ে গেল, যা এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। পেয়ে গেল আমার গুরুদেবের মহামূল্য আশীর্ব্বাদ। আর তার নারীজীবনের চরম স্বীকৃতি আদায় করল লৌকিক স্বামীর অর্থাৎ আমার কাছ থেকে। এই জন্যই বোধহয় বলে "চাইলে ঠকতে হয়, না চাইলে ঈশ্বর ছাপ্পড় ফুঁড়ে দেন"।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেবের সঙ্গে আজ কিন্তু আমিও বলছি "তার আত্মার সদগতি হোক, তার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

পাঠক এই কাহিনীর কারণ নির্দ্দেশ বা নামকরণ কি করবেন। শ্রদ্ধার কাহিনী, ভালবাসার ফল, গুরু সেবার গল্প?

আমি কিন্তু নাম দিয়েছি "বোবা কান্না"।

"জয়গুরু জয়গুরু জয় দে,
জয়ী হবি, জয় দে।"

* * * * * * * * * *

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফেলে আসা দিনগুলি মোর

গুরুদেবের কত বৈচিত্র্যময় লীলা তিনি যে আমাকে দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন বলে শেষ করা যাবে না। কারণ তিনি এক, আবার অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মান্ড ব্যাপী হয়ে অনন্ত রূপধারীরূপে অনন্ত খেলা তিনিই খেলতে পারেন। যা আমাদের মত সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাঁর কোন খেলা বুঝতে যাওয়া বা তাঁর কোন খেলার সংশোধনী আনা অথবা তাঁর কোন আদেশ বা প্রত্যাদেশ অবহেলা করা, অবমাননা করা যে কত বড় মূর্খামি বা অপরাধ তা বলে শেষ করা যায় না। এক কথায় বলা যায়, তাঁর কথা চুপচাপ শোনা, যথাসাধ্য তাঁকে স্মরণ করে আদেশ পালন করা, কোন প্রশ্ন করলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দানে তুষ্ট করা, যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করা, সবশেষে বলা ভাল তাঁকে তুষ্ট রাখাই শিষ্যের কাজ। কারণ অন্য যেই হোক রুষ্ট হলে গুরুদেব রক্ষা করেন কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হলে ব্রহ্মার কমন্ডলুতে আশ্রয় নিলেও রক্ষা পাওয়া যাবে না। তাঁর মনুষ্যের মত দোষ, গুণ, আচার, আচরণ গতিবিধি দেখা গেলেও তাঁর উপর মনুষ্য বুদ্ধি আরোপ করা উচিত নয়। কারণ সদগুরুর কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা সব কিছু সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত - স্থিরত্বের দ্বারা স্থিরীকৃত, ইষ্টের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, তাই দেহটা— উপরের খোলসটা মনুষ্যরূপী হলেও, কাজ করে চলেছে খোলসের ভেতরের বাসিন্দা যে সর্ব্বব্যাপী, সব জায়গাতেই বিরাজমান। তাই তার কাজের কোন ভুল হয় না, বিচারে কোন ত্রুটি ধরা যায় না, তার মধ্যে অসম ভাব বা বিপরীতভাব নেই। তিনি সকলের কাছে সমানভাবে অবস্থান করেন, সমান চোখে দেখেন, সমান ভালবাসেন আবার সকলের দোষ ত্রুটি

ᐧাশীল চোখে উপেক্ষা করেন। কখনও প্রয়োজনে মৃদু মধুর শাসনে, কখনও তোষণে, কখনও উদার হাতে কাম্য বস্তু প্রদানেও তাঁর কার্পণ্য নেই। তাঁর বিচার অভ্রান্ত, কোন দ্বেষ বা হিংসার স্থান বা তোষণের অবকাশ নেই। সেই মালিক তাঁর সেবকের কোন মজুরী বাকী রাখেন না, ভুলের পসরা নিয়ে জীবনের ফেরীঘাটে হাজির হয়ে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করলেই, তাঁর কাছে আত্ম নিবেদন করলেই ক্ষমা করেন। শুধু ক্ষমা নয়, আপনবোধে কাছে টেনে নেন। কিন্তু আমরা যে অজ্ঞানতায় ডুবে থাকি, যে অন্ধকার চোখে তাঁকে দেখি, যে কামনা বাসনা জীর্ণ মনে তাঁকে ডাকি তা দিয়ে আমরা কি ভুলই না করে বসি। সদগুরুকে আমাদের মত দেহধারী মনুষ্য বোধে না করি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, যদিও বা করি ভাবে নয় ভয়ে। যথাযথ উপদেশ বা আদেশ পালন করি না যদি করি তবে কিছু প্রাপ্তির আশা নিয়ে। তাঁর কথার বিচার মুখে না বললেও, প্রতিবাদী না হলেও, মনের গোপনে প্রশ্নকে জিইয়ে রাখি অতৃপ্ত মন নিয়ে। সংশয় প্রকাশ মুখে না করলেও মনের ভিতরে সেটা যেন অহরহ খচ্‌খচ্‌ করে। মিথ্যা ভয়ে জর্জ্জরিত হয়ে সম্মুখে কিছু বলতে সাহসী না হলেও, চোখের আড়ালে তাঁর দৃষ্টি বা তাঁর উপস্থিতি সর্ব্বময়, তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বময়, তাঁর খেলা বোঝা এত সহজ নয়, তাঁর কথা বুঝতে হলে সহজিয়া হতে হয় — তাই তোমাকে অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাতে হবে, তিনি যেন তোমাকে তাঁর চরণে রেখে তোমাকে তোমার ধর্ম্মজীবনে অটল, অদম্য করে রাখেন। তাঁর চরণে সুগভীর প্রেম জাগ্রত করেন, তিনি যেন তোমাকে অহংকার, যশোলিপ্সা ও দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত করেন। বৃথা অহংবোধ, সম্মান— প্রশংসা, মানুষের আত্ম উন্নতির পথে প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করে। তিনি যেন কৃপা করে সব বাধা দূর করে শুধু তাঁরই বোধ তোমার মধ্যে জাগ্রত করেন, তোমাকে যেন শান্ত করেন, তোমাকে যেন সকলকে ভালবাসার শক্তি দেন, তোমার মধ্যে যেন ঐক্যের বীজ বপন করেন। কে কতখানি ছোট জানাতে না দিয়ে কে কতখানি বড় তা যেন তাকে শোনাতে দেন।

☞ চতুর্থ ক্রিয়া প্রাপ্তি

তৃতীয় ক্রিয়া থেকেই কত না বিচিত্র অনুভূতি দয়াল গুরুদেব অন্তরে এনে দিয়েছিলেন, কত না বৈভবে ক্রিয়া করিয়ে অন্তঃরাজ্যের গুপ্তধন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কত না অনুভবে ভবসাগর তরণের বাস্তব রূপ দেখিয়ে জন্ম সার্থক করেছিলেন বলে শেষ হবে না। সমস্তই কত না মধুময়। বাইরের জগতে আর অন্তর জগতে কত ফারাক তাই ভাবি। অন্তর জগৎটা তখন সুনীল আকাশের দিগন্ত বিস্তারে মনে কামনা জাগাত। দিনরাত চোখ বুজেই থাকি - এরই মধ্যে বাবা ঘোষণা করলেন আমাকে চতুর্থ ক্রিয়া দান করবেন। সত্যি কথা বলতে কি এতে আমার আনন্দ যে হয়নি তা নয়। তবে যতটা উচিত ততটা হয়নি। কারণ আমার তখনই অর্থাৎ তৃতীয় ক্রিয়াতেই সদা সর্ব্বদা মনে হোত যেন শরীরটা আমার জ্বলে যাচ্ছে - পুড়ে যাচ্ছে দেহের ভিতরটা সদা সর্ব্বদাই। মনে অন্য কোন চিন্তা স্থানই পেত না। দয়াময় গুরুদেব একদিন হঠাৎই বললেন, "বিষ্টু তুমি এই চতুর্থ ক্রিয়াটা অতি সহজেই উত্তীর্ণ হবে কোন সন্দেহই নেই। তবু বলছি, এতেও কষ্ট আছে কিছুটা, তবে তৃতীয় ক্রিয়ার মত নয় একটু অন্য ধরণের কষ্ট"। ব্যস্! আমার মনে চিরদিন যা হয়ে এসেছে চাপল জিদ্, চাপল গবেষণা করার ইচ্ছা। খালিই ভাবছি কি ধরণের কষ্ট হতে পারে? কি কৌশলে, ঐ যে বাবা বলেছেন অন্য ধরণের কষ্ট সেটাকে জয় করে ক্রিয়াটা করা যাবে, এই শুধু চিন্তা করছি দিনরাত। ক্রিয়ার ব্যাপারে কারও সঙ্গে কখনও আলোচনা করতাম না। কেউ অনুভূতির কথা জানতে চাইলে বা নিজেদের মধ্যে বলা বলি করলেও বিরক্ত বোধ করতাম। একমাত্র বাবা যখন জোর করে বলাতেন তখন ছাড়া এ সমস্ত ব্যাপার কখনই কারও সঙ্গে কোনপ্রকার আলোচনাই করতাম না। তাও বাবাকে বলতাম সংক্ষেপে যতখানি পারা যায় রেখে ঢেকে। কারণ মনে ভয় হোত এ সমস্ত অনুভূতির কথা বললে যদি ক্রিয়া রাগ করে, আর যদি এ রকম না হয়, আর

যদি ভালভাবে ক্রিয়া না করতে পারি। আরও একটা ব্যাপার মনে আসত। সেটা হোল, কেবলই যেন মনে হোত অপরে আমার চেয়ে কত ভাল ক্রিয়া করে, নিজের কথা বলব কি করে? তাই ভয়ে চুপচাপ থাকাটাই শ্রেয় মনে হোত। কিন্তু আজ বলছি - পাঠক বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সমস্ত ক্রিয়াগুলোর মধ্যে কি জানি কেমন করে ঘটত জানি না তবে ঘটত এটা নিশ্চিত যে প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে নিজস্ব কৌশল, নিজেই কি করে ক্রিয়াটাকে সহজে আয়ত্বে আনা যায়, কিভাবে ক্রিয়াটা সহজে করা যাবে, এই নিয়ে খুব ভাবতাম। আর তারই ফলে দেখেছি, যে কোন ক্রিয়া কৌশলগত ভাবে ঠিক আয়ত্বে এসে যেত। তৃতীয় ক্রিয়ার শেষে পরাবস্থায় চুপ চাপ বসে থাকতাম। সেই আবেশের মধ্যেই চতুর্থ ক্রিয়া তন্ময় ভাবে হয়ে যেত। বাবাও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেননি কোনদিন, আর আমিও কিছু বলিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন শুধু দেহত্যাগের কিছুদিন আগে, তৃতীয় ক্রিয়ার ব্যাপারে। আমার উত্তর শুনে বলেছিলেন,"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ"। তারপর বাবা আমাকে দিয়েই বিশেষ কয়জনের ক্রিয়া দেখাতেন। মনে উৎসাহ নিয়ে ক্রিয়া দেখতে গিয়ে দেখতাম ভুল পদ্ধতিতে ক্রিয়া করে যাচ্ছে আর তার ফলে তাদের শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। তাদের ভুল সংশোধন করার পর বাবাকে বলেছিলাম যে ক্রিয়াটা তো এই রকম হওয়া উচিত। ঐ রকম অর্থাৎ তারা যা করছে সেই রকম তো হওয়া উচিত নয়। সেই সময়ে বাবা উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। অবশ্য এর জন্য আমার মনে কোন অহংবোধ বা বিকৃতি আসেনি গুরুকৃপায়। গুরু কৃপাতেই ছিলাম, আছি, থাকব। সেই গুরু কৃপাতেই পরবর্ত্তী দিনগুলোতে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ক্রিয়া লাভ করেছি এবং তাঁর প্রদর্শিত পথেই সেই ক্রিয়াগুলো সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও নিজস্ব ঢঙ ও কৌশল অবশ্যই ছিল। বাবা কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দেখতাম আমার নিজের ক্রিয়া আর দেখতে চাইতেন না, বলতেন "ও তোমার ক্রিয়া দেখার কিছু নাই।" কেন বলতেন জানি না কিন্তু বলতেন ঐ কথাটা। যাই হোক, আমার

নিজের ক্রিয়ার ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক। যেটা আমি নিজে করতাম, তাহল একটা সোপানের ক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কিছুটা সময় আমি পরাবস্থায় থাকার চেষ্টা করতাম। তাড়াহুড়ো করে ক্রিয়া করাটা আমার ধাতে ছিল না, আজও নেই। তাই ওই পরাবস্থায় থাকতে থাকতেই প্রাণায়াম সুরু হয়ে যেতো, তারপর আপনা থেকে কুম্ভক হয়ে পরের ক্রিয়াটা সুরু হয়ে যেত আর আমর চমক ভাঙ্গত ক্রিয়াটা শেষ হয়ে যাবার পর। তখন যথারীতি মনে হোত এ আর কি হল? যাই হোক তারপর মহামুদ্রা শেষ করে কিছুক্ষণ আবার পরাবস্থায় থাকার চেষ্টা করে তবে আসন ত্যাগ করতাম। আর একটা কথা, ক্রিয়ার আসন আমার কাছে ছিল অতীব মূল্যবান বস্তু, অতিশয় প্রিয়। আমি নিজে আসন পাততাম, উঠাতাম ও অত্যন্ত যত্নকরে যথাযথ জায়গায় রেখে দিতাম। চতুর্থ ক্রিয়াতে তো আর দুইশত দিন সম্পন্ন করতে লাগে না, কারণ বাবা আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন কতদিন লাগবে সংখ্যা পূরণে। পরের ক্রিয়াগুলোর কথা মনে করলে বোধে আসে শুধু আনন্দ আর আনন্দ, স্থিরতার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করা আর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা। আমার ঘরের কাজের ব্যাপারে তখন কোন চিন্তার কারণই ছিল না। কারণ দাদা বাড়ীতে থাকতেন। ঐ সব ব্যাপার উনিই সামাল দিতেন। সংসারে আমার কাজ ছিল অফিস করা আর সামান্য কিছু, ওদিক আমাকে প্রায় দেখতেই হোত না। আর মোক্ষদার তরফে তো কোন বাধাই ছিল না। শূন্যতার মধ্যে যে এত আনন্দ বাইরের কোন কিছুর সাথেই তার তুলনা হয় না। যাকে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে থাকা যায় তা যে কি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সাধক সাধিকা যেন সাবধান থাকেন, যেন এ ভাব কখনও মনে না আসে যে মহামায়ার মায়া দুর্ব্বল হয়েছে বা তারা পিছন ছেড়েছে। মাঝে মাঝে তীব্র আক্রমণ থেকে সে কখনও বিরত থাকে না। সাধক সাধিকাকে অনেক সময় নিম্ন ভূমিতে নামতে হয়, তখনই প্রারব্ধ বশে ঐ মহামায়ার মায়া কাঁধে চেপে বসে, আর একবার চেপে বসলে, তাকে নামানো তখন

অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তাদের সর্ব্বদাই চোখ কান খুলে রাখতে হবে, যেন কখনও ক্রিয়ায় শৈথিল্য না আসে বা এমন ভাব না আসে যে আমার ক্রিয়া ভাল হচ্ছে, এমন কোন আত্মতুষ্টির ভাব। আর সবচেয়ে যে সর্ব্বনাশ ভাব সাধক সাধিকাকে বিপর্য্যস্ত করে, তা হোল এমন মনোভাব যেন কখনও মনে না আসে যে, আমি কাম জয়ী হতে পেরেছি। কারণ কাম এমন একটা ছদ্মবেশী রিপু যে সদা সর্ব্বদা আত্মগোপন করে থাকে এবং সাধুর ছদ্মবেশে রাবণের সীতা হরণের মত ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। মনে হয়ত বেশ উল্লাসের ভাব এসেছে - এসেছে আনন্দের জোয়ার, সেখানে অহংকারের আগমন হোল, ওটা অহংকারের মধ্যে ছদ্মবেশী কামশত্রু হাজির হল বুঝবে। যে কোন মূহূর্ত্তে অতর্কিত আক্রমণ ঘটাবে আর সাধক সাধিকার সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে। তাই এই ছদ্মবেশী কাম রিপু মরেও মরে না। তবে ক্রিয়া ঠিকমত করলে আর নিরন্তর গুরু স্মরণে কাম রিপুকে হতবল করে জয় করা যায়। **''গুরুকৃপাহি কেবলম্''** - গুরুই রক্ষক, গুরুই ভক্ষক। কামকে ভক্ষণ করান গুরু, সাধককে রক্ষাও করবেন তিনি। গুরুর দয়া হলে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়, হওয়া যায় জীব থেকে শিব। অনেক সময় গুরুদেব শিষ্যের সামান্য অগ্রগতির জন্য তার সমস্ত নির্দ্দিষ্ট ভোগ নিজের কাঁধে বহন করেন। প্রয়োজনে তাঁর জীবন, যৌবন, ধন, মান, সব কিছু রক্ষা করে থাকেন। কথায় কথায় প্রাণরক্ষার কথায় একটা বিশেষ ঘটনা মনে পড়ল। অবশ্য এই সমস্ত ঘটনা গুরুদেব নিয়তই করছেন, আমরা তাঁর সব কাজ অজ্ঞানে থাকার জন্য বুঝতে চাই না, বুঝি না। মন শুধু প্রাপ্তির পর একটু উদ্বেলিত হয় বা আবেগে উথলে উঠে পরক্ষণেই কামনা পূরণমাত্র আবার গুরুর প্রতি অনুরাগ, বিরাগ পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ দয়াল গুরুর মূল্যায়ন হয় কামনা পূরণের তাৎক্ষণিক রক্ষক বা আনন্দময় হিসাবে, বিশ্বাস আসে মূহূর্ত্তের জন্য যার বিনাশ হয় পরমূহূর্ত্তে, কৃতজ্ঞতা আসে ক্ষণিকের স্থায়িত্বে, বিলীনও হয় সাথে সাথে। এই তো গুরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, রক্ষাকর্ত্তার ছবি। তিনি যে গতি, ভর্ত্তা,

প্রভু, সাক্ষী, নিবাস ও একমাত্র শরণযোগ্য সুহৃদ সে কথা আমরা কজন ভাবি বা কতটুকু মনে করি অথচ দয়াল গুরুদেব সস্নেহ দৃষ্টিতে একটিবার মাত্র আমাদের আবেগপূর্ণ ডাকার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন। যাই হোক, প্রাণ রক্ষক গুরুর গল্পটাতে আসা যাক।

প্রাণরক্ষক গুরুদেব একদিন হঠাৎ দুপুরে কর্ম্মরত শিষ্যের উদ্দেশ্যে ঘর থেকেই চীৎকার করে উঠলেন, "মারিস না মারিস না, ওরে যোগেশ মারিস না ওকে, ছেড়ে দে! ছেড়ে দে! ও তো তোর কোন ক্ষতি করেনি, মানে করতে পারেনি - ছেড়ে দে ওকে।" যাকে ছেড়ে দিতে বলা হল সেটা একটা বিষাক্ত সাপ আর যার উদ্দেশে বলা হোল সে হচ্ছে আনুখালবাসী বাবার সেবক একজন, নাম যোগেশ দাস, যে কখনও কখনও হাওড়ায় বাবার বাড়ীতে মাঝে মাঝে এসে থাকত।

বাবার বাড়ীতে বাবার খাটের নীচে তখন টিন ভর্তি করে চাল রাখা হত। বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে চাল রোদে দিতে হয়, পাছে পোকা লাগে। প্রচন্ড বর্ষা, কয়েকদিন ধরেই আকাশে সূর্য্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। সেদিন রোদ উঠেছে দেখে, মায়ের আদেশে যোগেশ দাস চালগুলো টিন থেকে ঢেলে রোদে দিচ্ছে। দিচ্ছে বটে কিন্তু তার মনের আকাশে প্রচন্ড মেঘের ঘনঘটা, পুঞ্জীভূত অভিমান। কেননা যোগেশ দাস একজন চাষী লোক, মাঠে জল হচ্ছে, চাষবাস সুরু হবে অথচ সে কয়েকদিন ধরে বাড়ী যাবার অনুমতি চেয়েও পাচ্ছে না বাবার কাছে। বাবা বলেছেন ২/৪দিন থেকে পরে যাবি। ২/৪দিন পরে আবার গেছে, বাবা বলেছেন আরও ২/৪দিন পরে বলব। মন তার বাড়ীতে রেখে, দেহটাকে টেনে টেনে কোনরকমে গুরুগৃহে দিনযাপন করছে পরম দুঃখে। মা অনুরোধ করেছেন বাবা রাজী হননি। শেষে বাবার বড় ছেলে গোপালদাকে ধরেছে, গোপালদা

গিয়ে বাবাকে যোগেশ দাসের মর্ম্ম বেদনা জানিয়ে বলেছে, "বাবা যোগেশদাকে ছেড়ে দিলে ভাল হত, চাষী লোক, চাষবাস করে খায়, বর্ষা চলছে।" বাবা উত্তরে বলেছেন, "দেখি।" সেই দুপুরের আগেই ঘটেছে এই ঘটনা। চাল ঢালতে ঢালতে টিনের চাল শেষ হওয়ার পরও উপুর করা টিনের ভিতর খর খরানি শব্দ শুনে ইঁদুর ভেবে যোগেশ দাস ভিতরে হাত দিতে গিয়েও কোন অজানা নিষেধে হাত না দিয়ে টিনটা উপুড় করা অবস্থাতেই পুনরায় ঝাঁকানি দিতেই বের হয়ে এসেছে এক জ্যান্ত মাঝারি গোছের বিষধর সাপ। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ দাসের মাথায় দ্বিতীয় রিপুর ভর হওয়ার পূর্ব্বেই গুরুদেবের ঘর থেকে ঐ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে, যা পূর্ব্বে লেখা হল। আবার পরমূহুর্ত্তে যোগেশ দাসের উপর গুরুদেবের লীলা খেলার আরও একটা তাৎক্ষণিক আজ্ঞা জারী হয়েছে, "বেরো শালা, এখনই ভাত টাত খেয়ে বিদেয় হ, একমূহুর্ত্ত দেরী করবি না।" দয়াল গুরুদেব অসীম প্রজ্ঞায় শিষ্যের মৃত্যুযোগ জ্ঞাত হয়ে সকলের অলক্ষ্যে যোগেশের অভিমানের, ক্ষোভের কথা জেনেও সময়টা পার করে, বিপদ মুক্তি ঘটিয়ে, শিষ্যের জীবন রক্ষা করে, তাকে তার নিজবাসে ফেরৎ দিলেন। এমন দয়ার ঠাকুর এঁরা, এমনই অঘটন ঘটন পটিয়সী এঁরা।

এমনই এক ঘটনার কথা অর্থাৎ গুরুদেব কিভাবে কৃপা করেন বলা ভাল, তাঁর অহৈতুকী কৃপার দ্বারা কেমনকরে প্রয়োজনে শিষ্যের প্রাণ রক্ষা করে থাকেন, ভাবলে আমরা হয়ত সেই মূহুর্ত্তে অবাক হই, শ্রদ্ধায় নত হই, কিন্তু পর মূহুর্ত্তে আমাদের সে ভাব, সে চেতনা টেকে কোথায়? টেকে না। কিছুক্ষণ পরেই আবার স্বভাবে ফিরে গিয়ে গুরুদেবকে দেহধারী সাধারণ মনুষ্যভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর আদেশ পালনে তৎপর না হয়ে, তাঁর প্রতি মনুষ্যবোধ আরোপ করি।

বেলের অমর ঘোষালও নাকি গুরুকৃপায় একইভাবে সর্পাঘাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দয়াল বাবা তাকে কাছে

ডেকে নিয়ে নিজের হাতে সাপটার পূর্ণাঙ্গ ছবি ও চিত্র বিচিত্র দাগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দ্যাখ্ তো সাপটার গায়ে এই দাগ ছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি! শুধু তাই নয় ডানহাতটা গণ্ডুষের ভঙ্গিমায় তুলে তাতে থু থু করে থুতু দিয়ে অমরের মুখের সামনে হাতটা ঘুরিয়ে নিয়ে পরে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ফেলে বলেছিলেন, ''যাঃ! তোর বিপদ কেটে গেল।'' এমনই দয়ার সাগর এঁরা। এঁদের অসাধ্য কিছু নেই।

বিপরীত ভাবে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অহংজ্ঞানে গুরুদেবের জাগতিক শিক্ষা কম ভেবে তাঁকে ছোট করে নিজে বড় হওয়ার একটা প্রবণতার চিত্র এখানে তুলে ধরলে মনে হয় অযৌক্তিক হবে না। আমরা সবাই প্রায় একইভাবে গুরুদেবকে দেখতে অভ্যস্ত হলেও এই ঘটনাটা একদিকে শিষ্যের শিক্ষার দম্ভে গুরুর প্রতি অসম্মান ও অন্যদিকে দয়াল গুরুর ভ্রূক্ষেপ বিহীন দৃষ্টিতে ক্ষমা ও উদারতার সাক্ষ্য বহন করছে, তাই এই অনুলিপি লেখনের লোভ সংবরণ করা গেল না। কাউকে আঘাত করা বা ইঙ্গিত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। বাবারই আদেশে কোন এক ক্রিয়ান্বিত ক্রিয়া দেখতে গেছে কোন এক গুরুভ্রাতার বাড়ীতে। গুরুভ্রাতাটি কোন এক হাই স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক। ক্রিয়া দেখাকালীন হরিনাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ আসায় আদেশ প্রাপ্ত সেবক বলেছে ''হ্'' শব্দের অর্থ মহাদেব। শিক্ষক ভ্রাতাটি জিজ্ঞাসা করেছে ''কোথায় দেখেছেন?'' আদেশ প্রাপ্ত ভাইটি জবাবে বলেছে, ''বাবার কাছে জেনেছি, উনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, কখনও মিথ্যা বা বেঠিক অর্থ করবেন না।'' কিন্তু জাগতিক শিক্ষক জাগতিক প্রমাণ খোঁজে। আদেশপ্রাপ্ত ক্রিয়ান্বিত ভাইটি বাবার কাছে সব বলতেই বাবা সন্দীপকে দিয়ে ডিক্শ্নারী খুলে অর্থটি দেখিয়ে পুনরায় তাকে ঐ ভদ্রলোকের বাড়ী ১৫দিনের মাথায় যেতে আদেশ দিলেন এবং তাকে ঐ ভদ্রলোককে বলতে বললেন, ''তুই গিয়ে আমার নাম করে বলবি, বাবা তোমাকে বলতে বলেছেন, কোন ইস্কুলে পড়ছস্?

তোমার মত ২/৪টা এম.এ বাবার কাছে তৈরী হয়''। গুরুভ্রাতা পুনরায় তার বাড়ী গিয়ে তাকে যথারীতি বাবার কথাগুলো নিবেদন করা মাত্র ঐ শিক্ষিত মন, গুরুর বিরুদ্ধে রাগতস্বরে বলেছেন, "তাই নাকি? আপনি যান্, আমি ক্রিয়া দেখাব না।'' "আমারও বয়ে গেছে যাঁর ক্রিয়া তিনি দেখবেন'' বলে আদেশপ্রাপ্ত ভাইটি তার বাড়ী থেকে ক্ষুণ্নমনে ফিরে এসে যথারীতি বাবাকে সব বলার পরও বাবা বলেছেন, "শালা! ক্রিয়া দেখাবি না? যাবি কোথা? জাল ছেড়ে পালাবি হোথা, পুকুর ছেড়ে যাবি কোথা? শালা! ক্রিয়া দেখাবে না? পাছায় বেঁধে এমন টাঁসন দেব না! ক্রিয়া দেখাতে পথ পাবি না''! যথারীতি সেটাই হয়েছিল, ঐ অহংকারী মনের মালিক শেষে বাধ্য হয়ে চোখের জলে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিল, আর বাবাও পুনরায় তাঁর সন্তানকে শাসন করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। এই তো হয়। এই তো আমাদের অনেকেরই গুরুভক্তির নমুনা, অনেকেই আমরা এই পথের পথিক! গুরুদেবের সামান্য তিরস্কারে মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমে, মনোমত কথা না শুনলে অভিমান আসে, আর একটু কোলে টানার ছল করলে গুরুদেবের কোল ছেড়ে কাঁধে, কাঁধ থেকে মাথায় চেপে বসতে চাই তাঁকে সাধারণ দেহধারী মানুষ ভেবে। এই কাহিনী তাই শিক্ষার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল। এ কাহিনী আমাদের মনের ভিতরের চিত্ররূপ। এ কাহিনী চিরন্তন সত্য। এ কাহিনীর উল্লেখ অধ্যাত্ম জগতের পথিকের প্রতি সাবধান বাণী স্বরূপ। চতুর্থ ক্রিয়াতে আকাশের বিস্তারের পরিধি তৃতীয় ক্রিয়ার থেকে অনেক বেশী জাগে। আর হৃদয়ে জাগে এক অপরূপ প্রশান্তি। ঐ ভাবেই মহা আনন্দে দিন কাটছে, সদা সর্ব্বদা বাহ্যভাবে বাবার কাছে থাকার ইচ্ছা জাগছে। নামে মাত্র দেহটা পড়ে থাকছে অফিসে। মনটা পড়ে থাকে বাবার কাছে, ফলে যা হবার তাই হতে লাগল। কাজে সব সময় ভুল হচ্ছে আর সহকর্ম্মী দাদারা সস্নেহ ভৎর্সনা করছে। কিন্তু তাতেও আনন্দ ও তৃপ্তি। 'কুছ পরোয়া নেই' জীবন ধারা চলছে, খালিই মনে হচ্ছে বাবার সঙ্গ করতে, ক্রিয়াও করছি, দর্শনের

অনুভূতিও আসছে, সেদিকে কিন্তু আমার আগ্রহ নেই। ছিলও না কোন কালেই। বাবা বরং অনেক সময় বলেছেন, "বিষ্টু! সমস্ত অনুভূতিগুলো লিখে রেখো।" বাবাকে উত্তর দিয়েছি, "বাবা! সময় কোথায়?" সত্যি বলতে কি অনুভূতি দর্শন বা বিভূতি দর্শনে আমার কোনকালেই রুচি ছিল না। একমাত্র রুচি, আগ্রহ যা কিছু বাবার সঙ্গলাভের জন্য। বাবাকে বলতাম, "বাবা, আমি অভাবী দিন মজুর, আমার দিনটা চলে গেলেই হোল। ও সমস্ত আর কিছু হয়ও না, আর লেখার সময়ও নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন"। কিন্তু সত্য দ্রষ্টা পুরুষের বাণী কি মিথ্যা হবে? তখন কি ছাই বুঝেছি যে বাবার ভিতর কি আছে? আজ বুঝছি, কত গভীর দূরদৃষ্টি নিয়ে বাবা আমাকে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন? তখন ও সব চিন্তাও করিনি। আজ চিন্তা জাগছে, জাগ্রত চিন্তা - মনে জাগছে অবহেলার যন্ত্রণাবোধ, অন্যায়বোধ, অপরাধ বোধ। কী ভীষণ অন্যায় করেছি তাঁর কথা অবহেলা করে। দুনিয়ায় আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ জন, আপনার জন, ক্রিয়ার মতই গভীর মিষ্টি লোকের কথাগুলো দুষ্টামি করে না শুনে চলার অতৃপ্তি বোধ — ভাষার দক্ষতা নেই বলে সেই মিষ্টিকে উপযুক্ত বিশেষণে ভূষিত করার অক্ষমতাবোধ। যাই হোক, চতুর্থ ক্রিয়ার সংখ্যা পূরণ নির্দ্দিষ্ট দিনেই হয়েছিল বাবার দয়ায়। আর স্থিতি যা হবার কথা তার চাইতে বেশী ছাড়া কম হয়নি সেও বাবারই দয়া। নচেৎ আমার কি সাধ্য? আমার ক্রিয়াতে বাবা অত্যন্ত তুষ্ট হলেন, বলতে পারি। এও তাঁর নিজগুণে কৃপা করা ছাড়া কিছু নয় মনে করি। যথারীতি চতুর্থ ক্রিয়া চলছে - তবে নূতন আস্বাদ এমন কিছু যে বুঝতাম তা নয়, অবশ্য তার জন্য কোন চিন্তাও মনে কিছু আসত না। তবে এটুকু অবশ্যই বলতে পারি যে প্রথম প্রাণায়াম করে আমার আশা মিটত না। ভীষণ ভাল লাগত প্রথম প্রাণায়াম করতে, আজও তাই লাগে।

☞ পঞ্চম ক্রিয়া প্রাপ্তি

এই রকম যখন চলছে, চতুর্থ ক্রিয়া সংখ্যা পুরণ হয়ে গেছে, এমন সময় বাবা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আকাশের প্রকাশ কতটা হয়েছে? আমার উত্তরে বাবা শুধু বললেন "বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে"। এর ঠিক এক বছরের মধ্যে বাবা আমাকে পঞ্চম সোপানের ক্রিয়া দান করলেন কৃপা করে। তখন একটা রেওয়াজ ছিল উপরের ক্রিয়া পেলেই গুরুভ্রাতাদের মিষ্টি খাওয়ানো - আর আমার ওই মিষ্টি মানুষের মিষ্টি ব্যাপারটা আরও মিষ্টি লেগেছিল। সেই ব্যাপারটা বলা যাক্।

ভীষণ মজার ব্যাপার ছিল সেটা। বাবা আমাকে পঞ্চম সোপানের ক্রিয়া দিয়ে বললেন কাউকে বলোনা - এদিকে বাবা আমাকে ঐ কথা বলে, নিজেই অন্যান্য গুরু ভ্রাতাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। খুব মজা করে সবাই মি্ষ্টি খেতে চাইছে, আমি তো অবাক! কি করে জানল? আমি তো কিছুই কাউকে জানাইনি। এদিকে বাবা আবার আমার সামনে মিষ্টির দাবীদার গুরুভ্রাতাদের বলছেন, "আহা ও মিষ্টি খাওয়াবে কেন? ও কত খেটেছে বল? ওকে তো তোমাদেরই মিষ্টি খাওয়াবার কথা।" কি রসময় পুরুষ, তাই ভাবি, রসসৃষ্টি করার জন্য নিজেই সাপ হয়ে কামড়াচ্ছেন, আবার নিজেই ওঝা সেজে বিষ ঝাড়ছেন। যাই হোক এমনি মিলন মধুর স্মৃতিতে ভরা দিনগুলোতে খরচ তো অবশ্যই কিছু হোত। কিন্তু আজ যেন সে দিনগুলো একজন দেহধারীর অনুপস্থিতিতে আমার জীবনে চিরদিনের খরচের খাতায় উঠে গেছে। মন আজ ফিরে ফিরে চায় সেই সুখ স্মৃতির দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে। স্মৃতি বড় বেদনার। কিন্তু স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে মনের গভীর থেকে - উঠে আসে বিষাদের কালিমা, ক্ষণিকের জন্য হলেও ঘুচিয়ে দিয়ে ক্ষণিক সুখে সুখী

করতে, উঠে আসে অন্ধকারময় জীবনে ক্ষণিকের আলোক বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে উজ্জ্বল আলোর পথে মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য সন্তরণ করাতে। নইলে দেহের বৃত্তি রক্ষা হয় না । দেহধারী হলে দেহের ধর্ম্ম পালন করতেই হয়, সব মহাপুরুষকেই করতে হয়েছে। আমাকে পঞ্চম ক্রিয়াদানের দিনই দয়াময় বাবা যে সমস্ত দাদারা পঞ্চম ক্রিয়া করতেন আমার ঐ ক্রিয়া পাওয়ার সময় থেকেই, তাদের কৃপা করে ষষ্ঠ ক্রিয়া দান করলেন। গুরু বাবার কৃপায় আমি তাদের ছুঁয়ে ফেললাম তবে এর জন্য আমার মনে কোনরূপ বিকার দেখা দেয়নি। - এটাও কিন্তু গুরুকৃপা, তার কৃপা ছাড়া এ কুহক এড়ানো মুসকিল।

☞ পঞ্চম ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব

তৃতীয় ক্রিয়ার মতই পঞ্চম ক্রিয়াও আমার জীবনে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে রঙে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, অপরূপা জগৎজননীর প্রসন্নতার আনন্দে। এ আনন্দ, এ প্রাপ্তি, শুধু প্রাপ্তি নয়, পরমার্থ প্রাপ্তি কত পরমানন্দময়, সাধক যে সেই জানে। অন্যজনে নাহি মানে, ছোটে জাগিতক টানে, চেয়ে থেকে পিছু পানে, মোহ মায়ায় বদ্ধ হয়ে গুটি গুটি পায়ে চলে শুধু ঐহিক সুখ সন্ধানে। সাধকের হয় যোগ, অন্যের হয় বিয়োগ, সাধকের আসে মুক্তি, অন্যের বাড়ে আসক্তি, সাধক পায় পরমার্থের সন্ধান, অন্যেরা করে অনর্থের অভিযান।

পঞ্চম ক্রিয়া দেবী কালীর আরাধনার ক্রিয়া। পঞ্চমুন্ডীর আসনে বসে, দেহকে শবে পরিণত করে দিগবসনা মায়ের মূর্ত্তি দর্শনলাভের, তাঁকে প্রসন্না করে, উর্দ্ধে, অধেঃ, ডাইনে, বামে, সম্মুখে পিছনে নমস্কার করে তাঁর প্রসন্নতায় পরমার্থের পথ খোলার অনুমতি লাভের

ক্রিয়া। পঞ্চম ক্রিয়া হল মা কালীর দর্শন ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির ক্রিয়া। পঞ্চম ক্রিয়া সীমার মাঝে থেকে অসীমতার আস্বাদন লাভের ক্রিয়া। পঞ্চম ক্রিয়া ব্যাপ্তি সুরুর ক্রিয়া। পঞ্চম ক্রিয়ার সুরু হতে দেখা যায়, শেষ দেখা যায় না। এখানে দেহের পঞ্চতত্ত্ব জয়ী সাধক মাকে মিনতি জানায়, তাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করে পরমার্থ ভান্ডারের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য। মা প্রসন্না হয়ে সেই পথের দরজা খুলে দিয়ে সাধকের চিরমুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে ধন্য করে দেন। মা কেন সাধকরূপী সন্তানের পথ আটকে দাঁড়ান এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মা মহামায়া হয়তো সন্তান চিরদিনের জন্য মোক্ষরাজ্যে চলে যাওয়ার বিরহ ব্যাথায় কাতরা হয়ে যতটুকু সন্তানকে নিজ কোলে ধরে রাখতে পারেন সেই চেষ্টায় থাকেন। তাই তাঁর এত টেনে রাখার সাধ জাগে, সাধকের পরমার্থ প্রাপ্তির হয় বিলম্ব। রূপকাকারে এই রকম ব্যাখ্যা যেন শুনেছিলাম মনে আছে।

☞ পঞ্চম ক্রিয়ার প্রকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা

পঞ্চম ক্রিয়া শব সাধনার ক্রিয়া। আগেই বলেছি, দেহটা হবে শব, তুমি থাকবে শবের উপরে। এই 'তুমি' অর্থে 'প্রকৃত তুমি,' স্বরূপ তুমি, কারণ তুমি তো দেহ নয়, দেহীর। দেহের মৃত্যু ঘটে, দেহীর তো হয় না। এই যে মন্ত্র অর্থাৎ "আত্মানং বিদ্ধি" নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা, কে আমি, এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় এই ক্রিয়া সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। এই হোল এর প্রকৃত অবস্থা যা প্রত্যক্ষভাবে সাধকের পাওয়া উচিত। বোঝা উচিত আমি আত্মা সুধাময়, জড় দেহ আমি নয়।

এই পঞ্চম ক্রিয়া করা কালীন আমার সর্ব্বদাই উজ্জ্বল আকাশের প্রকাশ থাকত। ক্রিয়া সুরু হবার পর থেকেই আকাশ যেন মনটাকে আকর্ষণ করে নিত, মনটা যেন বিবশ হয়ে যেতো, সে অবস্থা শুধু

অনুভব করা যায় কিন্তু কাউকে বলে বোঝানো যায় না, এ শুধু অনুভূতি, হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি। অনেক সময় মনটা এতটা নিবিষ্ট হয়ে থাকত, ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। অফিসে বসে কাজ করছি - ঠিক ঠিক কাজ চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ মনে হোত আমি কি করছি এর পরে কি করতে হবে? কিছুই যেন ঠিক করতে পারছি না - কিছুতেই মনে আসছে না কোথায় রয়েছি? তাই ত ! কোথা থেকে এসেছি? আমার বাড়ী কোথায়? বাসস্থানটা কোথায়? সব যেন স্মরণে আসছে না, একেবারে গুলিয়ে যাচ্ছে? এইভাব প্রায়ই হত, তবে কয়েক মুহুর্ত্তের জন্য; কিন্তু সেই সময় কোন কাজ হোত না, হাত থেমে যেত, চোখ স্থির হয়ে যেত, সে এক বেবাক্ স্থির অবস্থা। পাশে যে কাজ করছে, সে এই অবস্থা দেখে অবাক হয়ে ঠেলা দিয়ে বলত এই ঢোঁড়া তোর মাঝে মধ্যে কি হয় বলত? এ রকম করিস কেন? এত টাকা পয়সার কাজ এখানে? কিন্তু আমি কি করে তাকে বলব আমার কি হয়? কি করে বোঝাব তাকে আমার তাৎক্ষণিক অবস্থাটা। এ কি বলে বোঝাবার জিনিষ নাকি বললেই সে বুঝবে? চুপ করে থাকতাম। আহা সেই দাদা আজ আর ইহ জগতে নেই। কি ভালই না বাসত দাদা আমাকে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর সেই সহকর্ম্মীর সম্পর্ক কি মধুর, কি বলব? অন্যান্য সহকর্ম্মী দাদারাও, যারা অনেকেই আর আজ ইহ জগতে নেই। আমার নিত্য ভুল যত্ন নিয়ে সংশোধন করে কি মধুর শাসনই না করতেন আমাকে। কি অপূর্ব্ব আকর্ষণে আমাকে আটকে অনেকেই আজ আকাশপথে যাত্রী সেজে চলে গেছে, চিরকালের জন্য। স্মৃতির পশরা বহনের ভার দিয়ে গেছে আমাকে কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে। তাদের শুভগতি হোক প্রার্থনা করি, তাদের আত্মা হোক পরমাত্মায় লীন। দুরে থেকে কাছে থাকার স্মৃতিটুকু শুধু বেঁচে থাক মনে চিরকাল, চিরদিন যারা আমাকে একদা বেসেছিল ভাল, শুধতে পারব না যাদের ভালবাসার ঋণ, কোনকালে, কোনদিন।।

সবসে বড়া মজা আয়েগা মনে হোত তখন, যখন কখনও কখনও বোধে আসত যে আমি যেন শূন্য থেকে নামছি - নামছি।

নামছি, হঠাৎ শূন্যেই আবার দাঁড়িয়ে রয়েছি। আহা কি অবস্থা কি বলব? এমনও হত, বাসে করে কোথাও যাচ্ছি বা হয়ত বাবার বাড়ী যাচ্ছি বা বাবার বাড়ী থেকে বাড়ী ফিরছি। হঠাৎ মনে হচ্ছে সব গুলিয়ে যাচ্ছে, তাইত! কোথা যাচ্ছি? কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি? চির পরিচিত রাস্তা দিয়েই তো যাচ্ছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না, চিনতেও পারছি না, সব যেন অজানা, অচেনা, অপরিচিতের রাজ্য। আবার মুহূর্ত্তেক পরে ভ্রান্তি কেটে যেত যখন, আবার ঠিক ঠাক চলত। এই সমস্ত ব্যাপার যার হয় সেই বোঝে কিন্তু অপরকে বলে ঠিক বোঝানো যায় না। যাই হোক এই পঞ্চম ক্রিয়ার অবস্থা প্রসঙ্গে গুরুবাবার বহুদিন আগে বলা ভবিষ্যৎবাণীর প্রসঙ্গে আসা যাক্।

আগে, বোধহয় তৃতীয় ক্রিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তাই সংক্ষেপে ঘটনাটুকু উল্লেখ করছি।

বাবার সাথে সিনেমা হলে বসে বই দেখছি, বোধহয় আরাধনা। নায়ক নায়িকা খুব অন্তরঙ্গ দৃশ্যে স্বামী স্ত্রীর অভিনয়ের আঙিনায় ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বাবার এক পাশে রেখাবাবু, অন্যদিকে আমি, হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, "রেখা দেখ্ দেখ্, ওরা কেমন লেখাপড়া করছে!" লজ্জায় লাল রেখাবাবুর তো মাথাটা চেয়ারের তলায় চলে গেছে। আমার অবস্থা অতটা না হলেও খুবই সঙীন। বাবা কিন্তু কথাটুকু টুক করে বলেই নির্ব্বিকার।

আবার সিনেমা দেখতে দেখতে সামনে বসা এক নয়া দম্পতির দিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, "বিষ্টু! তুমি ঐ মেয়েটিকে বলতে পারবে, ওগো চন্দ্রবদনী, তোমাকে কি ভোলা যায়?" বলেই আবার গম্ভীর ভাবে সিনেমা দেখতে লাগলেন। সিনেমা ভেঙ্গেছে, পুরো জনস্রোত বেরুচ্ছে, হল ছেড়ে আমরাও যাচ্ছি। হঠাৎ বাবা ঐ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন, বলে উঠলেন, "ব্যাপারটা কি রকম জান? তুমি থাকবে উপরে, আর তোমার দেহটা একটা কাগজের ঠোঙ্গার মত নীচে পড়ে থাকবে। ক্রিয়া করে চল, পরে বুঝতে পারবে। স্বয়ং

ঈশ্বর প্রতিম মুক্ত পুরুষের কথা, তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে? দু চার দিন কি দুচার বছর নয়, শতবর্ষ পরে হলেও ঘটবেই ঘটবে, এতে কোন সংশয় নেই।

ঘটলও তাই। ঠিক কবে তা মনে নেই, তবে যে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছি সেটা পঞ্চম ক্রিয়া করার সময়ের ঘটনা এটা মনে আছে।

সেদিন, শুধুমাত্র পঞ্চম ক্রিয়া শেষ করে, রেচক করে একটু পরাবস্থায় থাকার চেষ্টায় আছি, যা আমি প্রতিটি ক্রিয়ার শেষে অভ্যাস বশে করি। সেদিনও, যেই মাত্র কূটস্থে মন রেখে পরাবস্থায় থাকার জন্য চেষ্টা করেছি কি, অমনি মনটা যেন কেমন বিবশ হয়ে পড়ল। একটা সুমিষ্ট ঝনঝনানির গম্ভীর সেতারের আওয়াজ শুনছি আর তারই মধ্য থেকে গম গম করে ভেসে আসছে শ্রীমদ ভগবৎ গীতার সেই শাশ্বত শ্লোকটি —

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।"

ঘরের ভেতরটা যেন আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য লোকের উজ্বল আলোর মাঝে নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। তন্ময়তা কাটতেই মনে জেগে উঠল, বাবার সেই অমোঘ বাণী "আরো কিছুদিন ক্রিয়া করে চল, সব বুঝতে পারবে।" দয়াল গুরু তো মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় তাঁর অমর বাণী। তাই কৃপা করে ক্রিয়ার অবস্থাপ্রাপ্তি শিষ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ ঘটিয়ে একদিকে সদগুরু যে কি জিনিষ প্রমাণ রেখে গেলেন, অন্যদিকে এঁরা যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, কালের অধীন নন বরং কালই তাঁর অধীন তারও প্রমাণ রাখলেন। তখন

হয়ত, হয়ত কেন, ঠিক ভাবে বুঝিনি তাঁর ঐ চন্দ্রবদনী কথাটার মানে - কে সে চন্দ্রবদনী? সে কি ঐ নব দম্পতির নারী সত্ত্বা না অতীন্দ্রিয় জগতের কিছু? দেহটা ঠোঙ্গার মত পড়ে থাকবে বলতে কি সে অবস্থার কথা জানাতে চেয়েছিলেন? কেন ঠোঙ্গা বললেন যাতে কোন বস্তুকে রাখা যায়? কেন অন্য কথা বললেন না? আজ বুঝি, নিজে প্রত্যক্ষ অনুভবে বুঝি। আনন্দ সাগরে ঐ অবস্থায় গিয়ে বুঝতে পেরেছি। মানে দয়া করে গুরুদেব বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকটি কথার সঠিক অর্থ কি? বাবা বলতেন, "ভ্যাদর ভ্যাদর করো না, করে দেখ্"। সাধক সাধিকার কাছে আমারও তাই বলার কথা আজ একটাই "ভ্যাদর ভ্যাদর না করে, করে দেখ, মরে দেখ, তরে দেখ, ভবসাগর তারণের কথামত চলে দেখ।।

☞ সদগুরুর সম্বন্ধে কিছু কথা

সদগুরুকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ মনে করে তাহলে মহাপাপ হয় ও সাধনার মহাক্ষতি হয়। সদগুরু কখনও সাধারণ মানুষ নন, তাঁকে তারকব্রহ্ম বলে বিবেচনা করা একান্ত উচিত। তাঁর আচার আচরণ অতি সাধারণ হতে পারে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সেভাবে প্রচ্ছন্নও থাকেন। হতে পারে তাঁর ভাবগতিক অশোভনীয় কিন্তু তুমি যেন কখনও তোমার বিচারে সাধারণ মানুষ ভেবে নিজের সমূহ ক্ষতি ডেকে এনো না। কখনও যেন এমন ভাব বা ধারণা মনে না আসে গুরুদেব কেন এমন ব্যবহার করলেন বা গুরুদেব কি নিষ্ঠুর অথবা গুরুদেব বড় কঠোর। কারণ গুরুদেব সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই অথবা যা আছে সবটাই ভুল, তো তাঁর কাজের কথা সম্বন্ধে ধারণা কোন কথা? যেমন কারও যদি যন্ত্রটার সম্বন্ধেই কোন পরিচয় না থাকে, তাহলে তার কাজ তো সে কিছুই বোঝে না। তাই তোমার ধারণা হবে বা হওয়া উচিত - "যদ্যপি আমার গুরু

শুঁড়ী বাড়ী যায় - তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'' এই হল গুরু সম্বন্ধে শিষ্যের প্রকৃত উক্তি। তোমার ভিতরে তুমি এই প্রত্যয় রাখবে যে তিনি সদা সর্ব্বদা তোমার আচার, আচরণ, তোমার মনের গভীরের ভাব, এক কথায় তোমার প্রতিটি শ্বাসের খবর তিনি রাখছেন এবং সেই অনুযায়ী ফলের বিধান করছেন। আজ হোক বা কাল হোক তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাবেনই করাবেন। তোমারই কর্ম্মের ফল তুমি তখন ভোগ করবে আর প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে নিজের ত্রুটি অনুভব করবে। সুতরাং যেদিন থেকে সদগুরু তাঁর করস্পর্শে কৃপা করে তোমার তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছেন, সেদিন থেকেই তুমি তাঁর নয়ন গোচরে রয়ে গেলে। সদগুরু যে সাধনা ও মন্ত্র দান করেন তার চাইতেও তাঁর দৈনন্দিন আদেশ ও নির্দ্দেশের গুরুত্ব অনেক বেশী। সাধন ভজন অনেকেই হয়ত ঠিকমত করতে পারে না কিন্তু গুরুর বাহ্য রূপের ধ্যান ধারণা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তিতেও ফললাভ সাধনার চেয়ে কম নয়। বরং অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি তাঁর বাহ্যরূপ ও বাহ্য শরীরের সেবাতেও মোক্ষলাভ করা যেতে পারে, যদি অবিচল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে। কোন সময়েই যেন তাঁর প্রতি কোন অবিশ্বাস না আসে, তাহলে ভরাডুবির সম্ভাবনা বেশী। তাই গুরুদেবের বিচার সমালোচনা কখনও করতে যেয়োনা - তাঁর প্রতি সদাজাগ্রত মন নিয়ে, নিজের মনকে চাঙ্গা রেখে চল। এটাই তোমার ব্রত, তোমার কর্ত্তব্য, তোমার সাধনা।।

পঞ্চম ক্রিয়া প্রাপ্তির পরই বাবা একদিন হঠাৎ বললেন, ''বিষ্টু! তোমার তো একটা জায়গা কেনা ছিল, তা তুমি সেখানে একটা বাড়ী করে ফেল। কারণ তুমি যে ফ্লাটে থাক সেটা বাপু ভাল নয়''। অন্তর্য্যামী গুরুদেব শিষ্যের সমস্ত খবর জানেন, তার দেহ-মন-প্রাণের কোন ব্যাপারই তাঁর নজরের বাইরে থাকে না। কিন্তু আমরা তো মহামূর্খ— বুঝেও বুঝি না, বুঝতে চাই না এসব। এমন কি

ঘটনাক্রমে গুরুদেব যদি মুখ ফুটে এই ব্যাপার শিষ্যের কাছে প্রকাশও করেন, আমরা সেটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। উদাহরণচ্ছলে যদি অলৌকিকভাবে মনের কথা বলেও দেন তো সাময়িক আশ্চর্য্য হয়ে পরেই আবার ভুলে যাই। কারণ মন আমাদের অস্থির, চঞ্চল, সর্ব্বদাই বিষয় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাই বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তা থাকে না, টেকে না। কথা প্রসঙ্গে বাবা বলেছিলেন একদিন, "বিষ্টু তোমাদের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের খবর আমার জানা আছে, কিন্তু মুখে কিছুই বলি না তোমাদের।" দয়াল গুরুদবে ঠিকই বলেছিলেন, ফ্লাটে ঐ বাড়ী ওয়ালার সঙ্গে অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের ইতিমধ্যে নানা ঘটনা ঘটতে সুরু হয়েছে, প্রায়ই গন্ডগোল লেগেই ছিল। অবশ্য আমার সঙ্গে কিছু তখনই হয়নি সুমধুর সম্পর্কই ছিল। তবে গুরুবাক্য তো মিথ্যা হয় না, তাই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে শেষকালে তেমন সদ্ভাব ছিল না। তাছাড়া আরও ঘটনা ঘটতে সুরু করেছে, যদিও ঐ সব ঘটনার বাহিরেই ছিলাম তবুও বাড়ী ছাড়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে সুরু করেছিল যা সর্ব্বজ্ঞ গুরুর নজরে আগেই এসে গিয়েছিল। যাই হোক, ঐ রকম একটা আদেশের জন্য আমি তো তৈরী ছিলাম না, তাই মনটায় একটু চিন্তা এল। কিন্তু বাবার যখন একবার আদেশ হয়েছে তখন তো বলার কিছু নেই, করতেই হবে, আর না করিয়ে তিনি ছাড়বেন না। এদের কথা অমূলক হয় না, কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য ছাড়া এঁরা আদেশ করেন না - কোন কারণ ছাড়া হুকুমজারী করেন না। পাঠক পাঠিকাকে বলে রাখা ভাল যে বাবা তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে বহু আগে থেকেই বলেছিলেন, "বিষ্টু! তুমি প্রতিমাসে অন্ততঃ একশত করে টাকা তোমার নামে জমাবে। কোন কর্ণপাত করিনি তখন, বাবার কথায় প্রথম প্রথম। কিন্তু আমার এই কথা না শোনা তাঁর নজর এড়ায়নি। এর পরে একদিন ক্রোধ দেখিয়ে পুনরায় বলাতে সেই সময় থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে কিছু টাকা রাখতে সুরু করেছিলাম, আর সেই অঙ্কটা একশ টাকার কম নয়। তারপরে মাইনে বেড়েছে, বছরে দুবার বোনাস পেয়েছি, ওভার

টাইম ইত্যাদি নিয়ে বাবার আদেশের সময় মোটামুটি হাজার দশেক টাকা জমে গেছে। বাড়ী করতে বলার পরই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে যে টাকা জমাতে বলেছিলাম সেখানে কত আছে?" পাঠক লক্ষ্য করবেন কার্য্যকারণ সম্পর্কের ব্যাপারটা। উনি তাঁর দুরদৃষ্টিতে কখন আমার ভাড়া বাড়ী ছাড়ার প্রয়োজন দেখা দেবে, কখন বাড়ী করার টাকার প্রয়োজন হবে, দয়াল গুরুদেব তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় সব জেনে দুরদৃষ্টি নিয়ে সময় থাকতে আমাকে সাবধান হতে বলে দিয়েছিলেন। মান্‌ব মান্‌ব করে চলার পর, শেষে কপট ক্রোধ দেখিয়ে যা করতে হবে, করলে মঙ্গল হবে, সেই কাজ শিষ্যকে জোর করে করিয়ে নিয়েছিলেন। তাই বললাম, "কম বেশী হাজার দশেক হবে।" একটু চুপ করে থেকে বাবা বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, আরম্ভ করে দাও - বাবাদের কৃপায় হয়ে যাবে।" আমার তো সব ব্যাপারেই বাবার সঙ্গে তর্ক করা স্বভাব ছিল। গুরুবাক্যে চট্‌ করে বিশ্বাস আমার এত দেখে শুনেও আসত না। তাই অর্ব্বাচীনের মত মতের মিল না হলেই তর্ক সুরু করে দিতাম। বাবা অবশ্য বিরক্ত হতেন না - অনেক সময়ে আমার মতটাকে মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু অন্যের ব্যাপারে সর্ব্বদাই এর ব্যতিক্রম দেখতাম। হায় দয়াল গুরু! আজ তোমার সেই সুধাময় দেহও দেখতে পাইনা, অমৃতময় বাণীও শুনতে পাই না - জীবনে অপচয়ের কি মর্ম্মান্তিক পরিণতি আজ বুঝতে পারি। বুঝতে পারি তোমা বিনে জীবন বীণার তারে মাঝে মাঝে কি করুণ সুর বাজে, বুঝতে পারি অসুরের দল কেমন ভাবে হানা দিতে এগিয়ে আসে, বুঝতে পারি চারিদিকে নাগিনীরা কি বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে কিন্তু তোমার স্মরণ মনন তো কখনও ছাড়িনি দয়াময়। তাই তোমার অপার করুণায় আমার মত ভ্রমান্ধ জীবের সব ত্রুটি ক্ষমা করে, সব ভুল সংশোধন করে, কেমন করে অপরিসীম স্নেহে সমস্ত বাধা বিঘ্ন, দূর করে, স্নেহভরে তুমি তোমার বক্ষের আড়ালে লুকিয়ে রাখ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তাও জানি । জানি, শুধু তোমার অযাচিত করুণার মূল্য দিতে পারি না, শুধু তোমার লীলার

সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী হতে চাই না, শুধু নিজেকে ভুলে তোমাকে নিয়ে থাকতে পারিনা। তাই পুনরায় ভুল না করে বাবার নির্দেশকেই প্রাধান্য দিলাম, সুরু হল বাবার নির্দেশে বাড়ী বানানোর পরিকল্পনা, আর মাথায় বাবা এটা ঢোকানোতেই ওদিকে সুরু হল ক্রিয়ার প্রতি বঞ্চনা। ক্রিয়ার ষোল আনা চিন্তায় এইবার বাড়ী তৈরীর পাঁচ পয়সার চিন্তা থাবা বসাল। দুর্ব্বার গতির ক্রিয়া ধীর গতিতে পরিণত হল, বিষয়ের বিষ জাঁকিয়ে ধরল। ক্রিয়ান্তে মশগুল থাকা মনটা, বাড়ী করার চিন্তায়, বিষয় বাসনায় লিপ্ত হল, আধ্যাত্মিক সচেতন মনটা, পরমার্থ চিন্তা ছেড়ে অনর্থ চিন্তায় নেমে এল। কিন্তু গুরুদেবের লীলা বোঝা এত সহজ নয়। পরে অবশ্য খানিকটা বুঝেছিলাম আর সেটা হোল বাড়ী নাহলে ক্রিয়া ব্যাহত হোত। তাই গুরুদেব ক্রিয়ার অগ্রগতি যাতে রুদ্ধ না হয় সে ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করে দিয়েছিলেন।

গুরুদেবের এইরূপ লীলা যে কত দেখেছি, শুধু আমি কেন, অনেকেই দেখেছেন, সে সব কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমাকে দিয়ে যখন বাবা বাড়ী করাচ্ছেন তখন ঐ বাড়ীটার খরচ হয়েছিল ৩০/৪০ হাজার টাকা। তার মধ্যে ঐ জায়গাটা সংস্কার করতেই প্রায় হাজার দশেক টাকা খরচ হয়েছিল। এরপর থেকেই জিনিষ পত্রের দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। যখন ঐ বাড়ীটা সুরু করি তখন ইঁটের দাম ৭৫ টাকা হাজার, সিমেন্ট কন্ট্রোলে দশটাকা বাইরে ১১/১২ টাকা ৫০ কেজি বস্তা। লোহার দামও অতি কম। সেগুন কাঠ ১নং মাত্র ৪০টাকা সি.এফ.টি, শাল কাঠ ২৫টাকা, মিস্ত্রি ৭টাকা, জোগাড়ে তিন থেকে বড় জোর ৪টাকা রোজ। আজ তাই ভাবি বাজার কোথায় উঠেছে। তবু কত বাড়ী হচ্ছে। ঐ বাড়ীটার খরচ তখন যেখানে ৩০/৩৫ হাজার টাকা লেগেছিল আজ কমপক্ষে ঐ বাড়ীটা তৈরী করতে ৪ লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা লাগবে। যাই হোক বাবার কৃপায় চারিদিক থেকে সাহায্যের হাত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু ওদিকে ক্রিয়াতে সময় কম দিতে বাধ্য

হলাম। আমি এ ব্যাপারে অর্থাৎ ক্রিয়া করার চাইতে বাবার আদেশ পালনে বেশী আগ্রহী ছিলাম। আগেই বলেছি, তাই বাবার আদেশ পালন করছি ভেবে মনে শান্তি আনার চেষ্টা করতাম, আনন্দও জাগত মনে এবং সব চাইতে বড় কথা বোধে আসত যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সদা সর্ব্বদা আমাকে আগলে রাখছে। পাঠক বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, কিন্তু এটা স্পষ্ট করেই মনে হোত। বাড়ী তৈরীর হিসাব পত্র, খরচ পত্র যা কিছু করার সবই দাদা ভার নিয়েছিলেন অর্থাৎ দাদার হাত দিয়েই হোত এটাই যা বাঁচোয়া। দাদারই নেতৃত্বে আমরা চার ভাই খরচ পত্র বা সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেছি। তবে সবাই যে সমান ভাবে বহন করেছি বা করতে পেরেছি তা নয়। যখন যে যতটুকু জোগান দিতে পেরেছি, তাতেই চলেছে, বাড়ীটাও শেষ হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীটার দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব সে ভাবেই পালন করা হচ্ছে। যাই হোক পঞ্চম ক্রিয়া পেয়েই ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলাম অর্থাৎ নতুন বাড়ীতে ঢুকেছিলাম। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই দোতলায় আর একটা ঘর তৈরী হল এবং গুরুদেবের নির্দ্দেশে আমি উপরের ঘরে বাস করতে লাগলাম। এতে আমার ক্রিয়ারও বেশ সুবিধা হল আর ক্রিয়া জগতের বাঞ্ছিত বস্তু যা যা হয়, অলৌকিক দর্শন, কত ঘটনার সাক্ষী হওয়া। কত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এই প্রসঙ্গে একদিনের ঘটনা উল্লেখ করছি।

সেদিন ক্রিয়া করছি, হঠাৎ ক্রিয়ার মধ্যে ঠাকুর লোকনাথ আবির্ভূত হলেন - স্পষ্ট অনুভব করছি তাঁর উপস্থিতি। আমি তাঁকে ঐ আবেশের মধ্যেই যেন জানতে চেয়েছিলাম সেদিন, যে ওঁদের সময়ে দীক্ষাদান পদ্ধতি কিরূপ ছিল। ইঙ্গিতে দর্শনের ভঙ্গি দেখিয়েছেন। কথা বলে যে জিজ্ঞাসা করেছি তা নয়। ঐ অবস্থায় থেকে প্রশ্ন এমনভাবে আসে, যেন প্রশ্ন কর্ত্তার উত্তর যে ভাবে চাওয়া হচ্ছে সেই ইঙ্গিতটুকুর শুধু স্পর্শ থাকে এবং উত্তরও তাই ঐরূপ হয় অথচ প্রশ্ন

কর্ত্তারও যেমন বুঝতে অসুবিধা হয় না উত্তর দাতারও প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাকের অনেক প্রকার ভেদ আছে। পরা বাক্, পশ্যতি বাক, বাক বৈখরী ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ সমস্ত বিষয় আলোচনা এখন থাক। ক্রিয়ার অনুভূতির ব্যাপার সাধকের নিজস্ব বিষয়, তাই ঐ আলোচনায় বিরত থাকাই শ্রেয় বোধকরি।

☞ মহাপ্রয়াণে মাতাঠাকুরানী

এই সময়ে আমার গুরু মাতা ঠাকুরাণীর শরীর ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগল। ব্রঙ্কাইটিস্, প্লুরিসি, ব্লাড সুগার ইত্যাদি নানা রোগে মাকে আক্রমণ করল। মাঠাকরুণ কিন্তু ঐ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও আমাদের সকল সন্তান সন্ততিকে বিশেষ ভাবে আমাকে অপার স্নেহ বিতরণ করে যাচ্ছেন। ঐ অবস্থাতেও যেমন আমার জন্য বড় বড় রসগোল্লা সন্দেশ লুকিয়ে রাখতেন, অনেকে ভাবত, মা বোধহয় নিজে খাবেন বলে রেখে দিচ্ছেন কিন্তু মা তো জানেন কার জন্য রাখছেন। কারণ মা তো ব্লাড সুগারের জন্য মিষ্টি খেতেনই না। আমি নিজে রসগোল্লার রস নিঙড়ে কলের জলে ধুয়ে মায়ের মুখে কখনও কখনও দিতাম। মা আমার তাতেই কত খুশী হতেন। মায়ের তো কোন আকাঙ্খা, দাবী এ সব ছিলই না, ছিল না সামান্যতম কোন দাবীও। ছিল শূধু অপরের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, ভালবাসা। নিজের ছেলের থেকেও বেশী ভালবেসে মা আমার জন্য, আমি খেতে ভালবাসি বলে সব রকমের খাদ্য রেখে দিতেন চেয়ে চেয়ে। আজ মনে হলে বুক ফেটে যায়, সবচেয়ে বেশী বাজে মায়ের কষ্টকর অসুস্থ দিনগুলোর স্মৃতি। কি কষ্ট, কি যন্ত্রণাই না মা আমার পেয়েছেন, সেই সে অভিশপ্ত দিনগুলোতে। জানিনা আমাদের কষ্ট লাঘব করার জন্যই ওঁরা এত কষ্ট সহ্য করেন কিনা? জানিনা দেহের

কষ্ট সাত্ত্বিক মনের অধিকারীর কাছে বড়ই তুচ্ছ, এটা আমাদের শিক্ষার জন্য এমন বীভৎস কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করেন কিনা, এবং সে ভোগ সাধক সাধিকাকেও রেহাই দেয় না এটা বোঝাবার জন্য করেন কিনা। শুধু এটুকু জানি, মানি এবং তা হোল পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ বা তাঁর লীলাসঙ্গীরা এসেছেন, সকলকেই প্রচন্ড দুঃখ ভোগ করতেই হয়েছে। সীতার কথা চিন্তা করুন, রাধার কথা ভাবুন, ভাবুন তো বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা, ভেবে দেখুন সতীর জীবন। তাঁকে তো স্বামীর অপমানে, দুঃখে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত করতে হয়েছে। ভেবে দেখুন দ্রৌপদীর জীবনটা, পঞ্চ পান্ডব স্বামী যার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সখী যে, তাকে কিনা নারী জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যে লজ্জা সেটাকেই বিসর্জ্জন দিতে হল সমগ্র পৃথিবীর রাজন্যবর্গের সামনে। দুঃশাসন নামক এক নরপিশাচের হাতে। আরও আশ্চর্য্য লাগে যখন দেখি দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করছে তখন শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত। তাই মনে ভাবি এঁরা আসেন জীবন দিয়ে শিক্ষা দিতে, ধূপের মত নিজেকে জ্বালিয়ে অপরের চোখে আলো বিকিরণ করাতে। নিজে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে অপরের প্রাপ্তির জন্য তাকে অক্ষত রাখতে, নিজেকে সযত্নে গোপন রেখে, সুপ্ত থেকে, অপ্রকাশিত রেখে অপরের মনে প্রকাশের বন্যা বওয়াতে। মনে হয়, এরই জন্য এরা দেহধারী হয়ে এসে নশ্বর দেহটাকে প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করে আমাদের ন্যায় জৈবিক দেহধারীদের কাছে দেহের নশ্বরতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা প্রমাণ করে দিব্যদেহে দেহলীন হয়ে কোন সে অজানা দিব্যস্থানে স্থানান্তরিত হন, রেখে যান আমাদের জন্য অমৃতময় শিক্ষার বস্তু, গবেষণার বস্তু, চিরদিনের খোঁজার বিষয় যা সাধককে সাধিকাকে চিরদিন প্রেরণা জোগাবে, জুগিয়েছে, আজও একইভাবে উদ্বুদ্ধ করছে জানতে, কোন সে বস্তু এঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন? কি শক্তিতে এঁরা এত শক্তিমান ছিলেন? কেন এঁরা সব পেয়েও সবহারা হয়ে ছিলেন? সাধকসাধিকা এইভাবে তখন ভাবে, খোঁজে, এগিয়ে চলার

গতির প্রেরণা পেয়ে বলে চরৈবেতি চরৈবেতি, এ জীবন সেইবস্তু প্রাপ্তির রেখে যাক্ সুখস্মৃতি। নশ্বর দেহটার সেই বস্তু প্রাপ্তিতে তবে হোক ইতি।

ইতি হল মমতাময়ী গুরুমাতা ঠাকুরাণীর নশ্বর দেহটারও, আমাদের সেই আনন্দধামের আনন্দময়ী মায়ের পূত পবিত্র হাড় মাংসের বোঝাটার, চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমার। সেদিনটা ছিল ইং ১১ই নভেম্বর ১৯৭৮সাল। শেষের দিনগুলোর কষ্ট ছিল বর্ণনার বাইরে। দয়াল গুরুদেব অবশেষে কৃপা করে কষ্টের অবসান ঘটালেন। বিজয়িনীর হল মহাপ্রস্থান, আমাদের সুখের দিনের ঘটল অবসান, আনন্দধামের পরিবেশ, পরিস্থিতি হল আপাতম্লান, শুধু বাবার মুখের হাসি রইল চিরঅম্লান। আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সঙ্গিনীর চির বিদায়ের দিনটাতেও বাবার মধ্যে কোন দুঃখের আভাষ নেই। আরও অবাক হতে হল এই দেখে যে বাবার দৈনন্দিন জীবন যেমন স্বাভাবিক ছিল তাই রইল, এতটুকু পরিবর্ত্তন নেই ভিতর বার কোথাও। যদিও গোপালদা, বৌদি এঁরা মায়ের দেহ রাখার পর মায়ের অভাব অনেকটাই পুরণের চেষ্টা করতেন, তবু মনে হোত মা আমার আর ইহজগতে নেই। যেটা হোত সেটাই বলছি। এই সময় থেকেই বাবার শরীরও খারাপ হতে সুরু করল। বাবা যদিও নিজের অসুস্থতা কাউকে বুঝতে দিতেন না, বুঝতে দিতেন না যে তিনিও ওপারে পাড়ি জমাচ্ছেন। মুখে বলতেন আমি এখনও বহুদিন এই দেহে আছি এবং নানারকমের রঙ তামাসা দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রাখতেন এমন কি অন্তিম কালের দিনটিতে সকালে, এমন কি দুপুরেও এতটুকু কাউকে বুঝতে দেননি যে সেদিনই তিনি নশ্বরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন। তবে আমার মন কিন্তু কেন জানিনা অন্য রকম বলত। যারা নিকটে ছিল, অতি নিকটের বাবার কাছে, তাদের

আমি বলতাম, "বাবা যাই বলুন না কেন, বাবা কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই নশ্বর দেহটা ছাড়ার জন্য।" পরে যদিও অনেকে আমার সম্বন্ধে অন্য রকম মতামত প্রকাশ করেছিল কিন্তু আমি কি করব? তাই অন্য কথায় আসছি।

☞ হঠাৎ ষষ্ঠক্রিয়া প্রাপ্তি

হঠাৎ কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি এইজন্য যে কোনরূপ পূর্ব্ব পরিকল্পনা বা ঘোষণা করে বা আগে থেকে আমাকে জানিয়ে এই ক্রিয়া বাবা দেননি বলেঋ একেবারে আচম্বিতে ঘটেছিল ব্যাপারটা - তাই হঠাৎ শব্দটার প্রয়োগ করলাম। বাবা তখন বালীতে তারকদার বাড়ীতে এসেছেন। আমারও সেই সময় নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল ভোরবেলা ক্রিয়া সমাপ্ত করে বাবাকে গিয়ে প্রণাম করা। সেদিনও সেই রকমই গেছি। বাবা ২/৪টা কথা বলার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, "বিষ্টু! বাবার ফটোটা দেওয়াল থেকে পার তো?" ফটো পাড়লাম। বাবা অনেক সময়ই এমন করতেন. ও আবার বলতেন তুলে রাখতে । এটা মনে হয় আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই করতেন। কেননা আমরা তো বিপদে না পড়লে অথবা কোন স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধা না থাকলে বাবাকে প্রণাম করতেই ভুলে যাই। মনেই থাকে না বাবাদের কথা বিশেষ করে সুখের দিনে। যখন কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না, সেইদিনে তো মনেই থাকে না। যাই হোক ফটো পাড়ার পর ঘরের কোণে রাখা গঙ্গাজলের ঘটিটা নিয়ে আসতে বললেন। যথারীতি তাই করা হল। বাবা এবার কিছুটা গঙ্গাজল হাতে নিয়ে নিজের মাথায় ছিটোলেন এবং কিছুটা আমার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তখনও কিছু অনুমান করতে পারিনি। কারণ এই সমস্ত

কাজগুলো বাবার দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই পড়ে, রোজই, প্রায়ই এই রকম করেন, তাই অনুমানের কোন ব্যাপারই নেই। কিন্তু তারপর যেটা করলেন সেটাই আশ্চর্য্য জনক এবং সেই জন্যই এই হঠাৎ কথাটা ব্যবহার করেছি। বাবা এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিষ্টু! এদিকে এস, বাবাদের আদেশ হয়েছে আজই তোমাকে ষষ্ঠ ক্রিয়া দান করতে হবে।" এইবার এল আমার অবাক হবার পালা। কেননা আমি ত মাত্র সকালের ক্রিয়া সমাপ্ত করে লুঙ্গি পড়ে বাবাকে শুধুমাত্র প্রণাম করবার জন্য গেছি। পরনে ধুতি পর্য্যন্ত নেই। ক্রিয়ার প্রস্তুতি তো দূরের কথা, লুঙ্গি পড়ে রয়েছি তখন। বাবা কিন্তু মনোভাব বুঝে যেন আপনমনে বলে উঠলেন, "ওটা এমন কিছু নয়। এই ক্রিয়াটা তুমি ঠিক টুক করে ধরে ফেলবে " — এই বলে বাবা আমাকে দয়া করে সেই অবস্থাতেই সেই সময়ে ষষ্ঠ সোপানের ক্রিয়া দান করলেন। বাবার কথাটা ঠিকই মনে হয়েছিল কারণ ষষ্ঠ ক্রিয়াটা কি ভাবে করতে হয়, বাবার কৃপায় ঐ ক্রিয়া পাবার আগেই কেমন করে জানিনা, আগেই ক্রিয়া করার সময়ই আমার অনুভবে এসে গিয়েছিল, তবে ক্রিয়াটা কখনও বাবাকে বলিওনি আর বাবার কাছে পাওয়ার আগে করিওনি। এরপর যথারীতি আবার সেই রসময় পুরুষের রসের লীলা চলল অর্থাৎ বাবা আমাকে বলে দিলেন, "দেখ বিষ্টু তোমাকে যে ক্রিয়াটা দেওয়া হল তা যেন কাউকে বলো না।" বরাবর জানি তিনি এই রকমই বলেন কিন্তু নিজে করেন তার উল্টো। অর্থাৎ বাবা আমাকে বলতেন কাউকে বলো না আর সকলে যখন বাবার কাছে বেশ ভীড় জমাতো তখন নিজেই হাটে হাঁড়ি ভাঙতেন। সেদিনও ঠিক তাইই হল। সেদিন বাবার ঘরে এক ঘর ক্রিয়ান্বিতদের সামনে বাবা হঠাৎ হাসতে হাসতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বাবা বললেন,"তোমাদের একটা মোটা খাওয়া পাওনা হয়েছে কি বল বিষ্টু?" কি রকম মজার ব্যাপারটা বুঝুন? নিজেই বাবা

আমাকে ক্রিয়া পাওয়ার কথা বলতে নিষেধ করেছেন আবার আমাকেই সকলের সামনে মজা করে সে কথা বলাতে চাইছেন। কিন্তু বাবার নিষেধটাই অব্যর্থ মনে করে বোবা বোকা ভাব করে বলতে হোত, "কি জানি বাবা? তবে আপনি যখন বলছেন সেটা নিশ্চয়ই সত্যি। তবে আমি বাবা কিছু বুঝতে পারছি না।" ভেবে দেখুন কি ভয়ানক সূক্ষ্ম পরীক্ষা? কথার প্যাঁচে ফেলে গুরু দেখতে চাইছেন আমার মনোভাব একদিকে আর গুরুবাক্য পালনে নিষ্ঠা অন্যদিকে। কারণ আমাকে কাউকে বলতে বারণ করেছেন যখন, তখন তো তাঁর কথা পরিষ্কার কিন্তু মোটা খাওয়া পাওনার কথা যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন ব্যাপারটা আমি বা আমরা আভাসে বুঝলেও পরিষ্কার নির্দ্দেশ তো কিছু নেই সেখানে। অতএব আমি কি করে বলি হ্যাঁ বাবা জানি। যদি তখন বলেন কেন বলত? আমি হয়ত বলতাম ক্রিয়া পাওয়ার জন্য আর তখনই বিচারে আমি পরীক্ষায় ফেল। কারণ বাবা তো পরিষ্কার নিষেধ করেছেন কাউকে বলতে। নির্দ্দেশ অমান্য করা হল। আর আমি যেটা প্রত্যহ ঘটনা থেকে অনুমান করে বলতাম সেটা হাজার সত্য হলেও অনুমান সাপেক্ষে বলা হোত। সুতরাং নির্দ্দেশ আর অনুমানের মধ্যে পরিষ্কার নির্দ্দেশ মানাই ভাল। এ ছাড়াও বাবা ঠিক মজা করে যদি বলতেন - আরে না, না, ওইজন্য নয়। এই ব্যাপারের জন্য তখন আমার কি অবস্থা হোত? এ কূল ওকূল দু কূলই যেতো। অর্থাৎ একটা হোত নির্দ্দেশ পালন না করে গুরুবাক্যে অবহেলা আর দ্বিতীয় হোত ক্রিয়া প্রাপ্তির কথা সকলকে বলার লোভের বশে প্রচ্ছন্ন অহংবোধের বিকাশ। অতএব বলটা যে দিক থেকে এসেছে সেটাকে নিয়ে নিজে না খেলে বা অন্যদিকে না ঠেলে, ঠিকভাবে সেদিকে আবার ঠেলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সেদিন তাই করেছিলাম তবে পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম না ফেল করেছিলাম সেটা বাবা জানেন কারণ পরীক্ষক তিনি।

এমনই সূক্ষ্মভাবে নানা পরীক্ষা যেমন গুরুভক্তির পরীক্ষা, অহং এর পরীক্ষা, নিষ্ঠা ভক্তির, গুরুর সঙ্গে একাত্মতার পরীক্ষা, স্মরণ মননের পরীক্ষা, সদগুরু মাঝে মাঝে লীলাচ্ছলে আধারভেদে করে থাকেন। এ সব এদের লীলা — কারণ এরা লীলাময়। আমরা অজ্ঞান, অবোধ, আমরা এর রহস্য কি করে বুঝব? তবে পরীক্ষা এলে তাঁকে স্মরণ মনন উপযুক্ত ভাবে করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনিই করে থাকেন বলেই বিশ্বাস, নইলে কখনই পারা যাবে না। মানুষ যে গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় তাকেই ধরে আবার তার মাথায় উঠতে পারে - এখানেও তাই।

রূপকাকারে শোনা গুরুর সঙ্গে শিষ্যের একাত্মতার বোধের এমনই এক পরীক্ষার গল্প বলা এখানে হয়ত অসঙ্গত হবে না মনে হচ্ছে। গল্পটা এই রকম একটা ভাব।

কোন এক শিষ্যকে বেশ একটা অসতর্ক মূহুর্ত্তে কোনরকম মনের প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ একটা জিনিষ দিলেন গুরুদেব। সে খাদ্যবস্তুই হোক অথবা যা হোক একটা বস্তু। ধরুন — এক ছড়া কলা। গুরুদেব শিষ্যকে ঐ কলার ছড়াটা হাতে দিয়ে বললেন, "মনে রাখবে, আমি তোমাকে দান করলাম।" শিষ্য কলার ছড়াটা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভেবে মাথায় ঠেকিয়ে যাবার জন্য পিছন ফিরতেই গুরুদেব আবার তাকে ডেকে বলছেন -

গুরু - মনে রাখবে আমি তোমাকে দান করলাম।
শিষ্য - হ্যাঁ বাবা!
গুরু - কি হ্যাঁ বাবা?
শিষ্য - আপনি দিলেন

গুরু - কি আপনি দিলেন?
শিষ্য - আজ্ঞে আপনি দিলেন।
গুরু - আরে মূর্খ আমি তো দিলাম, কাকে দিলাম।
শিষ্য - না, মানে, বাবা আপনি দিলেন।
গুরু - আচ্ছা মুস্কিল! এখন ওটা কার?
শিষ্য - আজ্ঞে আপনি দিলেন! আপনারই।
গুরু - আচ্ছা ঠিক আছে যাও।

শিষ্য চলে যাওয়ার পর গুরুদেব ফিক্ ফিক্ করে হাঁসতে হাঁসতে অন্যদের সামনে বলছেন, "you are the only man - you are the only man."

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রহস্যটা। গুরুদেব শিষ্যকে গুরুর নির্দ্দেশ পালনে ও ভাবে একাত্মতায় দেখতে পেয়ে খুশী হয়েছেন তার উপযুক্ততায়। কারণ এতবার প্রশ্ন করলেও কখনও সে আমিত্ব বোধের পরিচয় দিল না। না বলল আমাকে দিয়েছেন, না বলল এখন এটা আমার অর্থাৎ শিষ্যটি সেই সময় নিশ্চয়ই স্মরণে, মননে, চিন্তায়, একাত্মভাবে গুরুময় বোধে ছিল নচেৎ ঐ উত্তর আসে না। এই রকমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরীক্ষা সদগুরু করে থাকেন শিষ্যের অগ্রগতি লক্ষ্য করার জন্য, অবশ্য সেই গুরুবোধে থাকলে তিনিই আবার শিষ্যকে পরীক্ষা সাগর পার করে দেন নচেৎ পরীক্ষা দেবে কার সাধ্য? তাই আবার বলছি —

জয় দে ! জয় দে !
জয়ী হবি জয় দে !
জয় গুরু জয় গুরু।
* * * * * * * * * *

চতুর্দশ অধ্যায়

ফেলে আসা দিনগুলি মোর

আনন্দধামের আনন্দময়ী গুরুমায়ের আমার প্রতি যে কি অপরিমিত অপত্য স্নেহ বুকের মাঝে লুকানো ছিল — অসুস্থা মায়ের কাছে যাবার জন্য ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একদিন তা আমার চোখে ধরা পড়ে। আমার জীবনে, পুত্রের জন্য মায়ের প্রাণ যে কি ভাবে কাঁদে তার স্মারক চিহ্ন হিসাবে সেই ঘটনাটা আজও জ্বল জ্বল করছে। বাবার ঘরে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বাবা বললেন, "মায়ের কাছে যাও - তোমার মা ডেকেছেন।" ঘরে যেতেই আদরিনী মা এক মুখ হেঁসে বললেন, "ও বিষ্টু, তুমি তো বেল খেতে খুব ভালবাস তাই না?" "হ্যাঁ মা বেল আমার অত্যন্ত প্রিয়।" বলতেই মা আমার, তোষকের তলা থেকে সযত্নে রাখা একটা বেল বের করে আমার হাতে দিতেই বাবা ও ঘর থেকে মজা করে বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর এর জন্য এত খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছিল? বলা হচ্ছিল বিষ্টু এলেই পাঠিয়ে দেবে আমার ঘরে। আমি ভেবেছি কি না কি বোধ হয় রেখেছে। হায় ঈশ্বর, শেষে একটা বেল!" মা বাবার মিষ্টি মধুর ভালবাসার প্রতিযোগিতার এই কথোপকথনের মাঝে মন আমার কিন্তু বিরশ হয়ে ভাবছে জগৎজননী বিশ্বপ্রসবিনী মায়ের মহিমা। তাঁর অসীমতার গভীরে প্রবেশে উদ্যোগী মন যেন বলতে চাইছে দয়ামযীর রূপের যেমন অন্ত নেই দয়ারও তাঁর শেষ নেই। তাই শ্রীফল প্রদানে মা আমাকে সেদিন কৃতার্থ করলেন। শ্রী থাকলে তবেই তো শ্রীফল তার ভান্ডারে মিলবে। শ্রী মানে তো শ,র,ঈ। শ অর্থে শ্বাস, র শব্দে বহ্নিবীজ অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব, যার প্রকাশ হয় চক্ষুতে, আর ঈ শব্দের অর্থ হল শক্তি। একত্র হলে মানে দাঁড়ায় শক্তিপূর্ব্বক চক্ষুতে বায়ু স্থির হলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বিনা অবলোকনে দৃষ্টির স্থিরতা

প্রাপ্তি মা আমাকে সেইদিন রহস্যভরে সেই অমূল্যধন দান করে গেলেন। সপ্তদেবতার অধিষ্ঠাত্রী নারীরূপা মা আমার, অধম সন্তানকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থাৎ শ্রী সম্পদ দানে কৃতার্থ করে গেলেন আর বিশ্বেশ্বরীর সেই দান দেখে ভিখারী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর বাপও আমার, রহস্য জনক উক্তি করে লৌকিকভাবে গভীর তত্ত্ব বহনকারী সেই দানকে প্রচ্ছন্নভাবে তুচ্ছ করে দেখিয়ে নিজেদের লীলার জগতকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করে গেলেন। সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে। জাগতিক বা লৌকিক, আর একটা হল অধ্যাত্ম দিক। জাগতিক অর্থে বেল ঠিকই কিন্তু সাধকের জ্ঞানদৃষ্টিতে তা শ্রী সম্পদ। একটা লীলা আর একটা নিত্য। একটা অধ্যাস আর একটা অধ্যাত্ম। একটা শুধু নিছকই একটা ফল, যার নাম বেল। আর একটা পেতে চাই গুরুবল, সাধকের হৃদয়ে আনে ভানুমতীর খেল।।

এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করেছেন ঐ জগৎ জননী মহামায়া। তাঁরই রূপের মায়ায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত হয়ে আছে। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরা ব্রহ্মময়ী মা আমার নিরাকারে চিন্ময়রূপ থেকে অনিচ্ছার ইচ্ছায় মৃন্ময়ী রূপে আনন্দধাম বাসিনী হয়ে লীলা খেলা করে চলে গেলেন, চিরদিনের জন্য এই সন্তানকে মাতৃহারা করে নিরানন্দ সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, দিয়ে গেলেন শ্রী সম্পদ দানের সুখ স্মৃতি, দিয়ে গেলেন যেন নীরবে সাধনার আহ্বান, চিহ্নিত সন্তানের অনুভূতি। যে পথ পায়ে পায়ে চলে সন্তান নিজ দেহের পঞ্চমুণ্ডির উপরে উপবিষ্ট হয়ে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করবে দিগবসনা, আলুলায়িত কেশা, সীমাহীন নিঃসীম রাজ্যে অনন্তরূপিনী মায়ের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রূপের ছোঁয়া - প্রত্যক্ষ করবে মহাঘোরা জগদম্বা মহাকালীরূপ মায়ের রূপ। কিন্তু এখানেই শেষ তো নয়। মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ দর্শন করে মাতৃহারা সাধক সন্তানকে মাতৃশোক ভোলার জন্য আরও যে অগ্রসর

হতে হবে। সন্তান তাই শক্তিরূপার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গুরুপ্রদত্ত ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণে দীক্ষিত হয়ে, চরৈবেতির স্বপ্ন নিয়ে একদিন উপনীত হবে চিন্ময়ী মাতৃরূপা বশিষ্ঠ আরাধিতা মা তারার কাছে, দেবী কৌশিকীর পদপ্রান্তে পিতৃদরশনের প্রার্থনা নিয়ে। নমস্কারে নমস্কারে তাঁর দশদিক ভরিয়ে দিয়ে, দেবীর তুষ্টিতে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে, হৃদয় নিঙড়ানো চোখের জলে মহাদেবীর পদযুগল ধুইয়ে দিয়ে শেষে দেবীর তুষ্টি এনে দেবীর বক্ষভেদ করে ধাপে ধাপে সাধকের হবে পিতৃ দরশনের দ্বার উন্মোচন, হবে তার অদ্বৈত সমীপে উত্তরণ, হবে জীব শিব মহামিলন — সাধকের সাধনার হবে অবসান, প্রাপ্ত হবে মৃত্যু জয়ের সন্ধান — গাইবে সে "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। বিশ্ববাসী বিস্ময়ভরে গাইবে শুধু সাধকের জয়গান। কালচক্রে বিশ্বমনে যুগে যুগে, উচ্চারণে, এই পথে রমতা সাধুর কানে বয়ে যাবে সাধকের গুণগান, চিরকাল, চিরদিন, চিরঅম্লান।

বাবার কাছে শুনেছি প্রয়োজনে সাধককে নিম্নভূমিতে নেমে আসতে হয় কিন্তু নাড়ীর টান ঠিকই থাকে অর্থাৎ জাগতিক সব কাজ তাঁরা ঐ চৈতন্য সমাধিতে থেকেও করে যেতে পারেন। অবশ্য সাধকের নানা স্তর ভেদ আছে। অনেক ব্যাপার, সে সব উচ্চমার্গের ব্যাপার, উচ্চকথা। আমরাও তাই ভাবের রাজ্য ছেড়ে এখন অভাবের রাজ্যে অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপারে আসি। এই চিন্ময়ী মায়ের কথা বলতে বলতে আমার হঠাৎ মৃন্ময়ী মায়ের কথা অর্থাৎ আমার গর্ভধারিনী মায়ের রোগক্লিষ্ট মুখের ছবিটা যেন ভেসে উঠল। এই ছবিটার সঙ্গে সেদিনের সেই বাড়ী হওয়ার গল্পটা মানে তখনও কোনরকমে একতলা বাড়ীটা হয়েছে এমন অবস্থায় বাবা একদিন হঠাৎ বললেন, "উপরে একখানা ঘর করে ফেল", সেই প্রসঙ্গে বাবার অহৈতুকী দয়ার কথাটা বলা প্রয়োজন মনে হচ্ছে, সেই কথাটা তাই বলি -

☞ উপরের ঘর করার কিছু কথা

সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখছি মা অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন, একটু জ্বর হয়েছে। মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি মা যেখানে শুয়ে আছেন, সেই জায়গাটায় উপরের ছাদ ফেটে গেছে, অসুস্থা মায়ের কাছেই জল টপকে পড়ছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সেইদিনই শনিবার, বাবার কাছে গিয়ে বলতেই বাবা বললেন, "তাই নাকি? তা বেশ হয়েছে, তুমি ওর উপরে একটা ঘর করে ফেল।" আমি শুনে তো আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা। চারিদিকে ধার দেনা তখনও রয়েছে একতলা করার পর। সেটাই চিন্তাতে তখন জেঁকে বসে আছে। উপরের ঘর করার তো কোন কথাই আসে না। বাবাকে বললাম,"কি করে হবে? হাতে একটা পয়সাও নেই। তাছাড়া যে দেনা আছে সেগুলো শোধ করতে হবে।" বাবা কিন্তু নির্ব্বিকার। কোনরকম সময় না নিয়ে বললেন, "দেখ না, বাবাদের দয়ায় দেখবে ঠিক হয়ে গেছে।" অন্য সময়ে ক্রিয়া ইত্যাদির ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কত তর্ক জুড়ে দিয়েছি কিন্তু কেন জানিনা এ সময়ে বেশী কথায় গেলাম না। কারণ মনে তো জানছি বাবা যখন একবার বলেছেন তখন করতেই হবে। না করিয়ে উনি ছাড়বেন না। যাই হোক পরিশ্রান্ত মনে বাড়ী ফিরেছি। হঠাৎ খবরে শুনলাম সেই সময় বন্যা হয়েছে বলে 'বালী' ইত্যাদি এলাকা বন্যা কবলিত অঞ্চল বলে সরকারী আদেশনামায় জারি হয়েছে। মনে মনে বুদ্ধি বাবাই জোগালেন যে ঐ একটাই পথ, বাড়ী তৈরীর জন্য ব্যাঙ্কে ঋণ মঞ্জুর করাতে হবে। ম্যানেজার কিন্তু ঋণ দিতে রাজী হয় না। অগত্যা তাঁকে খুব রাগ দেখিয়ে কথা বলতেই ভয়ে ভয়ে রাজী হয়ে গেলেন। কোনোরকমে দোতলার ঘরের গাঁথুনীটাও সারা হয়ে দেল।। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাক্য মিথ্যা হয় না। ঘটনাতেও তাই, কিন্তু অলৌকিক লীলার চরম অংশ তখনও বাকী। ঘরটুকু শুধু ছাদ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, না প্লাষ্টার, না কপাট জানালা। কিন্তু বাবার আদেশ তো ঘর করে ফেল মানে

সম্পূর্ণ ঘর তৈরী কর, যাতে আমি থাকতে পারি। মনে মনে ভাবি, সময় কাটে, এমনি সময় আবার বাবা একদিন ঘরের কথা তুলতেই বাবাকে বললাম, "বাবা কঙ্কালটা খাড়া হয়েছে। কিন্তু প্লাষ্টারও হয়নি দরজা জানালার জামা কাপড় পরানোর কাঠও জোটেনি।" বাবা যেন কোন আমলই দিলেন না এমনভাবে আবার বললেন, "দেখো না বাবারা কি করেন।" এরপর একটা গঠন মূলক চিন্তা মাথায় পাকও খাচ্ছে। আবার বাড়ী যাবার পথে বাবার কথাটা কানে বাজছে, "দেখ না বাবারা কি করেন।" মনটা যেন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ঝুলছে। কষ্টটা মায়ের জন্যই বেশী হচ্ছিল। অসুস্থ মাকে জল পড়ে ভিজতে দেখলাম। অনেক কষ্টে তৈরী বাড়ীটা অমনভাবে ফাট ধরল। এইসব চিন্তা নিয়ে সেদিন বাড়ীতে ঢুকব, এমন সময় পাড়ারই এক বয়স্ক ভদ্রলোক, কিন্তু আমাকে দাদা ডাকেন, হঠাৎ আমার বাড়ীর কাছে এসে বললেন 'বিষ্টুদা' আপনি তো ঘর করছেন উপরে, সিমেন্টের তো দরকার। আমার কাছে বেশ খান কয়েক বস্তা সিমেন্ট আছে। ঘরের কাজে লাগাব ইচ্ছা করে এনেছিলাম কিন্তু এখন হয়ে উঠছে না। সিমেন্ট গুলো জমে নষ্ট হবে খুব শিগ্গির কাজে না লাগালে। আপনি যদি নেন খুব ভাল হয় - দাম আপনার সুবিধামত দেবেন।" বলব কি কথাগুলো শুনে মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। কন্ট্রোলে সিমেন্ট পাওয়াই যাচ্ছে না, যা পাওয়া যাচ্ছে অনেক কষ্টে। তাই মনে মনে ভাবলাম, "নেড়া ভাত খাবি না হাত ধুয়ে বসে আছি," আমার অবস্থা এমনই। তার উপরে ধারে পাওয়া যাবে, এতো ষোল আনার উপর আর চারআনা। মুখে বললাম, "দেখুন, দামটা সবটা আপনি এখনই পাবেন না — তবে ২/১ মাসের বেশী হবে না, শোধ করে দেব। ভদ্রলোক বেশ খুশীমনে বললেন, "আরে! কি মুশকিল? আমি তো বলছি যখন খুশী দেবেন — ঠিক আছে।" সিমেন্ট এল কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগল। এখন প্লাষ্টারের পর দরজা জানালার কাঠ কি হবে ভাবছি। পাঠক বললে বিশ্বাস করবেন না, বাবা যেন আগে ভাগে সব ঠিক করেই রেখেছিলেন

এমনিভাবে কাঠটাও জোগাড় হোল। মাত্র ১২০০ টাকার কাঠ সস্তায় একদিন পেয়েও গেলাম বাবার কৃপাতে। আর তারপরই দরজা জানালা সম্পূর্ণ বসে ঘরটাও সম্পূর্ণ হল। তৈরী হল আমার গুরুদেবের লীলার মাহাত্ম্যে আমার পরবর্ত্তী সাধন জীবনের অন্যতম মন্দির। কেননা ঐ ঘরে ক্রিয়া করা কালীন কত যে অলৌকিক দর্শন হয়েছে কত যে মহাত্মাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ হয়েছে, কত যে মহাপুরুষ দর্শন দিয়ে, উপদেশ দিয়ে ধন্য করেছেন তা লিখে বলা যাবে না। এমনও ঘটেছে যাঁরা কৃপা করে এসেছেন, দর্শন দিয়েছেন তাঁদের মায়িক অবয়বের সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি। অর্থাৎ আগে তাঁদের দেখিনি, জানিও না তাঁদের। যেমন শ্রীশ্রী ঠাকুর আমাকে যোগপথে কত যে সাহায্য করেছেন বলার নয়। এমন অনেককে তাঁর সঙ্গে দেখেছি, যাঁদের পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। এ ছাড়া কত অশরীরী আত্মা, বিভৎস রূপী সূক্ষ্মদেহী জানালার দূরে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ লাভে এসেছেন, কাজ মিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন বলা যাবে না। দয়াল গুরু বাবাকেও দেখেছি কখনও কখনও হাত নেড়ে ভঙ্গি করে যেন কাউকে উদ্দেশ্য করে চলে যেতে আদেশ দিচ্ছেন, প্রকারান্তরে জন্মগ্রহণ করাচ্ছেন বা মুক্ত করছেন। এ সব কথা তো সব লেখা যাবে না — তাই বিরত থাকলাম শুধু এটুকু বলে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিচারে ভ্রান্তি ঘটে না, ঘটে না কোন অসাম্যতা। আর আমাদের যা ঘটে তাহোল সঠিক বিবেকের কাছে পঙ্গুতা, অজ্ঞান চিত্তে গুরুদেবকে চিনতে ব্যর্থতা, আর গুরুদেবের সামনে বসে ছেদো গুরুভক্তির তৎপরতা। কিন্তু গুরুদেব কি তাই? যা আমরা সচরাচর মনে ভাবি। এ কথা অতি সত্যি যে ঘট ঘটমে বিরাজে রাম ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রকাশ কি সব ঘটে ঘটে? রাম তো সর্ব্বঘটে কিন্তু রামের কাম অর্থাৎ রামলীলা কি সর্ব্বঘটেই প্রকাশ পায়?

তাই ভাবছি মা তো লীলা সংবরণ করলেন কিন্তু পরমারাধ্য পিতৃদেব তো দেহধরে রয়েছেন এই লীলাধামে এখনও লীলাময়

হয়ে? চিন্ময়ী যদি মৃন্ময়ী হয়ে আসতে পারে তো চিন্ময় কেন মৃন্ময় হবে না। সবই তো সম্ভব-এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, তবে বাপ আর মায়ে ভেদ কোথা? যেই বাবা, সেই তো মা-যে শ্যাম সেই তো শ্যামা, যে রাম সেই তো রমা, যেই কৃষ্ণ, সেই তো রাধা, এ সবই তো ব্রহ্ম সাধনার পথিকের নানা ভাবের প্রতিফলন। সবই তো দয়াময় গুরুর নানাভাবের লীলাময় রূপের প্রকাশ। তাই সর্ব্বরূপের রূপকার, সব আধারের মূলাধার, সব ব্যক্তের বাস্তুকার দয়াময় শ্রীগুরুর চরণ সার মনে করাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মনে হয়। শুধু মনে হয় কেন, পারলে ইচ্ছা করে পরাণটারে দুই হাত দিয়া বাঁধি, প্রাণের প্রাণ গুরুদেবের চরণ ধইর‍্যা কাঁদি, আর একান্তে দুজন মিলে প্রাণের কথা ফাঁদি। তাই তাঁরই কথায় ফিরে আসা যাক্ আবার।। সেই যে সেদিন বলছিলাম না যে বাবা হঠাৎ আমাকে ডেকে নিয়ে তারকদার বাড়ীতে লুঙ্গি পড়া অবস্থায় কোনরূপ মানসিক প্রস্তুতির অবকাশ না থাকা কালীন তাঁর অযাচিত কৃপায় আমাকে ষষ্ঠ ক্রিয়া দান করলেন, সেই প্রসঙ্গেই এসে 'হঠাৎ' কথাটা একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি বাবা যে আমাকে হঠাৎ ক্রিয়া দান করলেন তা কি নিছকই হঠাৎ একটা খেয়াল অথবা তার কোন গূঢ় অর্থ বহন করছে যা আমাদের অজানা, একটু ভেবে দেখা যাক্।

☞ হঠাৎ কথাটার তাৎপর্য্য

হঠাৎ শব্দটা একটা তৎসম শব্দ। হঠ কথাটার ক্রিয়া বিশেষণ পদবাচ্য, ব্যাকরণগত বা লৌকিক শব্দের বিশ্লেষণ তাই বোঝায়। অর্থাৎ হঠ শব্দ থেকে হঠাৎ এর উৎপত্তি। হঠ শব্দটীর অর্থ হোল অসংস্কৃতে পরাজয়, বলপ্রয়োগ অথবা পশ্চাৎ অপসরণ আর হঠাৎ কথাটীর অসংস্কৃত অর্থ অকস্মাৎ, সহসা, অতর্কিতে, অথবা পূর্ব্বাপর

বিবেচনা না করে কোন কার্য্য সমাপ্তির অবস্থা। 'হ' অর্থে চন্দ্র 'ঠ' অর্থে সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে বোঝায়। সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে হঠাৎ শব্দটি হঠ শব্দের ক্রিয়া বিশেষণ হলে দাঁড়াল বলপূর্ব্বক কোন কাজের দ্বারা হ এবং ঠ কে পশ্চাৎ অপসারণ করে বা পরাজিত করে বা কর্ম্মচ্যুত করে তা থেকে কোন গৌরব জনক অবস্থা প্রাপ্তি। অর্থাৎ এমন একটি ঘটনার স্বীকৃতি লাভ যা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা দ্বারা আসে না। সোজা কথায় স্থিতিলাভ জনক অথবা স্থিরতা স্বরূপ কোন একটি বিশেষ ব্যাপারকে বোঝায়। এখন তাই মনে হয় যে, আমরা দেখছি বাবা আমাকে হঠাৎ ক্রিয়া দান করলেন। কিন্তু বাবাই তো হঠাৎ কাজ করতে পারেন একমাত্র। কারণ এঁদের কাছে তো কাল অখন্ড, সময় বা অসময় বলে কিছু নেই। যা আমাদের মত অজ্ঞানীদের আছে। কারণ আমরা কালকে খন্ড করে কালের বশে চলি আর এঁরা কালকে জয় করে কালজয়ী হয়ে কালকে নিজের বশে রাখেন। অর্থাৎ এঁরা পূর্ণ স্থিরত্বে অবস্থান করে অথবা ছায়ায় থেকে সমস্ত কাজই করে থাকেন। কার্য কারণ সম্পর্ক সেখানে চিরসত্য, কোন কাজের জন্য আমাদের মত সাধারণ জীবের ন্যায় কালের অপেক্ষায় থেকে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। সত্যের জ্ঞানালোকে অবস্থিত রাজ্যে থেকে, চিরস্থিরত্বের বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে কালজয়ী মহাকাল সেজে কালীকে জন্মদান করতে এঁরা সক্ষম। এঁরাই পারেন জীব সেজে এসে কালীর পা দুটো শবরূপী সাধকের রজোগুণ ও তমোগুণের স্থানে চেপে রেখে জিহ্বাগ্রন্থির ভেদের দ্বারা কেমন করে সাধক দিগ্‌বসনার দর্শন পায় তার ইঙ্গিত দিতে। আবার জীবরূপী সাধক দিগবসনার রাজ্য পার হয়ে মায়ারাজ্য ছেড়ে জ্ঞানগঞ্জ এবং শেষে বিজ্ঞানরাজ্যে কেমন করে মহাকাল সাজতে পারে তারও ইঙ্গিত বা সাধনা এঁরাই দান করেন। গুরুরূপে দেহধারী হয়ে কখনও লীলারঙ্গে

মেতে মায়ার অধীন হয়ে মায়ের অধীন হচ্ছেন, আবার কখনও মায়ের বাপ সেজে মহাকাল হচ্ছেন। এ সব ভারী মজার ব্যাপার - ভাবের ব্যাপার সাধনার রহস্যের ব্যাপার।

এই মায়ের বাপ কথাটা কলমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা মজার ব্যাপার আমারও মনে এসে গেল। আমিও যেন একবার হঠাৎই কপট ক্রোধে কাউকে ঘটনা চক্রে ঐ কথাটা বলে ফেলেছিলাম। সেই গল্পটা বেশ মজার-পাঠক মনে হয় মজাই বোধ করবেন। কারণ হোল, আমিও তো কথাটা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে বলিনি, হঠাৎই বলেছিলাম।

ঘটনাটা এইরকম -

☞ তান্ত্রিকের গল্প

তখন আমি কলকাতায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের মাণিকতলার ব্রাঞ্চে কাজ করি। রোজই প্রায় দেখি একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অফিসের ঠিক শাঁসালো কাজের সময়টাতে অফিসে ঢুকে ম্যানেজার থেকে নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী সকলের কাছে অবাধ গতিতে ঘোরাফেরা করে। পাথর টাথর বিক্রি বাটা করে, নানারকমের বুজরুকি দিয়ে ভড়ং দেখিয়ে নানাভাবে প্রলোভিত করে, প্রভাবিত করে দুর্ব্বল চিত্ত মানুষকে নানা প্যাঁচে ফেলে পাথর বিক্রীর পর চলে যায়। অফিসের সবাই যে ওর এই রকম এসে কাজের সময় বিঘ্ন ঘটানোতে সন্তুষ্ট, তা নয়, বরং অনেকেই বিরক্ত। আমিও দেখি, তবে কিছু আমলও দিই না। তাছাড়া কেন জানিনা সে আমার কাছে ঘেঁসেও নি কোনদিন। সেদিন অফিসের কাজে উপরওয়ালার ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় অফিসার ভদ্রলোক দেখলাম ঐ তান্ত্রিকের কাজের সময় এসে বিরক্ত করার জন্য নিজেই খুব বিরক্ত। তাছাড়া হুজুকে মেতে অনেকেই কাজের গাফিলতি করছে - সেজন্যও দেখলাম অফিসারটি খুব চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু

যারা আবার ঐ সব তাবিজ, কবচ, মাদুলি পাথরে ঘোর বিশ্বাসী এমন লোকও তো অফিসে কাজ করছে। তারা পাছে তান্ত্রিককে তাড়ালে অফিসারের উপর ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে ঐ ভদ্রলোক নিজে কিছু বলতে পারছে না। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার যেন একটু মনে জোর পেলেন দেখে মনে হোল। আমি যে যোগমার্গের সাধনা করি অফিসার ভদ্রলোক তা জানতেন না। তবে আমি যে কিছু একটা করি বা আমি যে সাহসী, স্পষ্টবক্তা, এককথায় বুক উঁচু করে চলি বা ন্যায়পথে চলার জন্য কোন আপোষ করি না- সব মিলিয়ে আমাকে অফিসার ভদ্রলোক - মোটামুটি আমি যে অফিসের মধ্যে ঐ তান্ত্রিককে ঘাড় ধরে বিদায় করতে একমাত্র লোক, এই বিশ্বাস ভদ্রলোকের মনে এসেছে। বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে বললেন, "বিষ্টুবাবু! শুনেছি আপনি তো কিছু সাধনা টাধনা করেন, তা ঐ তান্ত্রিক লোকটাকে অফিসে যাতে আর না আসে, একটু ব্যবস্থা করতে পারেন?" "বললেই হয়, আপনি পাশে থাকলেই পারি" - সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলেছি কি অমনি ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পাওয়ার খুশীর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ আমি বলছি, আপনাকে প্রয়োজন হলে লিখে দিচ্ছি, বিদেয় করুন তো ঐ লোকটাকে; অফিসের কাজ কর্ম্ম, ডিসিপ্লিন সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" ব্যস! আবার কি? এই মনোভাবটাই আমার দরকার ছিল, কারণ অফিস ওঁর, আর জীবনে কখনও কাউকে ছোট করে দেখার বা অন্যায় ভাবে আঘাত করা, বা সম্মান হানিকর কথা বা কাজের শিক্ষা আমার কখনই ছিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা তান্ত্রিককে গিয়ে চার্জ্জ করলাম। "ও মশায় শুনুন, অফিসের কাজের সময় রোজ রোজ এসে এভাবে বিরক্ত করছেন কেন? পাথর দিয়ে যদি লোকের ভাগ্য ফেরান যায় তাহলে নিজে ভিখিরীর মত পাথর বেচে বেড়াচ্ছেন কেন? ঐ পাথরগুলো সব গলায় বাঁধলেই তো পারেন, একদম ভাগ্য নিজের হাতের মুঠোয় চলে আসবে?" তান্ত্রিক লোকটা তখন একটা পাথর আঙ্গুলে ধরে আমার সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন বশ করার ইঙ্গিত

করে বলছে, "কে রে তুই? দাঁড়া মাকে বলে তোর ব্যবস্থা করছি।" শুনেই মেজাজ গেল সপ্তমে চড়ে। ভূতের মুখে রাম নাম। ভণ্ডের মুখে মায়ের নাম! হাতটার তর্জ্জনী তুলে তান্ত্রিক ব্যাটাকে অফিসের দরজার দিকে যাবার ইঙ্গিত করে মুখে হঠাৎ বেরিয়ে এল, তোর মায়ের বাপ্‌রে আমি-"বেরো, দূর হ বলছি, যা তোর মাকে গিয়ে বলগে, তোর মায়ের বাপ এখানে বসে আছে।" লোকটা মূহূর্ত্ত মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে কি তার মনে হোল জানিনা, গুটি গুটি পায়ে পেছিয়ে পেছিয়ে কোনরকমে দরজাটা পার হয়েই লাগাল চোঁচা দৌড়। দৌড়ায় আর তাকায়, তাকায় আবার দৌড়ায়। বড় রাস্তা পার হয়ে গিয়ে ট্রামলাইন পর্য্যন্ত ঐভাবে দৌড়াতে দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর আর দেখা যায়নি আর অফিসেও কোনদিন তাঁকে দেখা যায়নি। মনে হয় ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের কিছু দেখেছিল নইলে ঐভাবে হঠাৎ দৌড়াতে সুরু করবে কেন? মনে হচ্ছিল তাকে যেন কোন কিছু ভয়ঙ্কর বস্তু পিছনে তাড়া করেছে। এ সবই গুরুদেবের লীলা, আমি কিছু জানি না তবে আমার মধ্যে দিয়ে দয়াল গুরুদেব হঠাৎই ঐ ঘটনাটা ঘটিয়েছিলেন।

☞ ষষ্ঠ ক্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা

বাবার কথা কত বলব? কোনদিনই শেষ হবে না, কারণ, তাঁর দানের তো শেষ নেই, কথা শেষ হবে কি করে? সমস্ত দুঃখ কষ্ট বাবা নিমেষে ভুলিয়ে দিতেন, বাবাকে স্পর্শ করলেই তারা পালাত। দুনিয়াতে আমরা মানে তাঁর সন্তানেরা সকলেই ছিলাম সবচেয়ে সুখী মানুষ। পয়সার অভাব আমাদের পিছু ছাড়ত না - কিন্তু তাঁরই কৃপায় কোন কাজও বাকী থাকেনি। মন চঞ্চল হোত, বিপদগ্রস্ততা দেখা দিত, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাবার কৃপায় সব অস্থিরতা চলে গেছে, কোন বিপদ স্পর্শও করতে পারেনি। ক্রিয়া করতে জীবনে কত

রকমের বাধার সম্মুখীন হয়েছি, তারই করুণায় সব বাধা আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেছে। তিনি যে গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণং, সুহৃদ। তাই যে তাঁকে ডাকে, তাকে তিনি বুক দিয়ে রক্ষা করেন। যে তারজন্য কাঁদে নিজে এসে চোখের জল মুছিয়ে কোলে তুলে নেন। যে তাঁকে আপনার থেকেও আপনজন ভাবে তিনিও তাঁকে সেইভাবেই দেখেন। কোন অভাব তাকে স্পর্শও করতে পারে না। তবে ভাবের ভাবী হতে হবে, আর তা হলেই ভবপারে যাবার রাস্তাটা কান্ডারী এসে নিজে দেখিয়ে নিয়ে যাবে। দয়াল গুরুদেব তাঁর এই অধম সন্তানকে ষষ্ঠ ক্রিয়া দান করে, জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদদানে কৃতার্থ করেছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন কৃপা করে সেই সে রাস্তাটা যে রাস্তা ধরে চলে সাধক পঞ্চম ক্রিয়ায় দিগবসনার দর্শনে ধন্য হয়ে মায়ার রাজ্য পার হয়ে এসে উপনীত হবে দেবী কৌশিকীর পদপ্রান্তে পিতৃদর্শনের প্রার্থনা নিয়ে।

পঞ্চম ক্রিয়া হোল মহাকালীর রূপ প্রত্যক্ষ করার সাধনা। ঘোরা, ভীমা, ভয়ঙ্করী, আলুলায়িত কেশা, দিগবসনা জগদম্বার সাধনা -অনন্তরূপিনী মায়ের অনন্তব্যাপী রূপ দর্শনের সাধনা–যার সুরু আছে, শেষ নেই - ব্যাপ্তি আছে, সীমানা নেই। কালী আছেন কাল নেই, সাধক এখানে সীমাহীন মায়ের রূপ দেখে, মায়ারাজ্য ছেড়ে যেতে চায় ,নমস্কারে নমস্কারে দশদিক আলোড়িত করে মায়ের হৃদয়ে তুষ্টি এনে তাঁরই কৃপায় মায়ার বাঁধন ছেড়ে জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছানোর অনুমতি ভিক্ষায় প্রয়াসী হয়। মা তখন সন্তানকে জ্ঞানরাজ্যে পৌঁছে দেন। ষষ্ঠ ক্রিয়ায় সাধক তাই এখন হাজির হতে পেরেছে দেবী কৌশিকীর পদপ্রান্তে, যেখানে দেবী স্বয়ং চিরদিনের, চিরকালের, যুগযুগান্তরের যোগীজন বাঞ্ছিত ভ্রামরী গুহার দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। পঞ্চম ক্রিয়ায় হয় আকাশের প্রকাশ, অসীম, অনন্ত আকাশ, সীমাহীন। ষষ্ঠ ক্রিয়ায় সাধকের হয় নক্ষত্রের প্রকাশ, শুভ্র, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি নিয়ে। দিগবসনার অন্তর্ধান, নক্ষত্রের উত্থান, আলোর আগমনে অন্ধকারের

অবসান, জ্ঞানের আগমন বার্তায় অজ্ঞানতা ম্লান। এই নক্ষত্ররূপী দেবী কৌশিকী হলেন বশিষ্ঠা আরাধিতা মা তারা, যিনি তারণ করেন, যিনি ত্রাণ করেন, যিনি ভবপারে যাওয়ার একমাত্র তরণী। দেবী কৌষিকী বা কৌশিকী আদ্যাশক্তি মহামায়ার আর এক রূপ। পুরাণ মতে ইনি দেবী কালিকার কোষ বা কায়া হতে জাত। অতি জ্যোতির্ম্ময়ী নেত্ররূপে অন্ধকারা মহাঘোরা কালিকার বক্ষমাঝে ইনি বিরাজমানা। সাধককে ষষ্ঠ ক্রিয়ায় এই উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপা আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাধনা করতে হয়। প্রথমে দেবীর দর্শন ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে, অশ্রুসজল নেত্রে নমস্কারের উপচারে দেবীর তুষ্টি আনয়ন, পরে স্তব স্তুতিতে তুষ্টা মায়ের প্রীতিলাভে হয় সাধকের অন্তিম সাধনায় ব্রতী হওয়ার পথ — দেবীর বক্ষমাঝে লুকিয়ে রাখা যোগী বাঞ্ছিত ভ্রামরী গুহা দরশন। তারপরে পরবর্ত্তী ধাপ মৃত্যুগহ্বরে মরণ ঝাঁপ, সাধনার শেষ ধাপ-জীবনের মোক্ষলাভ ঘুচে যায় জীবনের সব পরমাদ, সাধক পায় পুরুষোত্তমের আস্বাদ, নিজেই নিজেকে দেয় ধন্যবাদ, ভোগ করে অমৃতের স্বাদ। সাধনাতে ব্যক্তাবস্থার সাধনা এখানেই শেষ - এর পরে পড়ে থাকে অব্যক্তের রেশ।

ষষ্ঠ ক্রিয়ার সময় বাবা একদিন বললেন, তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি বলেছিলাম ও সব দিন এখন আর নেই। ফেল করানো তো এখন যায় না। ফেল করালেই এখন পরীক্ষক ঘেরাও হবে। খুব মুশকিল হবে তখন। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন এ পরীক্ষা সে পরীক্ষা নয়। যাই হোক-এটা অবশ্যই ঠিক যে, পরীক্ষা বাবা আমাকে অনেক করেছিলেন ভিতরে ভিতরে, অত্যন্ত কঠিন কঠিন পরীক্ষাও দিয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু সদগুরুর এমনই লীলা যে তিনি দয়া করে যেমন পরীক্ষা করেন, আবার তার এত দয়া যে সন্তানকে সেই সব পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণও করে দেন। এ তাঁর একটা লীলা। এ তাঁদের অলৌকিক কার্য্য কারণ সম্বন্ধের ব্যাপার, এ তাঁদের জ্ঞানজগতের জ্ঞানীর বোধ্য বিষয়। উপযুক্ততা অর্জ্জন করে

সাধক সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির কোন সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে, সাধ্য বস্তু অর্জ্জনে কতটুকু অধিকারের অধিকারী হতে পেরেছে, মায়ার জগতের জীব হয়ে সে সমস্ত কথা জানতে যাওয়া ভুল। তবে পরীক্ষা, সাধককে সাধনার প্রতি স্তরে দিতে হবে, প্রতি মূহুর্ত্তে দিতে হবে, কোন অন্যথা নেই। বাবাকে কেউ যদি কখনও বলেছে, "বাবা এত ভার সহ্য করা যায় না," বা হয়ত কেউ যদি বলত "বাবা এত বোঝা বওয়া কি আমাদের সম্ভব?" বাবা বলতেন, "তাহলে কি বলতে চাও যে ঈশ্বর একজন ধোপার থেকেও অধম, কারণ একটা ধোপা যে, সেও জানে যে তার গাধার পিঠে কতখানি ওজন চাপাতে হবে - কতটা ওজন সেই গাধাটা বইতে পারে"। এরপর আর কোন কথা থাকে না। যে বলতে চাইত সেও চুপ, বাবাও চুপ। বাস্তবিক ভাবে দেখলে কিন্তু বাবার কথাটা অভ্রান্ত সত্য তো বটেই, কারণ যে সাধক বা সেবক যেমন যেমন পূর্ব্ব জন্মর্জ্জিত দেহ সংস্কার বশে ধারণ করেছে, তাকে সেইরূপ ফলভোগ করতেই হবে, এ সব তো তার নিজের হাতে তৈরী করা কর্ম্মফলের ভোগ, তারজন্য গুরু তো দায়ী নয়। আমি যদি পিতৃবাক্য না শুনে আগুনে হাত দিই তখন আগুন তার ফলদান করবেই। আর হাতটা যেটা পুড়বে, সেটা আমারই কাজের জন্য। তারজন্য তো পিতৃদেব দায়ী নন কারণ তিনি তো নিষেধ করেছিলেন এই কাজ করতে, আমি কর্ণপাত করিনি। এখন তাঁকে তো দায়ী করা চলে না, উচিতও নয়।

গুরুদেব তাই ভবিষ্যৎ ভেবে যাতে শিষ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা না থাকে বা থাকলে স্খলন হয় সেজন্য বহুপূর্ব্ব থেকে তাকে সাবধান করেন। নানা পরীক্ষার মাধ্যমে ফেলে কল্যাণ কামনা করে যান। এ পরীক্ষাগুলো তাই শিষ্যের কাছে কখনও কখনও অসহনীয় হলেও আখেরে কিন্তু মঙ্গলই নিয়ে আসে। বাবা একদিন দয়া করে এমন একটা কথা বলেছিলেন বেশ মনে আছে আর সেটা হোল, "বিষ্টুকে এত পরীক্ষা করলাম কিন্তু ফেল করাতে পারলাম না। ওকে দেখছি

সবকটাকেই দিতে হবে।'' এ অবশ্য তার নিজগুণের কথা, নিজের দয়ায় জালে ফুটো রেখে জেলে যেমন মাছ ধরতে গিয়ে মাছকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে, আগামী পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের আলোচনা করে শিক্ষক যেমন ভাবী পরক্ষার্থীকে মুখে না বললেও কায়দা করে সঠিক উত্তরদানে সাহায্য করে, এও তাই। নইলে লৌকিক জগতের কোন পরীক্ষাই যদি পরীক্ষার্থীকে ইচ্ছা করলে ফেল করাতে পারে তো ঈশ্বর প্রতিম গুরুদেবের ইচ্ছায় কি না হতে পারে? কি না করতে পারেন তিনি? এ তো সোজা কথা, বোঝার তো কোন অসুবিধা নেই। তাই বলছি বাবার, আমার উদ্দেশ্যে বলা ফেল করাতে পারিনি কথাটা একটা স্নেহের ব্যাপার, দয়ার ব্যাপার, করুণার কথা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা - কি লাভ হল আমার ঐ পরীক্ষায় পাশ করে। সেই তো আজও গাধার মত বোঝা বয়েই চলেছি। ছুটি পেলাম কোথা? আজ আমার বাবার দয়ায় অর্থের অভাব নেই, প্রয়োজনও নেইই বলা যায়। কিন্তু আমার এই কথাটা কেউ কি মানবে? মানতেই চায় না, চাইছে না। আগে সকলের কাছে যেমন প্রিয় ছিলাম, এখন কারও প্রিয় কারও বা অপ্রিয় হতে হচ্ছে। নিজের প্রয়োজনে কখনও গুরুদেবের কাছে কোনওরূপ প্রার্থনা জানাইনি, এমন কি আজ যেমন অহরহ শুনি, ''বাবা দেখো কি বাবা দেখবেন, যেন ক্রিয়াটা ভাল হয়'' - এসব কথা তো দূরের কথা মনের কোণেও কখনও আসেনি যে পরবর্ত্তী ক্রিয়া বাবার কাছে চাইব! কেন চাইব? না চাইতে যদি পাওয়া যায়, না চাইতে যে ঝুলি ভরে দেয়, না চাইতে যদি অতি সামান্য প্রয়োজন জাগতিক হোক বা পারলৌকিকই হোক, যদি কেউ সে প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, তাহলে আমার মনে হয়, চাইলে দাতাকে কৃপণ ভাবা হয়, বিজ্ঞ বা জ্ঞানী না মনে হয়ে আমাদের মত বিচার বুদ্ধিশূন্য অজ্ঞ মনে করা হয়, মনে করা হয় সর্ব্বজ্ঞ নয় সর্ব্বাজ্ঞ। আর শিষ্য হয়ে গুরুর বিচার, গুরুর প্রতি সংশয় প্রকাশ বা তাঁর কাজে ভুল ধরার চেষ্টা দূরের কথা, মনে আনাও পাপ। তাই চাইনি কোনদিন — পেয়েছি প্রচুর। বলিনি কোনোদিন — বলার জিনিষ দিয়েছেন ঝুলি

ভর্ত্তি করে। ভাবিনি কোনদিন কোন বলার কথা — বিনিময়ে ভাব যুগিয়ে দিয়েছেন অফুরন্ত। এই হল সদগুরুর লীলা। বলেছেন "চাইতে হয় না, না চাইলে অনেক পাবে।" কথাগুলো শুধু সত্য নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য।

পাঠক জানেন দয়াময় বাবার ক্রিয়া করা কালীন পরের ধাপের ক্রিয়ার ব্যাপার স্যাপারগুলি আমার অজান্তে কেমন করে তাঁরই কৃপায় পূর্ব্বের ধাপের কাজ করতে করতে আপনিই এসে যেত। এর জন্য আমার কোন কৃতিত্ব নেই-ঐ তো আগেই বলেছি, না চাইতেই ঝুলি ভরে দেন-তাই পাওয়ার কথা বলতেই হয় না। আর আমি পাবার পরও দাতাকে কোনদিন এই অহৈতুকী দয়ার কথা বলিনি, যা দিয়েছেন কৃপা করে, সযত্নে বুকের মাঝে রাখার চেষ্টা করেছি, আজও করি। মনে ভাবি —

"যা দিয়েছ সবই তো তোমার
নিমেষে তা ফিরায়ে নিতে পার শুধু তুমি,
অহঙ্কারে মদমত্ত মন ভাবে শুধু এ ধন আমার
এ সবেরই অধিকারী আমি-
ভাব দেখে হাসে অন্তর্য্যামী।"

আমি তাই বাবার কাছে কোন প্রার্থনা কখনও জানাইনি, কখনও না-যখন যা দিয়েছেন মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। আমি ছিলাম তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, বাবার আদেশ পালন করতে পারলেই আনন্দ পেতাম। তাই ষষ্ঠ ক্রিয়া অনুশীলনের সময়ে পরের ধাপের ক্রিয়ার অনুভূতি জাগলেও বাবাকে কোনদিনই জানাইনি। কারণ এটা তো ঠিক যে বাবা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, আমার কি অনুভূতি হচ্ছে বা না হচ্ছে সবই মহাযোগী জানতেন। আর সেটা তাঁর কার্য্য কলাপের মধ্যে দিয়ে মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিতেন।

বাবা আমাকে কৃপা করে ষষ্ঠ ক্রিয়া দান করে দেবী কৌশিকীর আরাধনার মন্ত্র দান করেছেন, যে ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সাধক ধন্য হবে যোগীদের চিরবাঞ্ছিত ভ্রামরী গুহা দর্শন করে। এবং আরও কৃতার্থ হয় গুহার মুখ আগলে দাঁড়িয়ে থাকা আদ্যাশক্তির অংশোদ্ভুতা দেবী কালিকার কোষ হতে জাতা তাঁরই আলোকময়ী রূপে রূপান্তরিতা নক্ষত্ররূপা দেবী কৌশিকীর মাতৃরূপ দর্শন করে। সে এক অভাবনীয় অবর্ণনীয়, অভূতপূর্ব্ব মনোহারিণী মূর্ত্তি। সে রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জগতের কোন ভাষাতেই সে রূপের আভাষ টুকুও বর্ণনা দেওয়া যায় না। শুধু বলা যায় ''দেখলে সে রূপের কণা যোগীশ্বরের জ্ঞান থাকে না।'' পাঠক অনুমান করতে পারবেন - কি সুন্দর, কি মনোহরণকারী, কি নয়নাভিবাম সে রূপের দৃশ্য, যে দৃশ্য দেখে যোগীশ্বর স্বয়ং মহাদেব জ্ঞানহারা হয়ে যান। অর্থাৎ বিচার করলে যা দাঁড়ায় তাহল এই যে, মা কৌশিকীর দর্শনলাভে কৃতার্থ সন্তান এর পর পরবর্ত্তী ধাপ জ্ঞানহারার রাজ্য অর্থাৎ পুরুষোত্তমের রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হবে। যেখানে গেলে, ''সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই'' অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে উপনীত হতে পারবে। ধাপে ধাপে সন্তান অগ্রসর হচ্ছে রূপ থেকে রূপাতীতে। পুরুষোত্তম সাধনা পর্য্যন্ত রূপের সাধনা, তারপরই সব অরূপ, অব্যক্ত, ব্রহ্মরাজ্য, যা মুখে বলা যায় না। তাই রূপকাকারে যোগীশ্বরের জ্ঞান থাকে না বলা হয়েছে মনে হয়। যে কথাগুলো বলছিলাম সেই কথায় ফিরে আসি।

দেবী কৌশিকী দাঁড়িয়ে আছেন ভ্রামরী গুহার দ্বার আটকে রেখে। ভ্রামরী গুহা অর্থে ভ্রমর কালো তমসাচ্ছন্ন গুহা। সোজা কথায় মৃত্যুর অন্ধকার, যে অন্ধকারে প্রবেশ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে পুরুষোত্তমের দেখা মিলবে। মা আমার দয়াময়ী, তিনি পিতার কাছে সন্তানের যাওয়ার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকার ক্রিয়ায় নমস্কারে নমস্কারে,স্তব স্তুতি, আরাধনা, চোখের জলে তাঁর পূজা ঠিক ঠিক সমাপ্ত করতে পারলে, সন্তানের সেবায় তুষ্ট হয়ে, কৃপা করে তখন

তিনি পথ ছেড়ে দেন। তখনি গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি মেলে। সন্তানকে ছাড়তে মন তাঁর চায় না। মায়ার রাজ্য থেকে সন্তানকে ছেড়ে চলে যেতে দিতে, সন্তানকে মৃতুগুহায় পৌঁছে দিতে, মায়ের কোল খালি করে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে চলে যেতে দিতে কোন মায়েরই বা ইচ্ছা হয়? তাই রূপকের ছন্দে এই পথ আগলে তিনি যেন দাঁড়িয়ে থাকেন। এই ভাবের কথাই যেন বাবার মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত সন্তানের শিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, সম্মান প্রাপ্তির উন্নতি হবে, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে লৌকিক জগতের মমতাময়ী মা যেমন চোখের জলে ছেলে কে বিদায় দেন এও যেন ঠিক সেইরূপ সন্তান স্নেহে অন্ধ মায়ার অধিশ্বরী মহামায়া দেবী কৌশিকী মৃত্যু গহ্বরের ভ্রামরী গুহায় সন্তানকে পিতৃ দর্শনে ঝাঁপ দিতে উদ্যোগী দেখে প্রথমে ব্যথা পান, দ্বার আগলে রাখেন কিন্তু পরে সন্তানের সাধনার অগ্রগতিতে, স্তব স্তুতিতে মুগ্ধ জননী সন্তানের উপযুক্ততা বিচার করে, পিতৃদর্শন ছাড়া সন্তানের মুক্তি হবে না চিন্তা করে নিজের বক্ষ চিরে শেষে ভ্রামরী গুহার অভ্যন্তরে সন্তানকে প্রবেশের অনুমতি দান করেন সন্তানেরই সর্ব্বকালের সর্ব্বনাশের জন্য—

আমিও তাই এই অবস্থায় বাবা যখন একদিন ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বললাম, "নক্ষত্র ভেদ করতে চাইলাম পারলাম না। আজ ভয় পেয়েছি বাবা!" বাবা অনুদ্বিগ্ন স্বরে শুধু বলেছিলেন "ওটা হলে তো শেষই হয়ে গেল।" অর্থাৎ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রচ্ছন্নভাবে বাবা শুধু একটি মাত্র কথায় আমার ক্রিয়ার স্তরের অবস্থান পরীক্ষা করে নিলেন। সাধনা চলছে, যেমন চলেছে পূর্ব্বাপর। গুহার ভিতর প্রবেশের যেমন প্রচেষ্টা চলছে, গুহার ভিতর থেকে যেন এক দুর্ব্বার আকর্ষণ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন সে আকর্ষণ থেকে কিছুতেই মুক্ত করা যাবে না। কি প্রচন্ড সে টান, সেই আকর্ষণ, তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখে কার সাধ্য!

ভয়ঙ্কর এক অসহায় অবস্থা। প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছি তখন। সেই দিনের সেই মূহুর্ত্তের কথা কখনও ভোলা যাবে না, ভুলব না কোনদিন। হাত দিয়ে কম্বলটাকে চেপে ধরে রেখেছি, কিছুতেই পারছি না টান থেকে নিজেকে বাঁচাতে। ভীষণ একটা কিছু দুর্ব্বার আকর্ষণে আমাকে সেই গুহায় টেনে নিচ্ছে। মনে হচ্ছে সব শেষ, বাঁচার কোন উপায় নেই, আমাকে রক্ষা করারও কেউ নেই। আর এখন আমাকে যে এতদিন বুকে করে রক্ষা করে এসেছে সেই তো প্রাণপণে কাছে টেনে নিতে চাইছে। ওঃ কি ভীষণ অন্ধকার! কি জমাট কালো নিকষ কালো গুহার অভ্যন্তর? সার্থক নাম বটে গুহার। ভয়ঙ্করী গুহা-মনে হলে ভয় হয়, কোথায় তার শেষ, কোথায় তার তল? কতদুর বিস্তৃত কে জানে? গুহা শুধু টানছে - টানছে, টানছে, টানছে জাগতিক সব বন্ধন ছিন্ন করতে, সব বোধের ইতি ঘটাতে, টানছে বিস্ময়কর আকর্ষণে সব কিছু পিছনে ফেলে তার দিকে এগিয়ে যেতে, সব কিছু ভুলে গিয়ে তার দিকে আকর্ষিত করছে। অসহায় ভাবে দেখছি বিস্মৃতি ঘটছে-যেন আত্মীয় পরিজন, বন্ধু, স্বজন থেকে দূরে বহুদূরে অসহায়ভাবে টানের জোরে হারিয়ে যাচ্ছি। চিরবাঞ্ছিত সেই গুহা কিন্তু এখন আমার কাছে যেন-সব কিছু কেড়ে নিচ্ছে, আমার ধন সম্পদ, আত্মীয়, স্বজন সব কিছু হারিয়ে ফেলছি নিজেকে, হারিয়ে যাচ্ছে, সব কিছু কোথায় যেন চলে যাচ্ছি, সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হারিয়ে ফেলছি, হারিয়ে যাচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে, গ্রাস করছে, ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছি আমি। ছেড়ে যেতে চাইছি না, ইচ্ছা নেই যাবার, তবু এগুতে হচ্ছে, থাকার বাসনায় কম্বলটা দুটো হাতে জোরে চেপে ধরেছি, কিন্তু হায়, ঐভাবে থাকতে থাকতে কখন হারিয়ে গেছি, চলে গেছি গুহার ভিতরে, গুহা আমাকে কখন গ্রাস করেছে জানিনা। তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই সত্যি বলছি, কিছু বুঝিনি, কিছু জানিনা - কিছুই আর মনে থাকেনি।

☞ বাবার পরীক্ষা

এর বেশ কিছুদিন আগে একবার শিবরাত্রির দিন দেবীধামে বাবার কাছে আমরা হাজির আছি। অজিতদা, দিলীপদা, নিতাই এইরকম বেশ কয়েকজন যারা স্থির বায়ুর ক্রিয়া করতাম সবাই আমরা। সেদিন সেই সময় বাবার কাছে আমরা কোন এক প্রহরের ক্রিয়া করছি অথবা এমনই বোধহয় গল্পটল্প হচ্ছে, এমন সময় আমি যেন বাবার কৃপায় হঠাৎই বিবশমনে কি রকম ধ্যানমগ্ন ভাব, এমন একটা অবস্থায় আছি-নিজে কিন্তু কিছু বুঝিনি। তখন ষষ্ঠ সোপানের ক্রিয়া করি। হঠাৎ সেইক্ষণে বসে সেই সময়ে বাবার ঈষৎ মৃদু উচ্চারিত প্রশ্ন শুনে বাহ্যভাব ফিরে পেতেই প্রশ্নের অর্থ বোধগম্য হল, বাবা জানতে চাইছেন, "কি রকম বুঝলে?" প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি বাবা ফিক্ ফিক্ করে হাসছেন। আর এড়াবার কোন পথ নেই, কারণ গুরু সর্ব্বজ্ঞ। তিনি, আমি সেই অবস্থার প্রাপ্তিতে কোথায় ঘূরছি কি দেখছি জ্ঞান দৃষ্টিতে সবই বুঝে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন এবং এমনভাবে করেছেন যা খুবই হঠাৎ। চুপ করে থেকে প্রথম বারের প্রশ্ন এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু না, এড়াবার পথ নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাবা আরও নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ছুড়েছেন "কতবড়?" অন্যে না বুঝলেও আমি তো বুঝছি বাবা কি জানতে চাইছেন? গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা হবে ভেবে উত্তর দিলাম "বড়" বাবা হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন "এতবড়? খুব উজ্জ্বল?" ঘাড় নেড়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব ইঙ্গিতে দিতেই বাবা খুব সন্তুষ্ট হয়ে মৃদু হাসিতে মুখমন্ডল ভরিয়ে শুধু খুশীর প্রকাশ দেখালেন। এইভাবে বাবা সকলের সামনে অথচ প্রচ্ছন্নভাবে আমার ষষ্ঠ ক্রিয়ার অবস্থালাভ টুক করে দেখে নিলেন। এই ক্রিয়ায় নক্ষত্রের প্রকাশ হবে, তার ঔজ্জ্বল্য দেখা যাবে, ব্যাপ্তি দেখা যাবে এবং দয়াময়ী মা দয়া করে প্রসন্না হলে তবে ভ্রামরী গুহার পথ দেখাবেন। এ সব এই ষষ্ঠ ক্রিয়ার রহস্য আর সাধকের সেই অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে। তাই এই প্রশ্ন, তাই এ পরীক্ষা এবং হঠাৎ পরীক্ষা

যা বাবা টুক করে সেরে নিলেন। এমন পরীক্ষা করা ওদেরই সাজে কারণ ওইদিনের ঐ সময়ে সকলের সামনে বসে সত্যই এমন একটা অবস্থা সেদিন বাবার সামনে বসে থেকে তিনি আমাকে দান করেছিলেন যার জন্য আমি ঐ সময়ে ঐ অবস্থা প্রাপ্তিতে দেহ ছেড়ে মনটা কেন জানিনা সত্যই ঐ জায়গায় অবস্থিতি করছিল, যেখানে গেলে গুহার দ্বারে দেবী কৌশিকীর দর্শন মেলে। এ সব তাঁরই লীলা, তাঁরই পরীক্ষা, আবার ঐ সব পরীক্ষাতে পাশ করতে যে অবস্থার প্রয়োজন সেটাও ছিল তাঁরই দান, তাই সম্ভব হয়েছিল। এতে আমার কিছু কৃতিত্ব আছে বলে বোধহয় না। এ সবই গুরুকৃপা। তাই আবার ফিরে আসি সেই কথাতেই।

ভ্রামরী গুহায় প্রবেশ করে হারিয়ে গেছি - হারিয়ে গেছে বোধ, সত্তা, অনুভূতি, জগৎ, ব্রহ্মান্ড সব কিছু, সব থেকেই আমি দূরে। কিন্তু এই অবস্থাটা একদিনেই পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। আগেই এর মহড়া বাবা কয়েকদিন করিয়েছেন। এই দিন ছিল চরম অবস্থা। আগেই বলেছি যে, কোন পরবর্ত্তী ক্রিয়ার অবস্থা গুরু কৃপায় আমার পূর্ব্বের সোপানের ক্রিয়া করা কালীন আপনিই বোধে আসত। তাই ষষ্ঠ ক্রিয়ায় পরের সোপানের ক্রিয়া অর্থাৎ সপ্তম ক্রিয়ায় যে পুরুষোত্তমের সাধনা তা আমার বোধে এই ষষ্ঠ ক্রিয়াতেই দয়াল গুরুদেব আগে ভাগেই দিয়ে দিয়েছিলেন এবং সযত্নে আমি তা মনের কন্দরে গোপনে রেখে দিয়েছিলাম কাউকে বলিনি, এমন কি বাবাকেও বলিনি। বলতামও না কোনদিন। তাই বাবা যখন পরের সোপানের ক্রিয়া দান করতেন তখন বোধহত যে এই ক্রিয়ার প্রক্রিয়াটা যেন আমার চেনা। অবশ্য তার জন্য বাবাকে মুখে কিছু বলতাম না। পুরুষোত্তম সাধনার পর ব্যক্ত সাধনার শেষ, অব্যক্তের সুরু। তারপরের কথা বলা যায় না সেখানে গুরু শিষ্য একাকার। অর্থাৎ সাধকের তখন একেবারে সোহংভাব, পরিপূর্ণ ডাইলুট অবস্থা, সেই অবস্থা কহনে না যায়, সে অবস্থা মনের গহনে, অনন্তশয়ানে অবস্থিত

থাকে। সে অবস্থাই অদ্বৈতবাদীর অবস্থা, সেই অবস্থা সমাধির অবস্থা, সেই অবস্থা সাধকের মোক্ষ প্রাপ্তির অবস্থা সেই অবস্থা এক কথায় শুধু যার হয় সেই জানে-চেয়ে চেয়ে অনন্তের পানে, যার হৃদি এক হয় পরমাত্ম সনে।।

বাবার শ্রীমুখে শুনেছি এইরকম অবস্থা বাবারও নাকি হয়েছিল - কিন্তু বাবা সেদিন ভয়ে নাকি কম্বল ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। এ কথা বাবার নিজের মুখে শুনেছি তাই লিখলাম, বাবা যেন ক্ষমা করেন, নচেৎ লিখতাম না। আমাকে যদিও পালাতে হয়নি আর তাছাড়া পালাবই বা কি করে? ঐ অবস্থা পাওয়ার পর মনের বল, গতরের শক্তি সব যেন হরণ করে নিয়েছেন। তবে তার পরের অবস্থা অত্যন্ত আনন্দ ঘন অবস্থা, আর সে অবস্থা যেটা শুধু নিজবোধ্যগম্য, অপরকে বলে বোঝান যায় না।

এইভাবেই যখন দিন কাটছে, বোধহয় বছর দুই খুব জোর, সেই সময়ে বাবা আবার হঠাৎ একদিন বললেন, "বিষ্টু! তোমাকে সপ্তম ক্রিয়া দিলে তুমি যদিও ঠিক করতে পারবে, তবুও আরো কিছু দিন ক্রিয়াটা অভ্যাস কর - অবস্থাটা আরও পাকা হোক।" বাবা কিন্তু ইদানীং আর আমাকে কোনরূপ ক্রিয়ার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতেন না বড় একটা। কেন জানিনা তবুও আবার সেই কথাই বলতে হয় যে সর্ব্বজ্ঞ গুরু অলক্ষ্যে থেকে আমার প্রতিটি লোমকূপের খবর যিনি জানেন তাঁর কাছে কি আমার অবস্থা অজানা-কিন্তু জেনেও এঁরা লৌকিকভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে ভালবাসেন বলে শিষ্যকে ক্রিয়ার কথা বলে লৌকিকভাবে ছলনা করতে লোক দেখান জিজ্ঞাসা করেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি কোন সন্তান ক্রিয়ার প্রতি সাময়িক ঢিলেমি আনে অথবা কোন কারণে শৈথিল্য দেখায় তখন দয়াল গুরুদেব তাকে যে ঠিক নজরে রেখেছেন শাসনসূচক বাক্যে বা সাবধানবাণী দিয়ে সে কথা অন্তরে তাকে

বুঝিয়ে দেন এবং এটা প্রায়ই দেখা যায়। সোজা কথায় শিষ্যের প্রাণে যিনি বাস করছেন, শিষ্যের দেহ মনের সব খবর তাঁর নজরে কি করে এড়াবে। তাই বাবা ইদানীং ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা না করলেও আমার যে ষষ্ঠ ক্রিয়া করা কালীন সপ্তম সোপানের অবস্থা প্রাপ্তি তাঁর কৃপাতেই অনুভবে এসেছে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটিয়ে তিনি তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমার ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তাঁর অগোচরে নয়। ব্যাপারটা খুব ছোট কিন্তু অধ্যাত্মবাদী পাঠকের কাছে গভীর ব্যঞ্জনাময়।

☞ অধরারূপী গুরুদেব

সেদিনও বাবার বাড়ীতে অনেকেই ছিল। আনন্দে মশগুল হয়ে বাবার কাছে সব বসে আছে আর রসরাজ পুরুষ মাঝে মাঝে রসের বন্যা এনেদিচ্ছেন। কিন্তু সেদিনটা ছিল আমার সর্ব্বনাশ পরীক্ষার দিন। অর্থাৎ বাবা একটা ছোট প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমাকে ফেলে আমার ইচ্ছার নাশ, বাসনার নাশ কতটুকু ঘটেছে - যা ঘটলে ক্রিয়াপ্রাপ্তির যোগ্যতা আসবে - সেই পরীক্ষাটা ওরই মধ্যে সূক্ষ্মভাবে টুক করে সেরে নিয়েছিলেন আর এই সেদিনটা অর্থে বোঝাতে চাইছি বাবা যেদিন আমাকে বলেছিলেন "তোমাকে সপ্তম ক্রিয়া দেওয়া যায়, তবে আরও একটু অনুশীলন কর, অবস্থাটা পাকা হোক।" আমার কিন্তু এ সব ব্যাপার কিছু রেখাপাত করেনি। ক্রিয়া করতে বরাবর ভাল লাগে ক্রিয়ার আনন্দে ক্রিয়া করি, এখনও তাই করি - কি অবস্থা আসবে অথবা কেন অবস্থা এল না বা পরের ক্রিয়া পেতে হবে এইবার - এ সমস্ত বাসনা কোনদিনই মনে রাখিনি। বাবা জানেন পরের ক্রিয়ার অবস্থাপ্রাপ্তি পূর্ব্বের সোপানে এলেও কাউকে বলা দূরের কথা বাবাকেই তো বলতাম না। বাবা দয়া করে যা দিয়েছেন, যে সোপান অনুশীলনের আদেশ দান করেছেন, তাই

করতাম বরাবর। অবস্থা প্রকাশ তাঁর কৃপাতে এলেও নিজ হাতে বাবা যতদিন না পরের সোপানের ক্রিয়া দান করেছেন আমি নিজ থেকে সেই প্রকাশের অনুশীলন তো করিই নি, অনুশীলনের চিন্তাও আসেনি। কারণ সেই বাসনা এলে বা সেই অনুশীলনে রত হলে এই পরীক্ষায় সেদিন বাবার কাছে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হোত। যাইহোক সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার ব্যাপারটা বলি। পাঠককে অনুরোধ, বাবার বলা দুটো কথা বিশেষভাবে এখানে স্মরণ করতে -একটা হোল তোমাকে সপ্তম সোপানের ক্রিয়া দেওয়া যায় এই বাক্যের যায় কথাটা আর দ্বিতীয় হোল অবস্থাটা পাকা হোক এই পাকা কথাটা।

আনন্দধামে বাবার সঙ্গে সবাই রঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে আছে, আমিও রসময়ের লীলা দেখছি - তখনও জানিনা আমাকে নিয়ে কি লীলা হবে। এমন সময় বাবা আমাকে ডেকে একান্তে ষষ্ঠ সোপানের ক্রিয়ার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেছেন, যথারীতি সরল মনে গুরুদেবের সমীপে আমার অবস্থাটাও ব্যক্ত করেছি। তখনই বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন "এখন কি করবে?" পাঠক নিশ্চয়ই অধরা গুরুর রূপ দেখছেন এই কথায়। কেননা, তিনি যে আমার ষষ্ঠ ক্রিয়ার মধ্যে সপ্তম সোপানের অবস্থা তাঁর দয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে জেনেই তো আগেই বলেছেন যে তোমাকে সপ্তম সোপানের ক্রিয়া দেওয়া যায় এবং তুমি তা টুক করে পারবেও, তবুও ধরা দিয়েও না ধরা অর্থাৎ গুরুদেবের অধরা রূপ দয়া করে প্রকাশের জন্য লৌকিকভাবে কাছে ডেকে অবস্থা জানতে চাইলেন। বাবার 'ঐ এখন কি করবে' প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম "আপনি যা বলবেন।" বাবা তখন বললেন, "আমি কি জানি?" আমি উত্তর দিলাম, "তাহলে আপনি যে সোপানের অনুশীলন করার আদেশ দিয়েছেন তাই করব।" বাবা তখন একটু মুচকে হাসলেন মাত্র। পাঠক ভেবে দেখবেন কি সূক্ষ্মভাবে কি গভীর পরীক্ষার ব্যাপার। বাবা সেদিন যখন বলেছিলেন, "অবস্থাটা পাকা হোক", সেদিনই তিনি আমার অহংনাশ, প্রবৃত্তিনাশ,

বাসনানাশ প্রভৃতির সময় দিয়েছিলেন। এই ক্রিয়ায় আরও অনুশীলনের মাধ্যমে কতটুকু অগ্রগতি তার পরীক্ষা নিলেন আজ, অর্থাৎ ওগুলো নাশ হলে তবে তো ঈশ্বর প্রাপ্তি সহজ হবে নচেৎ বিলম্ব ঘটবে। কারণ বাবারই মুখে শুনেছিলাম এতটুকু কামনা বাসনার আঁশ থাকতে ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটবে না। আজ তাই ভাবি ভাগ্যিস উত্তরটা ঐভাবে এসে গিয়েছিল তাঁর দয়ায়। মানে উনিই দয়া করে উত্তরটা ঐভাবে বের করে নিয়েছিলেন তাই রক্ষা। খুব জোর বেঁচে গেছিলাম সেদিন, আর ঠিক এই ঘটনার পরই কিছুদিনের মধ্যেই সপ্তম সোপানের ক্রিয়া দয়াময় দান করেছিলেন এই অধম সন্তানকে। উত্তরটা যদি অন্যভাবে আসত, তাহলে?

স্বয়ং ব্রহ্মরূপী গুরুদেবের এইভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা তাঁরা যে কতভাবে করেন পাঠক শুনে হয়ত নিরাশ হবেন কিন্তু বিশ্বাস থাকা উচিত যে এদের দয়ার অন্ত নেই, দয়ার সাগর এঁরা। তাই শিষ্যেরই কল্যাণের জন্য এঁরা যেমন পরীক্ষা করেন, নিজগুণে কৃপা করে শিষ্য যাতে সসম্মানে পরীক্ষা সাগর পার হতে পারে, তারও ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই ঠিক করে রেখে দেন। বাবাকে আমি বলতাম এই কথাটা প্রায়ই, "পরীক্ষা চলে চলুক কিন্তু ছাত্র ফেল করলে তো বাবা মাষ্টারেরই দোষ হবে।" বাবা ফিক্ ফিক্ করে হাসতেন। এদের কাছে তাই কোনদিন কিছু চাইতে নেই, চাওয়ার আগেই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু এরা তার সামনে আগেই হাজির করে দেন। অপেক্ষা শুধু কালের - অর্থাৎ জ্ঞানী গুরু শিষ্যের ঠিক কোন সময়ে কি অবস্থা প্রাপ্তি ঘটবে বা ঘটছে, তখন তার জন্য কি প্রয়োজন, সদা জ্ঞানালোকে অবস্থিত গুরুদেব তো সবই তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় পূর্ব্বাহ্নেই পরিচিত আছেন আর তাই সেই প্রয়োজনীয় পসরা শিষ্যের পূর্ব্বভাগে সাজিয়েই রেখেছেন, শিষ্য তার উপযুক্ততা দিয়ে অবাধে তা ভোগ করবে বলে। যেমন ধরা যাক্, কোন লৌকিক পিতাই তাঁর লৌকিক বিচারে নিজের জন্য ব্যবহার্য্য আগ্নেয়াস্ত্র তাঁরই

অবোধ শিশুসন্তানকে খেলার ছলেও হাতে করতে দেবেন না কারণ এতে তার অনিষ্ট হবে বা হতে পারে। কিন্তু ঐ শিষ্যটি কালক্রমে যুবক হলে উপযুক্ততা বিচার করে ঐ শিশুর পিতাই ঐ অস্ত্রটি স্বেচ্ছায় তার হাতে তুলে দেবেন, প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। তাই লৌকিক পিতার বিচার যদি সঠিক হয় ঈশ্বরের বিচার তো আরও বাঙ্ময়, আরও সূক্ষ্ম, আরও অর্থবহ হবে, এ আর কোন কথা?

☞ যবনিকাপাতের দিনগুলি

ঠিক একই ভাবের আরও গভীর ব্যঞ্জনাত্মক পরীক্ষা বাবা নিয়েছিলেন অনেকবার এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় পরীক্ষাসমুদ্র অবাধে পারও করিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। সে সব ব্যাপার শুধু আমার অনুভূতিতে চিরন্তন হয়ে বিরাজ করছে, বিরাজ করছে হারিয়ে যাওয়া বাবার বিরহের স্মৃতিতে, বিরাজ করছে আমার প্রতি বাবার ভালবাসার প্রাবল্য দর্শনে ঈর্ষাতুর অন্যজনের পরশ্রীকাতরতার স্মৃতিতে। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা যেন সেই সময় থেকে আর আমাকে কাছছাড়া করতেই চাইছিলেন না? এমন কি বাবার বাড়ীতে থাকা ঐ কিশোরগুলো, সন্দীপ, বুজি, প্রদীপ ইত্যাদি কয়েকজনও দেখতাম আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নবজীবন লাভ করতো - সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। বাবাও মাঝে মাঝে ওদের রঙ্গ করে বলতেন, "তোরা যে বিষ্টুর ভক্ত হয়ে গেছিস দেখছি!" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের রসজ্ঞভাবে কি প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যৎবাণী — আজ ভাবি। আমার অবস্থা এদিকে সঙীন হয়ে উঠছে নানাভাবে। ঐ আনন্দধামে এই সময় থেকেই, যদিও ব্যবহারিকভাবে কোন বাহ্যিক অসুবিধা হোত না, তবুও আমার প্রতি বাবার স্নেহের প্রকাশ অনেকের মধ্যেই ঈর্ষার বিকাশ ঘটাল, যার আভাষ আনন্দধামবাসীদের অনেকের আচার আচরণ, কার্য্যকলাপে ফুটে উঠতে সুরু করলেও বাবার মুখ চেয়ে আমাকে তারই মধ্যে বসবাস

করতে হোল। আমি অবশ্য ঐ সমস্ত ব্যাপারকে আমল দিতাম না। কারণ আমার মনে ক্রিয়া ছাড়া সংসার, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, গুরুগৃহে যাতায়াতকারী অন্যান্যেরা কেউই বসতি গড়তে পারেনি কখনও, হৃদয়ে বাবার আসন পেতেছিলাম ক্রিয়া পাওয়ার দিন থেকে, গুরু কৃপায় আজও সেই হৃদয়াসনে বাবা ছাড়া অন্য কারও কোন স্থান নেই। সেইটুকু শুধু আমার বাবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, বাবাকে একান্তে পাওয়ার জন্য ঐ স্থানটুকু কাউকেও প্রাণধরে দিতে পারব না কোনদিন, আমার আর যা কিছু আছে সকলে ভোগ করুক, কোন ক্ষতি নেই - হৃদয়স্থান শুধু আমার বাবার। তাই ও সব ব্যাপারে চোখ কান বুজে চলাই ছিল আমার সে সময়ের কাজ। পুরোদমে আট দশ ঘন্টা ক্রিয়া করি, বাবার বাড়ী যাই বাবাকে একান্তে চাই। বাবাকে মনোমত করে পাই এতেই সুখ, আবার কি চাই। সব কাজে তাই মনে হোত "ডর কেয়া -বাপ তো হ্যায়"। চালাও পানসী, বুক চিতিয়ে চলি আর অন্তরে বাবাকে বলি অহরহ "বাবা, আমি তোমার অধম সন্তান, তাকে হাত ধরে সঠিক পথে চালাবার ভার তোমার, আমি কিছু জানিনা"। বাবা কিন্তু ক্রমশঃ দেখছি নিজেকে যেন গুটিয়ে নিতে চাইছেন নিজের মধ্যে। এখন বাজারে যান না, টি.ভি দেখেন না। গোপালদা উপর থেকে টি.ভি সেট এনে বাবার ঘরে ফিট করে দিল, কিন্তু বাবা দেখতেন না। শুধু শাস্ত্র আলোচনা, গীতা পাঠ আর মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে ছোট ছোট রঙ তামাসা। রসরাজ যাকে এককথায় বলা যায়। শুধু রসরাজ নয়, রসরাজাধিরাজ যে পুরুষের স্বরূপ, সেই পুরুষ যদি ঐভাবে বাহ্যিকে হঠাৎ অন্তর্মুখীন হয়ে যান তাহলে তাঁর পরিচিত মহলে বিস্ময় জাগবেই। তাছাড়া বাবার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তেমনি অতীতের ঘটনাকে পেশ করার প্রতিভা, যেন সেই সমস্ত বিলীন অতীতকে চোখের সামনে টেনে এনে তুলে ধরতেন, দিনরাত হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন - কত ছোট ছোট ঘটনাকে কি সুন্দরভাবে মনের রঙে রাঙিয়ে মধুর করে শোনাতেন, সেই মানুষ যদি হঠাৎ জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাবার দিকে এগোয়,

সন্তান কখনও স্থির থাকতে পারে না। বাবার ঐরূপ ভাবান্তর দেখে মনে শঙ্কা জাগল বাবা এবার বোধহয় সরে পড়ার তাল খুঁজছেন। শরীরও বাবার খুব খারাপ হচ্ছিল ক্রমশঃ ক্রমশঃ। ঘনিষ্ঠ ২/৪ জনও এ ব্যাপারে দৃষ্টি পড়ার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম বাবার মতি গতি ভাল বুঝছি না। তারা বিশ্বাস করতে পারত না, কারণ বাবা নিজেই তখনও মাঝে মাঝে শোনাতেন "এখন এই দেহে অনেকদিন আছি"। কিন্তু আমাকে একদিন এরই মধ্যে যেদিন ডেকে বললেন, "বিষ্টু! এই দেহটা থাকতে থাকতে যতটা পার করে নাও, পরে দেখবে কত বাধা আসবে।" কেন জানিনা সেইদিনই আমি একটু অজানা ঝড়ের সঙ্কেতে ভয়ঙ্কর ভীত হয়ে পড়েছিলাম। নইলে বাবা আগে যখন স্বদেহে প্রায়ই বলতেন, "বিষ্টু! যখন 'আমি বই' হব এই দেহটা, সেদিন দেখবে কত জন স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠবে, ধর্ম্মের গ্লানি সুরু হবে।" তখন বাবার কথাতে মনে কোনরূপ অজানা ভীতির সঞ্চার হয়নি। কিন্তু আজ হোল - বোধে আসতে লাগল। শুরু হল বেহাগের সুর-দরবারী কানাড়াতে শেষ রাগিনীর কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে যা শেষ হবে, খন্ডিত আনন্দধাম দ্বিখন্ডিত হবে, পরিণত হবে "গোপালধামে" ও "খোকন ধামে"-উঃ! আজ তাই ভাবছি, ভাবছি আর এই চোখে দেখছি মহাপুরুষের বাণী কি অমোঘ? নিষ্ঠুর হলেও কি অব্যর্থ, অভ্রান্ত, চিরসত্য।

☞ একাকীত্বের আনন্দ

বাবাকে সর্ব্বদা আমি চিরদিনই একা একা পেতে চাইতাম। মনে হোত একা একা থাকলেই বোধহয় বাবাকে বেশী করে কাছে পাওয়া যায়। আজ আমি একা একাই আছি, একাই থাকতে হবে।

তাই মনটা আমার একাকীত্বের স্বাদে, আনন্দে আজ গেয়ে ওঠে, "তোমরা যে যা বল ভাই, আমি কিন্তু একা থাকতে চাই, একা থেকে একান্তেতে বাবাকে যে পাই, যে পাওয়ার বড় পাওয়া পৃথিবীতে নাই, দুয়ে মিলে একটি হয়ে জড়িয়ে থাকি তাই"। কিন্তু বাবাকে একলা একলা একান্তে পেতে গেলে তো তোমাকেও একা হয়ে যেতে হবে। আর সে একা তো শুধু বাহিরে হলেও চলবে না, অন্তে, বাহিরে সব জায়গায় তোমার একাকীত্বের প্রয়োজন হবে নচেৎ তো বাবাকে পাওয়া যাবে না। কারণ বাহিরের একাকীত্ব ও ভিতরের একাকীত্বে অনেক তফাৎ ভিতরে ভিতরে যে একা হতে পারেনি বাইরের একাকীত্ব তাকে অস্থির করে তুলবে। উল্টোদিকে যে ভিতরে ভিতরে একাকী হতে পেরেছে তার একাকীত্ব তাকে সব দিক দিয়ে পূর্ণ করে তুলবে। সে তখন সকলের সাথেই থাকবে অথচ কারো সঙ্গে মিশে যাবে না, সে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারবে, চলতে শিখবে। নিজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, সে তখন ঠিক ঠিক ভাবে সমস্ত জায়গায় থাকতে পারবে, সকলের খবর রাখতে পারবে অথচ তার খবর কেউ রাখতে পারবে না, জানতেও পারবে না। অন্যের রাখার ও জানার প্রয়োজনও তার থাকবে না, কারণ, সে হবে তখন এত সহজ ও সাধারণ যেন হাওয়ার মত। সে তখন সকলের সাথেই আছে, সকলের কাজে লাগছে, কীট পতঙ্গ থেকে বৃহদাকার জন্তু, মনুষ্য থেকে মনুষ্যেতর প্রাণী গাছ থেকে আগাছা বায়ু ছাড়া চলবে না। কিন্তু মজার কথা হোল বায়ুর কথা ভাবার মত কজন ভাবে, কজন? বায়ু এক ও অনন্য হয়ে সবার মধ্যে আনন্দের বন্যা বহাচ্ছে জানে কজন? বায়ু যে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ভাবে কজন?

বাবাকে আমি আবেদন করেছিলাম, "বাবা দুনিয়ার যত কঠিন কাজ হোক না কেন দয়া করে আমাকে দিয়ে করান।" বাবা আমার প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

☞ ভিতর বাহির একাকীত্বের পরীক্ষা

সেদিনটাই ছিল ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের দিন। রাত্রি বাড়ে, দুর্য্যোগও ঘনীভূত হচ্ছে, বাইরে যায় কার সাধ্য। কি একটা কাজে দূরে কোথাও একটা কাজে পাঠাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠল বাবার। লোক তো দরকার কিন্তু কে যাবে? রাত তখন বেশ গভীর। ক্রিয়ান্বিত ভক্তদের মধ্যে যারা ২/১জন আছে তাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বাবা আমাকে সেই কাজে যাবার আদেশ করলেন। কিন্তু বললেন, "বিষ্টু! রাত অনেক হয়েছে - তুমি কাউকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" বলেছিলাম, "না বাবা, যাই যদি আমি একাই যাব, কাউকে সঙ্গে নেবার দরকার নেই।" বাবা তবুও আবার বললেন, "একা না বোকা"। উত্তরে বলেছিলাম "আমি বোকা হয়েই চলব।" বাবা এবার যেন একটু ম্রিয়মান হয়ে বললেন, "তবে তাই যাও।" পাঠক নিশ্চয়ই এবার অনুমান করতে পারছেন যে সদগুরু কারো পাওনা গন্ডা বাকী রাখেন না। এইরকম সূক্ষ্মভাবে দয়াময় বাবা যে কত পরীক্ষা নিয়েছেন, আবার কৃপা করে উত্তীর্ণও করে দিয়েছেন হিসাব করে সব বলা যাবে না এই জীবনটাতে। জীবন আজ তাই একাকীত্বের আস্বাদ পেয়ে গেয়ে উঠতে চায় —

"সময় তো থাকবে না মা
কেবল মা তোর কথা রবে ।"

আজ বাবা নেই এই চোখে, বাবার দেহটাও নেই কিন্তু বাবার কথাটা রয়ে গেছে, রয়ে গেছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের রহস্যচ্ছলে বলা ব্রহ্মবাক্য "একা না বোকা।"

বোকা হয়েই আছি বাবা — বোকা করেই চিরদিন রাখো আমাকে এই আমার মিনতি। বোকা না হলে যে তোমাকে পাব না। বুদ্ধি এলে তো ভেদ আনবে, আনবে বিচার, কিন্তু যেখানে বিভেদ,

ভেদাভেদ সেখানে তো তুমি থাকবে না, আর তোমাকে না পেলে আমি যে বাঁচব না। তাই যতদিন দেহধরে আছি, তোমার সেবার জন্য, তোমাকে পাবার জন্য কৃপা করে আমাকে এমনই বোকাই করে রেখো ঠাকুর।।

জয়গুরু জয়গুরু,
জয়ী হবি, জয় দে।।

****

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফেলে আসা দিনগুলি মোর

মনের সর্ব্বনাশা ক্ষুধা যতকাল আছে, ততকাল ও ক্ষুধার পূর্ত্তি হয় না। এক শুদ্ধ মন হলে তখন তার একটা শালীনতা থাকে অর্থাৎ সেই মনটার তখন সৎ চিন্তা ও সৎ ভাবনা থাকে । কিন্তু তবুও মনকে কোন বিশ্বাস নেই, কখন কোন মুহূর্ত্তে কুমতির কুমন্ত্রণার করালরূপ ধারণ করে সে যে তার বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে একটা যা হোক অঘটন ঘটিয়ে বসবে কিছুই বলা যায় না। বিশ্বাস করা যায় না তাকে, তাই বিশ্বাস করতে হলে বিগত শ্বাস হতে হবে এবং তখন পঙ্গু করে দেওয়া যাবে মনটাকে অর্থাৎ শ্বাস জয় হলেই মন তোমার বশীভূত হবে আর সেই মনে তখন ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা থাকে না। আবার শ্বাসকে জয় করতে হলে শ্বাসের চরণে তেল মাখাতে হবে - অর্থাৎ অন্তর্মুখী প্রাণায়াম করতে হবে। যতকাল প্রাণের বহির্মুখী গতি থাকবে ততকাল ঈশ্বর অনুভূতির কোন উপায় নেই, কারণ, শ্বাস স্থির না হলে মায়ের

ভুবন মোহিনী রূপের সন্ধান পাওয়া যাবে না। মায়ার আবরণ ও তার জারিজুরীরও হতবল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কুমতির গর্ব্বও খর্ব্ব হওয়ার কোন সুযোগ নেই। শ্বাসের জোয়ার থাকতে কুমতির রমরমা ভাবকে ভাটামুখী করা যাবে না। তাই মহাপুরুষদের কথা হোল সদা সর্ব্বদা শ্বাসে লক্ষ্য রাখ, আত্মাকে, শ্বাসে লক্ষ্য রেখে স্মরণ করতে থাক, তবেই আত্ম জ্যোতিতে নিমজ্জিত হয়ে অমরপদে স্থিতিলাভ করে মৃত্যুকে জয় করে তাকে পরম বান্ধবরূপে বরণ করা যাবে। মৃত্যুই হল পরমানন্দ মাধব, মৃত্যুই আমার গতি, মৃত্যুই হোল আমার একমাত্র স্মরণযোগ্য বান্ধব। তাকেই চিনতে হবে, তাকেই জানতে হবে, মানতে হবে, তবেই অপার শান্তি, চিরন্তন নির্ম্মল আনন্দ লাভ হবে।

আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার যে, আমরা প্রতিমূহুর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তা না করে আমরা ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হয়ে ঐ কথাটা একবারে ভুলে গেছি। এই জগৎ যে অনিত্য, জগৎ যে মিথ্যা সে কথা ভুলে গিয়ে কবে কি ঘটেছে তার চিন্তায় ও নানা ভোগ সুখের চিন্তায় বিবশ হয়ে ডুবে আছি। এটা না করে শুধু চিরন্তন আত্মচিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখা উচিত, কারণ তোমার জীবনে পথ চলার তো শেষ নেই। যতই চলবে তোমার চলার পথ দিগন্ত বিস্তৃত হতে থাকবে। তাই চলতে চলতে অজস্র ধারায় পুণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করে এস। কখনও একস্থানে দাঁড়িয়ে থেকো না - যতটা এগিয়েছ তার চেয়েও বেশী তোমাকে যেতে হবে এখনও। দাঁড়িয়ে থাকার বা থামার অধিকার তোমার নেই জানবে। কারণ, এই যে দীর্ঘ চলার পথ দেখছ, এ পথ কে সৃষ্টি করেছে জান? করেছে তোমার মন, তাই মন চলে আর তোমার চরণও চলে। মনকে সর্ব্বদা সম্মুখে ঠেলে দাও, মনকে কখনও পিছনে যেতে দিও না, সাফল্য দেখে ভেবো না যে কাজ শেষ হয়ে গেছে, বরং মনে করবে কাজ এখান থেকে সুরু হোল-আরও অগ্রসর হতে হবে-অনেক অনেক

অগ্রসর হতে হবে। তোমাকে নীরব কর্ম্মী সেজে শুধু এগোবার কাজ করতে হবে-মৃত্যুর পথে তুমি নির্ভীক চলায়মান অনলস কর্ম্মী হয়ে চলবে, চলবে আর চলবে। কেউ দেখল কি দেখল না-তুমি কিছু দেখবে না, কেউ তাকাল কি তাকাল না তুমি কোনদিকে তাকাবে না, - কেউ ভাবল কি ভাবল না তুমি কিন্তু ভাববে না - তুমি যে নীরব কর্ম্মী, মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলনের জন্য তুমি শুধু নীরবে কাজ করে চলবে। নীরব কর্ম্মী সুখ, দুঃখ, প্রশংসা, নিন্দা, কোন দিকেই লক্ষ্য করে না - কাজ করাটাই তার ব্রত, সেই ব্রত উদযাপনের জন্য তারা নাম যশের প্রত্যাশী না হয়েই শুধু কাজকে ভালবেসে কাজ করে যায়, চারিদিক থেকে বাধা আসে আসুক, তাতে তারা দমে না, কারণ, তারা জানে যে ঈশ্বর অনুরাগীর হতাশা মহা অপরাধ, কারণ তারা বুঝেছে যে ঈশ্বর কাউকে কখনও ঠকান না, ঠকান নি, ঠকাবেনও না। এর চাইতে বড সত্য নেই। তারা তাই অতি বড় বিপদেও এই সত্যকে আঁকড়ে থাকে, এমন কি এই সত্যকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে বিপদ যদি বেড়েও যায়, তবুও মৃত্যুজয়েচ্ছু সাধক তাকেই ধরে থেকে দিব্য পৌরুষের পরিচয় দেয়, আর তখনই আত্মপ্রকাশ ঘটে। জীবশরীরে আধিব্যাধি তো লেগে থাকবেই - সাময়িক শয্যাশায়ী হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়, তা সত্ত্বেও তোমাকে অগ্রসর হতে হবে - এমন কি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে যখন তুমি দেহটাকে কাজে লাগাতে পারছ না, কুছপরোয়া নেই-মনটাকে কাজে লাগাও, থেমে থাকার উপায় নেই কারণ কার জন্য থেমে থাকবে? যে তোমাকে থামাতে চাইছে, তাকে তুমি জয় করতে যাচ্ছ, তাকে তুমি থামাতে চাইছ? সে কখনও চুপ থাকতে পারে-অতএব মাভৈঃ! তুমি মৃত্যুকে জয় করতে চলেছ - মৃত্যুকে ভয় করবে কেন? মৃত্যু তো তোমার পরম বান্ধব, মৃত্যু তো তোমার পরমগতি, তো ডরনা কিউ? তবে হ্যাঁ একটা কথা এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকলেই শুধু হবে না, আচরণের মধ্যে দিয়ে তাকে পালন করতে হবে। মন্ত্রে দীক্ষিত হলেই হবে না, মন্ত্রকে রূপ দিতে হবে।

ভাল মন্দ পথ শুধু বললে বা বুঝলে হবে না, সেই পথ অনুসরণ করে দেখাতে হবে। সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে বাহ্যিকে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে, কোন ফারাক রাখা চলবে না। কারণ প্রকৃতিতে থেকে সাধক সাধনা করছে। আর প্রকৃতি হল মায়াময়ী, ছলনাময়ী। জীবের সাধ্য কি তাকে বল দিয়ে অতিক্রম করবে? কি পরা প্রকৃতি, কি অপরা প্রকৃতি, প্রকৃতি রুষ্টা হলে সর্ব্বনাশ ঘটাবে, সাধক সাধিকার জীবনে অঘটন ঘটিয়ে ছাড়বে, একমাত্র শ্রীগুরুদেব ছাড়া তখন বাঁচাবার কেউ নেই। মনে রাখা উচিত সামান্য ভুল, মূহুর্ত্তের ভুল অসামান্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে প্রকৃতি তো আমার মায়েরই ছলনাময়ী রূপ। দিবারাত্র যদি মাকে স্মরণ মনন করা যায় তখন মা জননী কৃপা করে সন্তানকে সাবধান করেন। তারপরেও খেয়াল না করলে তখন নির্ম্মমভাবে শাসন করবেন। মায়ার ঘোর বিপাকে ফেলে ঘোল খাইয়ে ছাড়বেন। আর তাঁকে সন্তুষ্ট করে, স্তব স্তুতি আরাধনায় তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে, সাধকের মনটার মোড় ঘুরিয়ে মায়ার আবরণ তুলে নিয়ে, মৃত্যজয়ের পথের বিজয় নিশান উড়িয়ে চলতে তিনিই তখন সন্তানকে অকুন্ঠ সাহায্যদানের জন্য বরাভয় মূর্ত্তি নিয়ে এগিয়ে আসবেন। সাধক তাই দেবী 'কৌশিকী-আরাধনা' শেষে তাঁকে তুষ্ট করে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাধনায় ব্রতী হতে পারেন, তাই এখন সেই পূর্ব্বের কথাতেই ফিরে আসা যাক্।

☞ সপ্তম ক্রিয়া প্রাপ্তির কথা

বাবার অসীম করুণার কথা বলে শেষ করা যাবে না, তাই, সেকথা স্মরণে রেখে জানাই যে গুরু বাবার কৃপায়, তাঁর একান্ত করুণায়, দেবী কৌশিকীর আরাধনা সমাপ্ত করার পর পুরোদমে আটঘন্টা করে ক্রিয়া করে চলেছি, কিন্তু বাবা যেন ক্রমশঃ নিজেকে

গুটিয়ে নিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে। এখন আর বাবা সিনেমাও যান না, বাজারেও যান না। গোপালদা উপর থেকে টি,.ভি সেট এনে নীচেয় বাবার ঘরে ফিট করে দিয়েছেন, যাতে বাবা দেখতে পারেন, কিন্তু বাবা বড় একটা টি,ভি দেখতেনই না-পড়েই থাকত। যা করতেন তা শুধু সর্ব্বদাই শাস্ত্র আলোচনা, গীতা পাঠ, আর খুব জোর ভক্তদের সঙ্গে একটু রঙ তামাস–ব্যস! ঐ পর্য্যন্ত। খুব আস্তে আস্তে বাবা যেন নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে সুরু করছেন, খুব বিমর্ষ লাগত এ সব দেখে। বাবা ছিলেন রসরাজ-এইরকম কোন অসাধারণ রসময় ব্যক্তিত্ব যদি হঠাৎ সকলের কাছে আনন্দ দান করার বদলে চুপ হয়ে যান - ফাগুনের দিনে বৈশাখের দহন আসার মত সকলের কাছেই তা বিস্ময়কর হয়, তাই বাবার এই হঠাৎ অন্তর্মুখীনতার স্পর্শ আমার কাছে বিষাদের ছবিই বহন করে এনেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কোন এক দুর্য্যোগের ইঙ্গিতও যেন মনে মনে সুর তুলতে সুরু করেছিল। ইদানীং বাবার শরীরটাও একদম ভাল যাচ্ছিল না, বলা যায় ক্রমশঃ খারাপই হচ্ছিল। বড় বড় হোমিওপ্যাথ, এলোপ্যাথ ডাক্তার আসতেন, দেখতেন, ঔষধ দিতেন কিন্তু ঔষধে কোন কাজ হচ্ছিল না - অর্থাৎ কোন উপকার দর্শাতে পারত না। বাড়ীর বাইরে, যে পুরুষ সদাহাস্যময় হয়ে দশজনের কাছে রসসাগররূপে বিরাজ করতেন, যার সঙ্গে বাজারে গিয়ে বাজারের লোকের সঙ্গে রসালাপ দেখে, দরকষাকষির ভঙ্গি দেখে, যে কোন বাজার করার সময় ফাউ চাওয়ার মতলবের স্ফূরণ দেখে, আমরা, অর্থাৎ তাঁর বাজারের নিত্য সঙ্গীরা হেঁসে খুন হোতাম, সেই রসরাজের আজকের ব্যক্তিত্বের ছবি আমাদের কাছে বড় করুণ, বড় নিঃসঙ্গ, বড় হতাশার। যে মানুষ ছিল উচ্ছল, ছিল প্রাণপ্রাচুর্য্যে সদা চঞ্চল, তিনিই আজ অচঞ্চল কোন এক অজানা কারণে আমাদের কাছে যেন শরীরে থেকেও হতবল। বাড়ীর বাইরে যাওয়া, বাবার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বলা ভাল, গতি বিধির নিয়ন্ত্রণ ঘটেছিল। আজ আমি বলছি যে এইসব মুক্ত পুরুষদের

তাঁদের ইচ্ছামত, তাঁদের স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা বা কোথাও যাওয়া আসা করতে দেওয়া উচিত, কখনও, কোন কারণেই, কোন অবস্থাতেই তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত নয়। কিন্তু আমরা সাধারণ ব্যক্তিরা তার এতটুকুও বুঝতে পারি না, বুঝতে চাই না - তাই, তাঁদের আমরা আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিত্ব মনে করে তাঁদের উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিই-চাপাতে চাই। ঠিক এই সময় থেকেই বাবার কাছে আসা যাওয়া অনেকেরই নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল, যদিও বাবার কাছে আমার যাতায়াত অনিয়ন্ত্রিতই থেকে গেল। একটু যেতে দেরী হলেই বাবা খোঁজ করতেন লাগাতারভাবে। এই সময়েও বাবা আমাদের এতটুকু বুঝতে দিচ্ছেন না কি ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকে। যদিও আমরা ২/৪জন ঘনিষ্ঠ মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে অনিবার্য্যগতিতে এগিয়ে আসা নিষ্ঠুর পরিণতির আশঙ্কা অনুভব করে আলোচনা করতাম। কিন্তু বাবা তখনও সদা সর্ব্বদাই বলছেন আমাদের, যে আমি এখনও বহুদিন থাকব। এ সমস্ত শুনে আবার আমাদের সব তালগোল পাকিয়ে যেত। মাঝে মাঝে ক্রিয়ার খবর নিচ্ছেন, বিশেষ করে আমার ক্রিয়ার খবর। অপরের ক্রিয়ার খবরে আমার কোন কৌতূহল ছিল না, দয়াময় বাবাই আমাকে মাঝে মাঝে সব বলতেন। সারাটা জীবন ক্রিয়ার গবেষণাতেই যেমন মত্ত হয়ে আছি তখনও তেমনই থাকতাম। সারাটা জীবন ক্রিয়া নিয়েই কেটে গেল যদিও, তবু ক্রিয়ার ইতি করতে পারলাম না। আজ বল, সামর্থ্য কমে এসেছে-তবুও পুরানো অভ্যাসে ক্রিয়া ঠিকই করে চলেছি, অসুবিধাও কিছু নেই, ক্রিয়াই আমার সবকিছু - জীবন, যৌবন, ধন, মান, যশ, অযশ, পাওনা, দেনা, পাপ, পূণ্য, ভালমন্দ, সত্য, মিথ্যা সব কিছু ক্রিয়ার কাছে জমা রেখেছি, জমা রেখেছি নিজেকে, জমা রেখেছি আমাকে, আমার আমির শ্রীপাদপদ্মে।

সেদিনটা ছিল হরতালের দিন-সারাদিন সম্পূর্ণ বনধ গেছে।

রাস্তাঘাটে যানবাহন লোকজন নেই বললেই হয়-বাইরে কেউ যাওয়া আসার কোন গরজ নেই ভাব-বলা যায় বাইরে যাওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু আমাকে যে চিন্তামণির চেনা পথে চলার চিন্তা পিছু ছাড়ছেনা-ছট্‌ফটিয়ে ছাড়ছে মনটাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমে তা পেয়ে ছানা ফুটে বেরুবার মত-আমারও বাবার বাড়ী যেতেই হবে এই চিন্তাটাও ক্রমশঃ পুরুষ্ট হয়ে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। কিন্তু যাব কি করে-কোন সঙ্গী নেই-বিশেষ করে তাদের মধ্যে কোন উৎসাহ নেই—তার উপর তখন বাবার বাড়ীর দ্বার, আমার কাছে অবারিত থাকলেও সকলের সেই সময় প্রবেশাধিকার নেই একেবারে। সকলের যাতায়াত তখন একেবারে নিয়ন্ত্রিত। যদিও বাবা, মার উভয়েরই ঘরে, আমার জন্য দ্বার অবারিত-আর আমার সেই চির আকাঙ্খিত আনন্দধামে আমার আজ পৌঁছানো হবে না? কোন এক অজানা আকর্ষণে গুটি গুটি পায়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে বালী রেল ষ্টেশনে পৌঁছেছি-দেখি, ট্রেন চলছে বাবার দয়ায়। উৎসাহভরে হাওড়া গেছি এই আশা নিয়ে যে যদি বাবা দয়া করেন আঁরও কিছু। কি আশ্চর্য্য! হাওড়া গিয়ে জানলাম S.E.রেল চালু আছে আর পরম আশ্চর্য্যভরে দেখলাম যে ষ্টেশন প্লাটফরমে বাবার বাড়ী যাওয়ার একটি S.E. ট্রেন দাঁড়িয়েও আছে। অত্যুৎসাহে ট্রেনে চেপে বাবার বাড়ী টিকিয়াপাড়া ষ্টেশনে পৌঁছেছি-ভেবেছি পৌঁছে তো গেলাম, ফেরার ভাবনা পরে ভেবে দেখা যাবে।

একেই বোধহয় বলে ভাগ্য - আমি বলি প্রাণের টান। প্রাণ টেনেছে-এ প্রাণও কেঁদেছে-শুনেছি চোখে চোখে কথা হয়, আমার মনে হয় চোখ বুজেও কথা হয়, মনে মনেও কথা হয়, মনের কথা মনই জানে। তেমনি মনে হয়, প্রাণের কথা প্রাণই জানে, প্রাণই বোঝে, অপরে তা জানতেও পারে না, বোঝেও না,বুঝলেও ভুল বোঝে। তাই সাচ্চা হয়ে, সাচ্চা পথে, সাচ্চাকে ধরতে চাইলে

সাচ্চাকে পাওয়া যায়। ইভি সাচ বাতত্ হ্যায়। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে এ সব কিছু হয়নি। এমনিই যদি যাওয়া হয় বলে বেড়িয়ে পড়ে বাবার কৃপাতে বাবার বাড়ী অত বাধা বিপত্তির মধ্যেও পৌছে গিয়েছিলাম। মানে বাবা কৃপা করে সে দিনটার চরণ দর্শন বরবাদ করে দেননি, নানা পরমাদের মধ্যে তাঁর শ্রীমুখ দর্শনের, তাঁর অমৃতময় বাণীর আস্বাদ অনুভব করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বাবা তো আমাকে দেখে ভীষণ খুশী। বললেন তুমি এসে গেছ্? বেশ বেশ! বাবার আনন্দ দেখে মনে দারুণ আনন্দ হোল। আহা! সে সব কি দিনই না ছিল? বাবার কাছে যেতে যা দেরী-সব চিন্তা, ভয়, ভাবনা, কাম, ক্রোধ, সব ব্যাটা যেন একেবারে কর্পূরের মত মন থেকে উধাও হয়ে যেত। শুধু আনন্দ, আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দ সাগরে যেন ভাসতে থাকতাম-আর আজ? বাবার নশ্বর দেহটা ছেড়ে দেওয়ার পর আমার সেই আনন্দধাম আজ যেন নিরানন্দধাম। জীবনে এইটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একজনের অভাব যেন দুনিয়ার রঙটাকেই বদলে দেয়, পালটে দেয় মনের কোণে গোপন গহনে লুকিয়ে রাখা বিন্দু বিন্দু সঞ্চয়ের গড়ে তোলা পুঞ্জীভূত আনন্দের অদৃশ্য ভান্ডার, পৃথিবীটা তখন হয় বিবর্ণ, রুক্ষ, প্রাণহীন, বিবশ। আলোর নীচে দাঁড়ালে ছায়া দেখা যায় না, আলো থেকে দূরে গেলেই ছায়া বড় হয়। একইভাবে কেউ যখন জ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকে, তখন তার অহং নেই, জ্ঞানপ্রদীপ থেকে দূরে সরলেই অহংটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। আজ তাই দেখি যে, বাবাকে প্রত্যক্ষ ভাবে হৃদয়ে ধারণ করেও সেই আনন্দের স্বাদ পাই না, যে আনন্দের স্বাদ দয়াময় বাবা অকৃপণভাবে, অকাতরে দান করে গেছেন তাঁর নশ্বর দেহটার উপস্থিতি দিয়ে।

বাবার ওখানে তখন বুজি, সন্দীপ ওরা সব থাকত - সেদিনও

ছিল। বাবা বুজিকে বললেন, "গঙ্গাজলের ঘটিটা নিয়ে আয় তো;" আমি তখন বাবার খাটের পাশে যে পুরানো তক্তপোষটা থাকত তার একধারে বসে আছি। সেদিন আর কোন ক্রিয়ান্বিত নেই। দয়াময় বাবা গঙ্গাজলের ঘটিটা আনার পর ওদের সকলকে ঘর হতে কিছুক্ষণের জন্য বার হয়ে যেতে বললেন। তখনও আমি কিন্তু বাবার কি অভিপ্রায় কিছুই বুঝিনি। ভেবেছি বাবা তো এরকম মাঝে মাঝে করেন। কোথাও কিছু নেই, আপন খেয়ালে গঙ্গাজল ছিটিয়ে কিছুক্ষণ আপনমনে প্রাণায়াম করতেন - ভাবলাম, আজও বোধহয় তাই করবেন। বাবা আমাদেরও ঐ রকম করার পর বলতেন, "সময় পেলেই প্রাণায়াম করবে; যত খুশী, যতটুকু পার, হরদম ক্রিয়া করবে, প্রথম ক্রিয়া যত পার করবে"। আমিও তাই অনুরূপ চিন্তাতেই আছি। হঠাৎ বাবা অমাকে তাঁর কাছে যেতে ডাকলেন এবং কাছে যেতেই বললেন, "তুমি সপ্তম ক্রিয়াটা নিয়ে নাও।" তারপর নিজেই আমার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে সপ্তম ক্রিয়াটা কি ভাবে কত দিনের মধ্যে সংখ্যা পূরণ করতে হবে সমস্ত কিছু ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "সংখ্যা পূরণ করা খুবই কঠিন, তবে আশা করি গুরুদেবের কৃপায় তুমি তা করতে পারবে। তবে একবারে না পারলে চিন্তা করো না, কারণ আমিও একবারে সংখ্যা পূরণ করতে পারিনি।" তারপর কি ভাবে ওঁর সংখ্যা পূরণ হয়েছিল তার বিবরণ দিলেন। আমার কিন্তু কেন জানিনা, বাবার কৃপাতেই নিশ্চয়ই হবে, মনে কোনরূপ শঙ্কা জাগল না, কারণ অনুরূপ ক্রিয়ার অভ্যাস আমি অনেক আগে থেকেই করতে অভ্যস্ত ছিলাম, পাঠক ইতিপূর্ব্বে সেকথা জেনেছেন। আর একটা সহজাত অভ্যাস আমার যেন ছিল, তা হোল, কোন ক্রিয়া পাওয়ার সাথে সাথেই আমার ভিতরের আমিটা যেন কৌশলগতভাবে খুঁজতে সুরু করে দিত, কিভাবে সহজতর কৌশলে ক্রিয়াটাকে আয়ত্বে আনা যায়। কোন্ কৌশল অবলম্বন করলে ঐ ক্রিয়াটা সহজভাবে করা

যাবে, এ যেন তার খুঁজে বের করা চাই-ই-চাই। বেরিয়েও আসত, আর আমিও সযত্নে সেই কৌশলটি নিজের ভেতরে গোপনে চেপে রাখতাম। কাউকে, এমন কি গুরুদেবকেও, কিছু জানাতাম না। যাই হোক, এ ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটল। কৌশল নিরূপিত হল, আর ক্রিয়াটাও ঠিক নির্দিষ্ট দিনেই সুসম্পন্ন হল। এ সবই আমার দয়াল গুরুদেবের অসীম কৃপার ফল। দয়াময় বাবা আমার মধ্যে এই ক্রিয়ার জন্য জিদ ও উৎসাহ দেখে বলেছিলেন যে, এই ক্রিয়া নির্দিষ্ট দিনে সংখ্যা পূরণ হওয়া খুবই কঠিন। আমারও হয়নি, এমন কি দয়াময় বলাগড়ের বাবারও হয়নি। এ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেক বৎসর সময় লাগে। যাক্, তুমি তারজন্য চিন্তা করো না - আশা করি গুরুকৃপায় তোমার হয়ে যাবে। হয়েওছিল তাই। বাবার আশীর্ব্বাদে আমার সপ্তম ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনেই সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু ঠিক কত সময় লেগেছিল তা দেখা হয়নি, কারণ দেখার মত, অবস্থা থাকে না তখন, তবে আমার খুব কম সময় লেগেছিল বলে বোধ হয়না।

সপ্তম ক্রিয়া দান করে দয়াময় বাবা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, আমি যেন এ ক্রিয়া পাওয়ার কথা কাউকে না বলি। আমি বাবাকে বলেছিলাম, "শুধু একজনকে বলব, তাকে না বলে থাকাটা বোধহয় ঠিকহবে না, আপনি অনুমতি দিন।" বাবা হাসতে হাসতে বললেন, "ও বুঝেছি, বুঝেছি। হাসি খুশীর কথা বলছো তো?" আমি বললাম, "হ্যাঁ বাবা, যার অসাধারণ ত্যাগ আমাকে ক্রিয়ার জগতে সাহায্য করেছে, যার সাহায্য ছাড়া আমি বলা যায় ক্রিয়া করতেই পারতাম না, তাকে জানাতে চাই।" বাবা হাসতে হাসতে আবার বললেন, "ঠিক আছে, ওকে বলবে, তবে আর কাউকে বলো না।" আমি বললাম, "ঠিক আছে, তাই হবে।" বাবার নিষেধাজ্ঞার কথা আগেও বলেছি, আবার বলি যে, বাবা না বললেও ক্রিয়ার কথা আমি কখনও কাউকে বলিও নি, বলতামও না,

কারণ আমার তখন মনে হোত, "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।" আজ তাই ভাবি, যে আমাকে দিয়েছে অনেক, চায়নি কিছুই, পায়ওনি কিছুই, তারজন্য আজ মনটা কেন বিবশ হয়ে ভাবান্তরিত হয়? সে তো আজ আমাদের মধ্যে আমাদের মত নেই, কোথাও কোন কিছুতে আমাদের সে তো ভাগ বসাতে আসবে না এতটুকুও। আমি কিন্তু সেদিনও ছিলাম-আজও আছি, সবাই তো আছে, নেই শুধু একজন। তবে তার জন্য আজ আমার অভাব বোধও নেই-যা আছে তা শুধু ভাবান্তর - হারিয়ে ফেলার কোন বোধ নেই, আছে শুধু দৃশ্যান্তর, আছে বোধান্তর, মুছে যাওয়ার কোন অনুভূতি নেই, আছে শুধু স্পর্শান্তর। আজ আমি কোথায় কোন অবস্থায় আছি বলতেও পারি না, তবে এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, বাবার দয়ায় মৃত্যু বিজয়ের সাধনার পর মৃত্যুতে আমার কোন ভয় নেই - বরং মৃত্যুকে আজ পরম বান্ধব বলেই বোধ হচ্ছে। আজ আমার প্রাণখুলে সকলকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করে, "ওগো তোমরা কেউই যারা মৃত্যুকে দেখনি, জাননি, চেনো না, তারা কেউই মৃত্যুকে ভয় করে থেকো না-মৃত্যু আমাদের পরম বান্ধব, শান্তিদাতা, মৃত্যু আমাদের গতি, মৃত্যুই আমাদের পতি, মৃত্যুই একমাত্র আপনজন। তোমরা সবাই এস, সেই মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি-শুধু চেষ্টা নয় চরমভাবে, পরমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের চেষ্টাই হোল আমাদের একমাত্র কাজ।"

এরপর নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার সংখ্যা পূরণ দয়াময় বাবার কৃপায় সম্পন্ন হওয়ার পর বাবা বললেন, "বিষ্টু! তুমি আমাকে অবাক করে দিলে। আমি যা পারিনি তাই তুমি করলে এবং করতেই থাকবে।" এই ছিল আমার সপ্তম ক্রিয়া প্রাপ্তি ও ক্রিয়া সমাপ্তির ইতিহাস। এই ছিল বাবার শ্রীমুখের শেষ আশীর্ব্বাদ, যার স্মরণে আজও শরীরে রোমাঞ্চ আনে, আনে পিতৃত্বের আস্বাদ।

☞ অন্তিম দিনে অনন্তের টানে

আমার মনে কিন্তু সেইনি থেকে এতটুকুও সুখ নেই। চোখের সামনে দেখছি বাবার স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে-ঘরের ভেতরেই প্রায় সব সময় থাকতেন-কারো সঙ্গে বড় একটা দেখা করতেন না। রোজ বিকেলে বাবার কাছে বরাবরের মত যাই, কারণ বাবা ইদানীং বড় ব্যাকুল হয়ে থাকতেন আমার জন্য, বলা যায় যাওয়ার অপেক্ষায় যেন থাকতেন, খুব খুশী হতেন দেখতে পেলে, বার বার খোঁজ নিতেন আমি এসেছি কিনা। দেখতে পেলেই খুব খুশীর ভাব দেখাতেন। অথচ কতজন সারা বিকাল থেকে রাত্রি ৯টা সাড়ে ৯টা পর্য্যন্ত বাবার দর্শন প্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করত, বাবা দেখা করতে চাইতেন না, তারা অপেক্ষা করে করে ফিরে যেতো। ভিতরে বাড়ীর কজন লোক, জনা কয়েক ক্রিয়ান্বিত, আর বুজি, সন্দীপ, প্রদীপ যারা সর্ব্বক্ষণ বাবার সেবা করত, এরা ছাড়া কারও ঢোকার অনুমতি ছিল না। বুজি, সন্দীপ, প্রদীপকে বাবা কাছ ছাড়া করতেন না। আমি তখন সকলের কাছেই, কয়েকজন ছাড়া, অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। বলা যায়, তারা বাবার সব কিছু ব্যাপারে আমার উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এত বৎসর পার হয়ে এসে আজ একটা নিষ্ঠুর সত্য উপলব্ধি হচ্ছে, "চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।" মর্ম্মে মর্ম্মে এই সত্য উপলব্ধি করছি এখন।

সাধু ও সৎ ব্যক্তির কদর দেহ থাকতে কখনও হয়নি, হয়না, এ তো আমরা সব মহাপুরুষের ক্ষেত্রে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে আছি - এবং এই সত্যটা অস্বীকার করার কোন রকম অবকাশই নেই। আমার দয়াল গুরুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছিলাম, আজ বড় দুঃখে সে কথা স্বীকার করতেই হচ্ছে। মহাপুরুষদের দেহটা গত হলে তার ছবিটা আমরা দড়ি দিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিই। খুব ধূপ ধুনো দিই, ফুল দিই, দিই চন্দন তুলসী ইত্যাদি

ইত্যাদি; শুধু দিই না দু ফোটা চোখের জল-আর কামনা কলুষিত মনকে নিষ্কলুষিত করে তাঁর প্রতি হৃদয় নেঙড়ানো শ্রদ্ধার-চন্দন, দিই না বা দিতে মন চায় না নিষ্কাম মনের চন্দন দীপ-যে দীপমালায় উদ্ভাসিত হবে শ্রীগুরুর শ্রীমুখের ছবি-যে চোখের জলে মনের ময়লা ধৌত হয়ে যাবে-যে চন্দন গন্ধে কামনা বাসনার পুতিগন্ধময় বিষাক্ত বাতাস দূরে সরে গিয়ে দেবতার ছবির পরিমন্ডলকে সৌরভে ভরে তুলবে। ডাকি না তাঁকে সেইভাবে, যে ডাকের জন্য দেহাতীতে থেকে ভাবের ভাবী আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। তাঁর কাছে যাই করি আর যাই দিই কোনটাই "ভক্তের প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়", এমন কখনই নয়, বরং সব কিছুর পিছনে আছে শুধু "দেহি দেহি সুর", যা শুধু কামনা বাসনার স্পৃহায় ভরপুর। অথবা অনেকে আমরা আবার পাষাণ প্রতিমা তৈরী করি, তারপরে সেই পাষাণের সম্মুখে কতই না ভাঁড়ামি করি। যদিও আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, সেই পাষাণ মূর্ত্তির সামনে মাথা কুটে মরে গেলেও তা থেকে এক ফোঁটা রস বার করা খুব কঠিন। জীবন্ত দেহে থেকে, যে কত কষ্ট সে আমার জন্য ভোগ করে গেল, কত মর্ম্ম বেদনার সাক্ষী হয়ে রইল, কতভাবে তাকে বঞ্চনা করলাম-সে শুধু নীরবে সহ্য করল, কত অবজ্ঞা, কত অনাদর, কত লাঞ্ছনা সয়ে সে আমাদের জন্য হাসিমুখে নিজে বিষপান করে আমাদের মুখের হাসি অম্লান রেখে গেল, তার হিসাব কজন আমরা রাখি? রাখি না! রাখতে চাইও না, পারিও না, পারবও না। পারব বা পেরেছি শুধু তাঁর কথা না শুনতে, তাঁর উপদেশ অবহেলা করতে, তাঁর প্রতি অকারণ অভিমান করতে-আরও ভালভাবে পারি মনের মত কথা না শুনলে তাঁর উপর মুখ ফুলিয়ে রাগে অভিমানে তাঁর দোষ দর্শন করতে, বিচারের বিন্দুমাত্র শক্তি না থাকা সত্ত্বেও, তাঁর কাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করতে। দেহে থাকতে মহাপুরুষকে আমরা নিছক সাধারণ মানুষই ভাবি-বড়জোর ইপ্সিত কোন বস্তু প্রাপ্তি ঘটলে বা মনের কামনা পূরণ হলে তাঁর যোগবিভূতির কথা ২/৪বার জোরগলায়

বলে, লোকের কাছে নিজের সম্মান জাহির করতে পারি। একবারও কি ভাবি, কি প্রচন্ড শক্তি ঐ দেহের ভিতরে বিরাজ করছে, কি অনন্ত মহিমার সমাবেশ ঐ শরীরটার মধ্যে ঘটেছে! তা যদি ভাবতাম, তাহলে ঐ দেহটার অধিকারীর উপর মনোবিবেশ ঘটতে এতটুকু দেরী হোত না-ঐ দেহধারীর উপর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য ছবি টাঙানো বা পাষাণ মূর্ত্তি তৈরী করে ধুপ ধুনো দিয়ে পূজার কোনও প্রয়োজন হতো না। ঐ দেহধারী তখন আমার মনের অন্তঃপুরচারী হয়ে হৃদপদ্মমাঝে আপনিই বিরাজ করতেন সদা সর্ব্বদা, প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন। আর তখন কাজটাও কত সোজা হোত, তাকে সর্ব্বদা বুকের মাঝে নিত্য পাওয়ার? যে মহাপুরুষ কত কষ্ট সহ্য করে, কত না ত্যাগ স্বীকার করে, কত কঠিন ব্রত উদযাপন করে, ভঙ্গুর দেহটার ভিতরে অবিরাম "জগদ্ধিতায় চ" মন্ত্র উচ্চারণে কাল কাটাচ্ছে, তাঁর সেই দেহটাকে সাধারণের দেহ বোধ করে অবজ্ঞা, অবহেলা করে কত সময় না সাধারণ ভক্ত থেকে সমস্ত জাগতিক মানুষ বৃথা অপব্যয় করেছে, কেউ তাঁর এই মহান ত্যাগ, তিতিক্ষার, সাধনার কোন মূল্য দেয় না। ভ্রমান্ধ জীব এমনই ভ্রমান্ধ যে, তাঁর কাছে অমূল্য রত্নের সন্ধান না জেনে সামান্য পাওনার জন্য প্রতীক্ষা করেছে, যা অতি তুচ্ছ, যা আজ আছে কাল থাকবে না - বড় জোর, বিনিময়ে একটু অতি সাধারণ সৌজন্য দেখিয়েছে, কিন্তু মনটা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। এমন কি অতি নিকট আত্মীয় পরিজনও তাঁকে না চিনতে পেরে তুচ্ছ জাগতিক সম্বন্ধবোধে ব্রতী হতে চেয়েছে রত্নাকরের কাছে রত্ন না চেয়ে, চেয়েছে শুধু জীবন বোধের দেনা পাওনার ডালি - আর সেই ডালির ফুলে চিরন্তনের সেবা না হয়ে অনিত্যের উপচার সজ্জিত হয়েছে। এ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের এক আশ্চর্য্য লীলা, যুগে যুগে এই শুধু দেখা গেছে যে কিছুতেই তিনি জীবন্ত বিগ্রহের দিকে সাধারণের মনকে ঘুরিয়ে দেন না, জানি না তাঁর এই লীলা তিনি কেন খেলেন। রামচন্দ্র থেকে সুরু করে যুগে যুগে কত না মহাপুরুষ ধরাতলে বিচরণ করে জীবের মুক্তি সহজ করতে সহজতম পথ দেখিয়ে

গেছেন, কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট কঠিন মায়া নিগড় থেকে জীবকে চিরতরে মুক্ত করতে পারেননি। সকলেই বার বার বলেছেন সৎ হতে, কল্যাণকর ব্রতে ব্রতী হতে, কিন্তু জীব কখণও তাঁর বা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেনি। শত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেছে, করছে, হয়ত বা ভবিষ্যতেও করতে থাকবে, তবুও মহাপুরুষরূপী জীবন্ত বিগ্রহকে মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান দেখালেও তাঁদের বাণী অন্তর থেকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি। বাণী শুধু কানেই শুনেছে, মর্ম্ম দিয়ে অনুভূত হয়নি, উপদেশ শুধু গ্রহণই করেছে, অনুশীলন হয়নি। মহাত্মা রাম গত হয়েছে-শাস্ত্র শুনিয়েছে, 'ঘট ঘটমে বিরাজে রাম' কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত- যতটুকু শোনা গেছে তাতেই শেষ - বোধে আনতে কোন চেষ্টাই জীব করেনি। বর্ত্তমান যুগেও একই চিত্র চলেছে। মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার দেহধারী সেই জাতির জনককে পরিকল্পনা করে গুলি করে যে মারল, সেও কিন্তু জীব-সেও বিশ্বাস করত, 'ঘট ঘটমে বিরাজে রাম'। সুভাষ চন্দ্রকে তাঁর অবর্ত্তমানে জাতি দল নির্ব্বিশেষে তার মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে বা দড়ি দিয়ে তার ছবি টাঙ্গিয়ে ফুল দিয়ে মালা দিয়ে পূজা করছে- কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁর জাগতিক অন্তর্ধানের রহস্য লৌকিক জগতেই চিররহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তাই বলছি, ঈশ্বরীয় লীলা এমনই যে জীবন্ত বিগ্রহকে আমরা দেহধারী অবস্থায় চিনতেই পারি না, আর এই না চিনতে পারার জন্যই ভবিষ্যতে আমাদের মন পূর্ব্বের অবহেলা, অবজ্ঞা বা এককথায় আমাদের অজ্ঞানাবৃত ব্যবহার স্মরণে এসে বিচ্ছেদের বেদনাকে আরও প্রকট করে তোলে-মন শুধু অনুতাপের দহনজ্বালায় দগ্ধ হয়, কিন্তু শত চেষ্টাতেও মহামানবের সেইরূপ সে দেখতে পায় না, প্রায়শ্চিত্তেরও সুযোগ পায়না।

দয়াল গুরুবাবার যখন প্রায় একাকীত্বের জীবন, বন্ধ ঘরে ঐ রসরাজের প্রায় নির্জ্জনবাস সুরু হোল - আমাদের মন তখন তাঁরই কৃপায় বাবাময় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়েই দয়াল গুরুবাবার মহাপ্রয়াণের দিনও এগিয়ে এল-এগিয়ে এল, আমার কাঁধে বোঝা বওয়ার গুরু দায়িত্বের দিন।

☞ গুরু দেবের আসন প্রাপ্তি ও শেষ মুহুর্ত্তে গুরু কথামৃত

১৯৬২ সালের ২৬শে জানুয়ারী রাত ৮টায় দয়াল গুরুদেব তাঁর অন্তিম শয্যায় ঘোষণা করলেন "বিষ্টু ক্রিয়া দেবে।" সেই দিনও এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল। সেইদিনের আগেই বাবা আমাকে বলেছিলেন, "বিষ্টু! তারকের গাড়ীটা কি পাওয়া যাবে?" সেইদিন তাঁর গৃহ চিকিৎসক ডাঃ গিরীনবাবুর নির্দ্দেশে তাঁর বুকের X-Ray করার কথা। আমি বললাম "কেন পাওয়া যাবে না? গাড়ী যদি ঠিক থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।" বাবা বললেন, "তাহলে তুমি-তারকের গাড়ীখানা নিয়ে সকালেই এখানে চলে এস।" বাবা যখন এসব কথা বলছেন, তখন বাবাকে বেশ সুস্থই মনে হলেও, আমার মন কিন্তু বলছিল বাবার মতলব ভাল নয়, যতই উনি আমাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। যাই হোক, পরদিন সকালে গাড়ী নিয়ে গেছি, X-Ray করতে যাওয়া হল, বাবার বড় ছেলে গোপালদা-যিনি তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা, নিতাই গাঙ্গুলী ও গাড়ীর চালক নারায়ণ আমার সঙ্গে ছিলেন। X-Ray ক্লিনিকের ব্যক্তিরা বাবাকে পূর্ব্ব থেকেই চিনত। প্লেট দেখে Radiologist বললেন, আপনি তো ভাল হয়ে গেছেন, একটু ভাল করে খাওয়া দাওয়া করুন, তাহলেই স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ী ফেরা হল। বাবা স্নান সারলেন, খেতে বসলেন দেখে, আমি ও নিতাই বাড়ী ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। বাবাও তখন খুবই উদাসভাবে ও মৃদুস্বরে বললেন, "এসো এসো।" আমরা আর পিছন ফিরে দেখিনি, মানে দেখতে ভাল লাগছিল না এতটুকু, কারণ আমার মন সর্ব্বদা বিরুদ্ধ গাইছিল, বিরূপ চিন্তা হচ্ছিল বাবাকে ঐভাবে উদাস দেখে। যাই হোক আমরা তো বাড়ী ফিরে স্নান খাওয়া করে বিকেল ৪টা নাগাদ আবার বাবার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। টিকিয়াপাড়া ষ্টেশনে নেমে বাবার বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই দেখি, বাবার ন'মেয়ে দূর থেকে আরও কয়েকজনের

সঙ্গে বাবার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে-ইশারার ভঙ্গিতে। আমরা ভাবছি ঐ দিকেই তো যাচ্ছি, তাই একই গতিতে যাচ্ছি, কিন্তু দেখি দিদিরা খুব দ্রুত চলার ইঙ্গিত করছে। ছুটতে সুরু করলাম-কিন্তু গিয়ে একেবারে হতবাক্। একি দেখছি! আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব, আমার প্রিয়তম বাবা, সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাযোগী অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়ে রয়েছেন - আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, "বিষ্টুদা! আমাদের আর কিছু করার নেই-দেখুন আপনি যদি কিছু করতে পারেন"। আমি কোন কিছু উত্তর দিতে পারলাম না - মনটা শুধু অতীতের দিকে চলতে লাগল আর আমার দেহটা ক্রমশঃ স্থবিরত্বের দিকে যেতে সুরু করল। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, প্রদীপকে স্যালাইন আনতে পাঠিয়েছি তো অনেকক্ষণ, এখনও আসছে না কেন? যদি এখনও এসে পড়ত, তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত ! আমার বাহ্য চেতনা ক্রমশঃ লোপ পেতে লাগল। তখন অনেকেই বলতে সুরু করেছে বিষ্টুদা! কিছু একটা কর - কিছু একটা কর তুমি। সন্দীপ, বুজি আর্ত্তস্বরে বলছে, "কাকা, দাদুকে বাঁচাও তুমি।"আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরে আসছে যেন আমার, কিন্তু কথা বলার শক্তি যেন নেই - ভিতরে স্পষ্ট বুঝছি আমার উপর এদের কতখানি নির্ভরতা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝছি আমি কত অসহায়, কত বলহীন, কতখানি শক্তিহীন। কোথায় পাব শক্তি? যোগানদার যোগালে তবে তো শক্তি পাব। যোগানদার আমার ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছাতেই তো সব কিছু ঘটবে। তাঁর ইচ্ছা হলে, আমাকে দয়া করে শক্তি জোগালে, তবে তো কিছু করা যাবে। নচেৎ কিছুই সম্ভব নয়।

যাই হোক, বিবশমনে এইভাবে অবস্থান করছি স্থাণুর মত।

শুধু দেখছি কি হচ্ছে-কি ঘটছে-কেমনভাবে সবকিছু চলছে-আমি যেন নিমিত্তমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখার জিনিষ দেখছি শুধু। ইতিমধ্যে, ঝড়ের বেগে প্রদীপ এসে ঘরে ঢুকল, আর গিরীন ডাক্তার বাবুও সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছেন দেখছি। কিন্তু বিধির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। স্যালাইন দেবে কি? কোথাও সূঁচ ফোটানই যাচ্ছে না-অবশেষে অনেক চেষ্টা করে অনেকক্ষণ খোঁচাখুঁচির পর হাতের তালুর উল্টোদিকে কোনক্রমে সূঁচ ফোটানো গেল। প্রিয়তম গুরুদেবের দেহ তখন অসারভাবে অন্তিম শয্যায় শায়িত রয়েছে। স্যালাইন দেবার অনেকক্ষণ বাদে, একটু একটু করে, আস্তে আস্তে দেহটার মধ্যে জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠল। সকলেই আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছি-সকলেরই আশা, এই বোধহয় বাবা উঠে বসবেন। রাত ৮টা নাগাদ বাবার দেহে চেতনার লক্ষণ ফুটে উঠল, আমার ভিতরে কিন্তু সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে উঠছে। সেদিন বিকেলেই ২/৩ জন গুরুভ্রাতা আমাকে একান্তে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, "ভাই! তুমি বলত, কি রকম বুঝছ বাবাকে?" আমার ভিতরে বিষাদের সুর বেজেই চলেছে- তাই ইচ্ছা না থাকলেও সত্য প্রকাশের জন্য বলেছি তাদের, "কি আর বুঝব ভাই! সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ঘোর দুর্দিনের সূচনা হচ্ছে।" সকলেই এ কথা শুনে বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। এমন কি গিরীনবাবুও আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করছেন-সমানে স্যালাইন চালাচ্ছেন। পাঠক বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, তবে এটুকু অবশ্যই সত্য যে, এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের কথা লিখতে কলম থেমে যাচ্ছে- একেবারে ভাল লাগছে না। এ সমস্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনা লিখতে ইচ্ছা করছে না। ২/১ কলম লিখছি তো ২/৩দিন আর লেখার কোন উৎসাহই পাচ্ছি না। এ লেখা লিখতে কারই বা ভাল লাগবে? জগতে যে আমার একমাত্র বান্ধব, পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা,

পরমআত্মীয়, সুহৃদ, সখা, কি নয় বাবা আমার কাছে-কি ভাবে পাইনি তাঁকে-কি দয়া মায়া করুণা, মমতার ছোঁয়ায় রাখেননি তিনি আমাকে ? সেই বাবার-শুধু আমার বাবার শেষ বিদায়ের দিনের কথা লিখতে-চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে যে প্রাণময় পুরুষের প্রাণোচ্ছ্বল সদা হাস্যময় ছবি-অন্তিম শয়নে শায়িত নীরব নিথর দেহটার সেই দিনের ইতিহাস লেখা, কোন নিষ্ঠুর সন্তানের কাছেও বোধহয় জহ্লাদের কাজের মত মনে হবে। তাই পাঠক বিশ্বাস করুন, ভাল লাগছে না লিখতে, ভাল লাগছে না কলম ধরতে-কলম থেমে যাচ্ছে, গতি শ্লথ হচ্ছে, মন কোন উদাসীনতার ডানায় ভর করতে চাইছে। কিন্তু লিখতেই হবে আমাকে-জানাতেই হবে আমাকে-তুলে ধরতেই হবে আমাকে, সেই সে বিদায় দৃশ্য পাঠকের কাছে, আমি যে তাঁর দাস, দাস শুধু নয় দাসানুদাস। তাই বাবার অন্তিম দৃশ্যের ছবির সঙ্গে আমার জীবনের মোড় ফেরানো, অন্ধকারময় দিনের সূচনা ঘটানোর সেই বিদায়দৃশ্য আবার আঁকতে বসি-কারণ আমাকে যে আঁকতেই হবে, এটাই আমার জীবনের বিধিলিপি।

☞ নাটকীয় অন্তিম ঘোষণা

· চেতনা সবেমাত্র একটু এসেছে কি আসেনি-গমগম করে সেই ঘরের মধ্যে জলদ গম্ভীর স্বরে বাবার কন্ঠস্বর সকলকে একেবারে চমকিত করে, বিস্ময়াহত করে বেজে উঠল-বেজে উঠল মহাযোগীর অন্তিম ঘোষণা-একবার নয়, তিন তিনবার "বিষ্টু ক্রিয়া দেবে - শুকদেব, শিবশঙ্কর ও গোপাল এ্যাসিসট্যান্ট।" ব্যস! এরপর বিরতি-সে বিরতি আর শেষ হয়নি, তা নয়। ঐ নামগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয় জন আমার গুরুভ্রাতা আর তৃতীয়জন বাবার জ্যেষ্ঠপুত্র। ঘোষণার সময়

সকলেই সেখানে হাজির ছিলেন। এর আগে বাবা কয়েকবার আমাকে এই কথা বলতে চেয়েছিলেন-আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, আমিই ওঁকে একথা প্রকাশ করতে দিইনি, কারণ সেই সময় বাবা একথা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ যদি কোনরকমেই একবার করতেন তাহলে-আমার সেদিনের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আজ-তাই লিখছি যে, তাহলে বাবার কষ্ট আরও বাড়ত, বাবার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ সুরু হোত-যেটা সেদিন হয়েছিল, তাতেই মনে হয় মহাযোগীর উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ হওয়া ঠিক হয়নি। তার উপর এই ঘোষণা বাবা করলে, আরও দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হোত।

বাবাকে সব সময়েই একা একা পেতে চাইতাম-বড় ভাল লাগত বাবাকে একা পেলে। একদিন একা পেয়ে বাবাকে বলেছিলাম "বাবা, জগতের যত কঠিন কাজ আছে, দয়া করে আমাকে দিয়ে করান - ক্রিয়ার কাজ আমাকে দেবেন না, ভাল লাগে না।" বাবা হাসতে হাসতে জবাবে শুধু বলেছিলেন, "অত স্বার্থপর হলে চলে? শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে? অপরের কথা ভাবতে হবে না?" তখন তো অত তলিয়ে দেখিনি যে বাবা তো আমার মনের ভাব জেনেই কথা বলেছেন - কাউকে একা একা পেতে গেলে নিজেকেও তো একা হতে হবে, নচেৎ সে একা একা বাবাকে কি করে পাবে? তাই দয়াময় বাবা আমাকে একা করতে চাইলেন। এ যে কি মর্ম্মান্তিক অবস্থা, যা শুধু একা একাই অনুভব করা যায়, কাউকেই অনুভব করানো যায় না-যাবে না কোনদিন। বাবা আমাকে তাই সম্পূর্ণ একাকীত্বে নিয়ে যেতে চাইছেন-ভিতরটা হু হু করতে লাগল। নীরবে নিথর স্পন্দনশূন্য দেহটার দিকে তাকিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে থেকেছি সেই সময়।

আজ আমি বড় একা, আমি আজ আর কারও নই, আমারও কেউ নেই, এ কথা অতীব সত্য। আমার এই আত্মকাহিনী শুনে অনেকেই হয়ত কাব্যরসের আস্বাদ পাবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও একান্ত সত্যি যে, আমার অবস্থা বোঝা খুবই কঠিন। যে একা হয়েছে, সেই বুঝবে, কারণ একা না হলে একাকীত্বের অবস্থা বোঝা যায় না। কিছুদিন আগেই অর্থাৎ বাবার এই নশ্বর দেহ ত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে, আমার গর্ভধারিনী ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন-আমার প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের এই শারীরিক খারাপ অবস্থা তখন আমাকে এমনভাবে চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল যে গর্ভধারিনীর বিয়োগ ব্যথাও আমাকে সেইভাবে মনোযোগী করতে পারেনি, এমনকি মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম্ম যা কিছু সবই আমার দাদা ও ভাইয়েরা মিলে সুসম্পন্ন করেছিল বলা যায়, নামে মাত্র তাদের সঙ্গে আমি লিপ্ত থাকতে পেরেছিলাম — একমাত্র চিন্তা তখন প্রিয় গুরুর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হচ্ছে দেখে। তখন কে ভেবেছিল যে আমার ন্যাড়া মাথায় চুল গজাতে না গজাতেই আমি শুধু মাতৃহারা নয় সর্ব্বহারা হতে চলেছি।

যে কথা বলতে কলম থেমেছিল, সেই ব্যাপারে আবার লিখতে সুরু করতে হল। স্যালাইন চলা অবস্থাতেই বাবার ঘোষণার পর বিরতি ঘটেছিল-এরপরই অর্থাৎ ঐ কথাকটা বলার পরই বাবা যেন কেমন বিস্ময়কর ভাবে ঝিমিয়ে গেলেন আর তারপরের কথা যা বেরুতে লাগল সবই জড়ানো স্বরে। মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন, "বিষ্টু! তুমি কোথাও যাবে না" -একদম আমাকে কাছ ছাড়া হতে দিচ্ছেন না তখন। বাবার বড়ছেলে গোপালদাও সর্ব্বদাই বাবার কাছে রয়েছেন, সমস্ত রকমের ঔষধ ইনজেকশনের ব্যবস্থাও করছেন। বাবা কিন্তু আপনভাবেই তখন চলেছেন - যখনই কোথাও যাবার উপক্রম

করছি, অমনি বাবা বলে উঠছেন "বিষ্টু! তুমি কোথাও যাবে না।" কোনদিন বাবার বাড়ীতে ক্রিয়া পাওয়ার দিন থেকে সুরু করে, বাবার বিছানাতে বসিনি, আর বাবার বাড়ীতে রাতও কাটাইনি, কিন্তু আজ এই রাত্রে বাবাকে এই অবস্থায় রেখে বাড়ী ফেরার কোন প্রশ্নই নেই, তাছাড়া গুরুদেব বারবার কাছ ছাড়া হতে নিষেধ করছেন-এ দৃশ্য দেখা যায় না, কাছে থাকা যে আরও কত কষ্টের কি করে বলি, কাকে বুঝাব? কে বুঝবে আমার এই মর্ম্মান্তিক বেঁধে চাবুক চালানোর ইতিহাস? একমাত্র ব্যথার ব্যথী ছাড়া কাউকে বোঝান যাবে না আমার অন্তরের হাহাকার, মর্ম্মভেদী বেদনার কথা। বাবার ছোট জামাইও সেই সময় কাছে রয়েছে-গোপালদা মাঝে মাঝেই বাবাকে ঠিক ভাবে শোওয়াতে সাহায্য করছে। বাবা মাঝে মাঝে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে বলছেন। সেদিন সারারাত সেই বাড়ীতে বাবার কাছে আমি, অনিল জামাই, গুরুভ্রাতা অমলকর ও পরেশদা আর উপরে দোতালায় গোপালদা, দিদিরা, বৌদিরা খোকন। সারারাত ধরে যোগীন্দ্র পুরুষ অনবরত যোগের গূঢ়তত্ত্ব সকল বলে চলেছেন-আর যখনই আমি উঠতে যাচ্ছি বলে উঠছেন, "বিষ্টু! তুমি কোথাও যাবে না।" কি অকৃত্রিম ভালবাসা, কি সুদৃঢ় অন্তরের টান। সেই ডাকে সারারাত যে অনুভব করেছি-আজও স্মরণে এনে বারবার করছি—করে চলেছি-কাকে জানাব? কে বুঝবে-সেই ডাকে আমার হৃদয়ে কি মধুর অনুভূতি কি আনন্দের জোয়ার জাগাত? কাকে বলব, সেই মধুমাখা ডাক শোনার জন্য যুগ যুগ কান পেতে বিনিদ্র রজনী যাপনেও কোন ক্লান্তি আসবে না আমার? কাকে ডেকে বলব, "ওগো, আমায় সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর শোনাবার জন্য তোমার কাছে ঋণ স্বীকারে রাজী আছি"? চোখের সামনে অমৃতময় মহান যোগীশ্বর পুরুষ, যিনি এতকাল সবার রঙে নিজেকে রাঙিয়েছিলেন, তিনি চলেছেন অমৃতলোকে-সবার মাঝে বেঁচে থাকার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে।

তিনি অন্তিম শয়ানে শায়িত থেকেও ক্ষুদ্র দেহটার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বিন্দু বিন্দু করে অগ্রসর হচ্ছেন মহাসিন্ধুর মহাবিন্দুতে লক্ষ্য রেখে। ভেতরটা শুধু হাহাকার করছে-না পারছি দেখতে, না পারছি পালিয়ে যেতে, না পারছি সহ্য করতে, না পারছি সহ্য না করতে। মনে আসছে বাহ্য জগতে আর এঁকে পাব না কোনদিন, যে জন্য, যাঁর জন্য জাগতিক সমস্ত কিছু আকর্ষণ উপেক্ষা করে-সব বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে-সব কিছু ছেড়ে এই ঘরটাতে রোজ ছুটে আসতাম যে শ্রীমুখের দুটো মধুমাখা কথা শোনার জন্য, যাঁর শ্রীচরণে মাথা নোয়াবার জন্য, যে আলোর ঝর্ণা দেখার জন্য, সারাদিন অফিসে আনমনা হয়ে পড়তাম, বাড়ীতে ছটফট করতাম, তাকে আর এই দেহে তেমন করে পাব না, এই চিন্তা কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। সেই পরম পিতার কথাগুলো বাবার শ্রীমুখ থেকে অনর্গল বার হতে থাকলেও আমি কিন্তু সেগুলো ধরে রাখতে পারছি না কারণ আমার ভিতরে তখন চলছে ঘোর আলোড়ন, চোখের সামনে দেখছি অন্ধকার। কারণ চোখের সামনে দেখছি, যে আমার হাত ধরে এতদিন সর্ব্বদা নিয়ে গেছে-তাঁকে দেখছি আমার হাত তিনি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বাবাকে একদিন বাবার কথার জবাবে বলেছিলাম, "একা হয়ে থাকা মানে বোকা হয়ে থাকা হলেও সেই বোকা হয়েই চলব, তবু একা চলব।" তখন কি জানতে বা বুঝতে পেরেছিলাম ব্রহ্মজ্ঞ বাবাকে সেই কথা বলার ফল এই দাঁড়াবে? প্রথমে গর্ভধারিণী চলে গেলেন, পরে বাবা দেহত্যাগ করলেন, তারপর মোক্ষদাও চলে গেল, এমন কি তার পরের পরিস্থিতিতে মেনকাও চলে গেল। অবশ্য মেনকা আমাকে ছেড়ে একেবারে চলে যাবে, এটা যদিও আমি চাইনি, কিন্তু সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে তাকে সেই পথেই ঠেলে দিল। যারা গেছে, যারা গেল, তাদের কারও স্থান কারও দ্বারা কখনও পূরণ হবার নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হোল ,আমি একা-শুধু একা। মেনকা তো একাই

একশত ছিল-তার বহুমুখী প্রতিভার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু দুরন্ত ক্রোধ, যা তার আচমকাই আসত, দুরন্ত জেদ, যা তার একবার এলে আর ছেড়ে যেতে চাইত না, আর অপরের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব- যাকে সে একবার অসহ্য বোধ করত, মন থেকে কোনদিনই আর সে গ্রহণ করতে পারত না তাকে, এইসব ক্রুটি তাকে বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তা করল, কিন্তু তার সেবা যত্নে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। তার কথা এখনকার মত এখানেই থাক, পরে আনার চেষ্টা করা যাবে। আবার চলে আসা যাক্ মহাপ্রয়াণের দিনের কথাগুলোতে, বিশেষ করে সেই কালরাত্রির কথাতে। কথায় বলে, দুঃখের রাত পোহাতে চায় না। আমারও কালরাত্রি যেন শেষ হতে চায়না। কালরাত্রি এই জন্যই বলছি যে, পরের দিনের সূচনায় সূর্য্য উঠেছিল ঠিকই-কিন্তু সেই রাত্রে, তমসা আরও ঘনীভূত হচ্ছিল। রাত্রে ডাক্তার বললেন একটু প্রস্রাব হলে ভাল হোত। কিন্তু সেই কালরাত্রির কালভৈরব যেন আট ঘাট বেঁধে তৈরী হয়েই এসেছিল। কারণ দেখা গেল, ডাক্তার স্যালাইনের সাথে গ্লুকোজ লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঔষধের দোকানদার ভুল করে গ্লুকোজের বদলে সব স্যালাইন দিয়ে দিয়েছে। দোকানে চেক করার সময়ও ধরা পড়েনি-এমনকি বাইরে এসেও ধরা পড়েনি। কিন্তু যখন ধরা পড়ল, তখন সেটা অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাবার পেট তখন ফুলে উঠেছে-পেচ্ছাব একদম হচ্ছে না। সকাল থেকেই ছোট খাট ভুল ব্যাপার চলছে, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং যাদের চোখে ধরা পড়েছে, তারা তখন বাবার বাড়ীতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁদের নজরে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তারা সে কথা বলতেই পারেনি। কাজে কাজেই সব ব্যাপারটাকে দৈব বলে গণ্য করাই ভাল। তাছাড়া কারই বা কি করার ছিল ওখানে? চোখের সামনে দেখছি, নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখছি এক বেদনাদায়ক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। ক্রমে ক্রমে বাবা অচৈতন্যের

দিকে এগিয়ে গেলেন - আরো-আরও কাছে-তারপর আমাদের কাছে রইল শুধু চিরঅন্ধকার আর হাহাকার হাহাকার আর গুরুভার, গুরুভার আর সংসার-যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সার অসারের সমাহার।

☞ ধর্ম্মের হাটে নবীন সন্ন্যাস

জীবন নাট্যের হাসি কান্নার পাট চুকিয়ে জ্বলন্ত সূর্য্য আগামী প্রভাতে নূতনভাবে উদয়ের ইঙ্গিত দিয়ে অস্তাচলগামী হবার মত, ধর্ম্মের হাটে বাবাও পাটে বসলেন পূর্ব্বাচলে আগামীদিনে নতুন সন্ন্যাসীর উদয়ের ইঙ্গিতে। বাবা ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬২ সাল রাত ৮টায় আমায় ক্রিয়াদানের অধিকার দান করে ২৭শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ২টা ২০মিনিটে নশ্বর দেহত্যাগ করলেন-রেখে গেলেন গুরু দায়িত্বভার আমার উপরে। চোখে তখন ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার-যে অন্ধকার বুঝি কাটার নয়। তাই আজ সে সমস্ত দিনের ঘটনা লিখতে গিয়ে বারবার লেখনী থামে, লেখার মাঝে বিরতি নামে, সামান্য একটু লিখতে ভাটা পড়ে লেখার উদ্যমে। মন চাইছে না এগিয়ে যেতে - তবু যেতে হবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুদন্ড হাত পেতে নিতে- তাই বাবার ইঙ্গিতে পথ চলা সুরু করি আবার।

বাবাও দেহ ছাড়লেন আর আমারও সব হারিয়ে গেল সেই থেকে-হারিয়ে গেল আদর যত্ন এ জীবন থেকে—হারিয়ে গেল খুশীর দিন, ঈদের চাঁদের আশাভরা আনন্দের নওরোজ। শয়তানের দোজাকী দৃষ্টির মত কুলিশ কঠোর ভবিষ্যৎ দিনগুলো যেন হাজারো নাপাক পথে ঠেলে দেবার শুধু অপেক্ষা করছে। তবে এ কথাটা খুব সত্যি যে, যতদিন নিজের একার বুদ্ধিতে পথ চলেছি, ততদিন বাবা নিজে

ভেতরে বসে সর্ব্বদা আমাকে বল, বুদ্ধি সব কিছুই জুগিয়েছেন-আর যেদিন থেকে নানা উপদেষ্টা জুটেছে, বুদ্ধিদাতা জুটেছে, সেইদিন থেকে কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, কোন ক্ষতি নেই, আমি সত্য পথের পথিক হয়ে সত্য বলছি-ঠিক সেইদিন থেকেই আমার চলার পথটাই কন্টকাকীর্ণ হয়ে গেছে এবং বেশ কিছু প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটতে সুরু করেছে। সমস্ত কিছুই জানতে হবে দুর্দ্দৈব - সমস্ত কিছুই দুরদৃষ্ট।

গোপালদা ইতিমধ্যে বাবার মর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। আর একটা মহৎ কাজ গোপালদা ইতিমধ্যে যা করেছেন, তা হল, বাবার ঘরের দেওয়ালে একটা কাগজে বড় বড় করে লিখে বাবার ক্রিয়াদানের অধিকারের কথা টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। গুরু বাবার লেখা ‘‘সাধক সাধনা’’ বই এর প্রথম পৃষ্ঠায় শোক সংবাদ থেকে যার অংশ বিশেষের অবিকল অনুলিপি পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল।

‘‘সকল ক্রিয়ান্বিত বর্গের প্রতি সময়োচিত নিবেদন’’-

(১) বাবার দেহত্যাগের পর শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য (বিষ্টুদা) ক্রিয়া প্রচার করবেন অর্থাৎ দীক্ষা দিবেন। প্রয়োজন হইলে আমি বিষ্টুদার নির্দ্দেশমত তাঁকে সাহায্য করিব।

(২) ....

(৩) ....

(৪) প্রত্যেক কার্য্যে বিষ্টুদার নির্দ্দেশ, পরামর্শ এবং উপদেশই আমরা সকল ক্রিয়ান্বিত বর্গ মানিয়া চলিব।

(৫) বিষ্টুদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বাবা দীক্ষা দিবার অধিকার দেন নাই।

(৬) বাবা অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে সাময়িকভাবে অনেককে দিয়া দীক্ষা প্রদান করাইতেছিলেন, বাবার দেহত্যাগের পর ঐভাবে দীক্ষাদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-

(১)..............

(২) যদি কোন ক্রিয়ান্বিত এই নির্দ্দেশগুলি মানিয়া না চলেন, তবে তিনি ভ্রষ্টাচারী বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহাও বাবার নির্দ্দেশ।

এরপর যে সমস্ত ক্রিয়ান্বিত ও ক্রিয়ান্বিতারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছেলেদের নিয়ে গোপালদার নেতৃত্বে আমরা শ্মশানঘাট অভিমুখে রওনা হলাম। তারপর? তারপর আর কি? চোখের সামনে মহাযোগীর সেই পুণ্যময় দেব দেহটা অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারী ও স্নেহরসের উৎস সেই নশ্বর দেহটা আস্তে আস্তে অনলগ্রাসে পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল-পড়ে রইল শুধু দিগন্তব্যাপী হাহাকার।

বাড়ী ফিরতে অনেকটারাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আকাশে বাতাসে শুধু অনুভব করছিলাম এক দিগন্তব্যাপী শূন্যতা শূন্যতার আবরণে মোড়া বুক ফাটা বোবা কান্নার জ্বলন্ত অনুভূতি । কি রকম একটা যেন রিক্ততাবোধ কি যেন হঠাৎ হারিয়ে চলে এলাম-কি যেন একটু আগেই কাছে ছিল, পাশে ছিল, ছিল মনের গোপনে, ছিল স্পর্শে, গন্ধে, রূপে, রসে, বাহ্যিকে ও অভ্যন্তরে-সে যেন হঠাৎ

করে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজে কোথায় মিলিয়ে গেল। চারিদিকে শুধু তারই রেশ ছড়িয়ে আছে-সে কিন্তু নেই—চারিধারে শুধু তারই স্মৃতি জাগরূক রয়েছে-সে শুধু অরূপ হয়েছে-চারিপাশে যেন তারই শ্বাসের স্পর্শ কানে কানে ফিস ফিসানি তুলে বলে চলেছে আমি আছি, আমি ছিলাম, আমি থাকব চিরকাল, চিরদিন। কিন্তু হায়, খুঁজে তারে না পাই কাছে, সে শুধু বিলীন।।

ক্রমে ক্রমে শ্রাদ্ধবাসরের কাজ কর্ম্ম মিটল। কিন্তু তারপরই এল সেই বাস্তবতার সংঘাত-প্রকটিত হল সেই সে অব্যর্থ বাক-

"চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।।"

সত্যই পরিহাসই বটে! গোপালদা বাবার আদেশ ও নির্দ্দেশ নিজে লিখে প্রচার করার পরও বললেন যে বাবার বাড়ী গিয়ে আমাকে থাকতে ও সেখান থেকেই ক্রিয়া প্রচারের কাজ করতে। গুরুদেবের নির্দ্দেশ মেনে আমার উপলব্ধিতে যা এসেছে, তাতে আমি গোপালদার কথায় রাজী হইনি। অবশ্য এ ইঙ্গিত বাবা পূর্ব্বেই তাঁর জীবদ্দশাতেই আমাকে দিয়ে রেখেছিলেন যে "বিষ্টু! দেখবে একদিন এই বাড়ীটা খন্ডিত হয়ে যাবে, একটা হবে গোপালের অংশ "গোপাল ধাম", আর একটা হবে খোকনের অংশ "খোকনধাম"। ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয়না। বর্ত্তমানে ঠিক তাই তো হয়েছে। এখন তো বাবার বাড়ী বলে কিছু নেই, সেটা তো অতীতের ব্যাপার। তাই বাবার বাড়ী যাওয়াও হয়ে ওঠে না, কারণ তাঁর বাড়ীর তো কোন অস্তিত্বই নেই। তাই ভাবছি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাক্য নিষ্ঠুর মনে হলেও কি অমোঘ! কি অব্যর্থ!

ক্রিয়া প্রচারের দায়িত্ব যখন গুরুদেব কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর আদেশ তো পালন করতেই হবে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে, কারণ আমার তো কিছু করার নেই। এই নিয়ে কত সোরগোল সুরু হল বাবার শেষকৃত্য অর্থাৎ পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে। কোথায় চলে গেল বাবার আদেশ, নির্দ্দেশ ও নির্দ্দেশ মানার মানসিকতা। কারণ ঠিক কাজ মেটার পরই বাবার অতি আদরের ক্রিয়ান্বিত শিবির মূলতঃ দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। কত আপনজন পর হয়ে গেল। কিছু স্বার্থলোলুপ ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য আমাকে ত্যাগ করতে এতটুকু চিন্তা করল না। শুধু দয়াল বাবা আমাকে অন্তরে বাইরে অবিচল রাখলেন। বাবা অবশ্য এ ব্যাপারে আগেই আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ''বিষ্টু! যেদিন 'আমি বই হবে এই দেহটা' সেদিন দেখবে, কত জন স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠবে, ধর্ম্মের গ্লানি সুরু হবে''। ঠিক তাই তো হয়েছে, মহাপুরুষের অমোঘ বাণী মিথ্যে হয়নি। মিথ্যা হয়েছে শান্তির ললিত বাণী শোনাবার চেষ্টা। মিথ্যা পরিহাসে আজ পরিণত হয়েছে আদেশ ও নির্দ্দেশ পালনের সাময়িক প্রতিশ্রুতির দিনগুলো - বাস্তব পরিবেশে এসে যা আজ বিবর্ণ মলিন, দীনহীন স্বমূর্ত্তিতে দেখা যাচ্ছে। হায়রে! আমাদের পোড়া কপাল! কাঁচ কুড়িয়ে যতন করে আঁচলে বাঁধছি, বুকে জড়াচ্ছি রত্ন ভেবে, অমৃতের আস্বাদ গ্রহণে কোন যত্ন নেই।

আজ তাই দেখছি যে বর্ত্তমানে জনসংখ্যাও যেমন হু হু করে বাড়ছে, শ্রীশ্রীকাশীর বাবার ক্রিয়ার নাম শুনে ক্রিয়া নেবার আগ্রহও বাড়ছে - ক্রিয়াদানের অনেক শাখাও বাড়ছে-উপশাখাও তৈরী হচ্ছে, ক্রিয়াদানও সমানে চলছে। ভেজালের বর্ত্তমান যুগে গুরুগিরিতেও ভেজাল সুরু হয়েছে গুরুতররূপে-কেউ কেউ দেখছি এতদূর এগিয়ে গেছে যে আমার পরমপূজ্য পিতৃস্বরূপ গুরুবাবাকে মিথ্যা ভাষণে

ভূষিত করে বলতে সুরু করেছে যে, বাবা নাকি স্বপ্নে তাকে ক্রিয়াদানের আদেশ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্য্য হই শুনে যে, যে উচ্চতর সোপানের ক্রিয়াদান পুরোপুরী গুরুমুখীবিদ্যা, তাও নাকি বাবা স্বপ্নে দান করার আদেশ দিচ্ছেন তাদের।

দয়াল বাবার গড়ে দেওয়া শিবিরে বাবার ক্রিয়ান্বিত বর্গ প্রায় সকলেই আমরা রয়েছি-কয়েকজনই শুধু দূরে চলে গেছে বাবার নির্দ্দেশ না মেনে। তাই বাবার মহাপ্রয়াণের পর গ্রাম বাংলার প্রতিটি কোণে ক্রিয়ান্বিত ক্রিয়ান্বিতাদের আমন্ত্রণে ক্রিয়া প্রচারের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি-স্বইচ্ছায় নয়, তাদেরই আমন্ত্রণে। আর উপরোক্ত ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে চলেছি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে এবং প্রচ্ছন্নভাবে। আশ্চর্য্য হয়েছি ও হচ্ছি বাবাকে নিয়ে বাবার নামে এই প্রহসন দেখে। খুবই অবাক হয়ে ভাবছি যে এরা এদের পরিণতির কথা একবার ভেবে দেখে না? খুব দুঃখ হয়। কিন্তু কি করব? অধর্ম্মের স্রোতে, গ্লানির কালস্রোতে এরা ভেসে চলেছে-নীরব সাক্ষী হয়ে শুধু দেখে যাচ্ছি - সেটাই বাবার আদেশ ছিল - তাই বাবার আদেশই শুধু পালন করে যাচ্ছি।

বাবার অমৃতময় বাণী মনে পড়ে যায়, "বিষ্টু! যে যা করতে এসেছে করবে-বাধা দিওনা, তুমি শুধু দেখে যাও।"

দেখেই তাই যাচ্ছি বাবা, তোমার হুকুম মত, তোমার কথামত শুধুই দেখে যাচ্ছি। কিন্তু তোমার নাম নিয়ে যারা এই সমস্ত কাজ করছে, তাদের উদ্দেশ্যে তোমার সন্তান হয়ে বলছি, "এরা কেউ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এতটুকু সন্ধান পায়নি,-তাঁকে এরা এতটুকু জানে না, চেনে না, বোঝে না, কারণ তোমার শিক্ষায় শেখা কথা বলছি ব্রহ্মজ্ঞ

পুরুষ কখনও দুরকমের কথা বলে না। ব্যস! আর কিছু বলতে চাই না।''

বাবাগো! আমি তোমার দাসানুদাস হয়ে থাকতে চাই। জানি না তুমি আমাকে আরও কত কি দেখাবে? কিন্তু আমাকে তো কিছু করার হুকুম দাওনি তাই প্রার্থনা, যা করবার তুমিই করো। আমি যেমন তোমার দাস, ভৃত্য, সেবক আছি তেমনই থাকতে চাই। এটুকু কৃপা করো, যখন যেভাবে যেমনভাবে চালাবে তাই চলব, শুধু এটুকু মিনতি যে, ছেলের হাতখানা তুমি ধরে রেখো-আমার পা যেন কখনও বেচালে না পড়ে। যেমন ভাবে শিখিয়েছ ঠিক তেমনভাবেই যেন জীবনের বাকী কটা দিন চলে যেতে পারি আর তোমার দেওয়া কাজ যেন মনপ্রাণ দিয়ে করে যেতে পারি। আমার ভিতরে যেন কোন নাম যশের লোভ না আসে, কারণ এ সমস্ত তো বহুপূর্ব্বে তোমার পায়ে জমা দিয়ে দিয়েছি - ও দিকে যেন নজর না যায়-ফেলে দেওয়া থু থু যেন চাটতে না হয়। ভ্রান্তিরূপে কখনও যদি আচ্ছন্ন করে থাক, তা যেন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়; প্রারব্ধ বশে যদি কর্ম্ম কিছু করতেই হয় তোমার কৃপায় তা যেন নিরাসক্ত ভাবে সম্পন্ন হয় কোন আসক্তি যেন না থাকে। আর কখনও যদি আসক্তি আসে, তা যেন তোমার কথায়, তোমার কাজে, তোমার সেবায়, এককথায় তোমার পূজায় উৎসর্গীকৃত হয়ে আমার এ ছোট জীবন তরণীটাকে সবেগে ভাসিয়ে তোমার শ্রীচরণে পূর্ণাহুতি দিয়ে পরিপূর্ণ জীবনে যেন উত্তরণ ঘটায়।

জয় গুরু জয় দে
জয়ী হবি জয় দে।।

****

পরিশিষ্ট

'কানু ছাড়া গীত নেই' — একটা প্রবাদ। বৃন্দাবনে রাধা নেই, ভগবান আছে ভক্ত নেই, মাথা ব্যথা আছে মাথা নেই-কথাগুলো স্থান কাল পাত্রের অপবাদ, এগুলো মিথ্যা, তা আবার হয় নাকি? তেমনি আমার দয়াল গুরুবাবার শ্রীদেহ থাকার শেষের দিনগুলোতে বাবা আছেন অথচ তাঁর সেই দিনগুলোর ছায়াসঙ্গী নেই, লীলাসঙ্গী নেই, একথা অন্ততঃ ঐ রসরাজের জীবনকাব্যে অর্থহীন, অবাস্তব। ঐ সব চরিত্র গুলো বাবার কৃপায় তাঁর চরণে স্থান পেয়ে, লীলারস পান করেছিল কিনা জানিনা, অথবা হয়ত তারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের সংস্কারে বাবার লীলাকারাগারে বাবারই ফন্দিতে বন্দী হয়ে দাস্য, সখ্য, মধুর ইত্যাদি নানাভাবের ভঙ্গিতে, কখনও ইঙ্গিতে, কখনও সঙ্গীতে, কভু বা প্রত্যক্ষে কভু বা পরোক্ষে, বাবার ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকে কত ভাবে বাবাকে কাছে পেয়েছে, সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, কত হাল্কারসে ভেজানো গভীর ব্যঞ্জনাময় তত্ত্বকথার বাণী শুনেছে বা শোনার সৌভাগ্য তাদের বাবা দিয়েছেন কিনা তাও জানিনা, কিন্তু এটা জানি বা মানিও যে আমি বাবার শ্রীদেহ ছাড়ার দিনগুলো লেখনীতে আনতে যে কি যাতনা অনুভব করেছি-কতদিন কত কষ্টে বাবা দয়া করে লিখিয়ে নিয়েছেন, সে শুধু আমিই জানি। অন্যকে বোঝান যাবে না আর বিবশ মনের ভুলে ঐ চরিত্রগুলোর কথা ভুলে গেছি। এদের কথা না লিখলে, এদের উল্লেখ অবহেলা করলে সমগ্র লেখাটার অঙ্গহানি ঘটবে, এদের বাদ দিলে মনে বাদানুবাদের ঝড় উঠবে, তার চেয়ে প্রত্যবায়ের দায় এড়াতে ভুলো মনকে দায়ী করে দায়বদ্ধতার দায় শেষ করি।

উল্লেখ্য চরিত্রগুলোর নামও কি সুন্দর? প্রদীপ, ওরফে প্রদীপ পাল ওরফে বাবার বিদেশমন্ত্রী অর্থাৎ বাইরের জগতের যাতায়াতগত, যত্রতত্র প্রয়োজনে অনবরত কাজের কাজী, বাবার ডাকে কখনও 'দাদুভাই', কখনও 'পাজী' — এই চরিত্র বাবার দেহান্তের দিনে বিকাল থেকে সারারাত এমন কি পরদিন সকালেও জান বাজী রেখে ডাক্তার আনা, ঔষধ আনা, স্যালাইন আনা ইত্যাদি পরিশ্রম করতে এতটুকু গরবাজী তো দূরের কথা চড়কী বাজীর পাকের মত ঘর ও বার সামালের পাকের বাজীগরের বাজি দেখিয়ে দাদুর সেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। এই অধমও বাবার ছায়া সঙ্গীদের ভালবেসে ফেলেছে, গুরুর প্রতি একাত্ম হয়ে, একান্তভাবে আপনজনের প্রতি সেবার পরাকাষ্ঠা দেখে। শ্রীচরণে তার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি। দ্বিতীয় চরিত্র প্রদীপের ভাই সন্দীপ। দাদুর সেবায় সন্ধ্যা আরতির সন্ধ্যাদীপ। দাদুর আপাত কষ্ট, দুঃখবেদনায়, আপাত অসহায়তার স্রোতের তরঙ্গে দাদুর পা রাখার ব-দ্বীপ। সেবায়, যত্নে, তুষ্টিদানে পারঙ্গম পরম সখা। বাবা যেন হয়ে পড়তেন অসহায়, মূহুর্ত্ত যদি না পান দেখা, এই চরিত্রই আমারও দেখা — বাবার আর এক ভক্তের, বাবার একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সখারূপী সেবকের, তাহল এই সন্দীপের।

এই সেবকটিকে দেখেছি নিজের হাতে বাবার মলদ্বার থেকে কোষ্ঠবদ্ধ মল বের করতে, দেখেছি, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে সুরু করে বিছানা করা, কাপড় পড়ান, হাওয়া করা ইত্যাদি গুরু সেবার নানা ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে। আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের গুরুসেবা করতে অর্থাৎ ক্রিয়া করতে যেতে-দেখেছি সখারূপে চুরি করে সখার গড়গড়ায় তামাক টেনে, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে তৎপর হ'তে। আবার বুজির বাবার কাছে ধরা পড়ে সখারূপী গুরুর কাছে

পিতৃশাসনের ভবিষ্যৎ শাস্তির ভয়ে জড়সড় হতে। দেখেছি বাবার একান্ত প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত গুরুকে প্রদত্ত নানা অর্ঘ্যের সঞ্চয়কে বেহিসাবী খরচের খাতায় না যেতে দিতে — কর্ম্মকুশল হতে আবার দেখেছি অধাত্ম গুরুর কাছে ক্রিয়া জগতের নানা রহস্যের কথা শুনতে উৎসুক হতে। এরা তিনজন, প্রদীপ, সন্দীপ, বুজি ছিল বাবার কাছে Big three forces অর্থাৎ মহান ত্রিশক্তি। অন্য ক্রিয়ান্বিত ক্রিয়ান্বিতারা সবাই জানত এরা বাবার পার্শ্বচর, সহচর, দাদুর কাছে কখনও নাতি, কখনও বন্ধু, কখনও বা সেবক, কখনও শিষ্য আবার কখনও কিশোর মনে খেলাচ্ছলে বাবার কাছে স্থূলদেহে মজা করে ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির, কারণ এরা শুনতে ভালবাসত দাদু তথা বন্ধু তথা অন্তরঙ্গ সখার গালাগালগুলো- যার অধিকাংশ বাণীই ছিল, হারামজাদা, ছুঁচো, ঢেমনা অথবা পাজি। কত লিখব এদের কথা — বাবার অন্তিমদিনে দেখেছি এদের বিরহ ব্যথা-আজও অনুভব করি এরা যখন আমার কাছে কখনও কখনও বাবার কথা উঠলে খুলে দেয় এদের স্মৃতির পাতা।।

তৃতীয় চরিত্র বুজি ওরফে অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে 'ভোঁস'। অর্থাৎ মোষের মত হঠাৎ হঠাৎ বাবার পাছা ডলতে ডলতেই হয়ত ভোঁস ভোঁস নাসিকাধ্বনিতে ঘুমিয়ে পড়ত-তাই স্নেহের ডাক নাম ভোঁস। ভূর্জ্জপত্রের মত স্বচ্ছ ধারালো মনের কিশোর অনন্ত দেহধারী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী গুরুদেবের আর এক স্বভাব শান্ত ভক্ত। অনিত্য সংসারে থেকে অনন্তের সন্ধানের অনন্ত ইচ্ছা নিয়ে অনন্তদেবের একান্ত অনুগত, গুরুসেবায় প্রাণ যার গুরুগত, সেই কিশোর শিষ্য অনন্ত ছিল আমার গুরুবাবার আর এক লীলাসঙ্গী। সবার কাছে প্রিয় যার গুরুবাড়ীতে মেলামেশা কথাবলা, চলাফেরার ভঙ্গি। বাবার কাছে

বলা যায় ২৪ ঘন্টার একান্ত সঙ্গী, কখনও বন্ধু, কখনও সখা, কখনও শিষ্য, কখনও বা উপরের ক্রিয়ার সঙ্গী। অর্থাৎ রাত্রে গুরুবাবা সবাই চলে যাবার পর পরম স্নেহে বাবার নিজের কাছে এদের জন্য লুকিয়ে রাখা মিষ্টিগুলো, দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এদের চুপি চুপি খেয়ে নিতে বলার ফন্দি, বাবা একেই বলতেন 'উপরের ক্রিয়া'- রসরাজের কথার ধরণ ছিল ঐরূপ। বাবার এই 'ভোঁস' সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত দাদুর অর্থাৎ গুরুসেবায়, গুরুর কাজে ছিল নিষ্ঠাবান ও তৎপর। ভোর ৫টা থেকে ৮টা গুরুদেবের পদসেবা, তারপর পায়খানায় জলদেওয়া, দুধ বিস্কুট প্রাতঃরাশ খাওয়ানো, স্নানের জল রোদ দেওয়া, তামাক সাজা ইত্যাদি নানা প্রকার গুরুর সেবার কাজ হাসিমুখে স্বেচ্ছায় করে যেত। ওরই মধ্যে ক্রিয়া করার সময়ও ছিল ঠিক সময়ে। এক কথায় গুরুগৃহে বাস করার শাস্ত্র সম্মত প্রণালী এইটুকু ছেলেগুলো যেন মুখস্থের মত করে যেতো। বিশেষ করে বাবার অসুস্থতার দিনগুলোতে এদের গুরুসেবা, কর্ত্তব্যবোধ লিখে শেষ করা যাবে না। এরা সকলেই আমারও প্রিয় আর ওরাও আমাকে প্রচন্ড ভালবাসে। ঠাকুর বাড়ীতে আরও অনেকে ২/৪দিন আসত, থাকত, কিন্তু ধোপে টেকেনি-এদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। বাবা একদন্ডও এদের কাছ ছাড়া করতে চাইতেন না-অবশ্য গোপালদা ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক-চারিদিকে লক্ষ্য রাখতেন — কারও অসুস্থতায় সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিতেন- সকলকে শাসনে রাখতেন আবার স্নেহ ভালবাসা দিতেন অপ্রতুল ভাবে।

বাবার শ্রীদেহ ত্যাগের পর শান্তির নীড়টাই আমাদের ভেঙ্গে গেল। কি জানি কি ঘটল-গোপালদা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু হলো না। হয়ত বা দোষটা আমারই হবে — বুঝতে

পারিনা। বাবার ছোট ছেলে খোকনও ছিল আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।কিন্তু আমরা খন্ডকালে বাস করিতো, তাই সেই সম্পর্ক কালের বশে আজ খন্ড খন্ড। তবে সন্দীপ, বুজি, প্রদীপ তাদের ভালবাসার দীপ জ্বেলে আজও আমার কাছে রয়ে গেছে, রয়ে গেছে দাদুর স্নেহের ছায়া আমার মধ্যে দেখার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা বুকে নিয়ে।

বাবাকে হারানো তো আমার কাছে শক্তিশেলের মত মনে গেঁথে আছে, এদের কাছে পেয়ে একদিকে যেমন বাবার স্মৃতি মনে ভাসে, সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রতি আমর কর্ত্তব্যের কথা লেখনীতে আসে — তাই এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। জানি এদের উপস্থিতি মেটাবে না বাবাকে পাওয়ার তেষ্টা, তবু সর্ব্বহারা না হয়ে আনন্দধামের বাবার ২/৪জন লীলাসঙ্গীকে কাছে পেয়ে সিন্ধু বিনে বিন্দুপানে আনন্দ পাওয়ার প্রচেষ্টা। লীলাময়ের শ্রীদেহ হয়েছে পঞ্চতত্ত্বে লীন, বাবার শ্রীদেহের বিরহ মনে প্রাণে হয়ে আছে অর্ন্তলীন, মণিহারা ফণীর মত দেহমনের স্মরণসীমায় 'মণির' স্মৃতি বেহাগের ঝঙ্কারে বাজায় করুণবীণ তাই আজ আমি বাইরের জগতে পিতৃহীন হয়ে, কাঙ্গালরূপে মিনতি জানাচ্ছি তাঁরই কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে —

''ক্ষমা করো সব অপরাধ মোর,

আমি যে সন্তান তব,

হই যদি অকৃতজ্ঞ,

হই যদি দীনহীন।''

- সমাপ্ত